মাতৃমঙ্গল

জন্ম বিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ

(পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

আবুল হাসানাৎ

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের
ভূমিকা সম্বলিত

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

সরকারী চাকুরীর বিরল অবসরের মধ্যেও সামান্য সংখ্যক যে কয়জন সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন বর্ত্তমান লেখক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গলার পাঠক সমাজে তিনি ইতি-পূর্ব্বেই সুপরিচিত সুতরাং তাঁহার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই ভূমিকা লিখিতেছি না।

শিশুমঙ্গল আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের চিন্তাশীল জনগণের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। জাতিকে প্রাণবন্ত এবং উন্নতিশীল দেখিতে কাহার না সাধ হয়? ইউরোপ ও আমেরিকায় এই সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশে এই আলোচনা পরিত্যক্ত হইয়াই আসিতেছে। ইহাকে শুভলক্ষণ বলা চলে না। গতানুগতিক পথে চলাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা শোচনীয় দুর্ব্বলতা। ইহার ফলে জাতির ভবিষ্যৎ যাহারা তাহাদের মঙ্গল কিসে হইবে সে আলোচনা পর্য্যন্ত দোষাবহ মনে করা হইয়াছে।

"মাতৃ-মঙ্গল, জন্ম-বিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ"—পুস্তকখানিতে এই বিষয়ে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি অতি সহজ ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। আমার মনে হয় বাঙ্গলাদেশে এই ধরণের তথ্যবহুল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুলিখিত পুস্তকের প্রয়োজন আছে এবং আমাদের দেশে গ্রন্থখানির আদর হইবে।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়

২৮-৮-৪১

মুখবন্ধ

আমার "যৌনবিজ্ঞান" পুস্তকখানার মূল সংস্করণ ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত হয়। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ ইহাকে সাদরে গ্রহণ এবং ইহার প্রশংসা করেন। ইহাকে আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম ; কারণ, আমি যে নূতন এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা এযাবৎ এদেশে প্রায় নিষিদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ এবং বিশেষতঃ স্যার পি, সি রায়ের মত মনীষী আমাকে উৎসাহিত করিয়া জোরালোভাবে চিঠিপত্র লেখেন। মানব-জন্মপদ্ধতি এবং গর্ভস্থ বিকাশোন্মুখ জীবকে—যিনি ভবিষ্যৎ জীবসমূহের জন্মদাতা—বাঁচাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নরনারীর নির্ভুল জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করেন। অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের দরুন কত অগণিত, নিরীহ প্রাণী যে নিষ্ঠুরভাবে অহরহ আমরা বলি দিতেছি তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া ওঠে! মানবতার এই বিরাট মৃত্যুযজ্ঞ আমাকে বাস্তবিকই ভাবাইয়া তুলিয়াছিল ; তাই এইরূপ একখানি পুস্তক লিখিব ঠিক করিয়াছিলাম। এতদিন পরে এই গ্রন্থখানি পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

পুস্তকের মালমশলা, ভাবধারা এবং গঠনপারিপাট্যের দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল বেশী। আমার পূর্বরচিত "যৌনবিজ্ঞান" গ্রন্থ হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছে যথেষ্ট ; নূতন এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণমূলক আলোচনাও আমাকেই করিতে হইয়াছে অনেকক্ষেত্রে। পুস্তকের অধিকাংশ বিষয়বস্তুর সুবিন্যাস করিয়াছেন মোঃ আনোয়ার হোসেন।

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র দে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় এবং অকাতর পরিশ্রম করিয়া পুস্তকের পাণ্ডুলিপির প্রত্যেকটি শব্দ সমালোচনার সূক্ষ্ম মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া আমাকে অপরিমিত সাহায্য করিয়াছেন। এই সংস্করণের চিত্র সংযোজনায় পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন ডাঃ মদন রাণা, প্রণব বিশ্বাস।

পুস্তকের স্থানবিশেষে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের কথা আলোচিত হইয়াছে। পাঠকা পাঠিকারা সংস্কারমুক্ত হউন ইহাই আমার উদ্দেশ্য। আশা করি এই পুস্তকপাঠে অন্ধবিশ্বাসের স্থলে তাঁহাদের মনে বৈজ্ঞানিক সত্য দৃঢ়মূল হইবে।

দেশগৌরব আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি (১) আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, (২) পুস্তকে আলোচিত বিষয়ে তাঁহার অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন এবং (৩) একটি অতি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পাঠক পাঠিকারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমূহের খবর দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। আরও পূর্ণাঙ্গ এবং প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে তাঁহাদের উপদেশ সাদরে গৃহীত এবং কৃতজ্ঞভাবে বিবেচিত হইবে।

অনেক সংবাদপত্র এই পুস্তক হইতে স্ব-স্ব প্রয়োজনানুযায়ী গৃহীত প্রবন্ধাদি পূর্বাহ্ণেই প্রকাশ করিয়া উহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য পত্র পত্রিকা সম্পাদক এবং গ্রন্থকারগণও এই পুস্তকের অংশবিশেষ ঋণ স্বীকার করিয়া ছাপিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন। সাধারণভাবে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুমতি দেওয়া গেল।

এই সংস্করণে মূল সংস্করণ অপেক্ষা বিষয়সমূহ ও চিত্রসম্ভার 'প্রায় দেড়গুণ পরিবর্ধিত হইল। সর্বশেষ তথ্যাবলী সংশোধিত হইয়াছে।

আশা করি এই নগণ্য পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে শিক্ষিত সমাজ ঠিক সেই ভাবে উহাকে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। নিজের জন্মের উপর আমাদের কোন হাত ছিল না, কিন্তু যে মানববংশ আমাদিগকে অবলম্বন করিয়া ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইতেছে তাহাদের মঙ্গলবিধানার্থে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

১লা সেপ্টেম্বর
১৯৫৫

বিনীত
আবুল হাসানাৎ

বিষয় সূচী

মাতৃমঙ্গল

(১)

জীবনীশক্তির বৈচিত্র্য

প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্য

প্রকৃতি একটা বিপুল রহস্য-ভাণ্ডার। ইহার সৃষ্টি-রহস্য আরও বিচিত্র। সৌরজগতের শত সহস্র গ্রহ উপগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার মধ্যস্থ কোটি কোটি অণু-পরমাণু একটা বিরাট শক্তি-রহস্যের নিদর্শন। বিরাট রহস্যের এই লীলাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র আবার জীবন রহস্য। মানুষ বিজ্ঞান সাধনার বলে যে সমস্ত জটিল কলকব্জা আবিষ্কার করিয়াছে, প্রকৃতির জীবন-শক্তির বৈচিত্র্যের তুলনায় তাহা কত ক্ষুদ্র ও নগণ্য! প্রকৃতির ভিতরকার জীবনী শক্তি প্রতি মুহূর্তে কি বিচিত্র উপায়ে আত্মবিকাশ করিতেছে! ক্ষুদ্রতম জীবাণুও যে কত বিরাট জীবনী-শক্তির আধার তাহার প্রমাণ পাই আমরা কেবল তখনই যখন একটি মাত্র জীবাণুকে অল্পক্ষণে অনুরূপ জীবনী-শক্তি সম্পন্ন অসংখ্য জীবাণুর জন্ম দিতে দেখি।

জীবন-তথ্যের সর্বাপেক্ষা রহস্যময় ব্যাপার জন্ম-প্রকরণ। মানুষ এতদিন ইহাকে অজ্ঞেয় বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। এখনও এ বিষয়ে তাহার জ্ঞানোন্মেষ মাত্র হইতেছে। বিজ্ঞানের আলোকে যতটুকু ধরা পড়িয়াছে আমরা এখানে তাহারই পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

জীবন কি ?

জীবনের ঠিক লক্ষণ নির্ধারণ করা দুষ্কর। যদি বলা হয় 'গতিই জীবন', তবে নৌকার গতি বা চায়ের কেতলির ঢাকনির আলোড়নকে আমরা জীবন বলি না কেন ? যদি বলা হয় 'বৃদ্ধিই জীবন' তাহা হইলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায় কি ? জড় পদার্থও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং অন্যান্য কারণে অনেক সময়ে অণু-বিন্যাসের ফলে বৃহত্তর পিণ্ডে পরিণত হইতে পারে। যথা, জল জমিয়া বরফ হইলে অথবা লৌহ প্রভৃতি ধাতু উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে।

তবে জীবন কি ?—এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর কোন পণ্ডিতই আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। তবে কোনও দেহে প্রাণ থাকিলে, এককালীন পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা আমরা তাহা বুঝিতে পারি ঃ যথা—(১) স্বকীয় শক্তিবলে স্পন্দন-ক্ষমতা (movement); (২) বোধশক্তি (sensation) বা উদ্রিক্ত হইলে প্রতিক্রিয়া-জনিত স্পন্দন (response or irritability to stimuli); (৩) খাদ্য সাহায্যে দেহ-পোষণ-ক্ষমতা (nutrition); (৪) বৃদ্ধি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তি ক্ষমতা (growth); এবং (৫) বংশ-বৃদ্ধি (reproduction)।

'জীবন' তাহা হইলে কি ? উহার ঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া না গেলেও আমরা অনুভূতির সাহায্যে 'জীবন' সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারি। মোটা-মুটিভাবে বলা যায়—**যাহা অন্য সদৃশ বস্তুর জন্মদান করিতে পারে তাহাই 'জীবন'**। এই হিসাবে গাছপালারও জীবন আছে, আচার্য জগদীশ বসুর মতে, তাহাও মানিতে হইবে।

অঙ্গচালনা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, পরিপোষণ, বর্ধন ও প্রজনন এই পাঁচটিই সাধারণ জীবন লক্ষণ।

জীবনের সূত্রপাত—ধর্মীয় ও উপকথা মূলক

এই ধরাপৃষ্ঠে কি ভাবে জীবনের সূত্রপাত হইল এই প্রশ্ন চিরকালই পণ্ডিতদের নিকট এক বিষম ধাঁধার মত রহিয়া গিয়াছে। উৎসুক মানবজাতিকে এ প্রশ্ন হইতে নিরস্ত করা যায় নাই। গবেষক ও মহাপুরুষেরা চিন্তা করিয়া নানাভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মেই এ বিষয়ে কোনও না কোনও মতবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণ লোকেরা উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে ; বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু গবেষণা করিয়াই চলিয়াছেন।

অনেকের ধারণা অনন্ত অসীম ঈশ্বর (যিনি অনাদি কাল যাবৎ বিরাজমান আছেন) কোন এক মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পরিকল্পনা করেন এবং তাহারই ইঙ্গিতে জড় জীব উদ্ভূত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রথম জড়পদার্থ সৃষ্টি করেন এবং পরে তাঁহার ইচ্ছায় ধরাপৃষ্ঠে প্রাণবান পদার্থ আবির্ভূত হয়। কাহারও মতে ঈশ্বর প্রথমতঃ অসীম শূন্য এবং সৌরজগৎ, পরে পৃথিবী এবং উহার পৃষ্ঠে অবস্থিত সাধারণ জীবজগৎ এবং সর্বশেষে মানবজাতি সৃষ্টি করেন। ইহুদী, খৃষ্টীয় এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেদের ধারণা এ সম্বন্ধে মোটামুটি একই রকমের।

প্রায় সকল ধর্মমতেই প্রকৃতিকে কোন এক বা একাধিক স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশলের নিদর্শন বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। সৃষ্টের আকার, প্রকার ও বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী স্রষ্টা। তিনি যাহা চাহিয়াছেন তাহাই হইয়াছে ; তাঁহার ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই এবং হইতেও পারে না। প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ইহা অতি সহজ। প্রকৃত পক্ষে এটা কিন্তু উত্তর নয়, প্রশ্নকে এড়াইয়া যাওয়া মাত্র। কেন, কোন্ অভাব-বোধ-বশতঃ তাঁহার সৃষ্টিবাসনা উদিত হইল, যিনি অনন্ত ও পূর্ণ তাঁহার অভাব বোধ কি করিয়া হইতে পারে, সৃষ্টির পূর্বে তিনি কি অবস্থায় ছিলেন, যিনি এক সময়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, পরে সক্রিয় হইয়া সৃষ্টি করিলেন, তিনি পরিবর্তনশীল এবং যাহা পরিবর্তনশীল তাহাই বিনাশশীল, কিন্তু তাঁহাকে ত অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ প্রভৃতি বলা হয় ; সৃষ্টির পরে, তাঁহার দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া, তিনি আর কেমন করিয়া 'অনন্ত' থাকেন ; তাঁহার সৃষ্টিতে এত অপূর্ণতা ত্রুটি, দুঃখ, কষ্ট, অন্যায়, অবিচার, অমঙ্গল কেন— এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া মুশকিল।

বৈজ্ঞানিক মতবাদ

বৈজ্ঞানিকেরাও সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে সহজ ভাবেই উত্তর দিয়াছেন। **বিবর্তমান প্রকৃতির ক্রম বিবর্তনে প্রাকৃতিকভাবেই জড়-জগৎ হইতে জীব-জগতের উদ্ভব হইয়াছে** ; বাহিরের কোন সৃষ্টিকর্তার ধারণা না করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না।

বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের মতে অন্য কোনও জগৎ হইতে জীবন-কণা উল্কার মারফতে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই মতবাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবন-কণার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার ব্যাপারটাকেই হয়তো সমর্থন করে

মাত্র। আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, এবং উহা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, এই ধরাপৃষ্ঠেই প্রথমতঃ জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

পণ্ডিতেরা মনে করেন পৃথিবীর বয়স প্রায় ২০০ শত কোটি বৎসর এবং প্রায় ১৭০ কোটি বৎসরে ইহা শীতল হইয়াছে। সুতরাং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পৃথিবী শীতল হওয়ার পরে ইহা জীবজন্তুর বাসের উপযোগী হইয়াছে তাহা হইলে মোটামুটি ৩০ কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণীর জন্ম হয়তো সম্ভবপর হইয়াছিল। মানুষের জন্ম হইয়াছে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ বৎসর পূর্বে।

ইঁহাদের মতে পৃথিবী একটা উত্তপ্ত পিণ্ডবৎ ছিল। এই উত্তপ্ত পৃথিবী ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া কঠিন অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তপ্ত অবস্থায় পুঞ্জীভূত বাষ্পরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ছিল। পৃথিবীর শৈত্য-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বাষ্পরাশি জলে পরিণত হইয়াছে। শৈত্য-প্রাপ্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শুষ্ক ডালিমের খোসার মত উঁচু নীচু ছিল। উহার গভীর অংশগুলির মধ্যে সঞ্চিত ছিল জলরাশি। পৃথিবীর এই স্তরেও জীবজন্তুর অস্তিত্ব ছিল না। আরও বহুকাল পরে জলের মধ্যেই আদি জীবনের সূত্রপাত হইল।

জীবন কি ভাবে সৃষ্ট হইল?

কি করিয়া এবং কেন যে জীবন পৃথিবীতে আসিল তাহা কেহ সঠিক জানে না। তবে এটুকু জানা গিয়াছে যে, জল, কার্বন ডায়কৃসাইড(Carbon dioxide) এবং এ্যামোনিয়া মিশাইয়া যে পদার্থ হয় তাহার উপর অতি-বেগুনী রশ্মির (Ultra Violet Rays) ক্রিয়ার ফলে একাধিক জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়। জীবনবিহীন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে এই তিনটি বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন অত্যন্ত কম থাকায় সূর্য হইতে অতি- বেগুনী রশ্মি বিনা বাধায় পৃথিবীর উপর আসিতে পারিত। এই ভাবে প্রভূত পরিমাণে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইয়া যথাকালে জীবন সৃষ্টি হয়—সমুদ্রে।

সামান্য প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) হইতেই জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ হইতে বৃক্ষলতা এবং এককোষবিশিষ্ট জীব আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার পর ক্রমে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়াছে বহুকোষবিশিষ্ট জীব, সামুদ্রিক প্রবাল, স্পঞ্জ, ঝিনুক, শামুক, অস্থিবিশিষ্ট মৎস্য, 'কুম্ভীর,

কচ্ছপ, সরীসৃপ, গিরগিটি, কীট-পতঙ্গ, পক্ষী, ডিম্বপ্রসবকারী স্তন্যপায়ী জীব, হস্তী, অশ্ব, তিমি, ব্যাঘ্র, সিংহ, বাদুড়, লেজবিশিষ্ট বানর এবং শেষে **মানুষ**।

জড় ও জীবজগতে পারস্পরিক সম্বন্ধ

জীবজগতের সঙ্গে জড়জগতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জড়জগতে নিয়ত বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। জীবজগতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রজনন-শক্তির লীলাবৈচিত্র্য জীব জগতকে একটা স্বকীয়ত্ব দান করিয়াছে।—নিত্য নূতন জীবনোদ্গম, পুরুষ পুরুষানুক্রমে জীবন-ধারার পারস্পরিকতা রক্ষা, এক কথায় একই জীবের অনুরূপ জীবে রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশই হইল জীবজগতের বৈশিষ্ট্য। জড় পদার্থের রূপান্তরেও বৈচিত্র্য রহিয়াছে; কিন্তু জড়জগতের রূপান্তর জীবজগতের রূপান্তর অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

জীব ও জড়জগতের বিস্তৃতির তুলনা

জীবজগত পূর্ব হইতে বিস্তৃততর হইতেছে। বংশবৃদ্ধির ফলে ও নূতন নূতন শ্রেণীর উদ্ভবে আমাদের ধরাপৃষ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর নাম মানুষ তালিকাভুক্ত করিয়াই ফেলিয়াছে। আরও নূতন নূতন শ্রেণী বৎসর বৎসর আবিষ্কৃত হইতেছে।

জীবেরা সর্বত্র বাস করে—লোনাজলে, মিষ্টজলে, মাটিতে, বায়ুতে; কতক আবার গাছপালায় বা অন্য জীবের শরীরে অবস্থান করে।

জীবের আকারও বিভিন্ন পরিমাপের। একটি তিমি মাছ ৯৫ ফুট দীর্ঘ—এবং ৪১১৬ মণ পর্যন্ত ওজনে হইতে পারে অর্থাৎ বড় বড় তিনটি রেল ইঞ্জিনের সমান দেখায়। অপর দিকে আবার ম্যালেরিয়ার বীজাণু এত ক্ষুদ্র যে এক ফোঁটা রক্তে তিন কোটি বীজাণু থাকিতে পারে। হাম ও বসন্তের জীবাণু (virus) আরও ক্ষুদ্র।

দেখিতেও নানা জীব নানা প্রকারের। কতক জীব সুন্দর জ্যামিতিক ডিজাইনের, কতক কিম্ভুতকিমাকার, কতক গাছপালার আকৃতি বিশিষ্ট; কতক সুতার মত সরু ও লম্বা! পশুপক্ষীর আকারের বৈচিত্র্য অফুরন্ত।

কিন্তু ইহা সত্বেও জড়জগতের তুলনায় জীবজগত অতি ক্ষুদ্র—এমন কি নগণ্যই বলা যায়।

সামান্য পাতলা এবং **অল্পপরিসরের ধরাপৃষ্ঠই** আবহাওয়া ও শৈত্যের পরিমিত অবস্থার দরুন জীবন পোষণ করিতে পারে। ইহার বাহিরে সৌরজগতের নানা স্তরে অত্যধিক শীত বা তাপের প্রকোপে জীবন তিষ্ঠিতে পারে না। হিসাব করিয়া দেখিলে মনে হইবে সারা জড়জগতের লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ জায়গাও জীবের লীলাক্ষেত্র নয়।

জড়জগতের বিরাটত্ব কল্পনা করিলে তাক লাগিয়া যায়! গোটা কতক নক্ষত্র আমাদের এই পৃথিবীর সমান হইলেও হইতে পারে কিন্তু বহু নক্ষত্রই এত প্রকাণ্ড যে লক্ষ কোটি পৃথিবী উহাদের মধ্যে স্থাপন করিলেও অনেক জায়গা থাকিয়া যায়। আবার সৌরজগতে নক্ষত্রের সংখ্যা এত বেশী যে পৃথিবীর সমুদ্রতটের যাবতীয় বালুকণার সমান হইবে। সারা বিশ্বের তুলনায় আমাদের বাসভূমি এই ক্ষুদ্র পৃথিবী কোটি কোটি বালুকণার মধ্যেও একটি ছোট কণার মত।

অন্যান্য নক্ষত্রে জীবন থাকা কি সম্ভবপর ?

অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রে জীবন থাকা সম্ভবপর কিনা ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। মোট কথা, আমাদের এই পৃথিবীতে জীবনের অনুকূল বায়ু, তাপ ও শৈত্যের যে সন্তোষজনক অবস্থা আছে অপর গ্রহ উপগ্রহে তেমন অবস্থা থাকার সম্ভাবনা কম।

জীবের ক্রমবিকাশ

প্রস্তরীভূত জান্তব-অবশেষ (fossil) দেখিলে আদিম যুগের জীবজন্তু সম্বন্ধে আমাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়। ইহাদের আদিরূপ যাহাই হউক না কেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুকে কেন্দ্র করিয়াই যে জীবদেহ গঠিত ও বর্ধিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। অনাদি কাল যাবৎ জীবদেহের কেন্দ্রীয় উপাদান জীবকোষের পরিবর্ধন এবং উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে; প্রতিমুহূর্তেই উহাদের নিত্য নূতন রূপ পরিগ্রহের চেষ্টা এই জীবকোষকে কেন্দ্র করিয়া বহুরূপী জীবন ধরাপৃষ্ঠে উদ্ভূত হইয়াছে।

সর্বপ্রাচীন জীবজন্তু

প্রাণবান পদার্থ মাত্রই খাদ্য আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। বৃক্ষলতা প্রাণবান; ইহারা সূর্যরশ্মি হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া বাঁচিয়া রহিল। ইহারাই পৃথিবীর আদি জীব।

অন্য এক শ্রেণীর জীব জীবিত পদার্থের ক্ষয় সাধন ও পচনক্রিয়ায় সহায়তা করিয়া বাঁচিয়া রহিল; ইহারাই কীট। জীবকোষ উদ্ভূত হইয়া প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে পরিবর্তিত এবং অনুরূপ বিভিন্ন জীবে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে এই নির্বাচন এবং রূপান্তর চলিয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু মানব যে অতি দীর্ঘকালব্যাপী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং ঘষামাজার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জীবন কি স্বতঃস্ফূর্ত ?

জীবন হইতেই নূতন জীবনের উদ্ভব ইহাই প্রাণীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। জড়পদার্থ হইতে প্রাথমিক জীবোদ্ভব সম্ভবপর হইয়া থাকিলেও বর্তমানে নিত্যনূতন জীবনের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি সম্ভবপর কিনা ইহাও আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখানে প্রশ্ন উঠে সুদূর অতীতে যদি জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ধরাপৃষ্ঠে জীবন স্পন্দন জাগিয়া উঠা সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে এখনও অনুরূপ ব্যাপার ঘটা সম্ভবপর কি না ? যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোনও যুগে হয়তো জড়পদার্থ হইতেই প্রথম জীবনের উন্মেষ ঘটিয়াছিল তথাপি বর্তমান যুগে বোধ হয় আর তাহা সম্ভবপর নয়, কারণ ঐ যুগে পৃথিবীর যে প্রকৃতি, স্বরূপ এবং আবহাওয়া ছিল আজ আর শত চেষ্টা করিলেও তাহা ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বলিতে হয় আমাদের চতুর্দিকে আজ আমরা জীবজগতে কিংবা উদ্ভিজ্জগতে যে জীবন-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতেছি তাহার মূলে রহিয়াছে **প্রজনন-শক্তির বিচিত্র ধারা** এবং **প্রকৃতি**।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা ছিল জীবন স্বয়ম্ভু। ইহার পিছনে যে প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহার কথা কাহারও মনে জাগিত না। পচনশীল দ্রব্য হইতে বিভিন্ন জাতীয় কীটের এমন কি বিছার পর্যন্ত এবং কর্দম হইতে কেঁচো, ভেক ও কুম্ভীর ইত্যাদির জন্ম হয় বলিয়া পুরাকালে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল। ষাঁড়ের মৃতদেহ হইতে কি ভাবে মৌমাছি উৎপাদন করা যায় তাহার একটা ব্যবস্থা নাকি ভার্জিল (Virgil) করিয়াছিলেন। তখন এতাদৃশ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল, কারণ তখন প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে সত্য নির্ণয় করিবার মত বৈজ্ঞানিক মনোভাব কাহারও ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হইল যে, কেবলমাত্র

পচনশীল পদার্থ হইতেই কীটাণুর জন্ম হয় না। সর্বপ্রথমে রেডি (Redi) পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন যে, পচনশীল একখণ্ড মাংস যদি সাবধানতার সহিত ঢাকিয়া রাখিয়া মাছি প্রভৃতির স্পর্শ হইতে রক্ষা করা যায় তবে উহা হইতে কীটাণু জন্মায় না। আধুনিক যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর হইতেই কীটের জীবনধারার ক্রমোন্মেষ এবং উহার সংখ্যা বর্ধন পরীক্ষা করিবার সুযোগ হইয়াছে। ফলে পূর্বকালীন অবৈজ্ঞানিক মতবাদ অনেকটা অচল হইয়া পড়িয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনীষী পাস্তুরের (Pasteur) গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয় যে, **জীবিত পদার্থ হইতেই জীবিত পদার্থের সৃষ্টি হয়।** * কীটাণুর সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন পদার্থই বাঁচিতে পারে না, আবার বায়ু এবং আলোর সংস্পর্শে না আসিলে কোন পদার্থ হইতে কীটাণু জন্মিতে পারে না। সুতরাং বায়ু এবং আলোর মধ্যে যে জীবন-কণা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১নং ও ২নং ছবিতে পাস্তুরের একটি পরীক্ষা প্রণালী দেখান হইয়াছে।

সজীব পদার্থের প্রকৃতি

স্পর্শচেতনা (sensitiveness) এবং উত্তেজনা সজীব পদার্থমাত্রেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। কোন বাহ্য শক্তির সংস্পর্শে আসিলে উহারা সাড়া দিয়া থাকে। স্বাভাবিক বর্ধনশীলতাও জীবজগতের এক বিশিষ্ট ধর্ম। জৈব পদার্থ

---

* "That all living matter existing to day has descended directly from pre-existing living matter is the doctrine of 'Biogenesis', the rival of the dethroned doctrine of 'Abiogenesis'......................The law of biogenesis, now established as firmly as that of gravitation, may be expected to stand as the very rock of ages in the Science of Biology.

Such (describing the process by which Spontaneous Generation theory was refuted) is in outline the story of one of the greatest fallacies with which modern science has had to deal. But, strange to say, the establishment of the truth of biogenesis, which directly is of little importance to man, has laid the foundation for practical researches of a most momentous kind. To Pasteur and the other great generals in the last battles against the theory of Spontaneous Generation is due the honor of the establishment of the new science of bacteriology, which in the last two decades has come to play such a mighty part in the development of modern life"—Outline of Modern Knowledge.

উহার অন্তর্নিহিত অণু-পরমাণুর বিচিত্র বিন্যাসের ফলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এবং ঠিক এই কারণে এই জাতীয় পদার্থ অধিকতর চঞ্চল ও গতিশীল। প্রাণীদেহে প্রধানতঃ চারিটি পদার্থ বিদ্যমান, যথা—Oxygen, Hydrogen, Nitrogen এবং Carbon।* প্রথমোক্ত তিনটি বায়বীয় এবং শেষোক্তটি কঠিন জড় পদার্থ। বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর চঞ্চলতার দরুনই মূল পদার্থের রূপান্তর বটে। বাহ্য কোন শক্তির সংস্পর্শে আসিলেই জৈব পদার্থের বিসদৃশ এবং অস্থির উপাদান সমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়া
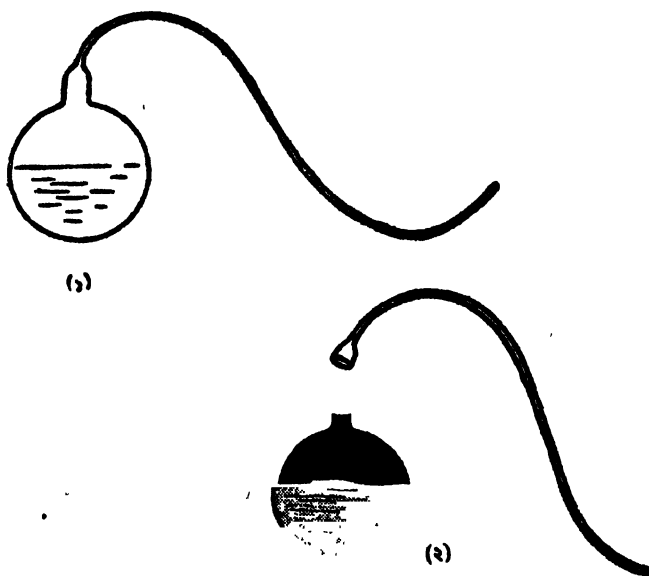
(১ ও ২ নং চিত্র) (ওয়েল্‌স্ অবলম্বনে)

[১নং চিত্রের পাত্রে দুধ বা অন্য কোন পচনশীল দ্রব্য রাখিলেও উহাতে কীট জন্মায় না, কারণ সরু নলের বাঁকের মধ্যে বাহির হইতে ধাবমান জীবাণুগুলি আটকাইয়া পড়ে ও পাত্রস্থ দ্রব্যে পৌঁছায় না।

২ নং চিত্রে ইহার ব্যতিক্রম হয় এবং বায়ুমধ্যস্থিত কীটাণু সংস্পর্শে শীঘ্রই কীট জন্মায়।]

---

* The necessary constituents of living matter which occur in every cell are oxygen, nitrogen, carbon, hydrogen, sodium, potassium, phosphorous, sulphur, calcium, magnesium, iron and chloride.

এবং ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া একীভূত হওয়ার ক্ষমতা আছে বলিয়াই জীবগণের সর্বত্র অবস্থানুযায়ী নিজকে খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা রহিয়াছে এবং এই জন্যই জৈবিক ক্রমবিকাশও সম্ভবপর। অপেক্ষাকৃত জটিল জৈব পদার্থে যে স্থিরতা একেবারে নাই এমন নহে। নতুবা জীব দেহ দৃঢ় এবং অল্প বিস্তর স্থায়িত্ব গুণসম্পন্ন হইত না।

যে **কোষকে** কেন্দ্র করিয়া জীবদেহ গড়িয়া উঠে তাহার খাদ্যগ্রহণশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। কোষ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন ইহার বহির্ভাগ আর যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যের যোগান দিতে পারে না ; কারণ আবরণের চেয়ে দ্রুততর গতিতে অভ্যন্তরস্থ কোষের বৃদ্ধি হয়। আবরণ আর তখন কোষকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না ; ফলে কোষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রজননের অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এবার আরম্ভ হইল। দ্বিখণ্ডিত কোষের দুইটি অংশই প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব কোষে পরিণত হয়। প্রজননের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মাইটসিস (mitosis)। নবজাত কোষগুলি মূল পৈতৃক কোষেরই প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রজনন-শক্তি আপাততঃ পৈতৃক কোষেই নিবদ্ধ থাকে। ইহার সামান্য অংশ মাত্র নূতন কোষ উৎপাদনে ব্যয়িত হয়; এই ভাবে পিতৃপুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যও কিছুটা অপত্যের মধ্যে বর্তে। এই পৈতৃক ধর্মের সমাগম কি পরিমাণে ঘটে তাহা ঠিক বলা যায় না।

এক জাতীয় কোষের বংশ বিস্তারের কথাই বলা হইল। অতি নিম্নস্তরের জীবজগতের বেলায়ই এই কথা খাটে। জীবজগতের উচ্চতর স্তরে ক্লিষ্ট কোষ সমূহ আরও বিশিষ্টতর রূপ ও ধর্ম পরিগ্রহ করে। **পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই জাতির সমবায়ে** যে জীবজগত গঠিত তাহাদের বেলায় একটি মাত্র কোষ হইতে প্রজনন সম্ভবপর নয় ; ডিম্ব শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জীব সৃষ্টি করে। এই সকল প্রক্রিয়ার সম্যক আলোচনা আমরা এই পুস্তকে অন্যত্র করিতেছি।

প্রজনন-প্রক্রিয়া

যৌন-মিলন নিরপেক্ষ প্রজনন

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষণস্থায়ী মিলনের ফলে স্ত্রীর ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীট কর্তৃক সন্তান উৎপাদনক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীতও সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পুরুষ গিরগিটি নদীর তলে বা কোন জলাশয়ে শুক্রকীট ছড়াইয়া রাখে। স্ত্রী গিরগিটি তাহার যোনিদ্বার পথে ঐ শুক্রকীট গ্রহণ করে। এক জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। ইহাদের পুরুষের শুক্র একটি রূপান্তরিত বাহুতে প্রবেশ করে এবং উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। স্ত্রী মৎস্যের সন্ধান পাইলেই তাহারা উহাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই সব ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সাক্ষাৎভাবে মিলন না হইলেও পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীর ডিম্বকোষের সংস্পর্শে আসিয়া গর্ভাধান করে। আরও নিম্নতর শ্রেণীর জীব বিশেষের বেলায় অন্য প্রকারে বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। স্বচ্ছ আবদ্ধ জলাশয়ের অধিবাসী এক জাতীয় এক কোষ বিশিষ্ট জীব অনেকটি উহারই সদৃশ অন্য এক প্রকার জীবের সঙ্গে মিলিত হয়—উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম জীবাণু গঠিত একটা সেতু অবস্থিত থাকে। ঐ সেতুর উপর দিয়া প্রাণবস্তুর আদান প্রদান হইয়া গেলে উহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সামুদ্রিক স্পঞ্জ, আগাছা, ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ, ব্যাঙের ছাতা, ইত্যাদির বেলায়ও যৌন-মিলন নিরপেক্ষ বংশ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উচ্চস্তরের জীবের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে সন্তান উৎপন্ন হয় কিন্তু সমস্ত জীবজগত সম্বন্ধে একথা খাটে না।

নিম্নস্তরের জীবের বংশ-বৃদ্ধি

ক্ষুদ্রতম এবং জটিলতা বিহীন জীবের মধ্যে একই প্রাণী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি নূতন প্রাণী সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে পিতৃস্থানীয় জীবটি দুইটি

বিভিন্ন জীবে পরিণত হয়—মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। মূল জীবটির দেহাভ্যন্তরস্থ সম্পূর্ণ পদার্থই নূতন দুইটি জীব সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যয়িত হয়।

বিভিন্ন রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণুর (bacteria) অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধির কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। একটি মাত্র উদ্ভিজ্জাণুকে উহার পক্ষে পুষ্টিকর কোন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রাখিয়া দিলে উহা চব্বিশ ঘণ্টা কালের মধ্যে কোটি কোটি অণুর জন্ম দিবে।

(৩নং চিত্র) (ওয়েল্‌স্‌ অবলম্বনে)

[এমিবা কি করিয়া বিভক্ত হইয়া দুইটি বা ততোধিক এমিবাতে পরিণত হয় তাহা এই দেখান হইয়াছে।]

প্রথমে দেখিব একটি মাত্র অণু, অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে দুইটি, পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ১০২৪টি, দশ ঘণ্টায় দশ লক্ষের বেশী, চব্বিশ ঘণ্টায় শত শত কোটি!

অনেক জীবাণু (Microbe) এত ক্ষুদ্র যে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়াও তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দশ কোটি একটি পয়সার উপর অবস্থান করিতে পারে।

উপরে জীবাণুর দ্বিধা বিভক্তির কথাই বলা হইল। একই জীবাণু দ্বিধা বিভক্ত না হইয়া বহুধাও বিভক্ত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি জীবাণু পর পর ক্রমাগত দ্বিধা বিভক্ত হইতে হইতে বহু সংখ্যক জীবাণুতে পরিণত হয়। ম্যালেরিয়ার জীবাণুর বেলায় এইরূপ ব্যাপার ঘটে। আবার কোনও কোনও

ক্ষেত্রে একটি জীবাণু দ্বিধা বিভক্ত হয় বটে কিন্তু উভয় অংশ একরূপ হয় না ; একটি প্রথমাবস্থায় অতি ক্ষুদ্র ; দেহ প্রায় গঠিত হয় না, এবং ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়! এ ক্ষেত্রে মূল জীবটি দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত অনুন্নত পেশীসমূহ হইতে নূতন একটি জীব সৃষ্টি করে মাত্র। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ কয়েকবার ঘটিতে দেখা যায়। মূল জীবটির মস্তকের পিছনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আত্মপ্রকাশ করে এবং পরিণত অবস্থায় মূল জীব হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়ে।

যৌন বংশ বৃদ্ধির সুবিধা

(১) পিতামাতার পক্ষে, নিজেরা দ্বিধাবিভক্ত হওয়া অপেক্ষা, কেবলমাত্র যৌনকোষ (শুক্রকীট ও ডিম্ব) উৎপাদনে শারীরিক অপচয় কম হয় এবং একই শরীর ধারণ করিয়া বহু জীব সৃষ্টি করা চলে।

(২) শিশু মাতৃগর্ভে, এবং জন্মের পর, পিতা-মাতার যত্নে, দীর্ঘদিন যাবৎ সহজে পরিণত হইবার সুযোগ পায়।

(৩) প্রকৃতির সৃষ্টি কর্মের দিক হইতে বিশেষ সুবিধা এই যে, দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কোষ (যাহার মধ্যে বিচিত্র গুণবীজসমূহ—genes আছে) মিলিত হইয়া নূতন নূতন প্রকারের জীব সৃষ্টির সুযোগ হয়।

যমজ সন্তান

এখানে যমজ সন্তানের কথা তুলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, খরগোস ইত্যাদির একই সময় ৪।৫টি বা আরও অধিক সংখ্যক সন্তান হইয়া থাকে। স্ত্রীর একটি মাত্র ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীটের সংস্পর্শে সন্তান উৎপাদনক্ষম হইলে একটি সন্তান হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যদি একাধিক ডিম্ব একই সময়ে পরিপক্ক হয় আর শুক্রকীটের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। একটি ডিম্ব বহুধা বিভক্ত হইলেও একাধিক সন্তান হইতে পারে। একজাতীয় প্রাণী একই সময়ে চারিটি সন্তান প্রসব করে, কারণ ইহাদের অঙ্কুরিত ডিম্ব প্রথমাবস্থায়ই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

জীবশ্রেষ্ঠ মানব জাতির মধ্যেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। অনেকের

যমজ সন্তান হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে 'যমজ সন্তান' সম্বন্ধে অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। *

এই অধ্যায়ে জীবজগতে বংশবৃদ্ধির প্রধান প্রধান উপায়ের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া হইল। বিষয়টি জটিল, তাই আলোচনা তত সহজ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শিক্ষিত পাঠক পাঠিকারা ইহা হইতে বিষয়টির মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। এ বিষয়ে আরও জানিবার কৌতূহল নিশ্চয়ই অনেকের হইবে, কারণ জীবজগতে ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম তথ্য আর কি হইতে পারে? এই পুস্তকের শেষের দিকে এ বিষয়ে তাহাদের জন্য বহু পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান দেওয়া হইল।

* "পূর্বে বা পরে আলোচনা করা গিয়াছে বা যাইতেছে" এরূপ নির্দেশ অনেক জায়গায় থাকিবে। নূতন সংস্করণে বিষয়-বস্তু আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়ায়, ঐ সকল আলোচনার পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নহে। এ সব আলোচনা বাহির করিতে হইলে সূচীপত্রে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বা শেষের বর্ণসূচী দেখিয়া লইতে হইবে।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বংশ-বিস্তার

উদ্ভিদ্-জগতে

এতক্ষণ আমরা ধরাপৃষ্ঠে জীবাগম রহস্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বৃক্ষ-লতা, ক্ষুদ্রতর জীবজন্তু, পক্ষী, ইত্যাদির মধ্যে বংশ-বিস্তার কিরূপে ঘটে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত আভাষ এখানে দিতে চেষ্টা করিব। বৃক্ষ-লতা এবং অন্যান্য সাধারণ পশু-পক্ষীর মধ্যেও আমরা যৌন-আকর্ষণ এবং যৌন-মিলন প্রক্রিয়ার সূচনা দেখিতে পাই। উদ্ভিদ-জগৎ এবং জীবজগতে বংশ-বৃদ্ধির এবং বংশ-রক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থাই না রহিয়াছে!

চেতন পদার্থকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি:—(১) উদ্ভিদ্ জাতীয়; (২) প্রাণী জাতীয়।

গাছ, লতা, ঘাস, ইত্যাদি উদ্ভিদ্ জাতীয়; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদি প্রাণী জাতীয়।

ডারউইনের (Darwin) অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) এখন বিজ্ঞান-জগতে সর্ববাদীসম্মত। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। মোট কথা, **মানব জাতি অপেক্ষাকৃত নিম্নতর জীবজগৎ হইতে ক্রমোন্নত জীবমাত্র; কোন স্রষ্টাবিশেষের সৃষ্টি নয়।**

এই জন্যই মানবজাতির প্রজনন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে উহাদের পূর্বপুরুষের, অর্থাৎ জীবজগতের, অপেক্ষাকৃত পুরাতন শ্রেণীর, অর্থাৎ—গাছ, লতা, ঘাস বা পশু পক্ষী কিংবা কীটের প্রজনন-প্রক্রিয়ার কতকটা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

প্রাণীদের সন্তান-সন্ততি হয়; উহারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। গাছ-পালারও বীজ হয় ও বীজ হইতে আবার গাছ জন্মে।

উদ্ভিদের মধ্যে আকার ও প্রকৃতিতে সকলগুলি একরূপ নয়। মোটামুটি ভাবে উদ্ভিদ্-জগৎকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়:—যে গুলির ফুল ও ফল হয় না, তাহারা **অপুষ্পক**; যাহাদের ফুল ও ফল হয় তাহারা **সপুষ্পক**।

শৈবাল, অর্থাৎ জলের মধ্যে যে শ্যাওলা হয়, ব্যাঙের ছাতা, ভিজা দেওয়ালের গায়ে সবুজ রংয়ের যে শ্যাওলা হয়, ফার্ণ (firn)—যাহা অনেকের বাড়ীতে সখ করিয়া রাখা হয় ইত্যাদি **অপুষ্পক**।

আম, জাম, কলা, ধান, তাল, গুপারী ইত্যাদি **সপুষ্পক**। ইহাদের বীজের মধ্যে একটি বীজ-পত্র থাকে।

পাঠক-পাঠিকারা উদ্ভিদ্-জগতের এক অতি সহজ উপায়ে বংশ-বিস্তারের কথা নিশ্চয়ই জানেন। গাছ পালার ডাল বা অংশ-বিশেষ কাটিয়া প্রোথিত করিয়া নূতন গাছ জন্মানোর ব্যবস্থাই এই উপায়।

আম, লিচু প্রভৃতি বড় গাছ এবং গাঁদা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের গাছের ডাল কাটিয়া গাছ জন্মানোর ব্যবস্থার কথা সকলেই জানেন। বাঁশ প্রভৃতির মূল হইতে আবার বাঁশ জন্মায়। ডাল ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই গাছ জন্মায় কিন্তু ভাল গাছের বিস্তার মানুষ বুদ্ধি-বলে "কলম" বাঁধিয়াই করিয়া থাকে।

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জীবদের মধ্যেও অনুরূপ বংশ-বিস্তারের নিদর্শন পাওয়া যায়। কেঁচোকে দুই ভাগে কাটিলে দুই অংশই দুইটি জীবে পরিণত হয়। সমুদ্রের ষ্টারফিশের (Starfish-এর) একটি বাহু কাটিয়া দিলে ঐ ছিন্ন অংশটি পুনঃ একটি ষ্টারফিশে পরিণত হয়। অন্যান্য উদাহরণও আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দিয়াছি।

গাছের বংশ-বিস্তার প্রণালী

কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের বেশীর ভাগ গাছপালাই **বীজের** সাহায্যে বংশ-বিস্তার করে। বীজের সাহায্যে বংশ-বিস্তারই প্রাকৃতিক প্রজনন-প্রণালী। সামান্য এক পয়সা মূল্যের কপির বীজে বহুসংখ্যক কপি হয়; ছোট একটি বট বা তেঁতুলের বীজে প্রকাণ্ড গাছ জন্মায়।

পূর্বোক্তভাবে ডাল কাটিয়া গাছ জন্মানোর একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। উহাতে **আসল গাছের গুণাবলী, স্বকীয়ত্ব বা বিশেষত্ব পরবর্তী গাছে পুরাপুরি বর্তে।** তাই কোনও ফুলের বা ফলের সৌন্দর্য বা স্বভাব বজায় রাখিতে হইলে উহার 'কলমের' চাষ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু নূতন নূতন রূপ ও গুণের কর্ষণ করিতে হইলে বীজের সাহায্যে গাছপালার চাষ করিতে হয়। **ইহার সূক্ষ্ম কারণ** লক্ষ্য করিবার বিষয়। **দুইটি পৃথক ভিন্ন স্বভাব-**

সম্পন্ন পিতা ও মাতার সহযোগিতায় উৎপন্ন সন্তান উভয় হইতে পৃথক স্বভাব-সম্পন্ন হয় কিন্তু উভয়েরই স্বভাবের অংশ গ্রহণ করে।

প্রকৃতির এই বিধানে নব নব সৌন্দর্য ও স্বভাব-সম্পন্ন বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের অভিব্যক্তি ঘটে এবং ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষ সম্ভবপর হয়।

ফুলের অনাবিল সৌন্দর্য এবং প্রাণ মাতানো সুগন্ধ সকলকেই মুগ্ধ করে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সকল প্রকার গাছেই ফুল ধরিবার এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে।

ফুল, ফল ও

গাছে এলোমেলো ভাবে ফুল ধরে না। ডালের যে অংশে ফুল ধরে, ফুল সমেত ডালের সেই অংশকে **পুষ্প-পুঞ্জ** বলা যায়। কোথায়ও ডালের একেবারে শীর্ষে কোন ফুল নাই; ডাল বাড়িয়া চলে এবং উহার নীচের দিক হইতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে। নীচের ফুলগুলি বয়সে বড় হয়। মুলা, সরিষা ইত্যাদিতে এইরূপ হয়। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় ডালের শীর্ষে একটি ফুল ধরে ও ডাল আর বাড়ে না। তখন পাশের দিক হইতে আবার ডাল বাহির হয় ও তাহার শীর্ষে ফুল ধরে। বেলা, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

ফুলের চারিটি অংশঃ—(১) বাহিরে সবুজ **পুষ্পবৃতি** (Sepal) বা পুষ্পভাণ্ডের বেষ্টনপত্র থাকে। ইহারা ফুল কলিকে আবেষ্টন করিয়া রক্ষা করে।

(২) পুষ্পবৃতির উপর **পুষ্পদল** বা পাপড়ি (Petal) থাকে। ইহারা প্রায়ই আকারে বড় এবং নানা রংএ রঙীন হয়।

(৩) পুষ্পবৃতির মধ্যে আবার কতকগুলি করিয়া **পুং-স্তবক** (Stamen) থাকে। ইহারা অতি কোমল ও সুন্দর ঃ শীর্ষ ভাগে সোনালী রংএর ধূলিকণার মত পুষ্পরেণু থাকে।

(৪) ফুলের মধ্যভাগে **স্ত্রী-স্তবক** (Pistil) থাকে। ইহারই মধ্যে বীজ লুক্কায়িত থাকে। স্ত্রী-স্তবকের অগ্রভাগে আঠা (Stigma) থাকে। উহার মধ্যভাগকে ষ্টাইল (Style) বলে এবং গোড়ায় **ডিম্বকোষ** (Ovary) থাকে। ডিম্বকোষেই **ডিম্বক** অথবা প্রাথমিক অবস্থার বীজ (Ovules) অবস্থিত থাকে।

পরবর্তী ছবি হইতে এই অংশগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।
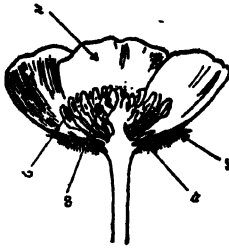
(৪নং চিত্র) (ওয়েল্‌স্ অবলম্বনে)
[(১) পুষ্পবৃতি (Sepal) ; (২) পুষ্পদল (Petal) ;
(৩) পুং-স্তবক (Stamen) ; (৪) ডিম্বকোষ (Ovary) ;
(৫) মধুভাণ্ড (Nectary) ।]

বাটারকাপ ফুলের ছেদিত অংশ।

এই তথ্যগুলি সহজ হইলেও সকলের হয়ত জানা নাই। যে কোনও ফুল লইয়া লক্ষ্য করিলে পাঠক পাঠিকারা এই সকল অংশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিতে পাইবেন। তবে সকল রকম ফুলে সব অংশ থাকে না। উপরের চিত্রে প্রদর্শিত প্রত্যেকটি ডিম্বকোষের অগ্রভাগ আঠাযুক্ত। সব সময়ে অংশগুলি পৃথক্ করিয়া বুঝান যায় না,—যেমন রজনীগন্ধা ফুলে। ইহার বৃতি ও দল পৃথক করা যায় না। একই পুষ্পের মধ্যে পুং-স্তবক এবং স্ত্রী-স্তবকও দেখা যায়।

ফুলের পুং-স্তবক (Stamen) এবং স্ত্রী-স্তবক (Pistil) গাছের বংশবিস্তারে সহায়তা করে।

বীজ কি ভাবে উৎপন্ন হয়

পুং-স্তবক সরু সূতার মত আঁশবিশিষ্ট ; ইহার শীর্ষদেশে একটি থলির মধ্যে সোনালী ধূলিকণার মত একপ্রকার গুঁড়া আছে। ইহাকে বলা হয় **পুষ্পরেণু** (Pollen grains)। নানা রকমে এই পুষ্পরেণুগুলি স্ত্রী-স্তবকের (Pisitil) সঙ্গে লাগিয়া যায় এবং তখন প্রত্যেকটি রেণু একটি করিয়া সরু সূতার মত আঁশে পরিণত হয় এবং ঐ আঁশ স্ত্রী-স্তবকের গোড়ায় অবস্থিত ডিম্বকোষ পর্যন্ত পৌঁছে। তাহার পরে ঐ আঁশের দ্বারা পুং ও স্ত্রী জাতীয় কোষের সংযোগ সাধিত হয়। এই সংযোগের ফলেই বীজ উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেকটি বীজের জন্য একটি করিয়া পুষ্পরেণু দরকার। আকারে রেণুগুলি খুবই ছোট কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহারা লম্বা লম্বা আঁশ যোগে পরবর্তী পৃষ্ঠায় ৫নং চিত্রে প্রদর্শিত প্রণালীতে ডিম্বকোষের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছায়।

(৫নং চিত্র) (ডাইবল অবলম্বনে)
[(১) পুষ্পরেণু; (২) স্ত্রী-স্তবকের অগ্রভাগ (Stigma); (৩ ও ৪) রেণুর আঁশ; (৫) ডিম্বকোষ; (৬) ডিম্বাবরণ; (৭) ডিম্ব।]
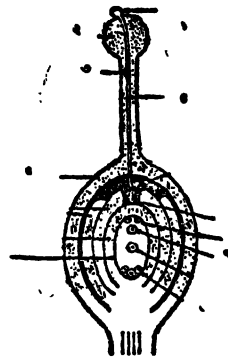
পুষ্পরেণু স্ত্রী-স্তবকে কি ভাবে পৌঁছে তাহা ভাবিবার বিষয়। অনেকক্ষেত্রে অবশ্য পুং-স্তবক এবং স্ত্রী-স্তবক এত ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে যে সামান্য বাতাসের কম্পনে পুষ্পরেণু স্ত্রী-স্তবকে লাগিয়া যাইতে পারে। প্রকৃতির বিধানে এক জাতীয় পুষ্পের স্ত্রী-স্তবকে সেই জাতীয় অন্য পুষ্পের রেণু সংযোজিত হইলেই বীজের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

এই সংযোগ কি ভাবে ঘটে? এক পুষ্প অন্য পুষ্পের নিকট যাইতে পারে না। কিন্তু কীট, পতঙ্গ, মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি অহরহ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ঘুরিয়া বেড়ায়। পুষ্পের বিচিত্র রংএর বাহার এবং অপূর্ব সুগন্ধের আকর্ষণেই ইহারা এরূপ করিয়া থাকে। অনেক পুষ্পে মধু সঞ্চিত থাকে; এই মধুর লোভেও কীট, পতঙ্গেরা আকৃষ্ট হয়। ইহাদের মাথায় এবং পায়ে পুং-স্তবকের রেণু জড়িত হইয়া যায়। কীট, পতঙ্গের পায়ে বা মাথায় জড়িত হইয়া পুষ্পরেণু স্ত্রী-স্তবকের শীর্ষদেশে যুক্ত হইয়া থাকে এবং পরে ক্ষুদ্র নলের ভিতর দিয়া ডিম্বাশয়ে প্রবেশ করিয়া ডিম্বগুলিকে নূতন প্রাণ দান করে। কালক্রমে এই বীজ পুষ্ট হইয়া নূতন বৃক্ষ লতার জন্মদান করে। বাতাসকে আশ্রয় করিয়াও পুষ্পরেণু স্ত্রী-স্তবকের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে। অনেক জলজ উদ্ভিদের বেলায় জলের মধ্য দিয়া এই পরাগ-সঙ্গম ঘটে। কানাডায় একজাতীয় জলজ পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পুংপুষ্প কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্ত্রীপুষ্পের সঙ্গে মিলিত হয়; ফলে পরাগ-সঙ্গম ঘটে।

সময় সময় মানুষও এই সংযোগ কার্যে সহায়তা করে। বাগানে মালীরা পীচ্ পুষ্পের উপরে পুষ্পরেণু ব্রাসে লইয়া ঝাড়ে। যবদ্বীপে ভ্যানিলা অর্কিডের চাষ এইভাবেই হয়। ফুল ফুটিলে ওখানকার স্ত্রীলোকেরা এক একজনে

প্রায় ৩০০০ ফুলে পুষ্পরেণু যোগায় এবং বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কার্যে সহায়তা করে।

ফুলের ডিম্বকোষে যে সকল ডিম্ব থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি বীজে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু বীজে পরিণত না হইলে ডিম্বগুলি শুকাইয়া যায়; আবার সব ফুল হইতেও ফল হয় না।

বীজের ছড়াইবার প্রণালী

বীজ পরিপুষ্ট হইলে মাটিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু সব বীজ একই গাছের আশে পাশে পড়িলে এক জায়গায় এত ঘনভাবে গাছ পালা জন্মিত যে উহারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আহরণ করিতে পারিত না। এই জন্য প্রকৃতি নানা উপায়ে বীজ চারিদিকে ছড়াইবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে।

বাতাসের সাহায্যে বহু ক্ষেত্রে বীজের বিস্তার হয়। কোনও কোনও ফলের বীজে পাখার মত একটি অংশ থাকে। ফল ফাটিয়া গেলে বীজ বাহির হইয়া এই পাখার সাহায্যে অনেক দূর পর্যন্ত বাতাসে ভাসিয়া যায়। শাল, সজিনা, প্রভৃতি এই জাতীয়। কোনও কোনও বীজের গায়ে সরু সরু সূতার মত জিনিষ থাকে। ইহার সাহায্যে বীজ বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। কার্পাস ও আকন্দের বীজ এই ধরণের। কোনও কোনও ঘাসের বীজ এত হাল্কা ও ছোট যে বাতাস ধূলিকণার মত উহাদিগকে বহন করিয়া থাকে।

জলও বীজের বিস্তারে কম সাহায্য করে না। নারিকেল জলে ভাসিয়া বহু দূরে যায়। সেই জন্য উষ্ণপ্রধান সকল দেশের সমুদ্রতীরে প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়। পদ্মের বীজ জলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। নদীর দুই পার্শ্বে ছোট ঝাউগাছ বা বিশিষ্ট রকমের জলজ আগাছা জন্মিয়া থাকে। ইহাদেরও জলের সাহায্যে বংশবিস্তার ঘটে।

পশু, পক্ষী এবং মানুষও বীজ বিস্তারে সহায়তা করে। অনেক বীজ বা ফলের গায় কাঁটার মত একরূপ পদার্থ থাকে। এই কাঁটার সাহায্যে উহারা জীব-জন্তুর লোম বা মানুষের কাপড়ে আটকাইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। চোরকাঁটার কথা সকলেই জানেন।

পাখীরা পেয়ারা, লিচু, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল খাইবার সময় তাহাদের বীজগুলিও খাইয়া ফেলে। এগুলি হজম হইয়া যায় না; অবিকৃত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আবার গাছ জন্মায়।

চট্টগ্রামের লোকেরা মালদহের আম খায়; আঁটী এখানে সেখানে ফেলিয়া দেয়। উপযুক্ত মাটিতে পড়িলে উহা অঙ্কুরিত হইতে পারে। মানুষের মারফতে নবজাত আম গাছ এই ভাবে পিতৃপুরুষ হইতে প্রায় ৫০০ শত মাইল দূরে গিয়া পড়ে। মানুষ এইভাবে অজ্ঞাতসারে বীজের বিস্তারে যেমন সাহায্য করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও সেরূপ আবার বীজ আনাইয়া বাগানে বপন করে; আবার বাগান হইতে ভাল বীজ দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়াও থাকে।

বৃক্ষলতার বংশবিস্তার প্রাকৃতিক বিধান ও প্রক্রিয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন। পুং-স্তবকের সামান্য ধূলিকণার মত রেণু স্ত্রী-স্তবকের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জীবনের সূচনা করে। পাঠক পাঠিকারা এই প্রক্রিয়ার সহিত প্রাণীজগতে প্রজনন-প্রণালীর অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন।

ভেকের বংশবিস্তার

আমরা এখন সচরাচর দেখা যায় নিম্নস্তরের এমন একটি প্রাণীর বংশবিস্তার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিব।

৩।৪ বৎসর বয়সের সময়ে ভেকেরা বংশবিস্তারের দিকে মনোযোগ দেয়। সুদীর্ঘ শীতকালটা একটানা সুখে কাটাইয়া যখন স্ত্রী ব্যাঙ প্রথম জাগরিত হয় তখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর একটি নূতন জীবনচাঞ্চল্য তাহাকে পাগল করিয়া তোলে। পুরুষ ব্যাঙও অনুরূপ পুলক শিহরণ অনুভব করে। উভয়েই তখন যৌন-মিলনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে।

স্ত্রী ব্যাঙের দেহাভ্যন্তরস্থ ডিম্বসমূহ ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিয়া নূতন বংশ বিস্তারের উপযোগী হইয়া উঠে। বর্ষার প্রারম্ভে পুরুষ ব্যাঙের গভীর উচ্চ স্বরে আকৃষ্ট হইয়া স্ত্রী ব্যাঙ তাহার কাছে আসে। পুরুষ ব্যাঙ তখন তাহার কোমর নিজের সামনের দুই পা দিয়া জড়াইয়া ধরে ও তাহার পেট চাপিতে থাকে। তাহার ফলে স্ত্রী ব্যাঙ ডিম্ব প্রসব করে। তখন পুরুষ ব্যাঙ স্বীয় শুক্রকীট স্ত্রী ব্যাঙের দেহ হইতে যে ডিম্ব পুকুর বা নালার জলে নিঃসৃত হয় উহাদের উপর ছড়াইয়া দেয়।

কয়েকদিন পরে ডিম্বসমূহ পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। একরূপ বর্ণহীন জেলী জাতীয় স্বচ্ছ পদার্থ উহাদিগকে ক্রমে ঢাকিয়া ফেলে। ডিম্ব হইতে যে বেঙাচি জন্মায় উহারা এই জেলী খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। দশ দিনের মধ্যেই অসংখ্য বেঙাচি জলের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। মনে রাখা দরকার

যে, স্ত্রী ব্যাঙের ডিম্বগুলি তাহার দেহের বাহিরে পুরুষ ব্যাঙের ছড়াইয়া দেওয়া শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসে।

পক্ষীর বংশবিস্তার প্রণালী

স্ত্রীপুষ্পের ডিম্বকোষের মত স্ত্রী পক্ষীরও ডিম্বকোষ আছে। ইহাতে ডিম্ব সঞ্চিত থাকে। ইহার সঙ্গে সংযুক্ত একটি সরু এবং ক্ষুদ্র নল অন্ত্রের শেষ প্রান্তে —যেখানে বায়ুদ্বার অবস্থিত তাহার অতি সন্নিকটে—প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল ক্ষুদ্র ডিম্ব স্ত্রী পক্ষীর দেহাভ্যন্তরে ডিম্বকোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পক্ষীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ডিম্বগুলিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং কালক্রমে অঙ্কুরিত হইবার মতো পক্ক হইয়া উঠে।

পুরুষ পক্ষীর জীবনে জন্মদানের শুভ মুহূর্তের আবির্ভাব নানাভাবে সূচিত হয়, যথা—সুন্দর পালক-সজ্জা এবং সঙ্গীতের নেশা। স্ত্রীজাতীয় পক্ষীর সঙ্গে মিলিত হইবার একটি দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তখন পুরুষ পক্ষীর মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। মোরগ এবং মুরগীর মধ্যে মিলনের পূর্বক্ষণে যে শৃঙ্গার অভিনয় ঘটিয়া থাকে তাহা হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। অন্যান্য পক্ষীর মধ্যেও শৃঙ্গার-অভিনয়, নৃত্য এবং সঙ্গীতের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাগমের একটি জাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পক্ষীকুল তখন যেন মিলন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে এবং বাসা নির্মাণের দিকে মনোযোগ দেয়। স্ত্রী পক্ষী সেখানে ডিম পাড়ে। এই ডিম কোথা হইতে আসে?

পুরুষ পক্ষীর শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়া স্ত্রী পক্ষীর ডিম্ব প্রাণবন্ত এবং অঙ্কুরিত হয়। প্রকৃতি সকল জীবের মধ্যেই বংশরক্ষা ও দৈহিক মিলনজাত আনন্দলাভের একটি সহজাত সংস্কারের জন্ম দিয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ পক্ষী এমন ভাবে মিলিত হয় যে, পুরুষ পক্ষীর দেহ-নিঃসৃত শুক্রকীট স্ত্রী পক্ষীর ডিম্বের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায়।* ফলে যথাসময়ে স্ত্রী পক্ষী ডিম পাড়ে। ক্রমাগত উত্তাপ দান করিতে করিতে নির্দিষ্ট সময়ে এই ডিম হইতে পক্ষী শাবক ফুটিয়া বাহির হয়।

* সাধারণত পুরুষ পক্ষীর লিঙ্গ থাকে না। পুরুষ ও স্ত্রী পক্ষীর মলদ্বার (cloaca) ঘর্ষিত হইলেই শুক্রকীট স্ত্রীদেহে প্রবেশ করে। উহাদের মলদ্বার, মূত্রদ্বার, শুক্রপথ ও যোনিমুখ একই ছিদ্রে সন্নিবিষ্ট। এই ছিদ্রকেই (cloaca) ক্লোয়াকা বলে।

মুরগীর ডিম ও ছানা

মোরগ ও মুরগী গৃহপালিত পক্ষী। সচরাচর উহাদিগকে দেখিবার সুযোগ আমাদের খুবই ঘটে। মুরগীর ডিম্বাশয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ডিম্ব অবস্থিত থাকে। এই ডিম্ব ক্রমে পরিপক্ক হইয়া ডিম্ববাহী নলের ভিতর

(৬নং চিত্র) (মিস ষ্ট্রেন্ অবলম্বনে)

[মুরগীর ডিমের খোসা প্রথমে নরম থাকে। বাহিরের আলো বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই উহা কঠিন হইয়া যায়।]
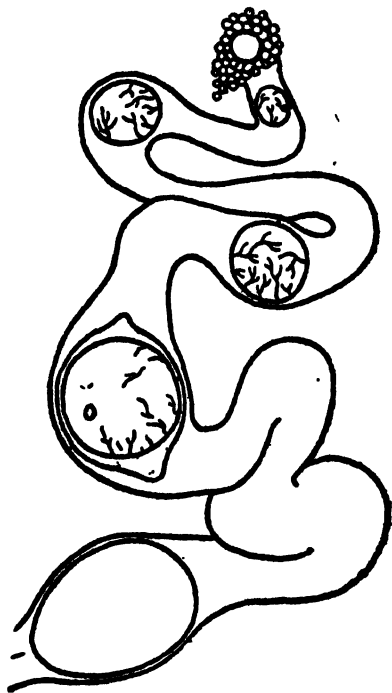
দিয়া একটি একটি করিয়া বাহির হইয়া আসে। আঙ্গিক মিলনের ফলে মোরগের শুক্রকীট মুরগীর ডিম্বগুলিকে প্রাণবন্ত করে। উপরের ৬নং ছবিতে ডিম্বের ক্রম-পক্কতা ও একটির পর একটির বড় হইয়া বাহির হইয়া আসিবার দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

ডিম্বের বিশেষত্ব এই যে উহাতে ভবিষ্যৎ ছানার গ্রহণোপযোগী সকল মাল-মশলাই পুরাপুরি ভাবে থাকে। পিতা মাতার সাহায্য ব্যতিরেকেও উহা হইতে মুরগীর ছানা জন্মিতে পারে। ইন্‌কিউবেটার (Incubator) যন্ত্রে এক সঙ্গে বহু ডিম নিয়মিত ও পরিমিত ভাবে উত্তাপ দিয়া ফুটান যায়।

৭ নং ছবিটিতে মুরগীর ডিমের ভিতরকার ক্রম-পরিবর্তন ও ছানার ক্রমপরিবর্ধন এবং উহার জন্ম বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।
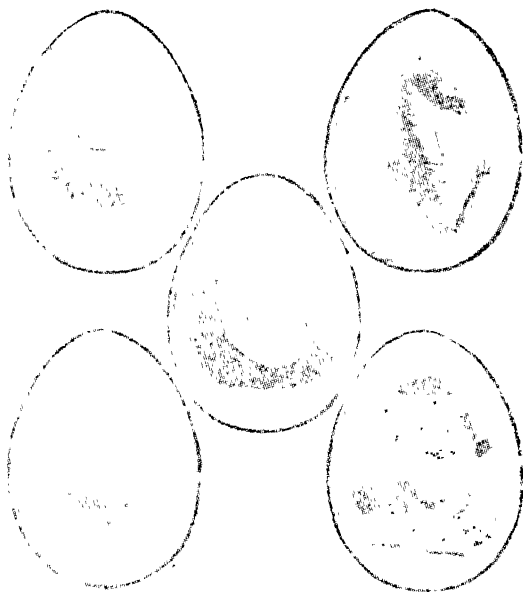
(৭নং চিত্র) (মিস্ ষ্ট্রেন অবলম্বনে)

মৌমাছির বংশবৃদ্ধি প্রণালী

মধুমক্ষিকা আমাদের এদেশে প্রচুর দেখা যায়। এক একটি মৌমাছির চাকে একটি রাণীমাছি, ৬০০ হইতে ৮০০ পুরুষ মাছি এবং ১৫০০০ হইতে ২০০০০ পর্যন্ত শ্রমিক মাছি থাকে। শ্রমিক মাছিকে পূর্বে ক্লীব জাতীয় বলা হইত কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে ইহারা স্ত্রীজাতীয় মাছিই বটে তবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত নহে। ইহারা আকারে ছোট ও হুল বিশিষ্ট। রাণীমাছিও ইহাদেরই মত কিন্তু উহা আকারে বড় এবং উহার পেট লম্বা। পুরুষ মাছিরা ভিন্ন রকমের। উহাদের মাথা গোল, চোখ বড় এবং হুল নাই।

রাণী মৌমাছির একমাত্র কাজ বংশবৃদ্ধি। ইহার দুইটি বড় ডিম্বকোষ আছে এবং ইহা ২৪ ঘণ্টায় ২০০০ হইতে ৩০০০ ডিম্ব পাড়িতে পারে। ইহার

আয়ুকাল ২।৩ বৎসর। পুরুষ মাছিগুলি গ্রীষ্মের প্রারম্ভে রাণীর পিছনে ধাবমান হয় এবং তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র উহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায়। এইরূপ সুযোগ পাইলেই পুরুষ মাছিটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

রাণী মৌমাছি তখন হইতে ডিম পাড়িতে থাকে। বসন্তকালে ইহা ২৪ দিনে প্রায় ১২০০০ ডিম্ব পাড়িতে পারে। পুরুষ মৌমাছির দ্বারা প্রাণবন্ত ডিম্ব হইতে স্ত্রীজাতীয় এবং অপ্রাণবন্ত ডিম্ব হইতে কেবল পুরুষ মৌমাছি জন্মায়। স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি অপরিণত অবস্থায় শ্রমিক-মাছি হয় ; বিশেষ যত্ন ও খাদ্যের প্রভাবে উহারা রাণী জাতীয়া উর্বরা মৌমাছিতে পরিণত হইতে পারে।

পিপীলিকার বংশবৃদ্ধি

পিপীলিকা যেখানে সেখানে দেখা যায়। মৌমাছির ন্যায় ইহারাও সমাজ-বদ্ধ জীবনযাপন করে। ইহাদের সমাজ জীবন খুব সুশৃঙ্খল। কার্যবিভাগ ও পরস্পরে মিলিত হইয়া কাজ করার পদ্ধতি কৌতুহলোদ্দীপক। পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী প্রকারের পিপীলিকা আছে।

এক একটি বাসায় এক বা একাধিক রাণী পিপীলিকা থাকে এবং বহু অপরিণত স্ত্রীজাতীয় পিপীলিকা শ্রমিক বা সৈনিক হিসাবে কাজ করে। রাণী ইচ্ছামত ডিম্ব পাড়ে। পুরুষ পিপীলিকার দ্বারা প্রাণবন্ত ডিম্ব হইতে স্ত্রীজাতীয় এবং অপ্রাণবন্তগুলি হইতে পুরুষ জাতীয় পিপীলিকা জন্মে। খাদ্যের পরিমাণ ও গুণের উপর স্ত্রী-পিপীলিকার রাণী পিপীলিকায় পরিণতি নির্ভর করে।

পুরুষ পিপীলিকা ও রাণী পিপীলিকার ডানা গজায় এবং তাহারা বাসার বাহিরে উড়িয়া চলে। এই অবস্থায় ইহাদের যৌনমিলন হয় এবং পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া পড়িয়া খাদ্যাভাবে মরিয়া যায়। রাণী হয় ঘরে ফিরে অথবা নূতন কোনও জায়গায় গিয়া নূতন বাসা বাঁধে।

রাণী জীবনে শুধু একবারই যৌন মিলনে ব্রতী হয় কিন্তু ইহার পরে বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া (১৭ বৎসর পর্যন্ত দেখা গিয়াছে) প্রাণবন্ত ও অপ্রাণবন্ত ডিম পাড়িতে পারে।

বংশবৃদ্ধির দ্রুত গতি

জীবজগতে বংশবিস্তারের একটি ব্যাপার বড়ই আশ্চর্যজনক। প্রত্যেক শ্রেণীই যাহাতে লোপ না পায় সেই জন্য বংশবিস্তারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

রহিয়াছে। তথাপি আবহাওয়ার পরিবর্তনে অনেক প্রাণীর বংশ পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে।

নিম্নস্তরের জীবসমূহ কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় তাহার পরিচয় দিয়াছি। বস্তুত প্রায় সকল জীবই নিজের অনুরূপ বহু জীবের জন্মদান করিতে পারে।

ডারউইন (Darwin) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Origin of Speciesএ এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে হস্তীই সম্ভবতঃ খুব কম শাবকের জন্মদান করে। কিন্তু তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৭৪০ হইতে ৭৫০ বৎসরে এক জোড়া হস্তীর বংশধর প্রায় ১৯০ লক্ষে দাঁড়াইবে! অন্যান্য প্রাণীর ত তবে কথাই নাই!

এক জোড়া বাইন মাছ যে ডিম্ব দেয় তাহা হইতে বংশ পরম্পরাক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত গঙ্গা নদী ভরিয়া যাইতে পারে। মাছের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ৭৫ জাতির প্রত্যেকের গড়ে ৬,৪৬,০০০ ডিম্ব হয়। উচ্চস্তরের প্রাণীদের মধ্যে ক্রমশ ডিম্ব বা সন্তানের সংখ্যা কমিয়া আসে। মানুষের মধ্যে প্রত্যেক বয়স্থা নারী ১৩।১৪ হইতে ৪৪।৪৫ বৎসর, অর্থাৎ ঋতু আরম্ভের পর হইতে ঋতু সংহারের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি দুই বৎসরে গড়ে একটি করিয়া মোট প্রায় ১৬টি সন্তান ধারণ করিতে পারে। বানর জাতির মধ্যেও সন্তান-সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় না।

একটি তেঁতুল গাছে এক বৎসরে যে বীজ হয় তাহাতে বহুশত মাইল-ব্যাপী স্থান তেঁতুল গাছে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতির সামঞ্জস্য-রক্ষা (Balance of Nature)

কিন্তু প্রকৃতি এক দিকে যেমন বংশরক্ষা এবং বিস্তারের ব্যাপারে খুব উৎসাহী তেমনি অপর দিকে আবার একই জীবে ধরাপৃষ্ঠ যাহাতে পূর্ণ না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। ইহাকেই প্রকৃতির সামঞ্জস্য-রক্ষার ব্যবস্থা (Balance of Nature) বলা যায়।

উদ্ভিদের অসংখ্য বীজের মধ্যে বহু নষ্ট হইয়া যায়; আবার যে সব বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া জন্মায় তাহাদের মধ্যে বহু সেই ক্ষেত্রে অন্য গাছ-পালার অবস্থিতির দরুণ বায়ু ও আলোর সংস্পর্শে আসিতে না পারিয়া মরিয়া যায়; বহু অঙ্কুর আবার জীব-জন্তুর উদর পূর্ণ করে। ডারউইন তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকে ইহার একটি পরীক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তিন ফুট লম্বা

এবং দুই ফুট প্রস্থ এক খণ্ড জমী সম্পূর্ণ খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেন। কিছুদিনের মধ্যেই উহাতে স্থানীয় আগাছার চারা দেখা দিলে তিনি প্রত্যেকটি গণিয়া চিহ্নিত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ৩৫৭টি চারার প্রায় ২৯৫টিকেই শামুক এবং কীটে নষ্ট করিয়া ফেলে। আবার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী গাছপালা দুর্বল গাছপালাগুলিকে মারিয়া ফেলে। ডারউইনের পরীক্ষাকৃত ৩ ফিট × ৪ ফিট একখণ্ড পরিচ্ছন্ন মাঠে ২০ প্রকার গাছপালার মধ্যে ৯ প্রকার অন্য ১১ প্রকার গাছপালার চাপে মারা গিয়াছিল।

বহু হরিণ অবশ্যই বাঘের উদর পূর্ণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া বাঘের শাবকে পৃথিবী ছাইয়া যায় নাই! এই ক্ষেত্রে প্রকৃতিই জন্মের হার হ্রাস করিয়া দিয়াছে। পুরুষ মানুষের প্রত্যেকবার বীর্যস্খলনে প্রায় ২০ হইতে ৫০ কোটির মত শুক্রকীট নির্গত হয় এবং প্রত্যেক সজীব ও সতেজ শুক্র-কীটই একটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সজীব স্ত্রী-ডিম্ব সাধারণত মাত্র একটি করিয়া প্রায় প্রতি ২৮ দিনে পরিপক্ক হইয়া নির্গত হয়। তাই উভয়ের সমন্বয়ে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে কম হয়।

জীবের বাঁচিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা (Struggle for Existence)

জন্মগ্রহণের পর সকল প্রাণীর বংশধরেরাই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতার (Struggle for Existence) সম্মুখীন হইয়া থাকে।

একই মাতাপিতার সন্তান-সন্ততির মধ্যে অনেকে শারীরিক দুর্বলতা, দুর্ঘটনা কিংবা শত্রুর বা রোগের আক্রমণে অল্পবয়সেই মরিয়া যায়। ইহাকেই ডারউইন প্রকৃতির নির্বাচন (Natural Selection) বলেন।

খাদ্যের অনটন ঘটায় বা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার চাপে যাহারা **উপযুক্ত** তাহারাই খাদ্যের যোগাড় করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest) ইহাকেই বলে।

সারমর্ম

পাঠক-পাঠিকার মনে রাখিবার সুবিধার জন্য আমরা আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

প্রকৃতির যাবতীয় পদার্থকে আমরা চেতন ও অচেতন—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। কীট, পতঙ্গ, গাছ, লতা ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর ; এবং

ইট, লোহা, জল ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর। অচেতন জগৎ হইতে কোনও এক উপযুক্ত মুহূর্তে চেতন জগতের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য এই দুইএর মধ্যে একেবারে সুনির্দিষ্ট সীমা রেখা টানা যায় না।

চেতন পদার্থকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—প্রাণীজাতীয়—যথা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, (২) উদ্ভিদ্ জাতীয়—যথা, গাছ, লতা, ঘাস।

চেতন পদার্থ নানারকম খাদ্যে পরিপুষ্ট হইয়া জীবন ধারণ করে ও বৃদ্ধি পায়; অচেতন পদার্থের জীবনও নাই এবং নিজ হইতে তাহার বৃদ্ধিও হয় না। এক টুকরা পাথরের কোন কিছু খাইবার দরকার নাই; যেমনটা তেমনটাই থাকিয়া যায়। **অবশ্য** রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে কিন্তু এই পরিবর্তন চেতন পদার্থের পরিবর্তনের অনুরূপ নহে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয়ের **জন্ম, শরীর, বংশবৃদ্ধি** এবং **মৃত্যু** আছে। উভয়কেই শ্বাস লইতে হয় এবং জীবন ধারণের জন্য উভয়েরই খাদ্য ও জলের প্রয়োজন হয়।

বংশবিস্তারের কথাই আমরা **প্রথম** আলোচনা করিব। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথাও পরে আলোচিত হইবে।

বংশবিস্তারের বহু উপায় প্রকৃতিতে দৃষ্ট হয়। (১) শরীরের অংশ-বিশেষ কর্তিত বা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া অন্য সদৃশ জীবের আকার গ্রহণ করে (২) একই জীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত হইয়া বংশবিস্তার করিতে পারে; (৩) স্ত্রীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্রকীটের সংযোগ দেহের বাহিরে হইতে পারে; (৪) আবার ডিম্ব ও শুক্রকীটের সংযোগের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী জীবের আঙ্গিক মিলনেরও আবশ্যক হয়।

উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হইয়া স্বীয় দেহাভ্যন্তরে সন্তান ধারণ করিয়া থাকে। যদিও মানুষ বুদ্ধি বলে পুরুষ-জীবের শুক্রকীট স্ত্রী-জীবে প্রবিষ্ট করাইয়া কৃত্রিমভাবে সন্তান জন্মাইতে (Artificial Insemination) পারে, তবু বিরাট প্রকৃতিতে জন্ম-প্রকরণের যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য।

মানবজাতির মধ্যে প্রজনন

জননেন্দ্রিয় সমূহ

(Anatomy of Reproduction)

মানব সৃষ্টির আদি কথা—ধর্মীয় ও উপকথামূলক

মানবজন্ম সম্বন্ধে ইহুদীদের মধ্যে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, সৃষ্টি-কর্তা গোড়াতে আদম নামক একজন পুরুষ ও হাওয়া (ইংরাজীতে লেখা হয় ঈভ Eve) নাম্নী একজন নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত নর-নারী ঐ আদম-হাওয়ার সন্তান। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম মানব-সৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে। এই বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু উহাদের কোনটিই বিজ্ঞান-সম্মত নহে। বিজ্ঞান-সম্মত না হইলেও ইহুদী মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, উহাতে সমস্ত মানবের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত আছে।

এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু মতবাদ এই যে, মনুই আদি মানব। মনু একটি মৎস্যের সাহায্যে জল-প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়া হিমালয় পর্বতে আরোহণ করেন, এবং সেখানে বিভিন্ন জৈবিক উপাদানে একটি নারী সৃষ্টি করিয়া তাহার গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করেন। মনু-সংহিতার মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মানুষ চারিটি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

বিভিন্ন ধর্মমত ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মানব-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রায় সমস্তগুলিই ঐরূপ কোনও-না-কোনও **আদি-মানবের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছে।**

বৈজ্ঞানিক মতবাদ

কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হয় ইউরোপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের (Theory of Evolution) প্রতিষ্ঠা দ্বারা এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি সূত্র আবিষ্কার করেন।

সহজ ও অবৈজ্ঞানিক ভাষায় সংক্ষেপত তাঁহার অভিমত এই যে, আদিম জীবাণু, প্রকৃতির শক্তি ও অবস্থার, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য নিত্য নূতন রূপ গ্রহণ করিতেছে (Variation)। বংশানুক্রমিকতা (Heredity) জীবাণুর রূপান্তর-গ্রহণ-ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিতেছে। ক্রমাগত জীবন সংগ্রামে রত থাকিয়া জীবাণু নিজেকে প্রকৃতি হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ উপযোগী হইবার জন্য জীবাণুকে গ্রহণযোগ্য নূতন রূপের নির্বাচন (Selection) করিতে, অর্থাৎ দৈহিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইতেছে। এই কার্য সম্পাদনকালে প্রাকৃতিক, দৈহিক ও মানসিক কারণে জীবসমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে (Isolation) এবং এই ভাবে শ্রেণীর (Species) সৃষ্টি হইতেছে।

কথাটা আরও বুঝাইয়া বলা যাউক।

অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন প্রচার করেন যে কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণে আদিম জীববস্তুর ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সাধিত হইতে হইতে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। **মানুষও এই রকমের ক্রমোন্নত জীব মাত্র।**

নিম্নে পাঁচটি প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লেখ করা হইল—

(ক) **পিতৃক্রম** (Heredity)—জীব নিজ সদৃশ জীবই সৃষ্টি করে। কুকুরে কখনও বিড়ালের জন্ম দেয় না; কুকুরের গর্ভে কুকুরই জন্মিয়া থাকে। সাধারণত দেখা যায় শিশু এবং তাহার মাতাপিতার মধ্যে কায়িক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(খ) **বৈসাদৃশ্য** (Variation)—একজাতীয় জীবও আবার পরস্পর একেবারে সদৃশ হয় না। দুইজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ঠিক একরূপ হয় না;— মানুষের শারীরিক গঠন এবং মুখাকৃতি চিরকালই বিভিন্ন। এ ব্যাপার খুবই সাধারণ বটে কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক।

(গ) প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তু যত জন্মায় তত বাঁচিয়া থাকে না। প্রকৃতি বড়ই হিসাবী, তাই দেখা যায়—

(ঘ) প্রত্যেক গাছপালা এবং জীবজন্তুকে খাদ্যবস্তু এবং জীবনধারণের

জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্য পরস্পরের মধ্যে **প্রতিযোগিতা** করিতে হয়। সুতরাং—

(ঙ) যে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে সর্বাপেক্ষা বলবান, অথবা পারিপার্শ্বিকতা ও জীবনধারণের পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে, সে-ই জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকে এবং জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকে। ইহাকেই **যোগ্যতমের উদ্বর্তন** (Survival of the Fittest) বলে।

এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আদিম জীববস্তু হইতে ক্রমোন্নত হইয়া মানবজাতি উদ্ভূত হইয়াছে। দৃশ্যত এবং দৈহিক বিবর্তনের দিক দিয়া মানুষ সিম্পাঞ্জি, গোরিলা এবং ওরাং-ওটাং-এর নিকটবর্তী। শুধু—ভাষার সাহায্যে মানুষ অপূর্ব চিন্তা-জগতের সন্ধান পাইয়াছে মাত্র।

অভিব্যক্তিবাদ—মানব জগতের চিন্তাধারার একটি আমূল পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে; তথাপি বলিতে হয় যে, এই মতবাদ নিজেই এখনও পর্যন্ত বিবর্তনের পথেই চলিয়াছে। এই মতবাদের সীমারেখা টানিবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই।

ডারউইন যখন এই মতবাদ লইয়া প্রথম বিজ্ঞান-জগতের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, ধার্মিক, অধার্মিক সমস্ত সম্প্রদায় মিলিয়া তাঁহাকে এক-ঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বর্তমানে সে বিরুদ্ধতার ঝড় কাটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার মত প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গচালন, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, পরিপোষণ, বর্ধন ও প্রজনন এই পাঁচটিই মাত্র সাধারণ **জীবন-লক্ষণ**। (প্রথম অধ্যায়ের 'জীবন কি ?' অনুচ্ছেদ দেখুন)। জীবনী-শক্তির এই পাঁচটি বিকাশ-ভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখা প্রণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রজনন শাখাই আমাদের বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

প্রজনন বিষয়ে প্রাচীন কালের লোকের ধারণা

প্রজনন সম্ভবপর হয় নারী পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা। এই সকল ইন্দ্রিয়ের সম্যক্ পরিচয় না থাকায় মানুষ অজ্ঞতা-প্রসূত অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া উহাদের পূজা পর্যন্ত করিয়াছে। **প্রত্যেক ধর্মের মূল উৎস হইয়াছে মানুষের বিস্ময়জনিত ভয়।** অজ্ঞাত বা রহস্যময়ের পূজা করিয়াই মানুষ ধর্মের অবতারণা করিয়াছে

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি বিশাল ও বিরাট রহস্যময় প্রকৃতির শক্তিকেন্দ্রসমূহকে কোনও কোনও সময়ে মানুষ পূজা করিয়াছে ; এখনও অনেক দেশে অনেক জাতি উহাদের পূজা করে। সূর্যকে বিভিন্ন নামে নানা জাতি পূজা করিয়াছে। সূর্যদেবের মধ্যে তাহারা জমি উর্বর করিবার ক্ষমতা আরোপ করিয়াছে। আলো এবং উত্তাপ দিয়া সূর্য পৃথিবীকে গাছপালা, ফুলে-ফলে সজ্জিত করে—এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ কল্পনার সাহায্যে **সূর্যকে পিতা** এবং **পৃথিবীকে মাতা** বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে।

আবার যেহেতু স্ত্রী, পুরুষ ও উভলিঙ্গ এই তিন জাতীয় প্রাণীর কথাই তাহাদের জানা ছিল, তাই তাহারা প্রকৃতির প্রায় সকল জিনিষেই কোনও একটি লিঙ্গ আরোপ করিয়াছে।

প্রথমতঃ প্রাচীন ও বর্বর জাতিদের প্রায় সকলেই অজ্ঞতাবশতঃ নর-নারীর দেহমিলনের সহিত গর্ভপ্রকরণের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইত না। স্ত্রীলোকের গর্ভে দেবতাদের দান হিসাবে সন্তানের জন্ম হয় বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। সহবাসকে শুধু আমোদজনক কার্য মাত্র বলিয়াই মনে করিত। যৌন উপগমন বা শৃঙ্গার-অভিনয়, নৃত্য, চুম্বন ইত্যাদি মিলনের প্রাথমিক ক্রীড়াসমূহকে দেবতাদের তুষ্টিজনক বলিয়া ধরা হইত। এমন কি স্বপ্নে বা কল্পনায় দেবতাদের সহিত মিলনের প্রতিচ্ছবি দেখা অনেকেরই আত্মপ্রসাদের কারণ হইত!

অপেক্ষাকৃত উন্নত আদিম জাতির মধ্যেও এই ধারণা এখনো রহিয়া গিয়াছে। বৃটিশ নিউগিনির অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে গর্ভাধান নারীর স্তনযুগলের মারফত হয় এবং পরে শিশু তলপেটে চলিয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অন্তর্গত কুইন্স্ল্যাণ্ডের (Queensland) অধিবাসীরা মনে করে তৈয়ারী শিশু সর্প বা পক্ষীরূপে জননীর অন্ত্রাভ্যন্তরে কোনক্রমে স্থান পায় ; উত্তর আমেরিকার উত্তরের অধিবাসী এস্কিমোরা মনে করে শিশুর জন্ম অতিপ্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে, স্ত্রীর যোনিদ্বারে পুরুষের শুক্র ভর্তি করার উদ্দেশ্য জরায়ুর মধ্যস্থ ভ্রূণকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলা।

লিঙ্গ ও যোনিপূজা

ইহার পরে বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মিলনের সহিত সন্তানের জন্মের সম্বন্ধ থাকাটাই সম্ভবপর মনে করিতে লাগিল। এই ধারণার

উপরেই বহু ধর্মে যে (সৃষ্টিকার্যের, সুতরাং সৃষ্টিকর্তার প্রতীকরূপে) লিঙ্গ-পূজার (Phallic worship) প্রচলন আছে তাহার ভিত্তি অবস্থিত। প্রাচীন-কালের পুঁথিপুস্তকে আমরা তখনকার লোকের এই বিশ্বাসের পরিচয় পাই যে, দক্ষিণ অণ্ডকোষের বীজে পুত্র সন্তান এবং বাম অণ্ডকোষের বীজে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।* পুরুষের লিঙ্গ এবং দুইটি অণ্ডকোষ—এই তিনটিকে (Phallic trinity) যথাক্রমে আশের (Asher), আনু (Anu) এবং হোয়া (Hoa) দেবত্রয়ের মধ্য দিয়া সিরিয়ার লোকেরা পূজা করিত এবং আশেরা (Asherah) নাম্নী উর্বরতার দেবীকে স্ত্রীলোকেরা ভগের প্রতিরূপ মনে করিত।

বাইবেলের বহুস্থানে ইন্দ্রিয় প্রশস্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে। তখনকার যুগে ঈশ্বরের নামে শপথ না করিয়া নিজের বা অপরের যৌনেন্দ্রিয়ে হাত রাখিয়া দিব্য করিলেই বক্তার সত্য কথনের প্রতি আস্থা হইত। এব্রাহিম নবী একবার তাঁহার ভৃত্যকে তাঁহার লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এইজন্য অণ্ডকোষের ইংরাজী Testicle শব্দ হইতে Test (পরীক্ষা), Attestation (সহি করা), Testament (দলিল), Testify (যথার্থতা সমর্থন করা), Testimonial (যে দলিলে কোনও কথা দৃঢ়ভাবে বলা হয় যথা, সার্টিফিকেট) ইত্যাদি হইয়াছে।

কোনও কোনও দেশে লিঙ্গ অপেক্ষা যোনির পূজা অধিকতর প্রচলিত ছিল। বাইবেলের পুরাতন ভাগে (Old Testamentএ) 'আশীরী' নামক এক পূত কাষ্ঠপিণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহা পূর্ব যুগে ফিনিসিয়দের প্রধান দেবতা বা আল-পত্নী অ্যাশ্‌টোরেথের জননেন্দ্রিয়ের চিহ্ন। আকারে উহা স্ত্রীলোকের যোনিরই সদৃশ ছিল।

প্রাচীনকালে ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের লোকেরা বাড়ীর বহির্দ্বারের উপর শুভ হিসাবে ভগচিহ্ন রাখিত। ভগাকৃতি বলিয়া সেখানে আজিও পথে পড়িয়া থাকা ঘোড়ার খুরের নাল শুভচিহ্ন ভাবিয়া অনেকে সযত্নে রক্ষা করে।

আরব, পারস্য, সিরিয়া, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি সকল স্থানে ব্যাপকভাবে এইরূপ পূজার প্রচলন ছিল।

---

* এমন কি গত শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত ডাঃ ট্রালের (Tryallএর) Sexual Physiologyর প্রথম সংস্করণে এই মত এবং ইহার সমর্থনে কতকগুলি পরীক্ষার বিবরণ ছিল।

স্যার উইলিয়াম হ্যামিণ্টন (Sir William Hamilton) বলেন, প্রতি বৎসর ইসারনিয়ায় (Isernia) একটি মেলা ও উৎসব হয় এবং এই মেলায় মোমের তৈরী পুরুষ-জননেন্দ্রিয়ের প্রতিমূর্তি প্রকাশ্যভাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই সকল লিঙ্গমূর্তি ছোট বড় সকল আকারেরই হইয়া থাকে।

লিঙ্গপূজার প্রচলন পূর্বে ভারতবর্ষে ছিল এবং এখনও আছে।

শিশ্নদেবতার সন্ধান ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। রুদ্র বা শিব ছিলেন তখনকার কালে রাত্রি ও ঝঞ্ঝার অধিদেবতা। তাঁহার কৃপায় রাত্রির অন্ধকারে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করা হয়—অথবা লোকের মনে সুরতস্পৃহা জাগাইয়া তিনি জীব-সৃষ্টির সূত্রপাত করেন এই হিসাবে শিব জীবজগতের মঙ্গল-বিধাতা বলিয়া গণ্য। তাঁহার শিশ্ন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী বলিয়া মনে করা হয়।

এখনও হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে শিবমন্দিরে গৌরীপট্ট সমন্বিত শিবলিঙ্গ ও কামাখ্যার দেবীযোনি ভক্তিভরে পূজা করেন। কুমারীরা শিবের মত সৎ ও মৃদু-স্বভাবের স্বামী লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করে।

অন্ধবিশ্বাসের জন্য পূর্বেকার লোকদিগকে বিদ্রূপ করিবার কোনও কারণ নাই। **যেখানে রহস্য, যেখানে শক্তি ও তেজ সেখানেই ঐশীশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা** মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তি। যৌনক্রিয়া সাধারণ ব্যাপার হইলেও মানবসৃষ্টি একটি রহস্যপূর্ণ ঘটনা। এই রহস্যোদ্ঘাটন সবে মাত্র সম্ভবপর হইয়াছে।

ধর্মের নামে অনাচার

যৌন-ব্যাপারে নিজেদের কুসংস্কার-বশত অনেক অন্ধ-ভক্ত, এবং মানুষের এই সাধারণ অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক ভণ্ড তপস্বী ধর্মের নামে নানা যৌনকদাচারের প্রবর্তন এবং যৌন-স্বৈরাচার সাধন করিয়া গিয়াছে।* বিভিন্ন জাতির ধর্ম-মন্দিরে ধর্মের নামে যে বেশ্যাবৃত্তি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, ইহা দ্বারা বুদ্ধিমান ভণ্ডেরা যে শুধু নিজেদের কাম-লালসার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে তাহাই নহে; সাধারণ মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণাকেও নিতান্ত নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছে। পরলোকে গিয়া সেবা করিবে অথবা নারীর অক্ষয় অনন্ত স্বর্গলাভ হইবে এই ধারণায় স্ত্রীকে জীবন্ত স্বামীর সহিত দগ্ধ করা বা জীবন্ত সমাহিত করা হইয়াছে। শিশু কন্যাকে হত্যা করা, ঈশ্বরকে

---

* শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত যৌনবিকৃতি ও যৌনাপরাধ দেখুন।

দেহদানের নামে তাঁহার স্থুলাভিষিক্ত ধর্মযাজক, মঠাধিকারী বা গুরুর শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, সন্তানলাভের আশায় মন্দিরবিশেষে পর-পুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়া, স্বামীর পদতলে স্বর্গের অবস্থিতি বলিয়া পুরুষের সহস্র অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ইত্যাদি সহস্র অনাচার ধর্মের নামে চলিয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে তখনকার লোকের স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে **সঠিক ধারণাই** ছিল না। **জন্মপ্রকরণের ধারা** ত আরও **অজ্ঞাত** ছিল।

যাহা হউক শরীর-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা এবং অণুবীক্ষণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর মানুষ নারী-পুরুষের আভ্যন্তরিক সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির **অবস্থিতি, ক্রিয়া** ইত্যাদির বিষয়ে **অনেক** জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

প্রজনন বিজ্ঞানের ইতিহাস

সৃষ্টির যুগল বীজস্বরূপ পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর ডিম্বের অস্তিত্ব যে কত অল্পকাল আগে জানা গিয়াছে তাহা নিম্নের প্রজনন-বিজ্ঞানের ই.তহাস হইতে প্রতীয়মান হইবে।

এ বিষয়ে ধারাবাহিক গবেষণা করেন সর্বপ্রথম গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিষ্টট্‌ল্ (Aristotle খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২)। তিনি প্রাণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন: এক শ্রেণী যৌন-মিলনের ফল; অপর শ্রেণী বিনা-যৌন-মিলনে প্রাকৃতিক শক্তি হইতে স্বতঃপ্রসূত। প্রাণীসমূহ সম্বন্ধে অ্যারিষ্টট্‌লের ও ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদের মত এই যে, নারীর ঋতুস্রাবের সহিত পুরুষের শুক্র মিশ্রিত হইয়া সন্তানোৎপাদন কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে! নারীর দান জীবের প্রাণশক্তি এবং পুরুষের দান তাহার দৈহিক গঠন!

এশিয়ার পশ্চিমে আধুনিক তুর্কীর অধিবাসী গ্যালেনের (Gallen ১৩০—২০১ খৃঃ) অভিমত এই যে, পুরুষের শুক্র তাহার অণ্ড-শিরায় এবং নারীর শুক্র তাহার রক্তবাহী অণ্ড-শিরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং উভয়ের শুক্র নারীর জরায়ুতে সংমিশ্রিত হইয়া ভ্রূণ উৎপাদিত হইয়া থাকে। প্রায় দশ শতাব্দী কাল এই মতবাদ ইওরোপে প্রচলিত ছিল।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের (Charles I) গৃহ-চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) এ বিষয়ে নূতন মতবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি হরিণীর উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অ্যারিষ্টট্‌ল্ ও গ্যালেন উভয়েরই মতবাদ ভ্রান্ত। তিনি সিদ্ধান্ত

করেন যে, পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে না ; পরন্তু উহার সংস্পর্শে জরায়ুর মধ্যে স্বতই একপ্রকার ডিম্ব উৎপন্ন হয়। উহাই ক্রমে ভ্রূণে পরিণত হয়।

ইহার পর লিডেনের (Leyden) সোয়ামার্ডম্ (Swammerdam), ভ্যান হর্ণ (Van Horne), ষ্টেন্‌সেন্ (Stensen), ডি, গ্রাফ্ (De Graf) প্রভৃতি গবেষকগণ এ বিষয়ে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হন। ডি, গ্রাফ্ ১৬৬৮ ও ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে দুইখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রজনন বিষয়ে জগতকে সম্পূর্ণ নূতন সত্য দান করেন। তিনি খরগোসের উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জরায়ুর মধ্যে ডিম্ব সৃষ্ট হয় না ; ফ্যালোপিয়ান নল বাহিয়া উহা জরায়ুতে আগমন করিয়া থাকে। বিজ্ঞান-জগতের রীতি অনুযায়ী, ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ডিম্বাণুর খোলের নাম রাখা হইয়াছে গ্র্যাফিয়্যন ফলিক্ল (Graffian follicle)।

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে লিউয়েনহোক্ (Leeuwenhock) সর্বপ্রথম শুক্রকীট আবিষ্কার করেন। কিন্তু শুক্র-কীটকেই তিনি সর্বেসর্বা মনে করিয়াছিলেন ; নারীর ডিম্বের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি একেবারে অস্বীকার করিতেন। লিউয়েনহোকের শুক্রকীট মতবাদকে তাঁহার শিষ্যগণ এতদূর প্রাধান্য দিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, উহা যুক্তির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে নাকি শুক্রকীটের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব দর্শন করিয়াছিলেন !

ইহার প্রায় সত্তর বৎসর পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ফন্ হেলার (Von Haller) ভেড়ীর উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ডিম্বাধার হইতে কোনও-একটা-কিছু জরায়ুতে আসিবার ফলেই তথায় ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জেনেভার (Geneva) প্রিভোষ্ট (Prevost) ও ডুমা (Dumas) নামক দুইজন তরুণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে, শুক্রকীট পুরুষের অণ্ডকোষে উৎপন্ন হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফন্ বেয়ার (Von Baer) সর্বপ্রথম নারীর ডিম্ব আবিষ্কার করেন। তিনি কুকুরের উপর পরীক্ষা চালাইয়া বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ জরায়ু হইতে ফ্যালোপিয়ান নলের দিকে লক্ষ্য করিয়া ডিম্ব-কোষের মধ্যে ডিম্ব আবিষ্কার করেন।

ইহার পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হার্টউইগ্ (Hertwig) যখন **ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলন** আবিষ্কার করেন, তখন প্রজনন-বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্তুত অধিকাংশ জীবের জন্মেরই ইহাই ধারা। **সাধারণ পুরুষের একটি মাত্র শুক্রকীট নারীর একটি মাত্র ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রূণের রূপ প্রাপ্ত হয়।**

আধুনিক মত

সুতরাং (এ্যামিবা প্রভৃতি কয়েকটি শুধু অণুবীক্ষণ দ্বারাই দৃশ্য জীব ব্যতীত) প্রত্যেক প্রাণীর জন্মের গোড়ার কথা **পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বের সংমিশ্রণ**। শুক্রকীট ও ডিম্বের সংমিশ্রণের জন্য নর-নারীর যৌন-
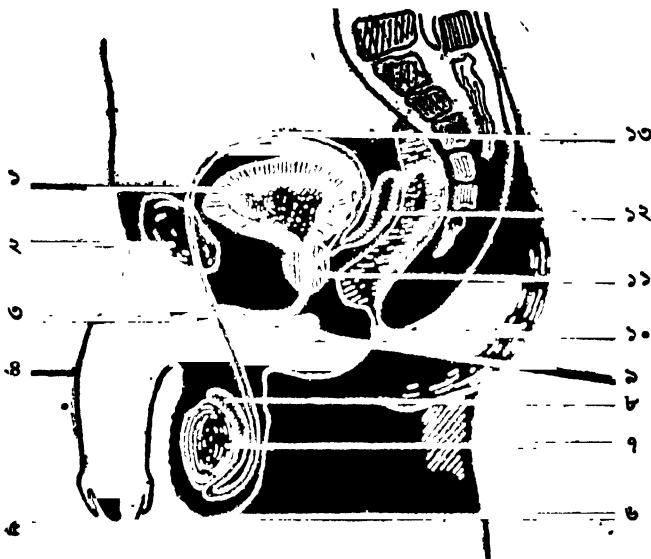
(৮নং চিত্র)

১। মূত্রাধার। ২। পিউবিক অস্থি। ৩। মূত্রনালীর পথ। ৪। লিঙ্গ। ৫। মূত্রনালীর মুখ। ৬। অণ্ডকোষের থলি। ৭। অণ্ডকোষ। ৮। এপিডিডাইমিস। ৯। কাউপার গ্রন্থি। ১০। গুহ্যদ্বার ১১। প্রষ্টেট গ্রন্থি। ১২। শুক্রকোষ। ১৩। শুক্রবাহী নল।

মিলন দরকার। অবশ্য নারী-পুরুষের যৌন-মিলন ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বের মিলন সংঘটন করিয়া সন্তানোৎপাদনের কাজ চলিতেছে। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিব। নারী-পুরুষের

যৌন-মিলনে যে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাই সর্বপ্রথমে আলোচ্য। কারণ মানুষ বুদ্ধিবলে অল্প ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের (Artificial insemination এর) সহায়তা করিলেও বিরাট প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহা সমাধা হয়।

জননেন্দ্রিয়সমূহ

প্রাণীজগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই পুরুষ ও নারী এই দুইটি যৌন শ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই দুই শ্রেণীর সহযোগিতাতেই সৃষ্টিকার্য চলিয়া আসিতেছে। পুরুষ ও নারী চিনিবার উপায় প্রধানত তাহাদের বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের প্রভেদ। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষের মধ্যেও জননেন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এখানে নরনারীর জননেন্দ্রিয়-সমূহের মোটামুটি পরিচয় প্রদান করিতেছি।

পুরুষের জননেন্দ্রিয়সমূহ

পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে **লিঙ্গ** ও **অণ্ডকোষই** প্রধান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছাড়া আবার প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি, শুক্রকোষ প্রভৃতি কতিপয় উপাঙ্গ আছে।

পূর্ব পৃষ্ঠায় যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, উহা নরদেহের জননেন্দ্রিয়-প্রধান অংশের লম্বমানভাবে ছেদিত অংশ। উহাতে পুরুষের যৌন-অঙ্গসমূহের পারস্পরিক অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইবে। নারীর যৌন-অঙ্গের আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালী হইতে পুরুষের যৌন-অঙ্গের আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালীর কত পার্থক্য, এই ছবির সহিত পরবর্তী নারী-যৌন-অঙ্গের ছেদিত আভ্যন্তরিক ছবির তুলনা করিলেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

বস্তিপ্রদেশ

নাভির তলদেশে উরুদ্বয়ের সংযোগ স্থলে যেখানে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ সংলগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে বস্তিপ্রদেশ বলা হয়। যৌবনাগমে ঐ স্থানে লোমোদ্গম হইয়া থাকে।

লিঙ্গ

পুরুষের **লিঙ্গ** (উপস্থ, শিশ্ন, Penis) প্রস্রাব নির্গমনের পথ হইলেও ইহা প্রধানত **সঙ্গমযন্ত্র** (চিত্র—৮, নং—৪)। ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় দুই হইতে

তিন ইঞ্চি লম্বা এবং এক হইতে সোয়া এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা শিথিলভাবে ঝুলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও অস্থি না থাকায় ইহা অতিশয় কোমল। ইহা প্রধানত শিরা, উপশিরা, তন্তু ও স্নায়ুর দ্বারা গঠিত। নীচে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, ইহা আড়াআড়ি ভাবে ছেদিত (Cross Section) লিঙ্গের ছবি।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে লিঙ্গের অভ্যন্তরভাগ তিনটি কুঠরীতে বিভক্ত। এই তিনটি কুঠরীই রক্তবাহী উপাদানসমূহের সমষ্টি মাত্র। উপরিভাগে স্পঞ্জের ন্যায় যে দুইটি যুক্ত কুঠরী (৫) দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহারা প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য রক্তবাহী নলিকার সমষ্টি মাত্র। ইহারা সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণশীল কতকগুলি স্নায়বিক ও পৈশিক তন্তুদ্বারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। উহাদের নিম্নে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি স্পঞ্জসদৃশ যে কুঠরীটি (৮) দৃষ্ট হইতেছে, উহাও রক্তনালীর সমষ্টিমাত্র। উহার মধ্যস্থলে যে **ছিদ্রটি** দেখা যাইতেছে (৭) উহাই **মূত্রনালী** (urethra)। **শুক্রও এই পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়।**
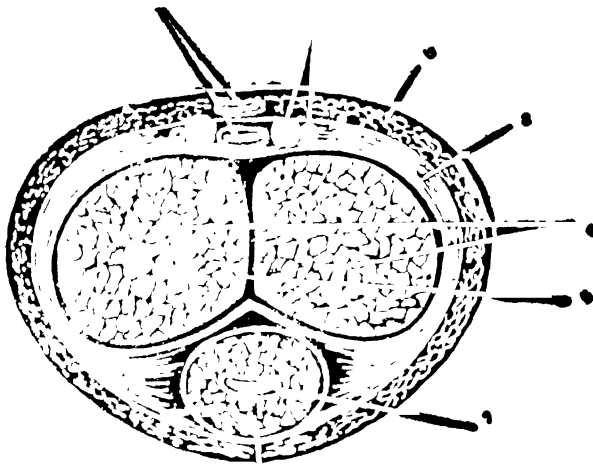
(৯ নং চিত্র)

১—পৃষ্ঠাবলম্বী লিঙ্গশিরা, ২—পৃষ্ঠাবলম্বী ধমনী ও স্নায়ু, ৩—চর্ম, ৪—তান্তব আবরণ, ৫—রক্তবাহী নলসমষ্টি, ৬—পর্দা, ৭—মূত্রনালীবেষ্টক, ৮—রক্তবাহী নলসমষ্টি।

উত্তেজনার সময় লিঙ্গের এই সমস্ত অসংখ্য রক্তবাহী নলিকাসমূহ (৫) শোণিত-সঞ্চাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গের আয়তন ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।

লিঙ্গমূলের পেশীসমূহ লিঙ্গের এই উত্থান ও দৃঢ়তা সংরক্ষিত করে। উত্থানাবস্থায় লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৭ ইঞ্চি এবং ব্যাস দেড় হইতে আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা নিগ্রোদের) এই অবস্থায় কাহারও নয় হইতে বার ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হওয়ার কথা ডাক্তারেরা বলিয়াছেন। ইহার আগাগোড়া আয়তনে প্রায় সমান, তবে অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা ও দৃঢ় হইয়া থাকে। বাহিরে লিঙ্গের দৈর্ঘ্য (সাধারণ অবস্থায়) মাত্র তিন চারি অঙ্গুলি দেখাইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অনেক বেশী লম্বা। উহা পশ্চিমদিকে দীর্ঘ হইয়া গুহ্যদ্বারের (চিত্র—৮, নং—১০) দিকে গিয়া শেষ হইয়াছে।

লিঙ্গের অগ্রভাগকে লিঙ্গাগ্র বা লিঙ্গমুণ্ড (Glans penis) কহে। ইহা শৈশবে ত্বক (Foreskin, Pre-puce, অগ্রচ্ছদা) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ত্বক্ (অগ্রচ্ছদা) ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তখন লিঙ্গাগ্র স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত আবৃত এবং উত্তেজিত অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত উন্মুক্ত হয়। লিঙ্গাগ্রভাগ অতিশয় স্পর্শশীল কোমল তন্তুসমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় কোমল ও মসৃণ ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত। ইহা ঈষৎ গোলাকার। লিঙ্গাগ্রভাগের মস্তকের ছিদ্রটি মূত্র ও শুক্র নির্গমনের পথ (চিত্র—৮, নং—৫)। লিঙ্গমুণ্ডের এক ইঞ্চি পশ্চাতে অঙ্গটি ঈষৎ সরু হইয়া লিঙ্গাবরক ত্বকের সহিত মিশিয়া আবার মোটা হইয়াছে, এই সরু অংশের নাম **লিঙ্গ-গ্রীবা** (Corona)। গ্রীবার অগ্রভাগে লিঙ্গের মুণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পরিধিবিশিষ্ট এবং বর্তুলাকার। ইহার ফাটলের পশ্চাৎদিক লিঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনুভূতিশীল স্থান এবং ইহা উঁচু বলিয়া রতিক্রিয়ার সময় ইহারই সহিত যোনিগাত্রের বেশী ঘর্ষণ হওয়াতে উভয়ের গভীর সুখানুভূতি হয়।

লিঙ্গের দৈর্ঘ্য বা আয়তন পুরুষের রতিশক্তির নির্ভুল পরিচায়ক নহে। উহার সহিত পুরুষের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতারও বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

অণ্ডকোষ

লিঙ্গের মূলদেশের নিম্নে একটি চামড়ার থলি (Scrotum) আছে (চিত্র—৮, নং—৬)। এই থলির মধ্যে দুইটি ঈষৎ গোলাকার মাংসগ্রন্থি আছে। এই মাংস গ্রন্থিদ্বয়কে **অণ্ডকোষ** (Testicles) বলা হইয়া (চিত্র—৮,

নং—৭) থাকে। অণ্ডকোষদ্বয়ের প্রত্যেকটি স্বভাবত দেড় ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি প্রশস্ত ও আড়াই ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডকোষ সাধারণত সুস্থতার লক্ষণ নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় অণ্ডকোষদ্বয় থলির মধ্যে দুই হইতে আড়াই ইঞ্চি ঝুলিয়া থাকে। শীত লাগিলে থলিটি সঙ্কুচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাম অণ্ডকোষটি দক্ষিণটি হইতে বড় হয় এবং একটু বেশী ঝুলিয়া থাকে। ইহাতে ভয় করিবার কিছুই নাই বরং সুবিধা আছে। দুই উরু একত্র করিলে অথবা এক উরুর উপর অপরটি রাখিলে উহারা পরস্পরের সহিত চাপিয়া যায় না।

স্থূলদৃষ্টিতে এই অণ্ডকোষদ্বয় মানুষের শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অণ্ডকোষদ্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। অণ্ডকোষদ্বয় অসংখ্য রক্তবাহী শিরা ও নলিকা দ্বারা গঠিত। **এই সমস্ত নলিকায় শুক্রকীট জন্মিয়া থাকে।** শুক্রকীট সৃষ্ট হইয়া তলপেটের ভিতরে মূত্রাধারের (চিত্র—৮, নং—১) দুই পার্শ্বের শুক্রবাহী নল (চিত্র—৮, নং—১৩) দিয়া অণ্ডকোষের উপরের দিকে ছোট দুইটি থলিতে চলিয়া আসে। এই থলিদ্বয়কে **শুক্রকোষ** (Seminal Vesicles) বলা হইয়া থাকে (চিত্র—৮, নং—১২)। ফলতঃ অণ্ডকোষদ্বয়ই শুক্র উৎপাদনের উৎস। পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয়কে নারীর ডিম্বকোষদ্বয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অণ্ডকোষদ্বয় স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে অথবা দেহমধ্য হইতে থলিতে নামিয়া না আসিলে দেহের উত্তাপ বশত তাহার মধ্যে শুক্রকীট জন্মিতে ও বাঁচিতে পারে না, সুতরাং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার অভাব সূচিত হয়।

অণ্ডকোষদ্বয়ে ইহা ছাড়া আবার এক প্রকার **হরমোন** (hormone) জন্মে। তাহার নাম টেস্‌টস্‌টেরোন (testosterone), এই রস সোজাসুজি রক্তে মিশিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেহে ও মনে পুরুষালি ভাব আনে।

শুক্রকোষ

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অণ্ডকোষে শুক্রকীট উৎপন্ন হইয়া উর্ধ্ব-দেশে উত্থিত হয় এবং **শুক্রকোষ** (Seminal Vesicles) নামক আধারদ্বয়ে আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই কোষদ্বয় মূত্রাধারের নিম্নে গা ঘেঁষিয়া অবস্থিত। এই

কোষদ্বয়ে শুক্র সঞ্চিত থাকা ব্যতীত এক প্রকার তরল রসও উৎপন্ন হয়। এই রস ঈষৎ পিচ্ছিল বলিয়া উহার সহিত শুক্র মিশ্রিত হইয়া শুক্রও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

শুক্রাধারের নিম্নে শুক্রকোষের সমান্তরালে মূত্রনালীর অপর পার্শ্বে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দেড় ইঞ্চি লম্বা আর একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থির নাম **মুখশায়ী গ্রন্থি** বা **প্রষ্টেট** (Prostate) **গ্রন্থি**। (চিত্র—৮, নং—১১) মোটামুটি ইহার অবস্থিতি শুক্র নির্গমন রোধ করে বলিয়া শুক্রস্খলনে পুরুষ এতটা পুলকাবেগ অনুভব করে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থি হইতে এক প্রকার শ্বেত রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঐ রস মূত্রনালীকে (চিত্র—৮, নং—৩) পিচ্ছিল করিয়া দেয় বলিয়া শুক্র নির্গমনে সুবিধা হয়। শুক্রকীট এই রসে উদ্দীপিত হয়। শুক্র বহির্গত হইবার সময় এই রসও তাহার সহিত মিশিয়া যায়।

কাউপার গ্রন্থি

মূত্রনালীর নির্গম পথের সম্মুখে বাদামের মত ক্ষুদ্রাকৃতি যে দুইটি গ্রন্থি অবস্থিত আছে, উহাদিগকে **কাউপার গ্রন্থি** (Cowper glands) বলা হয় (চিত্র—৮, নং—৯)। এই গ্রন্থিদ্বয় হইতেও প্রষ্টেট রস ও শুক্রকোষ নিস্রাবের ন্যায় একপ্রকার তরল স্রাব নির্গত হয়। এই স্রাবও শুক্র নির্গমের সুবিধার জন্যই হইয়া থাকে। কামোত্তেজনার সময় ইহার রস মূত্রপথে নির্গত হয়। এই রসও শুক্রের পতনের সময় তাহার সহিত মিশিয়া যায়। ইহা বর্ণ ও গন্ধহীন এবং ঈষৎ চট্‌চটে। ইহার জন্য সঙ্গম সহজে হয়।

নারীর জননেন্দ্রিয়সমূহ

স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় প্রধানত ভগ, যোনি, জরায়ু, ডিম্ববাহী নল ও ডিম্বকোষ। পরবর্তী পৃষ্ঠার ১০নং চিত্র নারীর জননেন্দ্রিয় প্রধান দেহাংশের লম্বমান ছেদিত অংশ। এই ছবি হইতে নারীদেহের জননেন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তরিক অবস্থিতির পারম্পরিকতা বুঝা যাইবে।

কামাদ্রি

উরুদ্বয় ও উদর যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে সেই ত্রিকোণাকৃতি স্থানটুকুই (১১নং চিত্র দ্রষ্টব্য) **যোনিপ্রদেশ** (Pubes)। উহা উপর হইতে ক্রমশ সরু হইয়া নীচের দিকে **মলদ্বার** (Anus) (চিত্র—১১,

এই স্থানটি পুরুষের লিঙ্গ অপেক্ষা বেশী স্পর্শানুভূতিশীল ও উত্তেজনাশীল। নিগ্রোজাতির স্ত্রীলোকদের ভগাঙ্কুর অপেক্ষাকৃত বড় হয় বলিয়া প্রকাশ।

ক্ষুদ্রোষ্ঠের ভিতরেও বহু সংখ্যক তৈল নিঃসারক গ্রন্থি আছে। **মূত্রনালীর** (Urethra) **মুখ** (চিত্র—১১, নং—৬) ভগাঙ্কুরের নীচে এবং **যোনিমুখের** (চিত্র—১১, নং—৯) উপরে অবস্থিত। এই পথটি **মূত্রাশয়** (Bladder) (চিত্র—১০, নং—১) হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

যোনিপথ

মূত্রনালীর মুখের একটু নীচেই এবং অল্প পিছনে **যোনিমুখ** অবস্থিত (চিত্র—১১, নং—৯)। **অনেকেই মনে করে যে স্ত্রীলোকের মূত্রনালী ও যোনিপথ একই**। ইহা ঠিক নহে। মূত্রনালী ও যোনিপথ ভিন্ন। **যোনিনালী**ই (চিত্র—১৩, নং—৫) একাধারে রমনপথ ও প্রসবপথ। এই যোনিনালীর ভিতরে বহু খাঁজ ও ভাঁজ রহিয়াছে।

(১২ নং চিত্র)

[ক্রমবর্ধমান জরায়ু] (মিস্ ষ্টেন্ অবলম্বনে)

বৃহদোষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিলে স্ত্রীলোকের যোনিমুখ দৃষ্ট হয়। যোনিমুখ হইতে জরায়ু মুখ পর্যন্ত ৩।৪ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট যে নল আছে তাহাকেই **যোনিপথ** (চিত্র—১৩, নং—৫) বলা হইয়া থাকে। এই নলটি সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল পেশীসমূহ দ্বারা এমন ভাবে গঠিত যে, ইহাকে চাপ দিয়া অনেকখানি বড় করা যাইতে পারে। সন্তান প্রসবের সময় ইহা পরিধিতে প্রায় ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত

হইতে পারে। যোনিপথ জরায়ুতে (চিত্র—১৩, নং—৪) গিয়া শেষ হইয়াছে। **যোনিপথেই পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে গমন করে এবং সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।**

জরায়ু

জরায়ু (Uterus, Womb) বস্তিকোটরে ঝুলায়মান একটি থলে। ইহার আকার অনেকটা পেঁপের মত। ইহার গলা সরু ও পেট মোটা। ইহার মুখ (Os) ক্রমে নিম্নদিকে যোনিপথের শেষ প্রান্তের মধ্যে থাকে। ইহা প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ২ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহা এমন সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল তন্তুদ্বারা গঠিত যে, গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থার ছয় হইতে আট গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে (১২নং চিত্র দেখুন)।

কিন্তু প্রসবের পরে ৪০ দিনের মধ্যেই ইহা আবার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। তবে সম্পূর্ণ ভাবে প্রসবের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। জরায়ুর ভিতর ভাগের গাত্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত।

ডিম্বকোষ

জরায়ুর উভয় পার্শ্বে ঈষৎ উচ্চে দুইটি গ্রন্থি আছে। ইহাদের আকার বৃহৎ বাদামের মত এবং দৈর্ঘ্যে দুই ইঞ্চির বেশী হইবে না। ইহাদিগকে
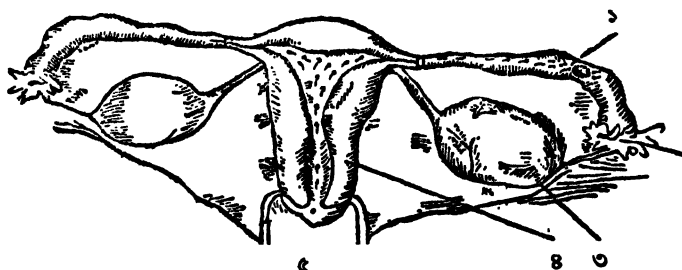
(১৩ নং চিত্র)

১। ডিম্ববাহী নল বা ফ্যালোপিয়ান টিউব ২। ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখ—ঝালর সদৃশ
৩। ডিম্বাশয় ৪। জরায়ু ৫। যোনিপথ

ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয় (Ovary) বলা হয় (চিত্র—১৩, নং—৩)। এই ডিম্বকোষদ্বয়ের অনতিদুর দিয়া দুইটি নল দুইদিক হইতে আসিয়া জরায়ুতে মিলিত হইয়াছে। ডিম্বকোষের নিকট ইহাদের মুখ ফোটা ফুলের মুখের মত

শাখাবিশিষ্ট (চিত্র—১৩, নং—২) এবং ইহারা দৈর্ঘ্যে চারি ইঞ্চির অধিক হইবে না। ইহাদিগকে **ডিম্ববাহী নল** (Fallopian tube) বলা হয় (চিত্র—১৩, নং—১। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল ফ্যালোপিয়াস্ (Gabriel Falloppius) এই দুটি নলের আবিষ্কার এবং উহাদের বিবরণ প্রকাশ করেন বলিয়া উহাদের নাম ফ্যালোপিয়ান টিউব রাখা হইয়াছে।

সতীচ্ছদ

যোনিমুখের সামান্য পশ্চাতে ঝিল্লীর পাতলা একটি পর্দাদ্বারা যোনিমুখ আবৃত থাকে। প্রথম সঙ্গমের দ্বারা, কিংবা অন্য কারণে, ইহা ছিঁড়িয়া যায়। ইহাকে **সতীচ্ছদ** (hymen) বলা হয় (চিত্র—১১, নং—)।· ইহার নাম সতীচ্ছদ দিবার কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বকালে এই পর্দাকে সতীত্বের নিদর্শন মনে করা হইত। এই পর্দা যোনিমুখ অনেকটা আবৃত করিয়া রাখে, তবে রক্তস্রাব বাহির হইবার জন্য ইহাতে ছোট একটি (কদাচিৎ একাধিক) ছিদ্র থাকে। * এই ছিদ্রের আকার বিভিন্ন রূপ হয়। সাধারণত এই আবরণ ছিন্ন না করিয়া পুরুষাঙ্গ নারীর যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং কোনও নারীর সতীচ্ছদ ছেঁড়া থাকিলে সে পুরুষের সহিত সঙ্গম করিয়াছে এমন মনে করা একেবারে অন্যায় নহে। তবে কথা এই যে, পুরুষের লিঙ্গ প্রবেশ ব্যতীত **অন্য কারণেও** সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে পারে এবং **অনেক ক্ষেত্রে হইয়াও** থাকে। বাল্যের লম্ফন-কুর্দনের ফলে এই পর্দা কদাচিৎ ছিঁড়িয়া যায়। অন্য কারণেও সতীচ্ছদ ছিঁড়িতে পারে। শৈশবে কৃমি প্রবেশ প্রভৃতির জন্য যোনিদ্বার চুলকাইতে চুলকাইতে কিংবা ঋতুকালে ভিতরে তুলা বা ন্যাকড়া গুঁজিবার ফলে সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে পারে, কারণ, কাহারও কাহারও ইহা খুব পাতলা ও নরম হয়। **সতীচ্ছদের অবিদ্যমানতা নারীর অসতীত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।** আবার কোনও কোনও নারীর সতীচ্ছদ এত পুরু ও শক্ত যে, সহবাসেও উহা কিছুতেই ছিন্ন হয় না। উহাদের পক্ষে পূর্ণ সঙ্গম করা সম্ভব নহে। সে জন্য অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদের সতীচ্ছদ ছিন্ন করিয়া স্বামী

* কাহারও সতীচ্ছদে আবার কোনও ছিদ্রই থাকে না (Imperforate hymen)। ঋতুস্রাবের রক্তও সেক্ষেত্রে বাহিরে আসিতে পারে না। ডাক্তারের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করাইয়া লইতে হয়।

সহবাসের সুবিধা করিয়া লইতে হয়। এই অস্ত্রোপচার ভয়ের কিছুই নয়; অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। কদাচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে বহু বৎসরের বিবাহিতা স্ত্রীরও, এমন কি (অতীব বিরল ক্ষেত্রে) সন্তানের মাতারও, সতীচ্ছদ অবিচ্ছিন্ন রহিয়া গিয়াছে! এ সব ক্ষেত্রে সতীচ্ছদ অতিশয় সম্প্রসারণশীল থাকে।

স্তন

স্ত্রীলোকের স্তনের সহিত প্রজনন কার্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যৌবনাগমের পূর্বে স্ত্রীলোকের ও পুরুষের স্তনের মধ্যে আকৃতিগত কোনও পার্থক্য থাকে না। যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় দৃঢ় অথচ কোমল-স্পর্শ দুইটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। স্তন সাধারণত চারিপ্রকার—(১) Conical (সূচাগ্র), Hemispherical (বর্তুলাকার), (৩) Bowl-shaped (বাটির ন্যায়) এবং (৪) Purse-shaped (থলির ন্যায়)। গর্ভাবস্থায় স্তন সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বৃহৎ হয়। এই সময়ে স্তনে দুগ্ধ জন্মে এবং স্তনের বোঁটার চারিপাশে বৃত্তাকার দাগ পড়ে এবং সেই অংশের বর্ণ গাঢ় (প্রায় কৃষ্ণ) হয়। সাধারণত সন্তানের জননী হইবার পর স্তনের স্নায়ুসমূহ দুর্বল ও শিথিল হইয়া হেলিয়া পড়ে।

(১৪নং চিত্র)

১। সূচাগ্রকৃতি, ২। বর্তুলাকার, ৩। বাটির ন্যায়, ৪। থলির ন্যায়।
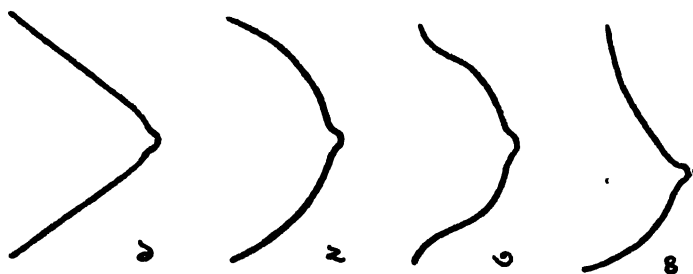
স্তনদ্বয় বক্ষের উভয় পার্শ্বের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থি আবৃত করিয়া বিকশিত হইয়া থাকে। ইহাদের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসারক গ্রন্থি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই মাতার দুগ্ধে তাহাকে পোষণ করা হয়। সেইজন্য প্রকৃতির বিধানে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

গরু-ছাগলের দুধের ব্যবস্থাও সন্তান পোষণের জন্য; মানুষ স্বার্থপরের মত উহার উপর ভাগ বসায় মাত্র।

আমরা এতক্ষণ মোটামুটিভাবে পুরুষের ও নারীর জননেন্দ্রিয়গুলির পরিচয় দিয়াছি। পাঠক-পাঠিকার এ বিষয়ে নিজস্ব কতকটা জ্ঞান আছে কিন্তু আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়সমূহের সম্যক জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নয়; কারণ উহারা বাহ্যত দৃশ্যমান নহে। প্রকৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ দান করিয়াছে; তাহারা নিয়ত আপন আপন কাজ সমাধা করিতেছে। গরু, মহিষ, বিড়াল, ইঁদুর সকলেই নিজ নিজ গর্ভে ভবিষ্যৎ বংশধর ধারণ করিতেছে ও মানুষের মতই মায়া মমতা দিয়া তাহাদিগকে পালনও করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাদের সাহায্যে বংশরক্ষার কাজ করিতেছে মাত্র। তাহারা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

শরীর রক্ষা বা দেহ ধারণ করিবার জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, সংশোধন ও উহা হইতে দেহরক্ষার জন্য সারাংশ গ্রহণের কত সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই না রহিয়াছে! আভ্যন্তরিক এই যে অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিয়মিতভাবে সহযোগিতা করিয়া দেহযন্ত্রকে কার্যক্ষম করিয়া রাখিয়াছে ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অনেকেরই নাই।

এ সব বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হইতে পারি। কোনও কারণে কোন ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য বা দৌর্বল্য উপস্থিত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগমুক্ত হইতে পারি।

উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবেই মানুষ এতকাল **অন্ধ কুসংস্কারে** ডুবিয়া রহিয়াছে, নানা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অহেতুক বিধি-নিষেধের আড়ম্বর করিয়া আসিতেছে এবং সুষ্ঠু যৌন-জীবনযাপন ব্যাপারেও বহুবিধ বাধা ও কণ্টকের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাণীজগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই পুরুষ ও নারী এই দুইটি যৌনশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই 'প্রায়' কথাটা বলার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

উভলিঙ্গ প্রাণী

একলিঙ্গবিশিষ্ট স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে বিপরীত-ধর্মী লিঙ্গবিশিষ্ট জীবের শারীরিক চিহ্নের কতকটা সূচনা কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু

পুরুষ ও স্ত্রী-লিঙ্গের উভয়ের সমাবেশ যে স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে আছে তাহাকে **উভলিঙ্গ** বলা হয়। অনেক প্রকার উভলিঙ্গ পুষ্পও * আছে। তাহাদের পুং-স্তবক (Stamen) ও স্ত্রী-স্তবক (Pistil) উভয়ই থাকে। পুরুষের লিঙ্গ, স্তন এবং অণ্ডকোষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যথাক্রমে ভগাঙ্কুর, স্তন এবং ডিম্বকোষের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে।

উভলিঙ্গ স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে আবার নানা শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়। একই ব্যক্তির মধ্যে এক জোড়া অণ্ডকোষ এবং এক জোড়া ডিম্বকোষ কিংবা এক পার্শ্বে একটি ডিম্বকোষ এবং অন্য পার্শ্বে একটি অণ্ডকোষ রহিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও কদাচিৎ দেখা যায়।

নর ও নারীর মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সমস্ত মানুষই অল্পবিস্তর দ্বিলিঙ্গাত্মক (Bi-sexual)—কোনও কোনও স্ত্রীলোকের ভগাঙ্কুর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে, গোঁফের রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহার পুরুষ-সুলভ দেহ ও ভাবভঙ্গী দেখিলে তাহাকে পুরুষ-ভাবাপন্না রমণী বলিয়াও আখ্যা দেওয়া যায়। আবার কোনও কোনও পুরুষের পৌরুষ-চিহ্ন স্বভাবত খুব কম ও অস্পষ্ট—গোঁফ-দাড়ির বালাই নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে আছে স্ত্রী-সুলভ লজ্জা, কুণ্ঠা এবং কোমল কণ্ঠস্বর।

উভলিঙ্গ জীব-সৃষ্টির মূলে একটি বৈজ্ঞানিক কারণ রহিয়াছে। সাধারণত ভ্রূণের আকারে যে মানবশিশু মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে তাহার লিঙ্গ-নির্ধারক কোষসমূহ দ্বৈতভাবাপন্ন, অর্থাৎ উহারা প্রথমাবস্থায় স্থূলত দ্বিবিধ লিঙ্গের জন্মদাতারূপেই অবস্থান করে। মোটামুটি গর্ভের অষ্টম সপ্তাহে সাধারণত ভ্রূণের লিঙ্গ-বিভাগ প্রকাশ পায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত এই বিভাগ প্রক্রিয়া মোটেই ঘটে না; ফলে তখনই সঙ্কর জাতীয় বা উভলিঙ্গ মানুষের জন্ম হইয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে যে উভলিঙ্গ লোকের সন্ধান পাওয়া যায় উহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কতকটা একত্র সমাবেশ রহিয়াছে এবং উহারা ঠিক পুরুষ কিংবা স্ত্রী তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক করা দুঃসাধ্য। হয়ত ইহারা পুরুষ এবং স্ত্রীর মত দুইভাবেই যৌনকার্যে রত হইতে সক্ষম। তবে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

---

* জন্তুদের মধ্যে দৃষ্টান্ত শম্বুক (শামুক) ও কেঁচো। ইহাদের প্রত্যেকের অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় উভয়ই থাকে।

ইয়ং (Young) একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন :

মেয়েদের মতই লালিতা-পালিতা একটি মেয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষের কাপড় পরিয়া অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করে। ইহার পরে সে বহু স্ত্রীলোকে উপগত হয়, আবার মেয়ে হিসাবে পুরুষের সংসর্গেও আসে। কখনও পুরুষ হিসাবে, কখনও স্ত্রীলোক হিসাবে সে ইচ্ছামত ভিন্ন লিঙ্গবিশিষ্ট লোকে উপগত হয়। সে অস্ত্রোপচারের প্রস্তাবে অসম্মত হয়।

মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য উভলিঙ্গ নাই

যাহাদের কেবলমাত্র বাহ্য গোপনাঙ্গে উভয় লিঙ্গের চিহ্ন কতকটা দেখা যায় তাহাদের **মিথ্যা উভলিঙ্গ** (Pseudo-hermaphrodites) বলে। ইহারা অতীব বিরল। পাক-ভারতে অনেক ব্যক্তি নিজেদের হিজড়া (উভলিঙ্গ) বলে এবং অজ্ঞ জনসাধারণও তাহাই বিশ্বাস করে। গৃহস্থের বাড়ীতে শিশু জন্মাইলে ইহারা আসিয়া এক বিশেষ রূপে হাততালি সহকারে, নৃত্য-গীতাদি করিয়া অর্থ ও বস্ত্র আদায় করে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ষোল আনা পুরুষ, উক্ত ব্যবসায় সহজে অর্থোপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্য গোঁফ কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজিয়া থাকে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ কোনও লোকের সন্ধান পান নাই যে **প্রকৃত ও সম্পূর্ণ উভলিঙ্গ**—অর্থাৎ যাহার বাহ্য জননেন্দ্রিয় উভয় লিঙ্গের মত হওয়া ব্যতীত, দেহাভ্যন্তরে উভয় লিঙ্গের যৌন গ্রন্থি (ডিম্বাশয় ও অণ্ডকোষ), নালী (এক জোড়া ডিম্ববাহী ও শুক্রবাহী নল) এবং সঙ্গম যন্ত্র আছে। সম্ভবত এমন কেহই নাই যাহার অন্তত উভয় লিঙ্গের সঙ্গম যন্ত্রগুলি (যোনি ও লিঙ্গ) সম্পূর্ণ আছে।

বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ৩০ এরও কম এরূপ ব্যক্তির (অস্ত্রোপচার অথবা মৃত্যুর পর চক্ষু দ্বারা দেখিয়া) সন্ধান পাইয়াছেন যাহাদের ডিম্বাশয় এবং অণ্ডকোষ উভয়ই, অথবা উহাদের যুক্ত যন্ত্র (ডিম্বাণ্ডকোষ, Ovotestis) ছিল।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাহারও দেখা যায় যে বাহ্য জননেন্দ্রিয় নারীর মত এবং ভগাঙ্কুর অল্পাধিক বৃহৎ। ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তিটি প্রকৃত পক্ষে পুরুষ, কিন্তু ভ্রূণের আদিম অবস্থায় সাধারণত পুরুষ শিশুর জননেন্দ্রিয়ের ফাটল যেরূপ বন্ধ হইয়া যায় (অণ্ডকোষের থলির মধ্যভাগে সেলাইয়ের মত চিহ্ন) উহা সেইভাবে কোনও কারণে বন্ধ হইতে পারে নাই।

কণ্ঠস্বর, বক্ষ, শরীরের গঠন এবং কাম-বৃত্তির বিকাশ হিসাবে নর ও নারী এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে নানা স্তরের মানব দেখা যায়, কিন্তু সম্ভবত ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এক প্রকার যৌনগ্রন্থিই (Gonad) অর্থাৎ, হয় ডিম্বাশয় নতুবা অণ্ডকোষ আছে ; সেই জন্য ইহারা মিথ্যা-উভলিঙ্গ।

নকল উভলিঙ্গ মানবের যৌন জীবন

এরূপ চুরাশি জনকে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যে পুরুষ অথবা নারী রূপে লালিত-পালিত হইয়াছে তাহার কামোদ্রেক নারীর অথবা পুরুষের প্রতিই হয় এবং সে পুরুষ অথবা নারী রূপেই রতি জীবন যাপন করে। একজনেরও প্রকৃত উভলিঙ্গের মত পুরুষ ও নারী, উভয়ের প্রতিই কাম ছিল না, অথবা উভয়ের সহিতই উপগত হইত না। বয়ঃসন্ধির পর যতগুলি ক্ষেত্রে (বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে) লিঙ্গ পরিবর্তিত হইয়াছে, কোনটিতেই সঙ্গে সঙ্গে, (পুরুষ বা নারী) যে ভাবে তাহারা পূর্ব হইতে রতি জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

কিন্তু উভলিঙ্গ লোক আপনি আপনাতে উপগত হইয়া গর্ভধারণ করিয়াছে বা সন্তানজন্ম দিয়াছে, এইরূপ কথা নিছক উপাখ্যানমূলক। এ পর্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই রকম কোনও দৃষ্টান্তের উল্লেখ নাই। আদম হইতে ঈভের জন্মের উপাখ্যান এবং অন্যান্য চলিত কাহিনী এইরূপ ভ্রান্ত মতবাদের জন্য দায়ী বলিয়া মনে হয়।

জন্মের পরে লিঙ্গ পরিবর্তন

এখনও খবরের কাগজে মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকের পুরুষত্বপ্রাপ্তির বা পুরুষের স্ত্রীলোকে পরিণত হইবার কথা দেখা যায়। এই সমস্ত লোক ঠিক উভলিঙ্গ নয় ; উহারা আংশিক উভলিঙ্গ বটে। পুরুষ ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় উভয়ই ইহাদের থাকে না। ইহারা হয় পুরুষের, না হয় স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হয় কিন্তু অন্যান্য লক্ষণের দিক দিয়া উহারা ঠিক বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট লোকের মত হইয়া থাকে। জন্মের সময় ইহাদের প্রকৃত লিঙ্গ বুঝা যায় নাই। এই সকল ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করিয়া ঠিক লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়। (অস্ত্রোপচারে লিঙ্গ পরিবর্তনের আজগুবি কাহিনী পরে বর্ণিত হইতেছে)। এই প্রকার লোকের

সংখ্যা অতিশয় কম বটে কিন্তু ইহাদের অস্তিত্বের কথা যত কম শোনা যায় বাস্তবিক পক্ষে উহাদের সংখ্যা তত কম নয়। সাধারণত বিবাহসংক্রান্ত মকদ্দমা বা অন্য কোন কারণে গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেলে আমরা সংবাদপত্রে বা অন্য উপায়ে উহাদের কথা জানিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের সংবাদ অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। লজ্জার খাতিরে উহারা অনেক স্থলে হয়ত চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করে।

এই প্রকার দৈহিক পরিণতির জন্য দায়ী **যৌন-গ্রন্থিসমূহের সুষ্ঠু ক্রিয়ার ব্যতিক্রম**। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক লোকের মধ্যেই মাতা ও পিতার প্রভাব রহিয়াছে এবং এই জন্য মেয়েলী ও পুরুষালী ভাব অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। তবে একলিঙ্গের প্রভাবই সমধিক হয় এবং পুত্র পিতার ও কন্যা মাতার স্থান অধিকার করে।

লিঙ্গ পরিবর্তন

লিঙ্গ-পরিবর্তনের আজগুবি ঘটনা কোন কোন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা কতদূর সত্য বা মিথ্যা এই তর্ক না তুলিয়া আমরা এক্ষণে কতিপয় নিম্নস্তরের জীবের লিঙ্গ-পরিবর্তন কথার উল্লেখ করিব।

ঝিনুকের মধ্যে লিঙ্গ-পরিবর্তনের ব্যাপার খুবই সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৎসরের পর বৎসর হয়ত একই ঝিনুক ক্রমান্বয়ে স্ত্রী হইতে পুরুষে এবং পুরুষ হইতে স্ত্রীতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। পুরুষ ঝিনুক হিসাবে যাহার জীবনযাত্রা সুরু হইল উহা ক্রমে স্ত্রী ঝিনুকে পরিণত হয়। এবং পর বৎসর আবার উহার পাণ্টা পরিবর্তন ঘটে। এই ভাবে আজীবনই ঝিনুক তাহার লিঙ্গ-পরিবর্তন করিয়া থাকে।

তরবারির মত লেজবিশিষ্ট একরূপ সুন্দর মৎস্য (Sword fish) দেখিতে পাওয়া যায়। উহারাও এরূপ লিঙ্গ-পরিবর্তন করিয়া থাকে। **জিপ্‌সি জাতীয়** একপ্রকার **পতঙ্গের** বেলায়ও এরূপ ঘটিয়া থাকে।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী ভ্রূণাবস্থায় স্ত্রী বা পুরুষ কোনটার আকৃতি বা প্রকৃতিই ধারণ করে না। উহারা পুরুষ, স্ত্রী বা উভলিঙ্গ কোনটাই নয়—কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের গুণ ধর্মবিশিষ্ট। ক্রমে একটিই বিশেষ লিঙ্গ উহাদের মধ্যে সক্রিয় হইয়া ওঠে—যদি পুরুষ হয় তবে পুরুষত্বের প্রকৃতি সুপ্রকট হইবে এবং স্ত্রীত্ব লোপ পাইতে থাকিবে। 'হরমোনে'র ক্রিয়ার ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া

থাকে। মানবদেহে হরমোনের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই যৌনবোধ জাগিয়া ওঠে। অণ্ডকোষ, ডিম্বকোষ এবং অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি প্রাণীদেহে যে একরূপ পদার্থ নিঃসৃত করে উহাকে **হরমোন** (hormone) বলে।

কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ লিঙ্গ-পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। জন্মের পূর্বে প্রাণীবিশেষের জননেন্দ্রিয় এতদুর পুষ্ট হইয়া পড়ে যে আকস্মিক উহার আমূল পরিবর্তন ঘটে না। তবে অস্ত্রোপচারের ফলে গুপ্ত, অস্পষ্ট, বা অসম্পূর্ণ পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব দুই-ই যথাসম্ভব আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

পৃথিবীর নানা সভ্যদেশে দুই একজন অতিসাহসী ডাক্তার অস্ত্রোপচার করিয়া মেয়েকে বালকে পরিণত করিবার চেষ্টাও নাকি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। এরূপ অস্ত্রোপচারে নাকি একবার বিশ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ে চেহারা, ভাবভঙ্গী, তেজ ইত্যাদিতে অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত "Famous girl Athlete changes her sex" নামক প্রবন্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনৈক পৃথিবী-বিখ্যাত খেলোয়াড় মেয়ের (Konbkova) পুরুষত্বপ্রাপ্তির চমকপ্রদ ঘটনা সচিত্রভাবে বিবৃত হইয়াছিল। মেয়ের বয়স তখন একুশ বৎসর, খেলাধূলায় সে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। হঠাৎ প্রকৃতির খেয়াল হইল তাহার মধ্যে ঘুমন্ত পৌরুষভাব জাগ্রত করিতে হইবে। যুবতীর জীবনে তখন আসিল এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা—যুবতী সারা দেহ-মনে যেন একটি যুবক-সুলভ ভাব অনুভব করিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর সাধারণ রকমের অস্ত্রোপচার মাত্র করিল। ফলে **যুবতী** হইল **যুবক**। খেলোয়াড় যুবতী তখন যুবক খেলোয়াড় বেশে রেকর্ড স্থাপন করিল, এবং উক্ত দেশের আইনানুযায়ী সৈন্য বিভাগেও প্রবেশ করিল।

বিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ড্ (Oscar Wilde) এর মধ্যেও নাকি আংশিক লিঙ্গ-পরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শরীরের বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি-নিঃসৃত রস 'হরমোন'-এর ক্রিয়ার তারতম্যের দরুন অনেক সময় স্বভাবজ স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গের আংশিক বা পূর্ণ লিঙ্গ-বৈকল্য ঘটিতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে অন্তঃস্রাবী বিভিন্ন যৌন-গ্রন্থি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

লিঙ্গ পরিবর্ত্তন ঘটানো

বালককে খোজা করা—দেখা গিয়াছে যে যদি কোন বালককে 'খোজা' (Castrated) করা হয়, অর্থাৎ, তাহার উভয় অণ্ডকোষ কাটিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার শরীরে গৌণ পুরুষ চিহ্নগুলি (Secondary sexual characteristics)—যথা, দাড়ি, গোঁফ ও বুক প্রভৃতিতে লোম গজানো, ভারি কণ্ঠস্বর, এবং কথায় ও কাজে পুরুষালী ভাব—বিকশিত হয় না। তাহার কণ্ঠস্বর মেয়েদের মত মিহি ও তীক্ষ্ণ (high pitched or soprano voice) হয়। মেদাধিক্য হয়। জননেন্দ্রিয়গুলি অপরিণত অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং কাম কখনও পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না।

যুবককে—কিন্তু, বয়ঃসন্ধির পর খোজা (Castrated) করিলে তাহার শরীরের অল্পই পরিবর্ত্তন হয়। গৌণ যৌন-চিহ্নগুলি বিকশিত হইবার পর উহার ফলে সেগুলি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়না, যদিও শরীর বৃদ্ধি সম্পর্কে নানা পরিবর্তন হয়, মেদাধিক্য হয় এবং মনোভাবেরও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কামবৃত্তি এবং রতিশক্তি উক্ত অস্ত্রোপচারের বহুকাল পরেও থাকিতে পারে, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐগুলি অনেক কমিয়া যায় অথবা একেবারেই লুপ্ত হয়।

জন্তুদের—দেখা গিয়াছে যে, কোনও জন্তুর পুরুষ বাচ্চার অণ্ডকোষ বাহির করিয়া লইয়া সেই শ্রেণীরই অপর পুরুষ বাচ্চার অণ্ডকোষ যদি তাহার শরীরে যথাস্থানে যথাভাবে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার গৌণ পুরুষালী বিশেষত্বগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হইতে থাকে।

জন্তুদের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন ঘটানো

ইহাও দেখা গিয়াছে যে স্ত্রী জন্তু অথবা পক্ষীর ডিম্বাশয় বাহির করিয়া তাহার শরীরে সেই শ্রেণীর জীবের অণ্ডকোষ বসাইয়া দিলে তাহাদের শরীর ও আচরণে, এমন কি যৌন আচরণেও, পুরুষালী ধরণ দেখা যায়।

মানুষের—যতদূর জানা যায় এ যাবৎ কোনও নারীর দেহে পুরুষের গ্রন্থি বসানো হয় নাই।

অন্যান্য তথ্য

দুইটি জীবের আঙ্গিক মিলন ঘটিলেই যে উহারা বিরুদ্ধ ধর্মী লিঙ্গবিশিষ্ট হইবে এমন কথা জোর দিয়া বলা যায় না। একই জীবের মধ্যে হয়ত স্ত্রী এবং

পুরুষ লিঙ্গের আকৃতিগত চিহ্ন রহিয়াছে। সাধারণ **শামুক, কেঁচো বা পোকা বিশেষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নাই,** ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ডিম্বকোষ এবং অণ্ডকোষ রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই ডিম্ব এবং শুক্রকীট উৎপন্ন করিতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ না থাকিলেও ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয় এবং প্রজনন কার্যে একে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে। ইহাই ইহাদের যৌন-সম্বন্ধ।

কুমারী প্রজনন

প্রজনন ব্যাপারে কোনও কোনও প্রাণীর পুরুষের দরকার হয় না। স্ত্রীজাতি স্বতই সন্তানের জন্মদান করিতে পারে। এই জাতীয় প্রজননকে কুমারী প্রজনন (Virgin reproduction) বলে। গাছপালার উকুন, পিপীলিকা এবং মৌমাছির মধ্যে এইরূপ প্রজনন সম্ভবপর। **মানুষের মধ্যে** কুমারী প্রজননের আখ্যান প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ সকল **কাল্পনিক** মাত্র। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইতেছে। এই বিষয়ে যৌনবিজ্ঞান প্রথম খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

কোনও কোনও জীবের দেহাভ্যন্তরে ডিম্ব এবং শুক্রকীট পূর্ণভাবে উর্বরতা প্রাপ্ত হইয়া একই সঙ্গে নির্গত হইয়া আসে।

পক্ষীদের নির্গম-পথ বা cloaca

পক্ষীদের এবং অন্যান্য কতিপয় নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে মূত্রনালী, যোনিদ্বার শুক্রপথ এবং গুহ্যদ্বারের একটিই মাত্র **নির্গম-পথ** (cloaca) থাকে। সঙ্গমের জন্য ভিন্ন পুরুষাঙ্গ প্রায়ই থাকে না; স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের নির্গম-পথের সংযোগ ঘটে এবং শুক্রকীট স্খলিত হইয়া স্ত্রী-পক্ষী অথবা স্ত্রী-জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

উটপক্ষী, হাঁস, রাজহাঁস এবং অন্যান্য কতকগুলি পক্ষীর কিন্তু আবার সঙ্গম-যন্ত্র বা জননেন্দ্রিয় রহিয়াছে।

যৌনবোধ ও প্রজনন

(Psychology of Reproduction)

লিঙ্গ ভেদ

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পুরুষ ও নারীর জননেন্দ্রিয়ের প্রভেদ দেখাইয়া জননেন্দ্রিয়সমূহের বিস্তারিত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাহৃত উভলিঙ্গের সামান্য দুই চারিজন লোক ব্যতীত গোটা মানবজাতিকে পুরুষ ও নারী—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

আমরা হয় পুরুষ, না হয় নারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদের সন্তান সন্ততিরাও এইভাবে কেহ পুরুষ এবং কেহ নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।

সাধারণত স্ত্রী ও পুরুষের সমবায়ে সন্তান হয় এবং এই হেতু মোটামুটি শতকরা ৫০টি ছেলে ও ৫০টি মেয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু নানা কারণ হেতু মাঝে মাঝে ইহার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

পিতামাতা ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সযত্নে এবং স্নেহপরবশ হইয়া লালন পালন করেন্। উভয়ে ছেলেবেলায় একত্রে খেলা করে; যৌনশ্রেণীর প্রভেদ হয়ত তখন তাহারা ততটা বুঝিতেই পারে না।

বাল্যে বালক-বালিকার প্রধান ক্রিয়াকলাপ সাধারণত **অঙ্গচালনা** এবং দেহ **পরিপোষণে** আবদ্ধ থাকে। যৌন-বোধের সম্যক উদয় তখন হয় না।

শিশুর যৌনবোধ

যৌন-বৈজ্ঞানিক, মনোবিশ্লেষক ও শিশুমনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের ভিতরে অনেক বাক-বিতণ্ডা ও গবেষণার ফলে বর্তমানে ইহা প্রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, মানুষের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় **যৌনবৃত্তিও** তাহার মধ্যে **শৈশবেই সুপ্ত থাকে,** বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় চৈতনার ফলে উহার ক্রমবিকাশ হয় মাত্র।

আমরা **যৌনবৃত্তি** বা **যৌনবোধের** উল্লেখ করিলাম কিন্তু উহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি নাই। পাঠক-পাঠিকার অন্ততঃপক্ষে এ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা রহিয়াছে। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব মাত্র।*

যৌনবোধ কাহাকে বলে

যৌনবোধের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই অসুবিধা হেতু বিভিন্ন যৌন-বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে যৌনবোধের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাগ (Prague) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কিশ্ (Dr Kish বলিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দৈহিক ও আঙ্গিক মিলনের যে বাসনা অনুভব করে তাহার নাম যৌনবোধ।

শৈশবে এই বোধ নিদ্রিত থাকে, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হইয়া যৌবনে পূর্ণ জাগ্রত হয় এবং অবশেষে বার্ধক্যে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

অধ্যাপক কিশের এই ব্যাখ্যা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হইলেও উহার সামান্য ত্রুটী এই যে, এ ব্যাখ্যায় মানুষের যৌন-বাসনাকে অনাবশ্যকরূপে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কারণ, নারী-পুরুষ যে কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে তাহা সত্য নহে, সম-লিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি মানুষের যে যৌন-আকর্ষণ, তাহাকে বিকল্প আখ্যা দিলেও উহা যে যৌনবোধের অন্তর্গত, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম-লিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উহাদের যৌনাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার যৌন-বিজ্ঞান পুস্তকের ১ম খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণের ১৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

দেহের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ

প্রাণী-জগতে যৌনবোধ একটি সহজাত স্বাভাবিক বৃত্তি। মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিটি ক্ষুৎ-পিপাসার মতই স্বাভাবিক ও শক্তিশালী; কর্ষণ ও অভ্যাসের দ্বারা অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এই বৃত্তিটিকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় মাত্র।

সহজাত বৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝি?

মাকড়সা জাল বুনে, পাখী বাসা নির্মাণ করে, মৌমাছি মৌচাক গড়ে—

* আমার "যৌন-বিজ্ঞান" পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

মাকড়সা, পাখী অথবা মৌমাছির এইগুলি সহজাত বৃত্তি চালিত কাজ নয় কি ?

যে স্বাভাবিক প্রবণতার বশবর্তী হইয়া এক শ্রেণীর প্রাণীরা কোনও এক সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে কোনও কার্য সমাধা করিতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহাকেই মোটামুটি সহজাত বৃত্তি বলা যায়।

মাকড়সা মাত্রেই একটি বয়সের সীমানায় উপনীত হইলে জাল বুনিতে থাকিবে। এই জাল বুনিতে তাহাকে পূর্বেই শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। আবার অন্য সকল মাকড়সা সাধারণত যেরূপ জাল বুনিয়া থাকে এই মাকড়সাটিও তেমনই করিবে।

প্রাণীর সহজাত বৃত্তির লক্ষণ ঃ—(১) একইরূপ কার্যকলাপ; (২) অধিকাংশ প্রাণীরই ঐরূপ কার্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া ; (৩) অন্যের বিনা পরামর্শে বা শিক্ষায় আপনা হইতেই উহার ক্ষমতা ও প্রবণতা থাকা।

মানুষও কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। **সহজাত বৃত্তি** এবং **অর্জিত অভ্যাসের** মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বর্তমান। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে কোনও একটি অভ্যাস গড়িয়া ওঠে কিন্তু সহজাত বৃত্তির বেলায় তাহা হয় না। এক জাতীয় প্রাণীর সহজাত বৃত্তির পরিচয় একইরূপ কার্যকলাপে সমান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে ; অধিকাংশ প্রাণীই সুনির্দিষ্ট একটি প্রণালীতে কার্য করিতে স্বভাবত উদ্বুদ্ধ হইবে। কিন্তু অভ্যাসের বেলায় জাতির প্রশ্ন ওঠে না ; হয়ত কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তি কোনও এক বিশেষ অভ্যাসের দাস হইতে পারে।

যৌনবোধ সহজাত বৃত্তি বলিয়াই অন্যের বিনা ইঙ্গিতে নর ও নারী পরস্পরের প্রতি আপনা হইতেই যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং বাধাপ্রাপ্ত না হইলে পরস্পরে উপগত হইবে। ধরুন, একটি বালক ও বালিকা ছোট বেলা হইতেই লোকসমাজের বাহিরে একত্র পালিত হইল। তাহারা অন্যের বিনা পরামর্শে, রতিক্রিয়ার প্রতিকৃতি বা দৃষ্টান্ত না দেখিয়াও, অন্য বাধা না থাকিলে, যৌবনাগমে সহজাত বৃত্তির তাড়নায় পরস্পরে উপগত হইবে। প্রকৃতির এইরূপই বিধান।

ইন্‌কিউবেটারে ফুটানো ডিম্বপ্রসূত একটি মোরগ ও মুরগীকে একেবারে পৃথক রাখিয়া পালন করিলেও যথাসময়ে উহারা এই বৃত্তির তাড়নায় যৌন-ব্যাপারে লিপ্ত হইবে, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।

প্রজননের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ

দেহের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, মনের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ঘনিষ্ঠ। যৌনবোধ মনের উপর ঠিক কি প্রণালীতে কার্য করে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও কোনও সর্ববাদীসম্মত সূত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আদিম কালে লোকের ধারণা ছিল যে, **যৌনবোধ মলমূত্রত্যাগের প্রয়োজনের মতই একটি** (সঞ্চিত শুক্রভার লাঘবের) **দৈহিক প্রয়োজন মাত্র**। মানুষ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ দ্বারা অধিকতর যুক্তি-বাদী ও অনুসন্ধিৎসু হইবার পর ধারণা করিল যে, **যৌনবোধ মানুষের সৃষ্টি-বাসনার নামান্তর মাত্র**। দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer) মতে সমাজের লোক-সংখ্যা যথেচ্ছা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে সন্তানোৎপাদন।

কিন্তু পরবর্তী কালে এই ধারণাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। উচ্চস্তরের প্রাণী-জগতে রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রজননের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্নস্তরের অনেক প্রাণীর বংশবৃদ্ধি যৌন-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ। এ সম্বন্ধে আলোচনা এবং উদাহরণের উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। জার্মান দার্শনিক নীট্শে (Nietzsche) বলেন "যৌনবৃত্তির পরিতৃপ্তির ফলে সচরাচর সন্তান উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু ইহা উহার লক্ষ্য নয় কিংবা অবশ্যম্ভাবী ফলও নয়। যৌন-বৃত্তি প্রজননের সহায়ক কিন্তু ইহার ভৃত্য নয়।"

যৌনবোধ সন্তান-লাভেচ্ছার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করে। যৌন-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নর-নারীর মধ্যে জাগ্রত হয় কিন্তু সন্তান লাভের ইচ্ছা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে ততটা প্রবল না-ও হইতে পারে।

সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যৌনবোধের নিবিড় যোগ নাই; যদি থাকিত তাহা হইলে গর্ভবতী হইবার পরে নারীর যৌন-লালসাগ্নি নির্বাপিত না হইয়া বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও উদ্দীপিত হয় কেন? অথবা নারীর সন্তানধারণের বয়স পার হইয়া গেলেও অর্থাৎ ঋতুসংহারের পরও যৌন-আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হয় না কেন? অথবা নর ও নারীকে অস্ত্রোপচারে সন্তান জন্মদানের অযোগ্য করিয়া ফেলিলেও তাহাদের কামলালসা বর্তমান থাকে কেন? অথবা চিরবন্ধ্যা নারীও মদনপীড়িতা হয় কেন?

কতকগুলি ইতর প্রাণীর বেলায় যৌনবোধ এবং প্রজননের ইচ্ছা নিবিড়-ভাবে সংশ্লিষ্ট; **সৃষ্টির জন্য মানুষের যৌন কামনার প্রয়োজন হয় না।**

পুরুষের শুক্রকীট যে কোনও প্রকারে স্ত্রীলোকের ডিম্বের সহিত যথাস্থানে মিলিত হইতে পারিলেই ভ্রূণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীলোকের ডিম্বের সহিত যে কোনও প্রকারে মিলাইয়া দিতে পারিলে **সহবাসপ্রণালী ব্যতিরেকেও সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে।**

কিন্তু ব্যাপারটা আরও একটু তলাইয়া দেখা যাক। মানুষের যৌনবোধ একটি সহজাত বৃত্তি মাত্র। এই বৃত্তির তাড়নায় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি একটি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। বংশরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রচেষ্টা জীবজগতের সর্বত্র আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহার সূচনা দেখিতে পাই এই যৌনবোধে। সন্তানের জন্মদান এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালন-পালন ব্যাপারে প্রাণীমাত্রেই অতি সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়।

যৌনলালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেই একটি অব্যক্ত আনন্দানুভূতির শিহরণ সমস্ত দেহমনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। মলমূত্রত্যাগও অতি স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া ; ইহাতেও শারীরিক এবং মানসিক আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা ঘটে। কিন্তু তবুও এই উভয় আনন্দানুভূতিকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না।

সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে যৌনবোধের সাধারণ যোগ রহিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া সন্তানোৎপাদন চলিতে পারে একথা মানিয়া লইলেও আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, যৌনলালসা-তৃপ্ত করিয়া প্রাণী মাত্রেই অপূর্ব আনন্দাবেগ অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অথবা কখনও কখনও সন্তানেরও জন্মদান করে। স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্ন যৌন-অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, প্রকৃতি যৌনবোধ এবং বংশবিস্তারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। যৌনবোধের তীব্রতা জাগরিত করিয়া বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করাই প্রকৃতির অন্যতম উদ্দেশ্য। মানব সমাজে চিরকুমার বা চিরকুমারীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। খৃষ্ট, সেণ্ট পল, শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নারীর সংস্পর্শে না আসিতে পারেন কিন্তু গোটা সমাজের বেলায় কি দেখিতে পাই? **যৌনবোধ মানুষকে বংশবিস্তারের দিকে চালিত করে ;** যৌনবোধের অভাবে এই বিশাল প্রাণীজগতের বংশরক্ষা হইত কি?

যৌনবোধের প্রকৃত স্বরূপ

তাহা হইলে দেখা গেল যে, যৌনবোধ ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (অহঙ্কার) বা মাৎসর্যের মত দেহ-নিরপেক্ষ কোনও বৃত্তিমাত্র নহে, পক্ষান্তরে উহা মলমূত্রত্যাগের ন্যায় কোন নিছক দৈহিক প্রয়োজনও নহে। তবে যৌনবোধ কি ? আধুনিক শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের বহু গবেষণার ফলে ইহা সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে যে, যৌনবোধ মানুষের **দৈহিক সম্বন্ধযুক্ত একটি মনোবৃত্তি**। এই বৃত্তি দ্বারা মানুষ একাধারে দৈহিক ও মানসিক আনন্দলাভে সমর্থ হয়। এই যৌনবোধের সহিত সন্তানোৎপাদন মুখ্যত না হইলেও সাধারণত সম্বন্ধযুক্ত।

যৌনবোধের মানসিকতা

যৌনবোধের **'বোধ'** শব্দটি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা প্রধানত মানসিক ব্যাপার। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে উহারা জ্ঞানে পরিণত হয়। যৌন-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও উহাই অবিকল সত্য। উহা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে আমরা উত্তেজনা ও পুলক অনুভব করিয়া থাকি। মস্তিষ্কই আমাদের মনের পীঠস্থান। সুতরাং আমাদের যৌনবোধ মূলত **মানসিক**।

নিম্নস্তরের প্রাণীজগতেও ইহা কতকটা সত্য। যদিও উহাদের মধ্যে দেহমিলনে মন অপেক্ষা শরীরের কার্য অধিকতর সুস্পষ্ট, তথাপি একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রী জাতির পশ্চাতে পুরুষের ঘোরা ফেরা, একই নারীর জন্য একাধিক পুরুষের সংগ্রাম করা এবং একত্রবাস চলাফেরা ও পরস্পরের জন্য মমতাবোধের দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহাতে উহাদের যৌনবোধকে কোন মতেই নিছক একটি দৈহিক ব্যাপার মাত্র বলা যাইতে পারে না।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, মানুষের যৌনবোধ যেমন দৈহিক তেমনি মানসিক। সুতরাং ইহার প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াও দৈহিক এবং মানসিক হইয়া থাকে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই আমাদের মনে কোনও না কোনও প্রকারের **অনুভূতি** সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই অনুভূতির কতকগুলি আমাদের **প্রিয়** এবং

কতকগুলি **অপ্রিয়**। প্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দ এবং অপ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের **বিরক্তি** উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনার সময়েই যে আমাদের আনন্দ বা বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে তাহা নহে। কারণ, মানুষের মন স্মৃতিফলক বিশেষ। এই ফলকে ইন্দ্রিয়-গৃহীত সমস্ত অভিজ্ঞতাই খোদিত থাকে। আনন্দের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রিয়, সেই জন্য স্বভাবত অধিকতর সুস্পষ্টভাবে উহা আমাদের মনের স্মৃতিফলকে লিপিবদ্ধ থাকে।

যৌন-অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতার মধ্যে তীব্রতম। সুতরাং মনের উপর উহার ছাপও সর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট। এইভাবে আনন্দের স্মৃতি যেমন আমাদের মানসচক্ষের সম্মুখে আনন্দদায়ক ক্রিয়াসমূহ সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া তোলে, তেমনই আনন্দদায়ক ক্রিয়াবিশেষের চাক্ষুষ দর্শন এবং স্মরণও আমাদের পূর্বলব্ধ আনন্দ-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত রসের উদ্রেক করিয়া থাকে। এই রসবোধের জাগরণ আমাদিগকে সেই আনন্দদায়ক কার্য পুনঃ পুনঃ সম্পাদনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের আনন্দবোধ আমাদের ইন্দ্রিয়-গৃহীত অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমাদের আনন্দবোধ অতিশয় সীমাবদ্ধ হইত। মানুষের মন **শুধু আনন্দ-ভোক্তা নয়, আনন্দ-স্রষ্টাও বটে**। লব্ধ অভিজ্ঞতার তুলনা, সমালোচনা, সংযোজন ও বিয়োজন দ্বারা মানব-মন কল্পনায় নিত্য-নূতন আনন্দচ্ছবি অঙ্কিত করিতে সক্ষম। এই সৃষ্টি-নৈপুণ্যবলে উহা নিত্য-নূতন আনন্দপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিয়া মানুষের ভোগের ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে।

আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় করিতে হইলে যৌনবোধের মানসিকতা আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যৌন-সম্বন্ধ দম্পতির শরীর ও মনের উপর কি ভাবে ক্রিয়া করিবে, উভয়েরই সে জ্ঞান সম্যকভাবে থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ের সম্যক ব্যাখ্যা আমার অন্য পুস্তক 'যৌনবিজ্ঞান'এর ১ম খণ্ডে আছে।

মানসিক অনুভূতির ক্রমবিকাশ

দৈহিক অনুভূতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে মানসিক ক্রমবিকাশও লক্ষিত হইতে থাকে। শিশু-মনে প্রথমত চুম্বন ও আলিঙ্গন করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, শিশু নিজের

প্রিয় ও অপ্রিয় জন নির্ধারিত করিয়া ফেলে। স্বীয় প্রিয়জন নির্ধারণে শিশুর মাপকাঠি যে কি, তাহা নিশ্চয়ই করিয়া বলা শক্ত। সম্ভবত যে ব্যক্তি তাহাকে অধিক ভালবাসে, তাহার অধিক প্রকার অভাব অধিক পরিমাণে মিটায় ও যাহা হইতে সে সমধিক সুখ ও আনন্দ লাভ করে, সেই তাহার বেশী প্রিয় হয়।

বয়স-ভেদে নারী-পুরুষের যৌনপ্রকৃতি

বয়সানুযায়ী মানুষকে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। মানব-জীবনের এই পাঁচ অধ্যায়ে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন রূপ বিকাশ হইয়া থাকে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় যৌন-বৃত্তিও যে বিভিন্ন পরিমাণে বিকশিত হইয়া থাকে ইহা বলা বাহুল্য। তবে যৌন-বৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ একমত নহেন বলিয়া আমি এখানে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়ে **অধিকাংশ পণ্ডিতদের গৃহীত মতই** লিপিবদ্ধ করিব।

যৌনবোধের স্ফুরণ ও ক্রমবৃদ্ধি

প্রসিদ্ধ যৌন বিজ্ঞানবিৎ হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ বলেন যে, **শৈশবে** মানুষের যৌনবোধ সাধারণত বিক্ষিপ্ত থাকে। সেইজন্য এই সময়ে যৌনবোধ নিশ্চিতরূপে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ হয় না।

ডাঃ ফ্রয়েড, উইলিয়াম জেম্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, **শৈশবে ও কৈশোরে** মানুষের যৌনবোধ সাধারণত **সম-লৈঙ্গিক** হইয়া থাকে। আধুনিক প্রায় সকল জীববিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, কোনও প্রাণীই **নির্ভেজ ও অবিমিশ্র স্ত্রী বা পুরুষ নহে**। সকল স্ত্রীর মধ্যেই কিছুটা পুরুষ-প্রকৃতি এবং সকল পুরুষের মধ্যেই কিছুটা স্ত্রী-প্রকৃতি বিদ্যমান আছে। সেইজন্য কৈশোরে পুরুষের মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রী-প্রকৃতি বিশিষ্ট রূপে ফুটিয়া না ওঠা পর্যন্ত উক্ত উভয় প্রকৃতি সমানভাবে ক্রিয়া করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বলিতেন মানুষের মধ্যে **শৈশবে কোন যৌনবোধ থাকে না,** তাহা অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শিশুদের লিঙ্গোত্থান সচরাচরই হইয়া থাকে। কিন্তু উহা শুধু দৈহিক, না উহাতে যৌনবোধ-রূপ মানসিক চৈতন্য বিদ্যমান আছে, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কারণ শৈশবের ঐ অবস্থার সময়কার মনোভাব স্মরণ রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যতদিনের চৈতন্য মানুষের স্মৃতি-পথে

জাগ্রত আছে, ততদিনকার স্মৃতি হাতড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, শৈশবের লিঙ্গোদ্রেকের সহিত একটি অব্যক্ত পুলকের অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, **সকল মানুষের মধ্যেই শৈশবে অল্প-বিস্তর যৌনবোধ বিরাজমান থাকে।**

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শৈশবে যৌনবোধ অনেকখানি বিক্ষিপ্ত থাকে। দৈহিক দিকে, শিশুর যৌন-অঙ্গ তখনও পরিপুষ্ট হয় নাই; আর মানসিক দিকে, শিশুর মনের দৃষ্টি তখনও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি নিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই এই বয়সে শিশুর যৌনবোধের স্পষ্টতম বহিঃপ্রকাশ হয় হস্তমৈথুনে।

হস্তের সাহায্যে যৌন-বৃত্তিকে জাগ্রত ও তৃপ্ত করার নাম হস্ত-মৈথুন, স্বমেহন বা আত্মরতি। ইহা শৈশবে আরব্ধ হইলেও, অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে বাল্যে, যৌবনে, এমন কি প্রৌঢ়ত্বেও অনেকে এই অভ্যাসের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তবে সাধারণত ইহা শৈশবে, বাল্যে বা কৈশোরে আরব্ধ হইয়া বিপরীত লিঙ্গ-সহবাসের নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের যৌনবোধ সমমৈথুনেও বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। সম-লিঙ্গ দুই ব্যক্তির চুম্বন, আলিঙ্গন, ঘর্ষণ ও মর্দন প্রভৃতিতে যৌনবোধ জাগ্রত ও তৃপ্ত করার নাম সম-মৈথুন, সমকাম বা সমমেহন। হস্ত-মৈথুনের ন্যায় সম-মৈথুনের অভ্যাসও শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে গড়াইতে পারে। কিন্তু সাধারণত বিপরীত-লিঙ্গ-সহবাসের নিয়মিত সুযোগ লাভের পর ইহাও প্রায়ই থাকে না।

স্বাভাবিক বিপরীত লিঙ্গ-সহবাসের অভাবে অন্যান্য যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে যৌনবোধ পর্যবসিত হয় তাহাকে আমরা সচরাচর যৌন-কদাচার বা যৌন বিকৃতি আখ্যা দিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে সাধারণত অন্যায় এবং গর্হিত কাজ মনে করা হইলেও উহাদের দ্বারা যৌনবোধের অস্তিত্ব এবং তীব্রতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিকল্পের বিবরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি আমার অন্য পুস্তক 'যৌন-বিজ্ঞান'এর ১ম খণ্ডে করিয়াছি।

বাল্য ও কৈশোরে যৌনবোধ

শৈশবের পর, বাল্য ও কৈশোর। কৈশোরে নারী-পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত যৌন-ভাব জাগ্রত হয়। এই বয়সে তাহারা নিজেদের যৌন-অঙ্গ-সমূহের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে শিখে, এবং বাল্যকাল হইতেই নিজেদের ও

বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তিগণের ঐ সমস্ত অঙ্গের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। এই পার্থক্য-চেতনা হইতে তাহাদের প্রাণে বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তিগণের যৌন-প্রদেশসমূহ দর্শন ও স্পর্শনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যে সমস্ত সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রথা আছে, সেই সমস্ত সমাজের কিশোর-কিশোরীরা এই সময়ে যৌন-অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইতেও পারে।

নারী পুরুষের দৈহিক বিবর্তন

কৈশোরে পদার্পণ করিতেই নারী-পুরুষের কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন হয়। এই সময়ে **বালকের** কণ্ঠস্বর মোটা হইয়া যায়। তাহার গলদেশ কণ্ঠের অস্থি-ঈষৎ বাহির হইয়া পড়ে, স্তনদ্বয়ের বোঁটা উন্নত হয়, মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাইতে আরম্ভ করে। সমস্ত শরীরে, বিশেষত মুখে উজ্জ্বল জ্যোতি দেখা দেয়। সমস্ত অঙ্গ, বিশেষত নিতম্ব, একটু স্থূল হইয়া পড়ে।

বালিকার শরীরেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহার কণ্ঠস্বরে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে না বটে, কিন্তু তাহার শরীরে যে সমস্ত পরিবর্তনের জোয়ার আসে, তাহা অধিকতর সুস্পষ্ট। তাহার স্তনমূল শক্ত হইয়া সুডৌল মাংসপিণ্ডের ন্যায় বর্ধিত হইতে থাকে। তাহার নিতম্ব-যুগল উন্নত ও প্রশস্ত হয়। সমস্ত শরীরের ত্বকে চমৎকার আভা দৃষ্ট হয়। তাহার চক্ষে লজ্জা আসে এবং তাহা হরিণীর চক্ষুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

বালক ও বালিকার এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্তনের সমস্তই বাহির হইতে দেখা যায়। দৃষ্টির অগোচরে উভয়ের অঙ্গে আরও পরিবর্তন আসে। উভয়ের কামাদ্রিতে ও বগলে কেশ গজাইতে থাকে। উভয়ে নিজ নিজ যৌনপ্রদেশে বিপুল পরিবর্তনের জোয়ার দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং একটি অভাবনীয় অনুভূতি অনুভব করিয়া থাকে। বালকদের নিদ্রাবস্থায় শুক্রস্খলন এবং বালিকাদের মাসিক ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হয়।

যে সমস্ত বালিকা ইতিপূর্বে যৌন-জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা ঋতুস্রাবের সময় হইতে নিজেদের যৌন-অঙ্গসমূহ ও তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতুহল বোধও সামান্য, অসম্পূর্ণ এবং অনেকটা ভুল জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। *

ঋতুস্রাব সম্বন্ধে শীঘ্রই বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

* শরীরতত্ত্ব এবং সুরুচিসম্মত যৌনবিজ্ঞানের পুস্তক পড়িতে দিয়া কিশোর-কিশোরীদের সাহায্য করা মাতাপিতার উচিত। এ সম্বন্ধে কি করা উচিত বা অনুচিত তাহা 'যৌনবিজ্ঞান' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হইয়াছে।

যৌবনে

যৌবনে যুবক-যুবতীর দেহের বাহ্যিক পরিবর্তন পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরস্পরকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে যুবকদের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্য থাকিলেও এই সময়ে তাহারা মিলনে ততটা সক্ষম হয় না, যতটা হয় যৌবনের মধ্যভাগে। বস্তুত অনভিজ্ঞতা, দ্বিধা, ভয় প্রভৃতির দরুনই যৌবনের প্রারম্ভে যুবকেরা অতি-ব্যস্ততা-বশে প্রায়ই উহাতে বিশেষ কৃতকার্য হয় না। চাঞ্চল্যের অবসানে যৌবনের মধ্যভাগে যখন তাহাদের সকল কার্যে স্থৈর্য আসে, তখনই তাহারা যৌন-মিলনে সম্যক্‌রূপে সক্ষম হইয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে শক্তির প্রাচুর্য-হেতু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় না করিয়া সাধুসঙ্গ, অধ্যয়ন, সমাজসেবা, ব্যায়াম, খেলাধূলা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিয়া ব্রহ্মচর্য বা আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা যৌনবোধের তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শারীরিক পরিপুষ্টি ও মানসিক স্থৈর্যলাভ করাই সকল যুবক-যুবতীর কর্তব্য। এই সময়কার সদাচার ও কদাচারের উপর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের ও শান্তি-অশান্তির অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে।

প্রজননে যৌনযন্ত্রসমূহের ক্রিয়া

(Physiology of Reproduction)

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ

জীবদেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়া ঘটিত পরিবর্তন, বৃদ্ধি এবং নানা প্রকারে শরীরযন্ত্র ঠিকভাবে চালাইবার জন্য কতকগুলি **অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি** আছে। ইহাদের ভিতর হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাতে শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটে। গ্রন্থির শিরার মধ্য দিয়া যখন রক্ত চলাচল করে তখন উক্ত রস কোনও নালীর মধ্য দিয়া না নামিয়া সোজাসুজি গ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই সব গ্রন্থির নালী নাই। এই জন্য ইহাদের নাম অনালী, বিনালী বা নির্ণালী অথবা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (Ductless glands—অথবা Glands of internal secretion অথবা Endocrine glands).

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে থাইরয়েড্ (Thyroid), প্যারাথাইরয়েড্ (Parathyroid), অ্যাড্রেনাল (Adrenal), পিটুইটারী (Pituitary), অণ্ডকোষদ্বয় (Testes), এবং ডিম্বকোষদ্বয় (Ovaries) প্রধান।

পর পৃষ্ঠার চিত্রে নারীদেহের প্রধান কয়েকটি গ্রন্থি দেখান হইয়াছে।

এই সব নির্ণালী গ্রন্থি হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে বলা হয় **হরমোন** (Hormone)। ইহা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষকে উদ্দীপিত এবং উত্তেজিত করে।

আপাত অপ্রয়োজনীয় এই সব গ্রন্থিগুলির উপকারিতা এবং কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রয়োজনের খাতিরে ইহাদের মধ্যে কোনও একটি গ্রন্থি অস্ত্রোপচার করিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে। গলগণ্ড নিরাময় করিবার জন্য **থাইরয়েড্ গ্রন্থি** বাহির করিয়া ফেলিলে দেখা গিয়াছে যে, রোগী কেশহীনমস্তক, বোকা, ঢিলা এবং পেট-মোটা হয়। **প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি** সরাইয়া ফেলিলে ৫।৬ দিন পরে রোগীর ধনুষ্টঙ্কার বা সারা দেহে আক্ষেপ হয় এবং কিছুদিন

পরেই রোগী মারা যায়। **অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির** প্রভাবে মানব-দেহ ক্লান্তির হাত হইতে রেহাই পায়, স্বাভাবিক যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং ক্রোধের সময় অসাধারণ সাহস ও শক্তির সঞ্চার হয়।

১৫নং চিত্র

১। পিনিয়াল (Pineal)
২। পিটুইটারী (Pituitary)
৩। থাইরয়েড্ (Thyroid)
৪। প্যারাথাইরয়েড্ (Parathyroid)
৫। থাইমাস (Thymus)
৬। প্যাঙ্ক্রিয়াজ (Pancreas)
৭। অ্যাড্রেনাল (Adrenal)
৮। ডিম্বকোষ (Ovary)
৯। প্ল্যাসেণ্টা (Plancenta)
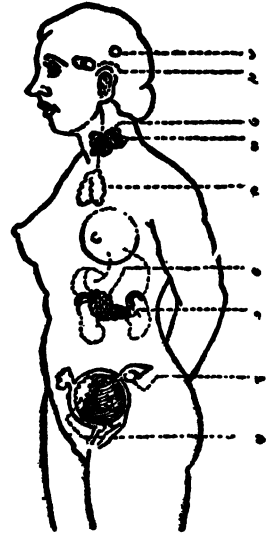
গ্রন্থি মূত্র-প্রবাহ এবং **যৌনবোধ** নিয়ন্ত্রণ করে। মানব-দেহের বৃদ্ধির উপর এই গ্রন্থির আশ্চর্য প্রভাব। ইহার **কার্য** স্বাভাবিক অপেক্ষা **অল্পমাত্রায় হইলে** মানুষ খর্বকায় হয় এবং যৌনবোধ পূরামাত্রায় জাগ্রত হয় না। আবার কিশোর অবস্থায় **অতিমাত্রায়** ইহার কার্য চলিলে মানুষ বিপুলকায় হইয়া পড়ে। ইহা হইতে খুব অল্প মাত্রায় রস নির্গত হইলে মানুষ নিদ্রা-কাতর হয়। এই সব নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত সাধারণভাবে অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির উপরও এই গ্রন্থির প্রভাব রহিয়াছে। এজন্য ইহাকে "Master gland" বা "Conductor of the Endocrine Orchestra" বলা হয়।

মানুষের মেজাজের উপর এই সকল গ্রন্থির প্রভাব খুব বেশী। থাইরয়েড্-এর কার্য একটু বেশী হইলে মানুষ খুব কার্যপটু ও চটপটে হইয়া থাকে; আবার অল্পমাত্রায় হইলে অলসতা এবং নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

পিটুইটারী গ্রন্থির প্রভাবে **নারীদেহে** প্রথম যৌবনের সূচনা লক্ষিত হয় এবং নারীত্বের অন্যান্য চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। মানবদেহের

রক্তনালীর উপর এই গ্রন্থির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শিশু মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিলে এই পিটুইটারীর প্রভাবেই উহার ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য **জরায়ুর সঙ্কোচন এবং প্রসারণ** আরম্ভ হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। পিটুইটারীর কার্যকারিতা নানা কারণে **হ্রাস** পাইয়া গেলে মানবদেহ ও মনের অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হয়। পুরুষের দাড়ি ভালভাবে গজায় না, সে দেখিতে অনেকটা মেয়েলী ধরনের হয় এবং বুদ্ধিশক্তির বিকাশও তেমন হয় না।

অর্থাৎ আলঙ্কারিক ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, সমস্ত অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির সমবায়ে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীনে ডিম্বকোষ সন্তানোৎপাদনমন্ত্রী রূপে কার্য করে। যৌন এবং বংশবৃদ্ধিমূলক ব্যাপারে সোজা কর্তৃত্ব করাই ইহার একমাত্র কাজ নয়; ইহা অন্যান্য গ্রন্থির নিকট বংশবৃদ্ধির জন্য কি কি দরকার তাহাও জানাইয়া থাকে।

মানবদেহের গঠন ও আকৃতির বৈষম্যের মূলে রহিয়াছে এই সকল গ্রন্থি। কিন্তু নরনারীর যৌনবোধের উপর এই সকল নির্ণালী অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রভাব যে কত বেশী তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যৌন ব্যাপারে নরনারীর দৈহিক এবং মানসিক বৈষম্য, কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা, নারীজনোচিত কিংবা পুরুষজনোচিত মনোভাব প্রভৃতির মূলেও এই সকল গ্রন্থির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, পুরুষের অণ্ডকোষ এবং নারীর ডিম্বকোষ যথাক্রমে পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য নয়। এমন নারীও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দেহে ডিম্বকোষ থাকা সত্ত্বেও তাহার মনোভাব, চালচলন সবই পুরুষের মত। আবার এমন পুরুষও আছে, যাহার অণ্ডকোষ থাকা সত্ত্বেও তাহার হাবভাব, চালচলন অনেকটা মেয়েলী। **অ্যাড্রেনাল্** গ্রন্থির বহিরাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন নারীর নারীসুলভ কোমলতা, কণ্ঠস্বর এবং কোমল মাংসপেশীর পরিবর্তে হয়ত পুরুষ-সুলভ শারীরিক দৃঢ়তা এবং বলবীর্য প্রকাশ পাইতে পারে। কেবলমাত্র অণ্ডকোষ এবং ডিম্বকোষের অস্তিত্বের দরুনই যে নারী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নহে; মানবদেহের অন্যান্য নির্ণালী গ্রন্থির প্রভাবও সে জন্য কতকটা দায়ী।

পুরুষ ও নারী উভয়েরই শরীরে পুং হরমোন এ্যাণ্ড্রোজেন (Androgen) এবং স্ত্রী হরমোন এস্ট্রোজেন (Estrogen) উভয়ই থাকে, তবে নারীদেহে পুরুষ অপেক্ষা এস্ট্রোজেনের অনুপাত অধিক এবং এ্যাণ্ড্রোজেনের অনুপাত

কম। আবার বিভিন্ন নারী ও পুরুষ দেহে ইহাদের অনুপাতের পার্থক্য থাকে। সুতরাং যে নারীর দেহে গড়পড়তা নারী অপেক্ষা পুং-হরমোনের আধিক্য থাকে সে একটু পুরুষালী হয়। সেইরূপ পুরুষ দেহে স্ত্রী হরমোনের আধিক্য হইলে সে মেয়েলী হয়।

যৌন-গ্রন্থি-রস

পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য রহিয়াছে। পুরুষ-হরিণের আছে লিঙ্গ শিং এবং অণ্ডকোষ; স্ত্রী-হরিণের আছে ডিম্বকোয়, জরায়ু এবং দুগ্ধবাহী গ্রন্থি। তাহার শিং নাই, আর থাকিলেও উহা ভিন্ন আকারের এবং শরীরের আকৃতিও তাহার ভিন্ন। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের দেহে বিভিন্ন প্রকৃতির যৌন-গ্রন্থি বিদ্যমান; এবং এই যৌন-গ্রন্থির বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াও আমরা স্ত্রী অথবা পুরুষ চিনিতে পারি। স্ত্রীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার **ডিম্বকোষ** এবং পুরুষের চিহ্ন তাহার **অণ্ডকোষ**।

নরনারার (বিশেষ করিয়া নারীদের) যৌনবোধ তাহাদের দেহের কোনও এক বিশেষ জায়গায় আবদ্ধ নহে; তাহা সারা দেহে ব্যাপ্ত। যৌন-গ্রন্থির ক্রিয়ার উপরই প্রধানত যৌনবোধ নির্ভর করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নরনারীর দেহ হইতে যৌন-গ্রন্থি অস্ত্রোপচার বা অন্য উপায়ে সরাইয়া ফেলিলে নরনারীর দেহের লিঙ্গ-নির্দেশক গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (Secondary sexual characteristics) পরিবর্তন ঘটে। অস্ত্রোপচার বাল্যাবস্থায় করিলে পরিবর্তনগুলি অধিক এবং যৌবনে অল্পমাত্রায় হয়।

ডিম্বকোষের কার্যক্ষমতার দরুনই নারীদেহে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট হইয়া উঠে এবং যৌবনের ভরা জোয়ার নারীর দেহ-মনকে আলোড়িত ও সচকিত করিয়া তোলে। এতদিন বালিকার মধ্যে যে নারীত্ব গোপনে অবস্থান করিতেছিল তাহা যেন কোন এক সোনার কাঠির পরশে জাগ্রত হইয়া ওঠে। অস্ত্রোপচার দ্বারা নারীর ডিম্বকোষ বাদ দিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার ফলে তাহার পেটের মাংসপেশীসমূহ ও ভগ শুকাইয়া যায়, কখনও কখনও মাসিক ঋতুস্রাবও বন্ধ হইয়া যায় এবং নারী সন্তানধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, মোটা ও কতকটা পুরুষালী হইয়া পড়ে।

নারীদেহে ডিম্বকোষের মত পুরুষের দেহে আছে অণ্ডকোষ। এই অণ্ডকোষ হইতে নিঃসৃত হরমোন টেস্‌টস্‌টেরোন (Testosterone) দেহের রক্তধারার

সহিত মিশ্রিত হইয়া পুরুষের দেহে ও মনে পৌরুষের সঞ্চার করে। যৌনবোধ জাগ্রত হইবার পূর্বে অস্ত্রোপচার দ্বারা বালকের অণ্ডকোষ বাদ দিয়া দেখা গিয়াছে যে, যৌবনে তাহার প্রজনন-অঙ্গসমূহ ও যৌনবোধ যথাযথভাবে পরিস্ফুট এবং তেমন ক্ষমতাশালী হয় না, বস্তিলোম ও দাড়ি গোঁফ দেখা দেয় না, দেহের গঠন, গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গী মেয়েদের মত হয়। এইরূপ যৌনগ্রন্থি নিষ্কাষিত করিলে, নরনারীর মন সাহস ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে, যৌন-গ্রন্থির সঙ্গে দেহের অন্যান্য শিরা-উপশিরার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু গবেষণা এবং পরীক্ষার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যৌন-গ্রন্থির সঙ্গে যৌনবোধেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে। মোরগের অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলিলে দেখা যায় উহা আর উচ্চৈস্বরে ডাকে না, উহার মাথার মুকুট ক্ষুদ্রতর, বিকৃত ও বিশ্রী হইয়া যায় এবং উহার স্বাভাবিক যৌনবোধ হ্রাস পায়; কিন্তু যদি পুনরায় উহার চামড়ার ভিতর অণ্ডকোষের অংশ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে প্রথমে অণ্ডকোষ বাহির করিয়া লওয়ার ফলে যে সব বিকৃতি দৃষ্ট হয় সেগুলি দূর হয়।

অণ্ডকোষের অন্তঃস্রাবই যে পুরুষের পুরুষালী ভাবের জন্য বহুলাংশে দায়ী তাহা জীবজন্তুর এরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বুঝা যায়। অণ্ডকোষ কাটিয়া ফেলিলে মোরগ যেমন আর মুরগীর পিছনে ততটা ধাওয়া করে না, পাঁঠাকে 'খাসী', অথবা ষাঁড়কে বলদ করার পরেও উহার ঐরূপ ভাবান্তর ঘটে।

আমার মস্ত বড় একটি ঘোড়া আছে। ইহার অল্প বয়সেই ইহাকে কেনা হইয়াছিল। তখন মস্ত বড় আকারের হইলেও যৌন-আকর্ষণের প্রভাব ইহার উপর পড়ে নাই বলিয়া তখনও মাদী ঘোড়ার দিকে মোটেই আকৃষ্ট হইত না। কিছুদিন পর ইহার যৌন-চাঞ্চল্য দেখা দিল। মাদী ঘোড়ার পিছনে ধাওয়া করিবার অদম্য প্রবৃত্তি দেখিয়া ইহার অণ্ডকোষ ছেদনের ব্যবস্থা করা হইল।

পশু-ডাক্তারেরা ইহার অণ্ডকোষ দুইটি না কাটিয়া অণ্ডকোষ হইতে যে সকল শিরা-উপশিরা উপরের দিকে গিয়াছে বাহির হইতে সাঁড়াশী দিয়া চাপিয়া তাহা পিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাতে অণ্ডকোষের অন্তঃস্রাবী রস-স্খলনের ব্যাঘাত ঘটিল এবং ঐ রসের চলাচল বন্ধ হইল। ফলে ইহার মাদী ঘোড়ার দিকে আকর্ষণ-বোধ নষ্ট হইল। শরীর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যৌন-হরমোনের অভাব ঘটায় ইহার পুরুষোচিত যৌনাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হইয়া গেল।

ইদানীং প্রমাণিত হইয়াছে যে গৃহপালিত পশুর অণ্ডকোষ হইতে টেস্‌টস্‌-টেরোন হরমোন বাহির করা যায়। এই হরমোন পুনরায় অণ্ডকোষহীন প্রাণীর দেহে ইনজেক্ট করিলে উহার মধ্যে আর **অণ্ডকোষহীনতার দরুন কোন বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না।**

পুরুষের দেহে স্ত্রীর ডিম্বকোষ বা স্ত্রী হরমোন এবং স্ত্রীর দেহে পুরুষের অণ্ডকোষ অথবা পুং হরমোন প্রবেশ করাইলে, কি পরিবর্তন ঘটে তাহা লক্ষ্য করার জন্য আজকাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলিতেছে। ভিয়েনার ষ্টেনাক (Steinach) এই ব্যাপারে অগ্রবর্তী হন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষ গিনিপিগ লইয়া পরীক্ষা চালান। পরীক্ষায় দেখা যায়, হরমোন বিনিময়ের ফলে উভয়ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষোচিত অনেকগুলি চিহ্নের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে।

সন্তান ধারণের প্রকৃত সময়

নারী-দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্যহেতু যৌবনের প্রারম্ভেই যুবতীরা সন্তান ধারণে তেমন উপযুক্ত হইতে পারে না। অবশ্য সাধারণের ধারণা এই যে, ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নারী উপযুক্তা হয়। ইহা অনেকটা সত্যও বটে, কিন্তু সন্তান ধারণ ও প্রসবে নারী দেহের উপর যে চাপ পড়ে তাহা সহ্য করিবার এবং শিশু পালনের গুরু-দায়িত্ব লইবার মত উপযুক্ত হইতে ঢের সময় লাগে। আমাদের দেশে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর বিভীষিকার কথা আর বলিতে হইবে না। **দারিদ্র্য, বাল্য-বিবাহ** ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং যৌন-বিষয়ে অজ্ঞতা উহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

মধ্য ইওরোপে নারীদেহের ক্রমবিকাশ

ডাঃ কিশ্‌ মধ্য-ইওরোপের নারী-জীবনে যৌন-চেতনার ক্রমবিকাশ ও হ্রাস-বৃদ্ধির একটি সুন্দর গ্রাফ (নক্সা) উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতদের গবেষণায় জার্মান ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের নারীদের গড়ে যে বয়সে দৈহিক পরিণতি ও অবনতি হইয়া থাকে ঐ গ্রাফে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরবর্তী ১৬ নং চিত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সাবালকত্বের পর হইতে বালিকাদের যৌন-চেতনা দ্রুত বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বিবাহের পরে এত দ্রুত না হইলেও অনুরূপ পরিণতি হইতে হইতে প্রায় ৩১।৩২ বৎসর বয়সে উহারা যৌন-জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে

তাহাদের কামেচ্ছার অবনতি প্রকাশ পাইতে থাকে। ৪৬।৪৭ বৎসর বয়স অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের যৌন চেতনা এবং দৈহিক সৌন্দর্য অতি দ্রুত বেগে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই স্তর হইতেই নারীর বার্ধক্য আরম্ভ হয়। প্রথম সন্তান জন্মদানের বয়স গড়ে ২৫।২৮ ধরিতে পারা যায়। কিন্তু জার্মানীতে হিটলারী আমলে যুদ্ধে সৈনিক যোগাইবার জন্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহাতিশয্যে বিবাহের ও সন্তানধারণের বয়স পূর্ব হইতে
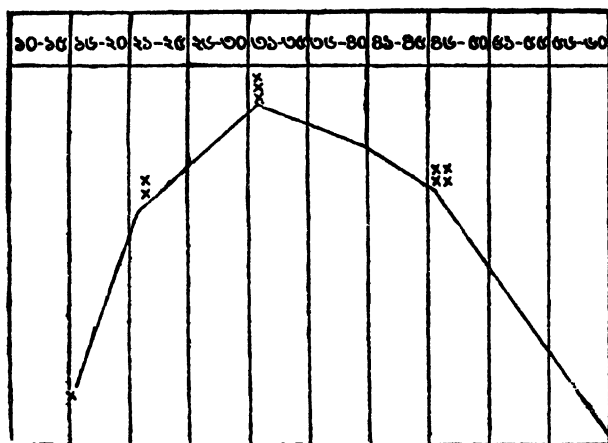
১৬নং চিত্র

× প্রথম ঋতু-দর্শন—১৫।১৬ বৎসর
× × বিবাহ—২১।২২ বৎসর
× × × যৌন-জীবনের সর্বোচ্চ স্তর—৩১।৩২ বৎসর
× × × × ঋতু বন্ধ হওয়া—৪৬।৪৭ বৎসর

নামিয়া গিয়াছিল। ইতালীতে মুসোলিনীর একই উদ্দেশ্যে সদৃশ ব্যবস্থায় একই ফল দাঁড়াইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত এইরূপ কোন গবেষণা হয় নাই। কারণ, এখানে নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব বা সূত্র পাওয়া যায় না। আমাদের মতে উক্ত অবস্থাগুলির বয়স গড়ে এইরূপ হইবে :—

× প্রথম ঋতু-দর্শন—১২।১৩ বৎসর
× × বিবাহ—১২।১৩ বৎসর
× × × যৌন-জীবনের সর্বোচ্চ স্তর—২৬।২৭ বৎসর
× × × × ঋতু বন্ধ হওয়া—৪২।৪৩ বৎসর

সচরাচর মাতার গড়ে ১৪ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যেই প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে বলিয়া ধরা যায়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সর্দা আইন প্রচলিত হওয়ায় বিবাহ-বয়সের গড় এখন ক্রমে বাড়িতে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। বাল্যবিবাহই আমাদের দেশে নারীদের অশিক্ষা, অকাল-বার্ধক্য, শিশু-মৃত্যু এবং প্রসূতি-মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ঋতুস্রাব সম্বন্ধে প্রাচীনকালের লোকের ধারণা

ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নানাদেশে নানা মতবাদের প্রচলন ছিল। ইহার প্রকৃত কারণ ও প্রকৃতি অজ্ঞাত থাকায় লোকেরা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নানা বিধি-নিষেধের জাল বুনিয়া ফেলিয়াছিল।

ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোককে অপবিত্র মনে করা হইত এবং তাহাকে একাকিনী রাখার ব্যবস্থা ছিল। **বাইবেলে** বর্ণিত হইয়াছে যে, ঋতুমতী স্ত্রীলোক যাহা যাহা স্পর্শ করে তাহাই অপবিত্র হইয়া যায়।

বাইবেলে (Old Testament) এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ—

"And if a woman has an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days : and whosoever toucheth her shall be unclean until the even."

"And everything that she lieth upon in her separation shall be unclean : everything also that she sitteth upon shall be unclean."

"And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even."

"And whosoever toucheth anything that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water and be unclean until the even."

"And if it be on her bed, or on anything whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even."

"And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean for seven days : and all the bed whereon he lieth shall be unclean."

"And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation ; all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation ; she shall be unclean."

যে ধর্মগ্রন্থেই থাকুক না কেন এইরূপ অভিমত কুসংস্কারমূলক এবং এইরূপ ব্যবস্থা নির্দোষ নারীদের জন্য অপমানকর। মা, বোনেরা এইরূপ কথা বিশ্বাস করিবেন না। ঋতুস্রাবের প্রকৃত কারণ এবং ঐ সময়ে বিজ্ঞানসম্মত পালনবিধি একটু পরেই বলা হইতেছে।

কোরানে ঋতুস্রাবকে পীড়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই সময়ে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। **তালমুদেও** (Talmud) এই প্রকার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। **জোরোষ্ট্রিয়ানদের** (Zoroastrain) অর্থাৎ পার্শীদের মতে ঋতুমতী নারী যে শুধু সাত দিন পর্যন্ত অপবিত্র তাঁহা নহে পরন্তু সে ভূতের প্রভাবের অধীন।

ঐ যুগে এই রকম ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠালাভ আশ্চর্যের বিষয় নহে। ইহার একটি সুফল এই ছিল যে, এই অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রায় সকলেই মনে করিত।

কুসংস্কারপূর্ণ অন্য সব মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, ঋতুস্রাবের রক্তকে মধ্যযুগে কোথায়ও নানা গুণসম্পন্ন ও কোথাও বিষাক্ত মনে করা হইত। বাত, কুষ্ঠ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে উহার ব্যবহার পর্যন্ত হইত। বাস্তবিকপক্ষে ঋতুস্রাব তখন একটি অত্যাশ্চর্যজনক ব্যাপার বলিয়া ধরা হইত এবং এই হেতু অন্ধবিশ্বাসী লোকেরা কল্পনার সাহায্যে নানা কথার অবতারণা করিত।

বর্তমান সভ্যযুগে হয়ত মানুষ লজ্জার খাতিরে ছেলে বা মেয়ের বয়োপ্রাপ্তির ব্যাপারকে ঘটা করিয়া লোকসমাজে প্রচার করে না। প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ের জীবনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন উহারা পূর্ণাঙ্গ সন্তানোৎপাদনক্ষম নর বা নারীতে রূপান্তরিত হয়। যৌনবোধের ক্রমপরিণতি এবং বিকাশ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ছেলে-মেয়েদের বয়োপ্রাপ্তি ঘোষিত করা হইত এবং এখনও কোথাও কোথাও হয়।

জাপানী মেয়েরা যখন প্রথম রজঃস্বলা হয় তখন তাহারা তাহাদের কেশ-রাজী বিশিষ্ট ধরনের একরূপ আলপিন দ্বারা বিন্যস্ত করে। অনেক জাতি হস্ত-পদে নানারূপ চিহ্নাদি অঙ্কিত করিয়া ছেলেদের বয়োপ্রাপ্তি প্রচার করে। আফ্রিকার জুলু, কাফির এবং লোয়াঙ্গো প্রভৃতি অসভ্যজাতির মধ্যে নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। জুলু মেয়ের রজঃস্বলা হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তাহার অনামিকা অঙ্গুলির খানিকটা অংশ কাটিয়া ফেলা হয়। কৃর্তিত

অংশ তাজা গোবরে আচ্ছাদিত করিয়া কুটিরের চালের উপরিভাগে স্থাপিত করা হয়। কোথাও আবার মেয়ের পিতা সুন্দর একটি গাভীর ভগদেশ হইতে কয়েকটি লোম উঠাইয়া লয় এবং তদীয় মাতা ঐ লোমের দড়ি পাকাইয়া উহা মেয়ের গলায় বাঁধিয়া দেয়। মেয়ে এবং গাভী তখন হইতে পরস্পর ভগ্নী হয়। গাভী আর কখনও বিক্রী করা হয় না। এদিকে মেয়ে ক্রমেই যেন রহস্যজনক ভাবে স্বাস্থ্য সম্পদ, উর্বরতা এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

কাফির নিগ্রো মেয়েদের মধ্যে আরও চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। রজঃস্বলা মেয়েদের কোনও এক নদীর তীরে একটি বাসস্থানে একত্র করা হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাহাদের সেখানে কাটিয়া যায়। তাহারা সেখানে থাকিয়া নানারূপ মেয়েলী শিল্প-কার্য শিক্ষা করে; তাহাদিগকে সময় সময় বেত্রাঘাতও করা হয়। তাহাদিগকে দুধ পান করিতে দেওয়া হয় না; সারা দেহে ছাই এবং কাদা মাখাইয়া দেওয়া হয়। কয়েকমাস পরে নানারূপ জাঁকজমকের সহিত তাহাদিগকে বাড়িতে ফিরাইয়া আনা হয় এবং প্রত্যেকে তাহার মনোমত বর বাছিয়া লয়।

রজঃস্বলা রমণীকে চিরকালই অপবিত্র এবং অপরিচ্ছন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে। পাক-ভারতেও উহাদের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের অনেক বালাই ছিল। ঐ অবস্থায় পুকুরে স্নান করা, রান্না করা, বিছানা, বাসন, প্রভৃতি স্পর্শ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করা হইত এবং এখনও পল্লীগ্রামে তো বটেই, শহরেও যে সমস্ত রক্ষণশীল পরিবার প্রাচীন প্রথাসমূহ মানিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যে ঐ সকল বিধি নিষেধ মানা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে ঋতুমতী হওয়ার প্রতিশব্দই 'নোংরা' হওয়া। **পশ্চিম আফ্রিকার** কোনও এক প্রদেশে এরূপ রমণী নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতে পায় না। আরব দেশের রমণীরা ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্র সর্ববিধ ধর্ম-কর্ম হইতে বিরত থাকে। কোনও এক সময়ে জনৈক আদিম অষ্ট্রেলিয়াবাসী, তাহার কম্বল স্পর্শ করায় তাহার ঋতুমতী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল। **এশিয়া এবং ইওরোপেও** অনেক স্থানে রমণীরা ইহা আরম্ভ হইলে যে বস্ত্রখণ্ড রক্ত শোষণ করিয়া লয় তাহা স্রাবকালে আর পরিবর্তন করে না। একই বস্ত্রখণ্ড পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে। তাহারা মনে করে নূতন বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করিলে স্রাব নূতনভাবে দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইতে পারে। **ভারতীয় রমণীরা** কেহ কেহ এই সময় পুষ্প-সম্ভবা চারাগাছের নিকট গমন করে না, কারণ তাহা হইলে উক্ত গাছ শুকাইয়া মরিয়া যাইতে

পারে; তাহারা ফলের বাগানে বা শস্যপূর্ণ মাঠে গমন করে না, কারণ তাহা হইলে ফল-মূল এবং শস্যের পরিমাণ নাকি হ্রাস পাইতে পারে! প্রাচীন জার্মানদের মধ্যেও এইরূপ ধারণা ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার **রেড ইণ্ডিয়ানদিগের** মধ্যে ঋতুমতী নারী সম্বন্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তাহাকে পুরুষের ব্যবহৃত কোনও বিছানা-পত্র বা কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিতে, রান্না করিতে, কিংবা বাহিরের কোন পুরুষের মুখ দেখিতে দেওয়া হয় না।

ইত্যাকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধিনিষেধ পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যেই স্থান পাইয়াছে।

বাংলা দেশে **হিন্দুদের মধ্যে** অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে সে কথা গোপনেই রাখা হইত। কারণ উহা নিন্দার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। বিবাহের 'পর যখন প্রথম ঋতু হইত তখন সেই যেন প্রথম বার হইল এইরূপ ঘোষণা করা হইত এবং নানারূপ আচার অনুষ্ঠান করা হইত।

প্রথম ঋতুমতীকে একটি আলাদা ঘরে এক বস্ত্রে ৪ হইতে ৭ দিন রাখা হইত। এই ঘরের নাম **'তীরঘর'**। উহার চারি কোণে চারিটি সরকাটি পুঁতিয়া উহাদের অগ্রভাগ তালপত্র দিয়া তীরের মত সূক্ষ্মাগ্র করা হইত।

মলমূত্রত্যাগ ছাড়া অন্য কোন কাজে বালিকাকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। যেহেতু সূর্য পুরুষ সেজন্য তাহাকে সূর্যের মুখ দেখিতে দেওয়া হইত না। চন্দ্র, শূদ্র, ব্রাহ্মণের মুখও স্নানের পূর্বে দেখা নিষেধ ছিল। এইজন্য ঘোমটা দিয়া মলমূত্রত্যাগ করিতে যাইতে হইত।

আত্মীয়েরা প্রতিবেশীদের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহার ভাত বালিকাকে ঐ সময়ে খাইতে দিতেন। ইহার নাম **"খুদমাঙ্গা"**। শেষ দিন আত্মীয়া ও বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করা হইত। পুরুষদের বাহিরে সরাইয়া মেয়েরা অশ্লীল কথা ও গানে মত্ত হইতেন এবং হলুদ গোলা জল পরস্পরের গায়ে ছিটান হইত। এক জায়গার চারি কোণে চারিটি কলাপাতা পুঁতিয়া তাহার মধ্যে একটি ছোট পুকুর খোঁড়া হইত। ইহার কাদা নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও বান্ধবীরা পরস্পরের গায়ে ছিটাইতেন। সেইজন্য এই উৎসবের নাম **"কাদা"**।

ইহার অন্য নাম **'পুনর্বিবাহ'**। বাপের বাড়ী আদ্য ঋতু হইলে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিবাহের মত অনুষ্ঠান ও উৎসব করা হইত বলিয়াই এই নাম হইয়াছে।

দুইটি সরার মধ্যে একটি ডাব রাখা হইত। ডাবের লেজটি বাহিরে থাকিত। সরা দুইটি উপর আলতা রাখিয়া লাল সূতা দিয়া বাঁধা হইত। উহা বালিকার কোলে রাখা হইত। ইহার নাম **"কোল সরা"**। ইহা শিশুসন্তানের প্রতীক। এটিকে 'কাদা' উৎসবের পরেও বাড়ীতে রাখিয়া দেওয়া হইত।

চতুর্থ বা সপ্তম দিনে স্নানের পর বরবধূ আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়াইলে হোমের পর কোন 'জেওঁজ' পোয়াতি (যাঁহার কোন সন্তান মারা যায় নাই) বধূর আঁচলে ডাব, কলা, আম, সুপারী প্রভৃতি পাঁচ রকমের ফল ঢালিয়া দিতেন। ইহার নাম **"ফল কোঁচে"**। ইহার পর সে কাহারও শিশু কোলে লইয়া প্রদীপের সম্মুখে তাহার মুখে পায়স দিয়া নিজে খাইত।

স্নান করিয়া আসার পর কোনও 'জেওঁজ' পোয়াতি বালিকার পিঠে তিন বার কিল মারিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে **'হুড়কো'** (স্বামীর বিছানায় যাইতে ভীতা, অনিচ্ছুক বা অবাধ্য) হইবে না।

প্রথম ঋতু হওয়ার নাম ছিল 'আদ্যঋতু' বা **'ফল দেখা'**। কোন্ কোন্ বার, মাস, তিথিতে আদ্যঋতু হইলে বালিকার প্রকৃতি ও ভাগ্য কিরূপ হইবে তাহা ফলিত জ্যোতিষের বিবিধ পুস্তকে লেখা আছে। বলা আবশ্যক যে, এ সমস্তই কাল্পনিক ও অবিশ্বাস্য।

মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাওয়ায়, এবং আধুনিক শিক্ষার ফলে নারীরা সুরুচিসম্পন্না হওয়ায় ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করায় এই সকল আচার, অনুষ্ঠান উঠিয়া যাইতেছে।

সভ্যতাপ্রসূত অতিমাত্রায় লজ্জাবোধ এবং যৌন-সম্পর্কীয় সকল বিষয়কেই (ভ্রান্তভাবে) নোংরা, লজ্জাকর, ঘৃণ্য, পাপজনক এবং গোপনীয়, সুতরাং আলোচনার বহির্ভূত মনে করার দরুন এখনও ঋতুস্রাব সম্বন্ধে বালিকারা অজ্ঞ থাকে। বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে **আকস্মিক রজোদর্শনে অনেকে ভীতা হইয়া পড়ে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে**। এইজন্য মায়েদের উচিত মেয়েদের স্তনোদ্গম হইতে দেখিলেই মাসিক স্রাব প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে আরম্ভ হইবে বুঝিয়া, ইহার সম্ভাবনা, প্রকৃত কারণ এবং সে সময়ের বিধিনিষেধ তাহাদের জানাইয়া দেওয়া, নতুবা হঠাৎ রক্তপাত দর্শনে সে ভীতা, উৎকণ্ঠিতা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িতে পারে।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, **আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে এখনও বহুবিধ কুসংস্কার রহিয়াছে।** আশ্চর্যের বিষয়, জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচারের নাম করিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা পুরাতন শাস্ত্র, আধুনিক বিজ্ঞানের ছিটা ফোঁটা, আয়ুর্বেদের ভ্রান্ত মত, ভ্রান্ত ফলিত জ্যোতিষ, লোকাচার এবং জনমতের এক অপূর্ব খিঁচুড়ী পরিবেশন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এদেশের তথাকথিত 'শিক্ষিত' লোকেরাও যৌনব্যাপার সম্বন্ধে এতদূর অজ্ঞ যে, এতাদৃশ অসংখ্য ভুল কথা পূর্ণ এক পুস্তকের প্রায় বিংশতি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। দৈব ঔষধের দেশব্যাপী জয়গান গাহিতে গিয়া জনপ্রিয় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে **"নারীর অবশ্য পাঠ্য"** প্রভৃতি শীর্ষক যে সব **ভ্রান্ত মত, পথ ও তথ্য** জনসাধারণ্যে প্রচার করিয়া দেশের বিশেষ অনিষ্ট করা হইতেছে তাহার নমুনা দিবার জন্যই আমি নিম্নলিখিত অংশটুকু অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি :—

নারীর কথা

(নারীর অবশ্য পাঠ্য)

ঋতু হয় কেন

"এই বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে যে, চন্দ্র ও মঙ্গল এই উভয়ই ঋতুর কারণ। চন্দ্রই জল এবং মঙ্গলই অগ্নি। এই উভয়ের মিশ্রণে স্ত্রীগণের শরীরে পিত্তোৎপত্তি হয়। ঐ পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রক্তকে সঞ্চালিত করতঃ নিঃসারিত করে এবং এই রক্তই ঋতু বলিয়া কথিত।

"ঋতুর প্রথম চারদিন রজঃস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শন দূষণীয়। যদি ইহার অন্যথা হয় তবে পতির আয়ুহানি সুনিশ্চিত এবং পত্নীর শিরঃপীড়া, হিষ্টিরিয়া, বাধক প্রভৃতি রোগ জন্মিবার বিশেষ আশঙ্কা। অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা, ত্বক, মাংস এবং রক্ত এই ষড়বিধ কোষের সংমিশ্রণে মানবদেহ গঠিত। প্রথমোক্ত ৩টি জনক হইতে এবং শেষোক্ত ৩টি জননী হইতে উদ্ভূত। সুতরাং গর্ভাধান সংস্কারের সময় জনকজননীর দেহ ব্যাধিমুক্ত, পবিত্র ও প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। তখন মাতা-পিতার শরীরে কোনও দোষ থাকিলে উহা সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

"ঋতুকালে নারী ক্রন্দন করিলে তাহার সন্তানের চক্ষু বিকৃত হইবার আশঙ্কা। এইরূপ নখচ্ছেদ করিলে সন্তান কুষ্ঠরোগী, গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহারে দুঃখার্ত, উচ্চবাক্য কথনে বধির, দিবানিদ্রায় অলস বা অতি নির্দালু, দৌড়িলে চঞ্চল, তর্ক

বিতর্ক করিলে বাচাল, বেশী শ্রম করিলে দুর্ব্বল বা উন্মত্ত, অঞ্জন প্রয়োগে অন্ধ এবং অধিক হাস্য করিলে তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, ও জিহ্বা কালো হইয়া থাকে। চতুর্থ দিবসে নারী ঋতুস্নানপূর্বক পবিত্রা হইয়া অগ্রে স্বামীমুখ দর্শন করিবেন। ইহার কারণ এই যে, যদি ঐ ঋতুতে গর্ভ সঞ্চার হয় তবে নিশ্চয়ই সন্তানের মুখ পিতার মুখের ন্যায় হইবে। পতি উপস্থিত না থাকিলে সূর্য্যদর্শনই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। গর্ভ সঞ্চারের পর হইতে গর্ভিণীকে প্রতি মাসে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পালসিটিলা ৩০ বা ৬ দুই তিন বার সেবন করাইলে কোনরূপ গর্ভরোগের আশঙ্কা থাকে না। গর্ভাবস্থায় প্রতি মাসে ৩ দিন করিয়া একটি ত্রিপত্র কচি পলাশের পত্র কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে উক্ত গর্ভে সুকান্তি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন—গর্ভাবস্থায় প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে কন্যা এবং অল্প আহার্য্য গ্রহণে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।”

এই বিজ্ঞাপন ঘটা করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার মত সর্বজনপ্রিয়, বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্রে না দিলে বোধ হয় আমি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতে পারিতাম না। পুঁথি, পঞ্জিকা এবং বাজারে প্রচলিত বহু পুস্তকই এইরূপ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করিয়া সমাজের ও দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

পূর্বোক্ত তথ্যের ছড়াছড়ি ও আদেশ উপদেশের বিষয়ে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, পাঠক-পাঠিকারা ইহাতে বোধ হয় এক কণাও প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাইবেন না। তাঁহারা এই সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবেন ইহাই আমার অনুরোধ। এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্যই কুসংস্কার দূরীকরণ এবং পাঠক-পাঠিকাদিগকে চিন্তাশীল যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করা।

ঋতুস্রাবের উপর আবহাওয়ার প্রভাব

যৌন-বৃত্তির উপর আবহাওয়ার প্রভাব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বালিকাদের গড়ে ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ১৩ হইতে ১৫ এবং শীত-প্রধান দেশে ১৫ হইতে ১৮ বৎসরে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে দেশের আবহাওয়া যত উষ্ণ—সেই দেশের নারীদের সাধারণত তত অল্প বয়সে ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া থাকে।

জার্মাণীর প্লস ও বার্টেল (Ploss and Bartel) উভয়ে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের নারীজাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া Woman নামক তিনটি সুবৃহৎ খণ্ডে সমাপ্ত, গ্রন্থে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন দেশে আদ্যঋতু হইবার গড়পড়তা বয়স এইরূপ দেখা যায় :—

গ্রীষ্ম-প্রধান

দেশ			বয়স
আলজিরিয়া	...	...	৯—১০
প্যালেষ্টাইন	...	....	১০
সিরিয়া	...	...	১২
তুরস্ক	...	...	১০
পারস্য	...	...	১০—১৪
ভারতবর্ষ	...	...	১২—১৩
কলিকাতা	...	..	১২—১/২
জাপান	...	....	১৩—১৪

শীত-প্রধান

দেশ			বয়স
ইংল্যাণ্ড	...	...	১৫
ফ্রান্স	...	...	১৬
জার্মাণী	...	...	১৫
ল্যাপ্ল্যাণ্ড	....	...	১৮
কোপেন্হেগেন	...	...	১৬

বৎসর বয়সে বালিকাদের ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া থাকে। অনেক পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন, দেশের আবহাওয়ার উষ্ণতা হেতু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তিসমূহ অকালে পরিপক্ক হইয়া যায়। সেইজন্যই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে দেহের পরিপক্কতাহেতু যৌনবোধ অতি অল্প বয়সেই জাগ্রত হয়।* এই যুক্তির

* সব চেয়ে কত কম বয়সে বালিকারা ঋতুমতী হইয়াছে বা হইয়া থাকে, একথা বলা শক্ত। বোধ হয় পরিপুষ্ট বালিকার ৮ বৎসর বয়সেও ঋতু দেখা দিতে পারে। ১০।১১ বৎসরে সন্তান প্রসব করার দৃষ্টান্তও খুব কম নয়।

পেরুর পার্বত্যদেশ (Peruvian Andes) হইতে চমকপ্রদ এক দৃষ্টান্তের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত এদেশের বাল্য-বিবাহ সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা **সকাল-সকাল** বিবাহ দেওয়া বা করাকে সমর্থন করিলেও **বাল্য-বিবাহ** কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে যে একটু সকাল-সকাল যৌনবোধ জাগ্রত হয়, উপরোল্লিখিত তালিকায় বালিকাদের রজোদর্শনের বয়স হইতে তাহাই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু দেহের অকালপক্কতাই ইহার কারণ, কি অন্য কোনও কারণ আছে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ একমত নহেন। ডাঃ কিশ্ (তাঁহার Sexual Life of Women গ্রন্থে) আবহাওয়ার উষ্ণতাহেতু দেহের পরিপক্কতাকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ফোরেল (তাঁহার The Sexual Question গ্রন্থে) বলেন, দৈহিক পক্কতা ইহার কারণ নহে; আসল কারণ শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে জীবনধারণের জন্য যতটা কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকদিগকে ততটা পরিশ্রম করিতে হয় না; সেজন্য গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অধিবাসিগণের অবসর বেশী, সুতরাং বাজে চিন্তা করিবার সময় যথেষ্ট। এই কারণেই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের মধ্যে সকাল-সকাল যৌনবোধ পরিস্ফুট হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও আমাদের মনে হয়, ডাঃ কিশের মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

নর-নারীর যৌনবোধ স্ফুরণে যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ কিশের মতে আর্য নারীর অপেক্ষা সেমিটিক

লিনা মেডিনা (Lina Medina) নামে একটি মেয়ে খুব গরীব ঘরে জন্মায়। মেয়েটি খুব সকাল সকাল বাড়িয়া উঠে এবং উহার অবস্থা সম্বন্ধে সকলেই উদগ্রীব হইয়া ওঠে। গ্রাম্য লোকেরা 'ভূতের কারসাজী' বলিয়া মনে করেন কিন্তু হুঁশিয়ার ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, লিনা গর্ভবতী!

তাড়াতাড়ি তখন লিনার প্রসব-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। লিমার মাতৃসদনে (Lima Maternity clinic) ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকা লিমা ৩৫ জন ডাক্তারের প্রত্যক্ষে, ১৯৩৯ সালের মে মাসে, ৫॥০ পাউণ্ড ওজনের একটি ছেলে প্রসব করে!

সারা বিশ্বের ডাক্তারেরা এই সংবাদে বিস্মিত হন।

লিনাকে পরীক্ষা করিয়া কোনও অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায় নাই। উহার ছেলে (Alejandro) এ্যালেজান্দ্রোও সব দিক দিয়া স্বাভাবিক রকমের একটি ছেলে!

সেই সময়ে মায়ের ও ছেলের ফটো ও নাম সংবাদ-পত্রে ছাপান হইয়াছিল।

নারীর অনেক অল্প বয়সেই ঋতুস্রাব হইয়া থাকে।* অবশ্য এই জাতিগত বৈশিষ্ট্য দৈহিক গঠনের পার্থক্যের উপরই নির্ভর করে। যে জাতির নারীরা বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, সেই জাতিতেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণত দেখা গিয়াছে স্বাস্থ্যহীনা, অপূর্ণ-দেহ, পিঙ্গল-কেশ, কোমল-চর্ম, নীলচক্ষুবিশিষ্ট গৌরাঙ্গী অপেক্ষা স্বাস্থ্যবতী সুগঠিত, ঘন-কৃষ্ণকেশ, স্থূল-চর্ম অথবা কৃষ্ণ-চক্ষু শ্যামাঙ্গীর তাড়াতাড়ি ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়।

সামাজিক অবস্থা ও জীবন-যাপন প্রণালীর প্রভাব

যৌনবোধের উপর সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবন-যাপন-প্রণালীর প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। প্রচুর-অবসরভোগী, বিলাসী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যত অল্প বয়সে ঋতুস্রাব হয়, কৃষক, শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তত সকালে ঋতুস্রাব হয় না। ঠিক এই কারণেই বড় বড় নগরীতে যত অল্প বয়সে নারী রজঃ দর্শন করিয়া থাকে, ক্ষুদ্র শহরে ও পল্লী গ্রামে তত অল্প বয়সে করে না। বড় লোকদের মধ্যে **অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের** ব্যবস্থা থাকার ফলে এইরূপ হইয়া থাকে, আবার ডাঃ ফোরেলের মতে, উহাদের যৌন-চিন্তা করিবার **প্রচুর অবসর**ও থাকে। পরিশ্রম না করা, আদি-রসাত্মক গল্প, উপন্যাস পাঠ, থিয়েটার, সিনেমা দেখিয়া উত্তেজনা লাভ ইত্যাদির প্রভাবও না হইয়া যায় না।

ঋতুস্রাবের প্রকৃতি ও কারণ

সাধারণত প্রথম ঋতুস্রাব সাবালিকা হওয়ার লক্ষণ। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এ সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইবার কোনই আবশ্যক নাই। এই বিষয়ে **প্রকৃত জ্ঞান** থাকা এবং স্বাস্থ্যনীতিমূলক ব্যবস্থা করা উচিত।

ঋতুস্রাবের কারণ

ঋতুস্রাবের মুখ্য উপাদানগুলি জরায়ু হইতে আসে। প্রতিমাসে ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নির্গমনের সময় জরায়ু গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাণবন্ত ডিম্বকে জায়গা দিয়া উহার বৃদ্ধির সাহায্য করিতে জরায়ুর ভিতরে যে উদ্যোগ

* যুদ্ধ উপলক্ষে ইরাকে প্রবাসী কয়েকজন সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া বলেন যে, আরব, ইহুদী ও কুর্দ (শেষোক্তেরা আর্য, সেমিটিক্ নয়) মেয়েদের স্তনোদ্গম ভারতীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের অপেক্ষা কম বয়সে হয়।

ও আয়োজন হয় তাহাতে জারায়ুর ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বেশ পুরু হইয়া ওঠে ও ইহার ভিতরকার গ্রন্থিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। গর্ভোৎপাদন না হইলে অর্থাৎ নারীর ডিম্বের সহিত পুরুষের শুক্রকীটের সংস্পর্শ না ঘটিলে, ঐ ঝিল্লীর অধিকাংশ অনাবশ্যক হওয়ায় রক্তস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং উহার স্থলে অবশিষ্ট ঝিল্লী হইতে নূতন ঝিল্লী গঠিত হয়। কোন অতিথির অথবা বিদেশস্থ আত্মীয়ের আগমনের সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহার বাসের জন্য যে অস্থায়ী ঘর তৈয়ার করা হয়, তিনি না আসিলে সেই ঘর অনাবশ্যক বোধে, যে-রূপ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তেমনি শুক্রকীট দ্বারা প্রাণবন্ত ডিম্বের জরায়ুর ভিতর আসিয়া বাসা বাঁধিবার (Nidation) জন্য যে নূতন আয়োজন প্রতি মাসে (নিঃসারিত ডিম্বের আধার ডিম্বাশয়স্থ গ্র্যাফিয়ন্ ফলিকল Graffian follicle—স্থিত পীত বস্তু—কর্পাস্ লুটিয়্যম Corpus luteum হইতে ক্ষরিত হরমোন প্রোজেষ্টেরনের—progesterone-এর প্রভাবে) হয়, তাহা না হইলে, উক্ত অনাবশ্যক রক্ত ও ঝিল্লী পরিত্যক্ত হয়। ইহাকেই **ঋতুস্রাব** বলে। প্রতি মাসে এইরূপে গর্ভ গ্রহণের জন্য জরায়ু প্রস্তুত হয় এবং গর্ভাধান না হইলে ঋতুস্রাবও মাসে মাসে হয়।

ডিম্ব ও শুক্রকীট কি করিয়া মিলিত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে তাহা একটু পরেই ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

ডিম্ব পরিপক্ক হইয়া ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হইয়া আসাকে ডিম্বস্ফোটন বলে। অষ্ট্রিয়ার নাউস (Knaus), জাপানের ওজিনো (Ogino) এবং পরবর্তী বৈজ্ঞানিকবৃন্দের বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সাব্যস্ত হইয়াছে যে ঋতু আরম্ভের ১৪।১৫ দিন পূর্বে ইহা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহার নিয়মিতভাবে ২৮ দিন পর পর মাসিক আরম্ভ হয়, তাহার কোনও মাসের ১লা স্রাব দেখা দিলে, পরবর্তী মাসিক সেই মাসের (১+২৮) ২৯-এ আরম্ভ হয়, এবং ডিম্বস্ফোটন সেই মাসের প্রায় (২৯—১৪) ১৫ই হয়। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, **দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী** সময়েই ডিম্বস্ফোটন হয়। এ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ 'নারী জীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়'......অধ্যায়ে বলিয়াছি।

ঋতুস্রাবের উপাদান

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ঋতুস্রাব নিম্নলিখিত কয়টি দ্রব্যের সমষ্টি :—

১। **রক্ত**-সুস্থাবস্থায় ঋতু রক্ত শিরা প্রবাহিত রক্তের (Venous

Blood) ন্যায়ই গাঢ় কালচে লাল এবং এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও দেখা যায় না। তবে ঋতুরক্ত সাধারণ রক্তের ন্যায় সচরাচর জমাট (Clot) বাঁধে না, কারণ ইহার সহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। ইহার সহিত খুব ক্যালসিয়াম্ নির্গত হয়।

২। জরায়ু ও জরায়ু গ্রীবাস্থিত গ্রন্থিগুলির রস।

৩। জরায়ুস্থিত ঝিল্লীর ছিন্ন অংশ।

৪। যোনিপথের ঝিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন কোষসমূহ।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এই স্রাব বিষাক্ত।

স্রাবের স্থায়িত্ব ও পরিমাণ

সাধারণত ৩ হইতে ৫ দিন পর্যন্ত ঋতুস্রাব হয়। যদি আরও বেশী দিন স্থায়ী হওয়ার ফলে শরীর খারাপ হয় তবে উহাকে রোগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এইরূপ হইলে চিকিৎসকের-সাহায্য লওয়া উচিত।

রক্তের পরিমাণ লোক হিসাবে ও দিন হিসাবে বেশী কম হয়। সাধারণত এক ঋতুকালের ৩।৪ দিনে মোট প্রায় আধ পোয়া (৪।৫ আউন্স) রক্ত ক্ষয় হয়। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের স্রাবের পরিমাণ কম এবং দুর্বল মেয়েদের বেশী হয়। ক্ষেত্রভেদে স্রাবের পরিমাণ আধ ছটাক হইতে এক পোয়া হইয়া থাকে।

ঋতুস্রাবের ব্যবধান

সাধারণত প্রতি ২৮ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয় এবং উহা কয়েকদিন (পূর্বে বর্ণিত) স্থায়ী হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ২১ হইতে ৩০ দিন অন্তরও ঋতুস্রাব হয়। খুব কদাচিৎ ৪০ দিনেরও ব্যবধান দেখা যায়। কোনও কোনও নারীর ঋতুস্রাব মাসে মাসে আগাইয়া আসে বা পিছাইয়া যায়। শতকরা ৯৭ জন স্ত্রীলোকেরই স্রাব নিয়মিত ব্যবধানে হয়; কাহারও কাহারও এত নিয়মিত হয় যে উহার আরম্ভের দিন ও সময় পর্যন্ত বলিতে পারে। শতকরা ৩৯ জনের ৩০ দিন, ২২ জনের ২৮ দিন, ১১ জনের ৩২ দিন, ২৫ জনের ২৮ হইতে কম অথবা ৩২ দিনের বেশী অন্তর অন্তর হয়। শতকরা ৩ জনের খুব অনিয়মিতভাবে ঋতু হইয়া থাকে।

ঋতু আরম্ভ ও বন্ধ হইবার বয়স

দেশভেদে ১১ হইতে ১৮ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ৪২ হইতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। দেশ-কাল ভেদে ও বিভিন্ন কারণে ঋতুস্রাব আরম্ভ ও বন্ধ হওয়ার বয়সের ব্যতিক্রমও যে হয় তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কোন্ বয়সে আদ্য ঋতু হইলে কোন্ বয়সের মধ্যে সাধারণত ঋতু একেবারে বন্ধ হয় তাহার একটি নক্সা 'ঋতু বন্ধ হইবার বয়স' অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় এবং সাধারণত সন্তানকে দুধ দিবার সময় কয়েক মাস ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে।

ঋতু শেষ বারের মত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহে অনেক পরিবর্তন আসে, উপযুক্ত হরমোন ক্ষরণের অভাবে ডিম্বকোষ শুকাইতে থাকে, এবং প্রসব-পথও ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পীড়া হইতে পারে।

ঋতুর-পূর্ব লক্ষণ ও ঋতুকালীন যন্ত্রণা

ঋতু আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব হইতেই হাত পা, কোমর ও পিঠ ভারী হয়; গা ম্যাজ-ম্যাজ্ করে। স্তনদ্বয় ভারী হয় ও টিপিলে বেদনা অনুভূত হয়। কখনও কখনও মাথা ধরা, নিদ্রালুতা, আলস্য ইত্যাদি লক্ষণও দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সময় সাধারণত কোনও যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিরদাঁড়ার নীচে এবং তলপেটের উপর ব্যথা হয়। ব্যথা ক্রমশ পায়ের নীচের দিকে নামিয়া আসে। কাহারও কাহারও মেজাজ গরম হয়। ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার আগে যে ব্যথা হয় তাহা সাধারণত পিছন দিকে থাকে; কিন্তু স্রাবের সময় বেশীর ভাগ ব্যথা তলপেটেই হয়।

নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অনুরূপ অবস্থা

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে ঋতুবিশেষে যৌনবোধ ও যৌন-লালসা অতি মাত্রায় জাগিয়া ওঠে। এই সময় তাহাদের ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নিঃসৃত হইয়া যায়। উহাদের ডিম্বস্ফোটন সাধারণত যৌনমিলনের পরে হইয়া থাকে।

বানরেরা যখন বংশবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকে না তখন ডিম্বস্ফোটন ব্যতীতও উহাদের ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। বন্ধ্যা মেয়েদেরও অনেক ক্ষেত্রে

এই প্রকার ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। কিছুদিন ডিম্বস্ফোটন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকিলেও ঋতুস্রাব নিয়মিত এবং স্বাভাবিক রীতিতে ঘটিতে পারে। আদ্য ঋতু হইবার পর ২।১ বৎসর কোনও কোনও মাসে ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব হয় না। এই তথ্য না জানা থাকায় সেই মেয়ের মা, হয়ত কন্যার অবৈধ গর্ভ হইয়াছে মনে করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়ে, এবং স্রাব পুনঃ প্রবর্তন করাইবার জন্য (ছদ্মনামে গর্ভপাতের) বিজ্ঞাপিত ঔষধ আনাইতে ব্যগ্র হয়।

স্ত্রীর ডিম্ব যদি শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়া উর্বরতা প্রাপ্ত না হয় তবেই ঋতুস্রাব হইয়া থাকে, অন্যথায় আর হয় না। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ডিম্বস্ফোটন হইবার অব্যবহিত পরে যাহাদের গর্ভাধান হয় তাহারা যদি আবার সন্তানকে বুকের দুধ ছাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই এবং ঋতুস্রাব পুনরায় দেখা দিবার পূর্বেই ডিম্বস্ফোটন হওয়াতে গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে তাহাদের বড় একটা ঋতুস্রাব হইতে দেখা যায় না। এই কারণে মাঝে মাঝে এমন স্ত্রীলোকও দেখা যায় যাহারা একটির পর একটি সন্তান জন্ম দিতে দিতে বহু কাল পর্যন্ত ঋতুস্রাব দেখেই না।

এই কারণেই ইতর জীবগণের ঋতুস্রাব কদাচিৎ হইতে দেখা যায়।

জরায়ুর অবস্থানের দরুনও ইতর জীবের ঋতুস্রাব প্রায়ই হয় না। যে সব উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট জীবজন্তু দাঁড়াইতে পারে কিংবা সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে তাহাদেরই ঋতুস্রাব হয়। মেষ, গাভী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির ঋতুস্রাব হয় বটে কিন্তু তাহাদের জরায়ুর অবস্থিতির দরুন রক্ত উহার মধ্যেই আটকাইয়া যায় এবং যথারীতি নির্গত না হইয়া, হয় দেহমধ্যে পুনঃশোষিত হইয়া যায়, নতুবা শরীরের আবর্জনাদি নির্গমনের পথে বাহির হইয়া যায়। তাই ইতর প্রাণীর মধ্যে নিয়মিত ঋতুস্রাবের রীতি নাই।

গাভী, ঘোটক, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে কখনও খুব অনিয়মিতভাবে যোনিনালী হইতে শ্বেত বা ঘোলাটে রঙের স্রাব হইতে দেখা যায়। এই স্রাব দুই তিন দিন স্থায়ী হয়। উহাকে অবশ্য প্রকৃত ঋতুস্রাব বলা যায় না।

ঋতুমতীর কর্তব্য

(১) ঋতুস্রাব **প্রাকৃতিক নিয়ম**; ইহাতে লজ্জার, ভয়ের বা ঘৃণার কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে মিছামিছি দুশ্চিন্তা পরিহার করা কর্তব্য। পূর্বোল্লিখিত

কুসংস্কারাদি ও উহা হইতে প্রচলিত দেশাচার বা ধর্মীয় আচার পালনের বিশেষ কোন্ সার্থকতা নাই। কি করিতে হইবে না হইবে তাহার নির্দেশ দিবে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(২) ঋতুকালে যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। জল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকের একটি কুসংস্কার আছে। নিজ শরীরের তাপের সমান (অর্থাৎ যে জলে কনুই ডুবাইলে * বিশেষ শীতল বা উষ্ণ বোধ না হয় এরূপ জলে) ঋতুমতী নারীর প্রত্যহ স্নান করা উচিত। চুল যত শীঘ্র শুকাইতে পারা যায় ততই ভাল নতুবা সর্দি হইতে পারে। এই সময়ে ঐ দুইটি বিশেষ ক্ষতিকর।

(৩) অতিরিক্ত শৈত্য ও আতপ জলে ভিজা, একটানা অনেকক্ষণ দাঁড়ান বা হাঁটা, অত্যন্ত ভারী জিনিষ বহন বা উত্তোলন, উচ্চস্থানে আরোহণ ইত্যাদি বর্জনীয়। তবে লঘু সাংসারিক কাজ কর্ম, এমন কি অধিক স্রাবের সময় ছাড়া, অল্প হাল্কা ধরনের খেলাধূলা করিতেও বাধা নাই। মুক্ত নির্মল বায়ুতে ভ্রমণ এবং অল্প স্রাবের সময় অভ্যস্ত ব্যায়ামাদি করা ভাল। সাঁতার কাটিতে পারা যায়, কিন্তু বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন (ক) শরীর শীতল হইয়া না যায় এবং (খ) অধিক ক্লান্তি না হয়।

(৪) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ২।৩ বার ঈষদুষ্ণ জল ও সাবান দ্বারা স্ত্রী-অঙ্গ ধৌত করা উচিত। যাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডুশ ব্যবহার করিতে হইলে প্রাত্যহিক ব্যবহারে সাবান-গোলা অল্প গরম জলই যথেষ্ট তবে মাঝে মাঝে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে, মৃদু চাপে (অর্থাৎ পাত্রটি শরীর হইতে দুই ফুটের অধিক উচ্চে না রাখিয়া লাইসল (Lysol) বা ডেটল (Dettol) লোসন দিয়া লওয়া উচিত। ছোট (পাইণ্ট বা পাঁট) বোতলের এক বোতল (দেড় পোয়া বা ১২ আউন্স) জলে চা চামচের এক চামচ (অর্থাৎ ১ ড্রাম) ঐ দুইটি ঔষধের মধ্যে কোনও একটি দিয়া ডুশের জল প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত ঔষধগুলির পরিবর্তে শুধু ঐ পরিমাণ লবণ দিয়াও উক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করিলে অঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখার পক্ষে যথেষ্ট। যেরূপ, পরিষ্কার থাকিবার জন্য আমরা প্রত্যহ দন্ত মার্জনা, মুখ প্রক্ষালন এবং সাবান সাহায্যে স্নান করি তেমনি নিত্য

---

* অঙ্গুলিগুলি সর্বদা বাহিরে থাকায় শরীরের অপর অংশ অপেক্ষা উহা উষ্ণ বা শীতল হইতে পারে

কেবলমাত্র লবণ জলের ডুশ লওয়া উচিত। কিন্তু উপরোক্ত ঔষধগুলির দ্বারা প্রত্যহ ডুশ লওয়া ক্ষতিকর। দেড় পোয়া জলে চায়ের চামচের তিন চামচ সোডা বাইকার্ব, অথবা আধ পোয়া হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ (Hydrogen peroxide) এর সঙ্গে এক পোয়া জল মিশাইয়া ঐ জলে অঙ্গ ধৌত করা ভাল।

ডেটল বা লাইসলের মত উগ্রবীর্য পচন-নিবারক ঔষধের দ্রবণ (Strong antiseptic solution) দ্বারা অন্য সময়ে মাঝে মাঝেই অঙ্গ ধৌত করা ভাল, তবে দৈনিক নয়, কারণ ঐগুলি যোনিপথের রক্ষী-সৈন্যদলকে— অর্থাৎ বহিরাগত দুষ্ট জীবাণু ধ্বংসকারী ডোডেরলীন্ ব্যাসিলাস্ (Doderlein bacillus) কে নষ্ট করে, সুতরাং ঐ স্থান রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা হারায়। ইহা ব্যতীত উক্ত ঔষধাবলী ঘন ঘন ব্যবহারে জ্বালা ও প্রদাহ হইতে পারে। *

(৫) পরিষ্কৃত এবং কোমল বস্ত্র নেংটিরূপে ব্যবহার করা ও উহা প্রত্যহ আবশ্যক মত দুই একবার বদলানো দরকার। পরিষ্কার তুলা, ঋতুর তোয়ালে

* বয়ঃসন্ধির পূর্বে এই রক্ষী জীবাণুগুলি বিশেষ থাকে না। তখন সতীচ্ছদ (বা যৌনাবরণী) সচ্ছিদ্র হইলেও বাহিরের দুষ্ট জীবাণু হইতে কতকটা শরীর রক্ষার কার্য করে। বয়ঃসন্ধির পর এই হিতকারী জীবাণুর সংখ্যা ক্রমশ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ঋতুর পূর্বে ও পরে ইহার সংখ্যা খুব বেশী হয়, এবং ঋতুকালে সর্বাপেক্ষা কম থাকে। সুতরাং তখন বীজাণুদূষণের (infection এর) আশঙ্কা অধিক। এই জন্য ঋতুকালে সঙ্গম অবিধেয়। গর্ভের শেষ তিন মাসে, যখন বীজাণুদূষণ হইতে শরীরকে রক্ষা করা খুবই আবশ্যক, তখন ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

বয়ঃসন্ধির পর, ডিম্বাশয়ের গ্র্যাফিয়ান্ ফলিক্ল হইতে এস্ট্রোজেন্ হরমোন ক্ষরিত হয়। ইহার প্রভাবে যোনির গাত্রে গ্লাইকোজেন্ (Glycogen) জমা হয়। উক্ত ডোডেরলীন বীজাণু ঐ গ্লাইকোজেনের সংস্পর্শে আসিয়া ল্যাকটিক এ্যাসিড (Lactic acid—দধি জাতীয় অম্ল) সৃষ্টি করে। এইজন্য স্বাভাবিক যোনিস্রাব অম্লীয় হয়। দেহে ইষ্ট্রিন্ বা এস্ট্রোজেন (Oestrin or Oestrogen) হরমোন প্রবেশ করাইলে (ইঞ্জেকশানের দ্বারা) ঐ বীজাণু, সুতরাং যোনির অম্লত্বও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন নারীর এবং একই নারীর বিভিন্ন সময়ে, যোনির অম্লত্বের মাত্রা বিভিন্ন হয়।

ঋতু একেবারে বন্ধ হইবার পরে ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিক্ল হইতে আর ডিম্বস্ফোটন হয় না। সুতরাং, বয়ঃসন্ধির পূর্বে যেরূপ যোনিপথের অম্লত্ব থাকে না, ঋতু সংহারের পরও তদ্রূপ থাকে না। তখন জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনিপথ প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়গুলি ক্রমশ শুষ্ক ও সঙ্কুচিত (Atrophied) হইয়া যায়। এইজন্য, রক্ষী জীবাণু এবং যোনির অম্লত্বহীন বালিকার সতীচ্ছদ যেরূপ তাহাকে বীজাণুদূষণ হইতে কতকটা রক্ষা করে, বৃদ্ধার সঙ্কীর্ণ যোনিমুখও তদ্রূপ তাহাকে উক্ত বিপদ হইতে কতকটা রক্ষা করে।

(Sanitary towel) বা ন্যাকড়া ব্যবহার করা উচিত। তুলা বা ন্যাকড়া যোনিপথের ভিতর রাখা উচিত নয়। ডাক্তারখানায় অনেক প্রকার স্বাস্থ্যকর প্যাডও পাওয়া যায়। ইহাদিগকে স্যানিটারী প্যাড বা স্যানিটারী টাওয়েল বলে। Cotex (বিলাতী), Ladco (দেশী), Tampax (ভাল জিনিষ) প্রভৃতি বহুপ্রকার towel পাওয়া যায়। কোন কোন স্ত্রীলোক স্পঞ্জ ব্যবহার করে। একই স্পঞ্জ বেশী দিন ব্যবহার করা ঠিক নয়।

শীঘ্র স্রাব আরম্ভ হইবে বুঝিতে পারার সময় হইতে সাধারণত যে কয়দিন স্রাব থাকে তাহারও একদিন পর পর্যন্ত দিবারাত্র নেংটি ধারণ করা উচিত। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে অজ্ঞাতে হঠাৎ স্রাব আরম্ভ হইয়া পরিহিত বস্ত্র নষ্ট করিয়া লজ্জায় ফেলিতে পারে। **নেংটি ধারণ কয়েক প্রকারে** হইতে পারে ঃ—

(ক) কোমরে একটি শাড়ী বা ধুতির পাড়ের ফালি বাঁধিয়া প্রায় এক হাত লম্বা এবং আধ হইতে এক হাত চওড়া টুকরা ধৌত কাপড়ের কোণাকুণি ভাঁজ করিয়া দুই প্রান্ত ধরিয়া, মধ্যের অংশ জড়াইয়া, এক এক প্রান্ত উক্ত ফালিতে, সামনে ও পিছনের দিকে এমন ভাবে বাঁধিতে হইবে যাহাতে মাঝের মোটা অংশটি ঠিক যোনিপথের সম্মুখে থাক। একটি বস্ত্রখণ্ড বেশী ভিজিয়া গেলে সেটি কাচিবার জন্য রাখিয়া দিয়া অপর একটি কাপড় ঐভাবে বাঁধিতে হইবে।

ঐরূপ বস্ত্রখণ্ড পুরাতন ধুতি বা শাড়ী হইতে কাটিয়া অথবা নূতন মলমল কিনিয়া প্রায় এক হাত লম্বা ও প্রায় এক হাত চওড়া টুকরা কাটিয়া একক রাখিয়া, অথবা দুইটির কিনারা সেলাই করিয়া জোড়া দিয়া ব্যবহার করা যায়।

এইরূপ প্রায় আটটি টুকরা বাক্সে রাখিতে হইবে। ব্যবহৃত কাপড়গুলি কাচিয়া শুকাইয়া আবার ব্যবহার করা যাইবে। শেষ হইবার, অথবা ৫ দিন (যেটা অধিক) পরে সেগুলি ধোপার দ্বারা কাচাইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিবেন।

(খ) প্রায় ৮ আঙ্গুল চওড়া ও প্রায় এক হাত লম্বা কাপড়ের একটি ফালি লম্বালম্বি দুই ভাঁজ করিয়া তাহার দুই প্রান্ত কোমরের দড়িতে বাঁধিবেন। স্রাবপথের সম্মুখে অপর একটি ধৌত বস্ত্র কয়েক ভাঁজ করিয়া উক্ত ফালির ভিতরে রাখিবেন। ভিজিয়া গেলে ঐ ভাঁজ করা প্যাড্ বদলাইয়া সেটি ফেলিয়া দিবেন অথবা কাচিয়া রাখিবেন। ফালিতে দাগ লাগিলে তাহাও

কাচিয়া লইবেন। এইরূপ ৩।৪টি ফালি আর প্যাডের কাপড়, কাচিয়া ব্যবহার করিলে ৮টি এবং ফেলিয়া দিলে ১০।১৫টি আবশ্যক হইতে পারে।

(গ) কোমরের ফালির মাঝখানে নেংটির ৪।৫ অঙ্গুলি চওড়া কাপড়টির এক প্রান্ত সেলাই করিয়া ইংরাজী টি অক্ষরের (T) আকারের বন্ধনী ৩।৪টি তৈয়ার করিয়া বাক্সে রাখিলে আর ঐ দুইটি আলাদা খুঁজিতে হইবে না। ব্যবহার করিবার সময় প্রথমে ফালিটি কোমরে বাঁধিয়া কাপড়টির খোলা প্রান্তটি সামনের দিকে ফালির নীচ দিয়া টানিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া পিছনের দিকে লইয়া গিয়া ফালিতে বাঁধিবেন।

নোংরা ন্যাকড়া ড্রেণ পায়খানায় ফেলা উচিত নয়। পথ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। খাটা পায়খানা থাকিলে সেখানে, (গোপনীয়তার জন্য কাগজে মুড়িয়া) ডাষ্টবিনে অথবা মাঠে সুবিধামত ফেলার ব্যবস্থা করা উচিত।

ভিতরে স্যানিটারী প্যাড রাখায় বিশেষ ক্ষতি নাই তবে বাহিরে ব্যবহার করাই ভাল।

(৬) এই সময়ে পুষ্টিকর আহার্য যথা, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, মোটা আটা প্রভৃতি গ্রহণ করা কর্তব্য। অধিক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (যথা ভাত, আলু, রুটী, চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন) এবং অধিক মশলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা ঠিক নয়।

(৭) অপর সময়ে মালাই (কুলফি) বরফ খাইলে অথবা বরফ জল পান করিলে যদি ক্ষতি না হয় তবে এই সময়েও ঐ সবে কোনও ক্ষতি হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সকলের জন্য সাধারণভাবে উপরোক্ত উপদেশগুলি দেওয়া হইল। যদি কেহ দেখেন যে কোনও বিধি তাঁহার সহ্য হয় না, তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন না। যে কার্য অধিকাংশের পক্ষে ক্ষতিকর নহে, তাহাই আবার একজনের অনিষ্ট করিতে পারে। সকলের নিজ নিজ শরীরের বিশেষ মেজাজ বুঝিয়া চলা উচিত।

ঋতুকালে অস্বাভাবিক লক্ষণ

ঋতুকালে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে যথা,—

(১) তলপেটে ও কোমরে যন্ত্রণা।

প্রতিকার—শুইয়া থাকা উচিত। তলপেটে গরম জলভরা বোতল বা রবারের ব্যাগ দ্বারা সেঁক দিলে অনেক সময় আরাম পাওয়া যায়। একমাত্র অত্যল্প রক্তস্রাবের সহিত ব্যথা থাকিলেই ঐরূপ সেঁকে আরাম বোধ হইবে।

স্বাভাবিক বা বেশী পরিমাণে স্রাব থাকিলে সেঁক না দেওয়াই ভাল। কারণ, তাহার ফলে স্রাব বৃদ্ধি পাইবে। যন্ত্রণা লাঘবের জন্য উপযুক্ত মাত্রায় সারিডন (Saridon), ভেরামন্ (Veramon) ইত্যাদি ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে। সেবন বিধি ঔষধের সঙ্গেই থাকে। সন্দেহ হইলে ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া সেবন করা উচিত।

(২) **অত্যধিক রক্তস্রাব**। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ বারের বেশী কপনী (Diaper) বদলাইতে হইলে বুঝিতে হইবে স্রাব অধিক পরিমাণে হইতেছে। স্রাবের সহিত রক্তের চাপ বাহির হইলে তাহাও অস্বাভাবিক লক্ষণ।

প্রতিকার—শয্যাত্যাগ করা নিষেধ। শীঘ্র ডাক্তারের সাহায্য পাইবার সুবিধা না থাকিলে, বোরিক তুলা বা গজ (Gauze) গরম জলে ফুটাইয়া, ঠাণ্ডা হইলে, উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হস্তে নিংড়াইয়া তাহা প্রসব-পথের ভিতর ঠাসিয়া দিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা পরে উহা বাহির করিয়া নূতন তুলা দিতে হয়। তলপেটে বরফ অথবা ঠাণ্ডা জলের পটি দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) **অত্যল্প রক্তস্রাব**।

প্রতিকার—(ক) তলপেটে গরম ভূষির পুলটিস দিলে উপকার হয়। দুই ঘণ্টা অন্তর এই পুলটিস বদলাইতে হয়।

(খ) বড় গামলায় বা টবে সহ্যমত গরম জল রাখিয়া তাহাতে কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে কিংবা অল্প গরম জলের ডুশ লইলে কখন কখন স্রাব ঠিকমত হইতে পারে।

(৪) **বেশী দিন রক্তস্রাব থাকা**।

প্রতিকার—অত্যধিক রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিতে হয় এই ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য।

(৫) **অনিয়মিত ও অপরিমিত স্রাব**।

ঋতুস্রাব অনিয়মিতভাবে অনেক সময় অতি অল্পবয়স্কা বালিকাদের মধ্যেও দেখা যায়। আট নয় বৎসরের মেয়েরও ঋতুস্রাব হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহা অপেক্ষা কম বয়েসও মেয়েদের ইহা হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সকল **রক্তস্রাবই** ঋতুস্রাব নয়। আভ্যন্তরিক কোনও পীড়া, ক্ষত বা ফোড়ার জন্যও রক্তস্রাব হইতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য আমাদের দেশের নারীদের একটি সাধারণ রোগ। অনেক ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় **ব্যথা ও অসুবিধা** এই জন্যই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সুতরাং মাসিক আরম্ভ হইবার পূর্বেই যাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রতিকারের কথা "গর্ভাবস্থায় বিধিনিষেধ" শীর্ষক আলোচনায় পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

মোট কথা, **অনিয়মিত ও অপরিমিত স্রাব** হইলে চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ করাই কর্তব্য। সবজান্তা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, হাতুড়ে ডাক্তার, ঘরে পড়া হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ বা হেকিমের উপর নির্ভর না করিয়া যথাসাধ্য পাশ করা ভাল ডাক্তার দেখান উচিত।

(৬) আরও নানারূপ অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে,—কষ্টঋতু বা বাধক, অনিয়মিত ঋতু, জ্বর, বিবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ইত্যাদি। এই সব লক্ষণের **সুচিকিৎসা** হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঋতুকালীন নিয়মাদি যথাবিধি পালন না করিলে, জরায়ু, ডিম্বকোষ ও ডিম্ববাহী নলের (ফ্যালোপিয়ান টিউব) প্রদাহ হইলে, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটিলে, মেহ, গরমি প্রভৃতি কারণে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইলে এবং জরায়ুতে 'টিউমার' বা 'ক্যান্সার' হইলে উক্ত অস্বাভাবিক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে পারে।

ঋতুমতীর স্বামী-সহবাস অপ্রশস্ত ও বর্জনীয় হইলেও এই অবস্থায় নারীর রতিবাসনা অত্যধিক উদ্দীপিত হইলে তাহার অনুরোধ বা সম্মতিক্রমে উভয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে এবং স্রাব কম থাকিলে উভয়ের জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া সাবধানতার সহিত সহবাস করিলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না বলিয়া আধুনিক ডাক্তারগণের অভিমত। ঘৃণা ও বিরক্তি হয় এবং রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে বলিয়াই এই অবস্থায় সহবাস অপ্রশস্ত এবং সাধারণত পরিত্যজ্য।

ঋতু বন্ধ হইবার বয়স

আমরা পূর্বেই দেশভেদে মেয়েদের বয়োপ্রাপ্তির বয়সের তারতম্যের উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এগার কিংবা বার, শীতপ্রধান দেশে চৌদ্দ হইতে আঠারো বৎসর বয়সে সাধারণত মেয়েরা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ বয়েড (R. H. Boyed) তাঁহার Controlled Parenthoodএ বলেন যে, বিলাতের ও নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলির এ্যাঙ্গলো স্যাকসন্ বালিকাদের ১০ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে ঋতু আরম্ভ হয়। যে সকল বালিকাদের

১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঋতু না হয় সে সব ক্ষেত্রে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা উচিত। ঐ সব দেশে সাধারণত ৪৭ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে ঋতু একেবারে বন্ধ হয়। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশগুলির এবং ভারতীয় বালিকাদের ঋতু পূর্বোক্তদের অপেক্ষা পূর্বে আরম্ভ হয়।

অন্যদিকে আবার ৪২ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের পরে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকে **ঋতুসংহার** (Menopause) বলে।

নিম্নলিখিত নকসায় (tableএ) সুস্থ নারীদিগের ঋতু আরম্ভের বয়স অনুসারে ঋতু বন্ধ হইবার মোটামুটি বয়স দেখান হইল। সাধারণত এইরূপই হয়, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে ইহার ব্যতিক্রমও হয়।

আগুঋতুর বয়স	ঋতু বন্ধ হয় কোন্ বয়সের মধ্যে
১০	৫০-৫২
১১	৪৮-৫০
১২	৪৬-৪৮
১৩	৪৪-৪৬
১৪	৪২-৪৪
১৫	৪০-৪২
১৬	৩৮-৪০
১৭	৩৬-৩৮
১৮	৩৪-৩৬
১৯	৩২-৩৪
২০	৩০-৩২

দেখা যাইতেছে যে যাহাদের যত তাড়াতাড়ি ঋতু আরম্ভ হয় তাহাদের তত বিলম্বে উহা শেষ হয়; পক্ষান্তরে যাহাদের যত বিলম্বে আরম্ভ হয় তাহাদের তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়।

পরবর্তী সময়ে কিনযে প্রমুখ এ্যামেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের গবেষণা দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, যে পুরুষেরা কম বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহারা প্রায় তখন হইতেই কোনও না কোনও প্রকার যৌনক্রিয়া আরম্ভ করে, যাহারা বিলম্বে যৌবন প্রাপ্ত হয় তাহাদের অপেক্ষা ইহাদের অধিক বয়স পর্যন্ত যৌন

ক্ষমতা অধিক থাকে। অধিকবার এবং অধিক বয়স পর্যন্ত যৌন ক্রিয়ার ফলেও তাহাদের যৌন ক্ষমতার লাঘব হয় না। (Sexual Behaviour in the Human Male ১৯৪৮, ২৯৮, ৩০১, ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কিন্তু, তাঁহারা ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌবন প্রাপ্তির বয়স ও যৌন আচরণের মধ্যে যেরূপ স্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়, নারীদের ক্ষেত্রে ঐ উভয়ের সেরূপ পরিষ্কার সম্বন্ধ দেখা যায় না। (Sexual Behaviour in the Human Female ১৯৫৩, ৬৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।) অন্তত ঋতু আরম্ভ ও শেষ হওয়ার বয়সের মধ্যে স্পষ্ট যোগাযোগ দেখা যায়।

বহু সন্তান প্রসব অথবা গুরুতর পীড়ার ফলে ৩০ এর কোঠার শেষের দিকে অথবা ৪০ এর কোঠার গোড়ার দিকে (অর্থাৎ ৩৮ হইতে ৪২ এর মধ্যে) ঋতুবন্ধ এবং আনুসঙ্গিক পরিবর্তন হইতে পারে। আবার অস্ত্রোপচারে উভয় ডিম্বাশয় বাহির করিয়া লইলে, অথবা একস্-রে বা রেডিয়াম দ্বারা চিকিৎসার ফলে সে গুলি নষ্ট হইলে, যে কোনও বয়সে উহা হইতে পারে। যদি অস্ত্রোপচার দ্বারা জরায়ু বাহির করিয়া লওয়া হয় কিন্তু ডিম্বাশয় দুইটি থাকে, তাহা হইলে যদিও ঋতু ও সন্তান ধারণ ক্ষমতা লোপ হয়, তবুও ঋতুবন্ধের আনুসঙ্গিক পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় না।

ঋতুসংহারের পর আর ডিম্বস্ফোটন হয় না, ঋতুস্রাব বন্ধ হয় এবং স্ত্রীলোক আর গর্ভবতী হয় না। কদাচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে ঋতুবন্ধ হইয়া যাইবার পরেও কোনও কোনও স্ত্রীলোককে সন্তানধারণ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তখনও ডিম্বস্ফোটন হইত। ঋতু নিতান্ত আকস্মিক-ভাবে চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় না; সাধারণত ২।৩ বৎসর ধরিয়া ঋতুস্রাব অনিয়মিত হইতে হইতে পরিশেষে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

এই অবস্থায় স্ত্রীলোকদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে বটে কিন্তু সচরাচর কুসংস্কারপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ যে সকল লক্ষণের কথা শুনা যায় তাহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই। যথা অনেকের ধারণা আছে যে, ঋতু বন্ধের পরে স্ত্রীলোকের আর **সহবাসের আকাঙ্ক্ষা থাকে না** এবং সহবাসে ব্রতী হইলেও আর পুলক অনুভব করে না। ইহা **সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক**। বরং আর সন্তান হইবার আশঙ্কা নাই বুঝিয়া পূর্বের বাসনা গর্ভভয়ে দমিত থাকিলে তাহা ছাড়া পায়। তবে পুরুষদের মত তাহাদেরও বার্ধক্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সহবাসের আকাঙ্ক্ষা ও পুলকের তীব্রতা কমিয়া আসে।

অপর পক্ষে অনেকে আবার মনে করে যে ঋতু বন্ধ হইয়া যাইবার পরে আর **সন্তানধারণের একেবারেই সম্ভাবনা** থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থার সামান্য পরেও ডিম্বস্ফোটন হইতে পারে, অনেক সময়ে **জন্মনিরোধের** বিভিন্ন উপায় ঋতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই পরিহার করিলে কখন যে শেষবারের মত বন্ধ হইয়া গেল তাহা সহসা জানা যায় না, কারণ তাহা হইবার ২।১ বৎসর পূর্ব হইতে ঋতুস্রাব বিলম্বিত ও অনিয়মিত হইতে থাকে। সুতরাং এই সময়ে **গর্ভাধান** হইলেও হইতে পারে। সেইজন্য সন্তানধারণে আপত্তি থাকিলে **ঋতুবন্ধের পরেও একবৎসর কাল জন্মনিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত**। *

কৈশোরের ঋতুস্রাব যেমন **প্রাকৃতিক বিধান** প্রৌঢ় বয়সে ঋতু বন্ধ হওয়াটাও সেইরূপ এবং একেবারে ঋতু বন্ধ হইবার ২।১ বৎসর পূর্বে ও পরে গুরুতর কোনও শারীরিক পরিবর্তনের আশঙ্কার কারণ নাই। পরিবর্তনের মধ্যে সাধারণত, ঋতুস্রাবের স্থায়িত্বকাল, ব্যবধান ও পরিমাণ অনিয়মিত হয়; জননেন্দ্রিয়সমূহ সঙ্কুচিত হইতে থাকে; স্তন শুষ্ক হইয়া যায়; আবার অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা ও মানসিক অবসাদ ইত্যাদিও সাময়িকভাবে দেখা দিতে পারে। কাহারও কাহারও, বিশেষত চিরকুমারী, বালবিধবা, বন্ধ্যা প্রভৃতিদের মধ্যে, এসময়ে হঠাৎ লালসার আধিক্য আসিতে পারে। এই পরিবর্তনের কারণ **ডিম্বকোষের সক্রিয়তা হ্রাস** এবং **আভ্যন্তরিক** হরমোন ক্ষরণের স্বল্পতা।

এই অবস্থায় **প্রথম সাবধানতা :—দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ**; কারণ আশঙ্কার কোনই হেতু নাই। মনের প্রফুল্লতা রক্ষা করা নিতান্ত অপরিহার্য।

দ্বিতীয় সাবধানতা :— অতিভোজন পরিহার এবং জননেন্দ্রিয়সমূহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা। **সাধারণ অবস্থার কোন ব্যতিক্রম দেখা দিলে অবিলম্বে পাশ করা সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।**

পুরুষের অনুরূপ অবস্থা

নারীর মধ্যে যেমন ঋতুস্রাব চিরতরে বন্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়, পুরুষের মধ্যেও পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে তেমনি একটি পরিবর্তনের ভাব আসিয়া থাকে। ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে নারীর সন্তানোৎপাদিকা ক্ষমতা

---

* জন্মনিরোধ বা জন্মশাসন সম্বন্ধে আমার লিখিত "জন্মনিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ" চতুর্থ সংস্করণ ও Controlled Parenthood দ্রষ্টব্য

লোপ পায়; পুরুষের জীবনেও এমন একটি সময় আসে যখন তাহার অপর সকল শক্তির ন্যায় যৌন-শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইতে থাকে। সাধারণত পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সময় হইতে পুরুষের যৌন-জীবনে ক্রমে ভাঁটা পড়িতে থাকে এবং এই ভাঁটার জের দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়। নারীর বেলায় যেরূপ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি চিরতরে লোপ পায়, পুরুষের বেলায় তাহা হয় না। অধিক পরিণত বয়সেও পুরুষের উহা **সম্পূর্ণ** লোপ পায় না; অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের সন্তানাদি জন্মিয়াছে এরূপ ঘটনা জগতে বিরল নয়। নানা দেশে দীর্ঘজীবী পুরুষের অস্তিত্বের খবর আমরা পাইয়া থাকি। কেহ ১২০ বৎসর, কেহ ১২৫ আবার কেহ বা ১৩০ বৎসর বাঁচিয়া রহিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি তুরস্কের অধিবাসী **জারো আগার** জীবন-ইতিহাস সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার জনৈক আত্মীয় অনেক বিলম্বে বিবাহ করেন; তিনি প্রায় ১২৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ৮০।৯০ বৎসর বয়সেও তাঁহার সন্তানাদি জন্মিয়াছিল। রবিবার ৬ই জানুয়ারি ১৯৪৬ এর অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার প্রিসট্‌লি (Priestley) আরমিনিয়ার একটি গ্রামে কয়েকজন শতায়ু দেখিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার মত অনুরূপ কোন ব্যাপার পুরুষের ঘটে না। *

* নারীদের এত বয়সে সন্তানজন্মের সম্ভাবনা থাকে না। ঋতু সংহারের এক বৎসরের পর আর তাহারা সন্তান ধারণ করে না।

কত বেশী বয়সে নারীদের সন্তান হইতে দেখা গিয়াছে এ প্রশ্নও অনেকে করেন। ডাঃ কিশ্ বলেন ডেনমার্ক, সুইডেন এবং আয়ারল্যাণ্ডে শতকরা ৩ হইতে ৪ জন নারী পঞ্চাশের পরও সন্তান লাভ করেন। তবে সাধারণত ১৫ হইতে ৪৫ই সন্তান ধারণের বয়স। আমাদের দেশে ১২ হইতে ৪২ পর্যন্তই এইরূপ সাধারণ বয়স ধরা যায়। পঞ্চাশের পরে গর্ভাধান বড় একটা দেখা যায় না।

জননকোষসমূহ

ডিম্ব

ঋতুস্রাবের সঙ্গে ডিম্বস্ফোটনের সম্বন্ধ আছে এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণত দুই ঋতুস্রাবের **মধ্যবর্তী** সময়েই ডিম্বস্ফোটন হইয়া থাকে।

এই **ডিম্বই** সন্তানের প্রথম উপাদান। নারীর ডিম্বের **অস্তিত্ব সম্বন্ধে** প্রাচীনকালের লোকের ধারণাই ছিল না। 'মানবজাতির মধ্যে **প্রজনন**' অধ্যায়ের 'প্রজনন-বিজ্ঞানের ইতিহাস' অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ফন্ হেলার (Von Haller) ভেড়ীর উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, **ডিম্বকোষ** হইতে **কোনও-একটা-কিছু জরায়ুতে** আগমন করিবার ফলেই তথায় ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফন্ বেয়ার (Von Bear) সর্বপ্রথম নারীর ডিম্ব আবিষ্কার করেন।

"ডিম্ব হইতেই সকল প্রাণীর জন্ম" বলিয়া যে সাধারণ প্রবাদ আছে তাহা অনেকাংশে সত্য।

নারীর ডিম্বের ব্যাস এক ইঞ্চির ১২০ ভাগের এক ভাগ। ইহা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে সহজে দৃষ্ট হয় না। পরবর্তী চিত্রে হাঁস এবং মুরগীর ডিম্বের আকারের তুলনায় নারীর ডিম্বের ছয় গুণ বর্ধিত বিন্দুও অপেক্ষাকৃত কত ক্ষুদ্র তাহাই তুলনামূলকভাবে দেখানো হইয়াছে।

নারীর ডিম্ব কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কি ভাবে ফাটিয়া বাহির হইয়া আসে সে সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আভ্যন্তরিক স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়সমূহের অবস্থিতির কথা মনে করিতে হইবে।

নারীর জরায়ুর ঊর্ধ্বাংশে দুই কোণে ফ্যালোপিয়ান নলদ্বয় এবং জরায়ুর দুই পার্শ্বে প্রশস্ত বন্ধনীদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ডিম্বকোষ অবস্থিত। এক একটি ডিম্বকোষে শিশুর জন্মের সহিতই প্রায় এক লক্ষ করিয়া ফলিকল (Follicle) অর্থাৎ ডিম্ব ও উহার চারি পার্শ্বে একটি বেষ্টনী-কোষ অতি প্রাথমিক অবস্থায় থাকে।

সাধারণত প্রতি ২৮ দিনে কোনও ডিম্বকোষের একটি ডিম্ব পরিপুষ্ট হয়। তখন তাহার উপরিস্থিত আবরণ ফাটিয়া যায় এবং উহা ডিম্বকোষ হইতে বাহির হইয়া ডিম্ববাহী নলের ঝালর সদৃশ মুখে পতিত হইয়া ঐ নলের মধ্য দিয়া জরায়ু অভিমুখে চলিতে থাকে (১৩ নং চিত্র)। যদি পথের মধ্যে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা প্রাণবন্ত না হয় তবে উহা জরায়ুর ভিতরে আসিয়া যোনিপথে

(১৭ নং চিত্র)

(মিস্ ষ্ট্রেন অবলম্বনে)

১। মুরগীর ডিম

২। নারীর ডিম্ব (ছয় গুণ বর্ধিত দক্ষিণ পার্শ্বে সাদা বিন্দু)।

৩। হাঁসের ডিম

বাহির হইয়া যায়। পূর্বে মনে করা হইত যে, এক মাসে একটি ডিম্বকোষ হইতে এবং অপর মাসে অপরটি হইতে পর্যায়ক্রমে ডিম্ব বাহির হয়। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, এই পর্যায়ক্রমতার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কখনও কখনও একই ডিম্বকোষ হইতে কয়েক মাস পর্যন্ত ডিম্বস্ফোটন হইতে পারে। আবার অন্যটি হইতেও ঐরূপ হইতে পারে।

শুক্র

এবার আমরা পুরুষের শুক্রের কথা বলিব। শুক্র শ্বেতবর্ণ, কফ বা ভাতের ফেনের মত ঘন, আঠালো এবং বেশীক্ষণ জলে ভিজানো বস্ত্রখণ্ডের

মত গন্ধ বিশিষ্ট রস বিশেষ। **শুক্র** (Semen) সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের মত এই যে, ইহা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের সপ্তম রূপ, অর্থাৎ আমাদের খাদ্যকে শুক্রে রূপান্তরিত হইতে মধ্যপথে ছয়বার পরিপাক হইতে হয়; খাদ্যদ্রব্যের দ্বিতীয় রূপ রস, তৃতীয় রক্ত, চতুর্থ চর্বি, পঞ্চম অস্থি, ষষ্ঠ মজ্জা এবং সপ্তমরূপ শুক্র। সুতরাং এই মতে শুক্র যে আমাদের দেহের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় পদার্থ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং হিন্দুদের হঠযোগে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শুক্রকে মানুষের **জীবন** বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।* শরীরের সমস্ত উপাদানের মধ্যে শুক্রই

১৮ নং চিত্র

১। মস্তকাবরণ অণুসমষ্টি ২। গ্রীবা ৩। মধ্যভাগ ৪। লেজ ৫। শেষাংশ

যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিভিন্ন চিকিৎসা-শাস্ত্রে মতভেদ ছিল না। আয়ুর্বেদ ও ইউনানী শাস্ত্র এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, খাদ্যদ্রব্য চতুর্থ বার পরিপাক হইয়া মস্তিষ্কের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে এবং মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ড বাহিয়া মূত্রাশয়ে এবং তথা হইতে শিরার সাহায্যে অণ্ডকোষদ্বয়ে প্রবেশ করিয়া পঞ্চম পাকে শ্বেতবর্ণ শুক্রে পরিণত হয়। **এই সব মত এখন অচল হইয়া গিয়াছে।**

এ সম্বন্ধে আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদগণের অভিমত এই যে, শুক্র অণ্ডকোষ, শুক্রকোষ, প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি এবং অন্যান্য কয়েকটি **গ্রন্থি-নিঃসৃত রস ও শুক্রকীটের সমষ্টি।** অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু শুক্র পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বিদ্যমান। ইহার প্রত্যেকটি প্রায় ১/৫০০ ইঞ্চি লম্বা। কীট-দেহ মস্তক মধ্যভাগ ও লেজ, এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহারা দেখিতে কতকটা বেঙাচির মত। লেজটিই সমস্ত কীটের ৯/১০ ভাগ। শরীরের অনুপাতে বেঙাচির মাথা অপেক্ষা শুক্রকীটের মাথা সরু এবং তাহার লেজ নিজের দেহের অনুপাতে বেঙাচির লেজ অপেক্ষা লম্বা। উপরের চিত্রে শুক্রকীটকে বহুগুণ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

* "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

ইহারা যতক্ষণ অণ্ডকোষ, বা এপিডিডাইমিসে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ উহাদের কোনও জীবনীশক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যখনই উহারা অণ্ডকোষ ও এপিডিডাইমিস হইতে বহির্গত হইয়া শুক্রকোষের দিকে ধাবিত হয়, তখনই উহাদের জীবনীশক্তি ও গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তখনই উহারা পরিপক্ক হয়। উহারা লেজের সাহায্যে চলিয়া থাকে। পুরুষের এক-একবারের স্খলনে গড়ে প্রায় চার ঘন সেন্টিমিটার (চা চামচের প্রায় এক চামচ) পরিমাণ শুক্র বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শুক্রস্খলনে মোটামুটি ২০ হইতে ৫০ কোটি শুক্রকীট বহির্গত হইয়া থাকে।

শুক্রে শুক্রকীটের অবস্থিতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্‌গণ ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না। ইহার আবিষ্কারের ইতিহাস আমরা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

অনেকেরই এইরূপ ধারণা ছিল যে রতিক্রিয়ার সামর্থ্য থাকিলেই মানুষ সন্তান জন্মাইতে পারে। কিন্তু ইহা **সত্য নহে**। যাহাদের শুক্রে বহুল সংখ্যায় সবল কীট বিদ্যমান নাই, তাহাদের শুক্র হইতে সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে না। **আবার পুরুষের শুক্র কিন্তু একাই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না, স্ত্রীর ডিম্বের সহিত শুক্রকীটের সংযোগ হওয়া দরকার।**

পর পৃষ্ঠার চিত্রে শুক্রকীট অণ্ডকোষের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন হইয়া কি করিয়া উপরের দিকে ধাবিত হয় এবং শুক্রকোষে গিয়া সঞ্চিত থাকে তাহা বুঝানো হইয়াছে। শুক্রকোষ হইতে প্রষ্টেট গ্রন্থির ভিতর দিয়া মূত্রনালী বাহিয়া উহারা বীর্যস্খলনের সময় বাহির হইয়া থাকে। শুক্রকীট বিভিন্ন গ্রন্থির রসে ভাসমান অবস্থায় চলে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর ডিম্ব, এই উভয়ের মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

মনে রাখিতে হইবে ঃ—

(১) শুক্রকীট জীবিত এবং সতেজ ;

(২) ইহারা গতিশীল ;

(৩) অনুকূল অবস্থায় ইহারা কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে ;

(৪) ইহারা এত বেশী স্পর্শকাতর যে, যদি কোন তরল পদার্থে কিংবা তাপের মধ্যে উহাদিগকে স্থাপন করা হয় অথবা সঙ্গে সঙ্গে যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় তবে ইহাদের মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয় ;

(৫) ইহারা এত ক্ষুদ্র যে চর্মচক্ষে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৬) ইহারা সংখ্যায় এত বেশী যে, একবিন্দু শুক্রে সহস্র সহস্র এবং এক-বারের স্খলিত বীর্যের মধ্যে ২০ হইতে ৫০ কোটির মত কীট থাকে।
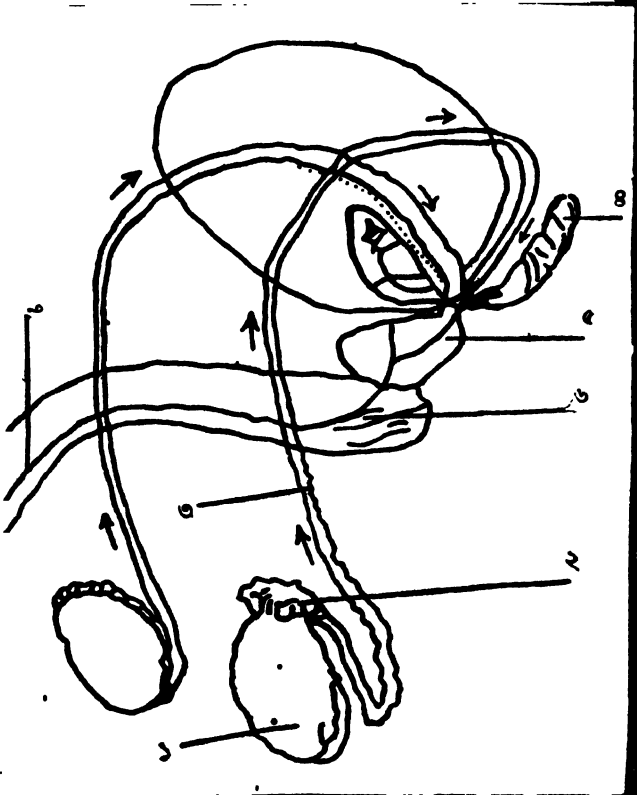
(১৯ নং চিত্র)

১। অণ্ডকোষ ২। এপিডিডাইমিস ৩। শুক্রকীটবাহী শিরা ৪। শুক্রকোষ (২টি ২ দিকে)
৫। প্রষ্টেট গ্রন্থি ৬, ৭। মূত্রনালী।

সংশয়বাদী এ সব উক্তির সত্যতা সহজে মানিতে চাহিবে কি? অদৃশ্য বস্তু নিয়া যাদুকরের খেলা কিংবা কল্পনার সাহায্যে কবিত্বপূর্ণভাবে সংখ্যাকে শত সহস্র গুণ বেশী করিয়া বর্ণনা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া এ সব মনে হইতে পারে। সাধারণ পাঠকের মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন জাগিবে: ধর্মীয় ব্যাপারকে কেন্দ্র

করিয়া যে সব কল্পিত কাহিনী যুগে যুগে বিস্তার লাভ করে কিংবা সুদূর অতীত যুগে মানবসমাজে প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর মতই এইসব **বৈজ্ঞানিক কাহিনী** মাত্র নয় কি ? যাদুকর এবং শাস্ত্রকারদের সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস আমরা পোষণ করিয়া থাকি, বৈজ্ঞানিকদের উক্তি সম্বন্ধেও কি অনুরূপ কুসংস্কারাচ্ছান্ন বিশ্বাস আমাদের মনের কোণে স্থান পাইতেছে না ?

কিন্তু মোটেই তাহা নয়। বিজ্ঞান কেবল **উক্তি করিয়াই** ক্ষান্ত হয় না, সম্ভব হইলে **প্রমাণও** করিয়া থাকে।

আমি আমার জনৈক ডাক্তার বন্ধুর সহযোগিতায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে এ বিষয়ে পরীক্ষা চালাইয়া ইহাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শুক্রকীট পরীক্ষাকালে ২০ ফোঁটা বিশুদ্ধ জলে ১ ফোঁটা এ্যাসেটিক্ এ্যাসিড্ (Acetic Acid) মিশ্রিত তরল পদার্থের মাত্র এক ফোঁটা শুক্রকীটের উপরে ফেলিলে **তৎক্ষণাৎ** তাহারা **সব মরিয়া** যায় একটিও সজীব থাকে না।

বিশুদ্ধ জলে সোডা বাইকার্ব (Soda Bicarb) ফেলিয়া ১-২০ শক্তি ক্ষারজাতীয় (Alkaline) দ্রবণের এক ফোঁটা শুক্রকীটের উপর ফেলিলেও **সমস্ত শুক্রকীট মরিয়া যায়**। সাধারণ জলে **অম্লভাব** থাকিলে তাহার এক ফোঁটাতেও ইহারা মরিয়া যায়।

ঐ এ্যাসিড ও ক্ষারদ্রবণকে ১।১০০ নরম করিয়া পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে উক্ত এ্যাসিডের সংস্পর্শে আসার প্রায় **অর্ধঘণ্টা পরে দুই একটি ছাড়া সব শুক্রকীটই মরিয়া যায়**। কিন্তু ক্ষারদ্রবণে **একটিও মরে না**।

টেষ্ট-টিউবের মধ্যে এই শুক্রকীটগুলি ২৪ ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল। সকল গুলিই এক সঙ্গে মরে নাই; কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। কঠিন টেষ্ট-টিউবের বাহিরে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে হয়ত ইহারা আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিত।

যৌনমিলন ও গর্ভাধান

যৌনমিলন

ডিম্ব এবং শুক্রকীটের একত্র হইবার সুযোগ হয় নারী পুরুষের যৌনমিলনে। পূর্ণাঙ্গ মিলনের উপরেই দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যৌনবোধ দৈহিক এবং মানসিক। উভয় দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলা যায়, মনে লালসার উদ্রেক ও ভোগের চিন্তার ফলে সুপ্ত যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং ঐ বাসনা তৃপ্ত করিতে দেহের প্রয়োজন হয়।

মিলনকে পূর্ণতর এবং সুন্দরতর করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিবিড় সহযোগিতা দরকার। সুকৌশলে সম্পন্ন রতিক্রিয়া উভয়কে পরম আনন্দ দান করে।

পুরুষের শুক্রস্খলনই তাহার চরম-পুলক-লাভের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। **স্ত্রীর চরম মুহূর্তের চিহ্ন** * তত সুস্পষ্ট নহে বলিয়া অনেক সময়ে সহানুভূতিসম্পন্ন স্বামীও এ বিষয়ে অজ্ঞ ও অচেতন থাকেন। সাধারণ লোক তো এ বিষয়ে বেশীর ভাগই উদাসীন থাকে।

সখ্যতাসম্পন্ন দম্পতির চরম-পুলক-লাভের লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয় না। তাহাদের মনোভাবের **অসঙ্কোচ আদান প্রদান** সর্ববিষয়েই করা উচিত—এ বিষয়েও বটে।

যাহা হউক **পূর্ণাঙ্গ** মিলনেই শুক্রকীট ও ডিম্বের একত্র হইবার সুযোগ বেশী হয়। নারীর পুলকাবেগ লাভ হইলে জরায়ুর সঙ্কোচন-প্রসারণে শুক্রকীটগুলি **ঊর্ধ্বে নীত হইতে পারে** এবং এই হেতু সহজে গর্ভাধান সম্পন্ন হইতে পারে। উভয়ের চরমতৃপ্তি একই সময়ে হইলে জরায়ুর মুখ খোলার সময় শুক্র পিচকারীর বেগে একেবারে জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাতে গর্ভ হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

* আমার যৌনবিজ্ঞান ২য় খণ্ডে ইহার [illegible]াবলী বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে।

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, নারীর পুলকাবেগের সহিত গর্ভাধানের এই সামান্য মাত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে। পুলকাবেগ নারীর দৈহিক এবং মানসিক পরিতৃপ্তিদায়ক। নারীর একান্ত অনিচ্ছায়, এমন কি ধর্ষিতা নারীর একান্ত অসম্পূর্ণ মিলনেও গর্ভাধান হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে।*

গর্ভাধানের জন্য কেবলমাত্র যোনি পথে যথেষ্ট সংখ্যক সক্রিয় শুক্রকীটের আবশ্যক। মিলনের সম্পূর্ণতার উপর স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক, মানসিক তৃপ্তি, ও স্বাস্থ্যোন্নতিই কেবলমাত্র নির্ভর করে।

নারীর চরম-তৃপ্তি না হইলে গর্ভাধান হইতে পারে না, এই ভুল ধারণাবশত অনেক ক্ষেত্রে নারী মিলনের সময়ও উদাসীন থাকিয়া গর্ভাধান এড়াইতে চায়। ইহা অতিশয় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ ইহাতে মিলনের আনন্দ হইতে শুধু শুধু বঞ্চিতই হইতে হয়। এইরূপে গর্ভাধান এড়ানো যায় না।

গর্ভাধান

প্রত্যেক নারীর সাধারণত প্রায় প্রতি ২৮ দিনে একটিমাত্র ডিম্বস্খলন হইয়া থাকে। ডিম্ব ও শুক্রকীট-স্খলনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুরুষের শুক্রকীট যৌন-আবেগের সময় শুক্রের সহিত নিঃসারিত হইয়া থাকে; কিন্তু নারীর ডিম্বস্খলনের সহিত রতিক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ডিম্বকোষস্থ যে ডিম্বটি যখন পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট হয় তখনই সেই ডিম্বটি ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর দিয়া আসিয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে।

পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুমুখে পতিত হইলে শুক্রকীটগুলি লেজ নাড়িয়া চলিতে চলিতে জরায়ুতে প্রবেশ করে। সাধারণত উক্ত নলের (খুব কম ক্ষেত্রে জরায়ুর) মধ্যে শুক্রকীট ডিম্বের সহিত মিলিত হইলেই গর্ভাধান হয়।

এই গর্ভাধান নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শুক্রকীট কি করিয়া জরায়ু এবং ফ্যালোপিয়ান নলে বিচরণ করিতে থাকে ১৩ নং চিত্রে তাহাও দেখানো হইয়াছে।

শুক্রকীট ও ডিম্বের সাক্ষাৎ হইলেই শুক্রকীটগুলি ডিম্বকে ঘিরিয়া ফেলে। এই সমস্ত শুক্রকীটের মধ্যে সর্বাগ্রগামী শুক্রকীট ডিম্বগাত্রে সজোরে মাথা ঠুকিয়া একটু গর্তের সৃষ্টি করে এবং এই গর্ত ক্রমশ বড় করিয়া ডিম্বের ভিতর তাহার মস্তক ও গ্রীবা প্রবেশ করায়, কীটের মধ্যভাগ ও লম্বা লেজটি কিন্তু

* আমার 'যৌনবিজ্ঞান' ২য় খণ্ডে দাম্পত্য মিলন সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

বাহিরেই থাকিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ঐ মধ্যভাগ ও লেজটি নিস্তেজ ও অচল হইয়া লোপ পায়। এই সংযোগ হইয়া গেলেই ডিম্বের চারিদিকে একটি আবরণ জন্মায়, ফলে অন্য শুক্রকীট আর উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না।

নিম্নের চিত্রে শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনের প্রতিকৃতি দেখানো হইয়াছে; উভয়েই **বহুগুণ বর্দ্ধিত** আকারের।

মনে রাখিতে হইবে এপর্যন্ত ডিম্বের প্রাণবন্ত হওয়ার প্রকৃত দৃশ্য কেহ দেখিতে পায় নাই। ১১ দিনের ভ্রূণের আকার দেখা গিয়া এবং তাহাও মাত্র বিন্দুর মত ছিল! তবে অন্যান্য জীব শরীরের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে **মানুষের বেলায়ও এমনতরই হয়।**

(২০ নং চিত্র)

১। ডিম্বে প্রবেশোদ্যত শুক্রকীট
২। ডিম্বে প্রবিষ্ট শুক্রকীট
৩। ডিম্বের বহিরাবরণ
৪। ডিম্বের অন্তরভাগ
৫। নিউক্লিয়াস
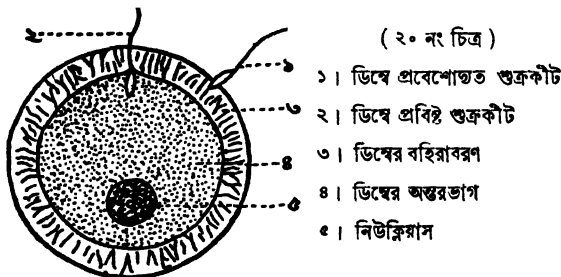
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রকীটের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে শুক্রকীটের গতি দ্রুত এবং চঞ্চল এবং এই গতি লক্ষ্যহীন ও বিভিন্ন দিকে অর্থাৎ উপরে, নিম্নে এবং চক্রাকারে হইয়া থাকে।

প্রসব পথে সঞ্চিত শুক্রকীটসমূহ কোন্ শক্তিবলে চালিত হইয়া জরায়ুমুখের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আরও উপরে চলিয়া যায়? ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কারণসমূহ উল্লেখ করা যায়ঃ—

(১) অভ্যন্তরস্থ ডিম্ব এমন কি স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষদ্বয়ও শুক্রকীটকে আকর্ষণ করিতে পারে। ইহা রাসায়নিক আকর্ষণ।

প্রজনন-ক্রিয়ার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ডিম্ব ও শুক্রকীটের মধ্যে একটি **স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি** বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইরূপ আকর্ষণ যে আছে তাহা পরীক্ষাগারেও লক্ষ্য করা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, শুক্রকীট এক টুকরা কাঁচের উপর শুক্র-রসে ভাসিয়া বেড়ায় ও এদিক ওদিক চলিতে থাকে। নর বা নারীর শরীরের অন্য কোনও অংশ উহাদের সন্নিকটে রাখিয়া দিলে উহাদের গতিবিধির কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু নারীর জরায়ু বা ডিম্বকোষের খানিকটা রাখিলে তাহার দিকে উহারা চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত ধাবিত হয়।

অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, শুক্রকীট ডিম্বের দিকে এমন সবলে আকৃষ্ট হয় যে, শুক্রকীট জরায়ুর মধ্যে ডিম্বের সাক্ষাৎ না পাইলে ডিম্বের সন্ধানে ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানেও ডিম্বের সন্ধান না পাইলে আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ডিম্ববাহী নলের অপর প্রান্তে বস্তি-কোটরে গিয়া উপস্থিত হয়।

(২) কোটি কোটি শুক্রকীট যতটুকু স্থান পায় তাহাতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া কতকগুলির উপরে চলিয়া যাওয়াটা অস্বাভাবিক নহে।

(৩) নারীর চরমপুলকের সময় জরায়ুর মুখ পর পর দ্রুত খোলা ও বন্ধ হওয়া জনিত আকর্ষণ (suction)।

(৪) যোনিপথের স্বাভাবিক সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে শুক্রকীটসমূহ বহির্ভাগে কিংবা ঊর্ধ্বদেশে—উভয়দিকেই উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে।

উপরে উল্লিখিত সমুদয় বা তন্মধ্যে কতকগুলি কারণেই শুক্রকীট জরায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বদিকে গমন করিয়া থাকে।

উদ্ভিদজগতে গর্ভসংযোগ

উদ্ভিদ্‌জগতে পুষ্পরেণু কি করিয়া লম্বা আঁশ ফেলিয়া স্ত্রী-স্তবকের সারাটা দেহপথ অতিক্রম করিয়া নীচে ডিম্বকগুলিকে প্রাণবন্ত করে তাহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। পাঠক-পাঠিকারা এই ব্যবস্থার বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়েই পাইয়াছেন।

এখানে আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শুক্রকীটের মত পুষ্পরেণু গতিশীল নয় তবুও ইহা কি করিয়া ডিম্বের সন্ধানে ঠিকমত 'পা বাড়ায়'?

ডিম্বের প্রতি পুষ্পরেণুর **রাসায়নিক আকর্ষণই** এই সংযোগে সাহায্য করে বলিয়া বিশ্বাস।

নারীর গর্ভাধান

পূর্বোক্তরূপে শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন হইয়া গেলেই ডিম্বটি উর্বর এবং প্রাণবন্ত হইয়া নিজ হইতে বিভক্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে ফ্যালোপিয়ান নল দিয়া জরায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ে। জরায়ুর মধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় গাত্রে উহা প্রোথিত হইয়া যায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

গর্ভাধানের পর্যায় এবার আরম্ভ হইল। **পরবর্তী** অধ্যায়ে উহার বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

মনে রাখিতে হইবে যে, জরায়ু গাত্রের অনুপযুক্ততা বা অন্য কোন কারণের দরুন যথা সিফিলিসের বিষের জন্য ডিম্বটি জরায়ুর মধ্যে টিকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে ও অনেক ক্ষেত্রে যায়। তাহা হইলে আর গর্ভাধান হয় না।

আণুবীক্ষণিক এক-কোষ-বিশিষ্ট জীব এবং গাছপালার মধ্যেও যৌন-মিলনের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই মিলনের প্রক্রিয়া সকল ক্ষেত্রে একরূপ নয়। উচ্চতর শ্রেণীর জীবের মধ্যে যে মিলনের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সার কথা এই যে, নূতন জীব সৃষ্টি ব্যাপারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জনন-কোষ (sex cells) মিশিয়া ভিন্ন এক বস্তুতে পরিণত না হইলে বংশবৃদ্ধি ঘটে না। এই কোষ দুই জাতীয়ঃ—(১) পুরুষের শুক্রকীট এবং (২) স্ত্রীর ডিম্ব। যৌন-মিলন উচ্চস্তরের জীবের বংশবৃদ্ধির অন্যতম উপায়। ক্রমবিবর্তনের ইহা এক পরিণতি।

প্রজননের ব্যর্থতা—বন্ধ্যাত্ব-প্রতিকার

(Sterility and its cure)

গর্ভাধান সঙ্গমের ফল—বিবাহের চরম সাফল্য

নারী ও পুরুষের মধ্যে **বিবাহের ফলের** দিক হইতে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিগুমান রহিয়াছে, তাহা সন্তানের জন্ম। নারী-পুরুষ হয়ত বা সমান পুলকে, সমান উৎসাহে সহবাস করিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শুক্রস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়। কিন্তু গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর দায়িত্ব প্রকৃত পক্ষে **আরম্ভ** হয় মাত্র।

মানসিক পরিস্থিতির দিক হইতেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পুরুষ প্রিয়তমাকে তাহার প্রণয়িনী স্ত্রীরূপে পাইতে চায়। আর নারী চায় তাহার প্রিয়তমকে নিজের সন্তানের পিতারূপে পাইতে। পুরুষের অন্তরে সাধারণত **পিতৃত্ব সন্তর্পণে আত্মগোপন** করিয়া থাকে; নিজের ঔরস-জাত সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার পূর্বে সে সেই পিতৃত্বের বিশেষ সন্ধানই রাখে না। কিন্তু নারীর **মাতৃত্ব** অর্ধ-জাগ্রত হয় তখনই—যখন সে শৈশবে পুতুল লইয়া খেলা করে।

অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে হয় না তাহা নহে। এমন অনেক নারী আছে, যাহাদের মধ্যে মাতৃত্ব-বোধ অতিশয় অল্প এবং এমন অনেক পুরুষও আছে যাহারা সন্তানের অস্তিত্ব ব্যতীত বিবাহের কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে, ব্যতিক্রম মাত্র। নারী-ও পুরুষ-মনোবৃত্তিতে এই পার্থক্যের দৈহিক কারণ আছে। **পিতৃত্ব** একটি **আকস্মিক** ব্যাপার মাত্র। কিন্তু **মাতৃত্ব আকস্মিক** নহে—গর্ভিণী অবস্থায় ও সন্তানের নাবালক অবস্থা পর্যন্ত নারীকে দীর্ঘ দিন ধরিয়া মাতৃত্বের সাধনা অর্থাৎ বিশেষ কষ্ট সহকারে শিশুর দেহ পোষণ এবং তাহাকে লালন-পালন করিতে হয়।

মাতৃস্থানীয়া নারীজাতি তাই অবজ্ঞার পাত্র নহে; ভক্তির পাত্র। প্রত্যেক নর ও নারীকে সারাজীবন তাই মায়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে হয়, বলিতে হয়,

"মা, মা! তোমার আত্মদানের নিদর্শন এই সন্তানের ভক্তিমাল্য গ্রহণ কর; স্নেহময়ী, করুণারূপিণী,—তুমি নিজের রক্ত দিয়া আমার রক্ত, নিজের অস্থি দিয়া আমার অস্থি, নিজের জীবন দিয়া আমার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছ।"

সন্তান লাভ পুরুষের অপেক্ষা নারীর পক্ষে অনেক বেশী আনন্দপ্রদ সত্য; কিন্তু উহা তাহার পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। সন্তান ধারণে, প্রসবে ও পালনে প্রসূতিকে তাহার জীবনী শক্তির কিছুটা ব্যয় করিয়া অনেক ক্ষেত্রে কষ্ট পাইতে হয় এমন কি মৃত্যুবরণও করিতে হয়। নারীকে যে কি ভাবে আত্মদানের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, সে কথা সকলেরই জানা আছে। তবু নারীর মাতৃত্ব সাধ এত তীব্র যে, অধিকাংশ নারী বিবাহ-জীবনের দু-চার বৎসরের মধ্যে মাতৃত্ব লাভ করিতে না পারিলে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে।

পুরুষের দিক হইতেও পিতৃত্বই আদর্শ হওয়া উচিত। কারণ, পুরুষকেও আত্ম-বিকাশ লাভ করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে যে সৃষ্টি-ক্ষুধা লুক্কায়িত আছে তাহার সাফল্য আত্ম-বিকাশে, সন্তান-সৃষ্টিতে। তাহা ছাড়া মানুষের আদর্শ আত্মকেন্দ্রী সুখ নহে। সন্তান মানুষকে যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও সাধনার সম্মুখীন করে, মানব-জীবনের সার্থকতা সেই দায়িত্ববহনে, সেই কর্তব্যপালনে এবং সেই সাধনার সফলতায়। সন্তানপ্রেমের ভিতর দিয়াই মানুষের বিশ্ব-প্রেমের দীক্ষা হইয়া থাকে। সুতরাং **সন্তান জন্মদানেই** দাম্পত্য-জীবনের চরম সাফল্য।

* * * *

বন্ধ্যত্ব

নির্দোষ ও নীরোগ দম্পতির মিলনে সন্তান জন্মলাভ করিবেই, ইহা সাধারণ কথা, প্রকৃতির নির্দিষ্ট আইন। তবু অনেক বাহ্যত সুস্থ দম্পতির যৌন-মিলন যে নিষ্ফল হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ তাহারা বাহ্যত সুস্থ হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের উভয়ে অথবা একজন নিশ্চয়ই অসুস্থ। কোনও মতে শতকরা ১০টি কোনও মতে ১৭ টি দম্পতি নিঃসন্তান থাকেন। "বিয়ে করলেই পুত্র-কন্যা আসে যেমন প্রবল বন্যা" এটিও যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, নিঃসন্তান বিবাহও তেমনই বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং বন্ধ্যত্বকে অদৃষ্টের লেখা না ভাবিয়া উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

সন্তান না হওয়ার সমস্ত দোষ নারীর ঘাড়ে চাপাইয়া পুরুষ নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষ অজ্ঞতা এবং কোনও

কোনও ক্ষেত্রে চাতুরীর পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার কোনও চেষ্টা করিতেছে না।

অথচ প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে এই বন্ধ্যত্বের জন্য দায়ী **পুরুষ**। আমাদের অজ্ঞতা ও বর্তমান সামাজিক-মনোবৃত্তি অনুসারে বন্ধ্যত্বের জন্য প্রধানত নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য নারী যতটা যাতনা বোধ করে, পুরুষ ততটা করে না।

পুরুষের দোষেও যে বহুক্ষেত্রে দম্পতি নিঃসন্তান হয় একথা জানিয়া উহার প্রতিকার করা উচিত।

পুরুষত্বহীনতা

পুরুষত্বহীনতার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা বলিব: **পুরুষত্ব-হীনতা** দুই প্রকারের—(১) **আঙ্গিক অপারগতা**, অর্থাৎ লিঙ্গের উত্থান শক্তি হীনতা বা **ধ্বজভঙ্গ** এবং (২) আঙ্গিক-ক্ষমতা সত্ত্বেও **সন্তানোৎপাদনে অক্ষমতা** বা বন্ধ্যত্ব।

সঙ্গমের চারিটি স্তর—(ক) সঙ্গমেচ্ছার উদ্রেক; (খ) পুরুষাঙ্গের দৃঢ়তা-প্রাপ্তি ও নারীদেহে প্রবেশ; (গ) শুক্রনিঃসারণ; এবং (ঘ) উভয়ের চরমানন্দ লাভ।

প্রথম তিনটির মধ্যে যে কোনও একটি প্রক্রিয়ার গোলমাল হইয়া আনুষঙ্গিক পুরুষত্বহীনতার সূচনা হইতে পারে।

(১) ধ্বজভঙ্গ বা আঙ্গিক অপারগতা

(ক) স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমেচ্ছা জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যৌনবোধ-বিকাশে সাহায্যকারী (পুরুষের এ্যাণ্ডোজেন ও নারীর এষ্ট্রোজেন) হরমোন প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। তৃষ্ণা বা ক্ষুধাহীন মানুষ যেমন আমরা কল্পনা করিতে পারি না, উক্ত হরমোনদ্বয়ের ক্রিয়াবশত সঙ্গমেচ্ছা উদ্রিক্তহীন মানুষও তদ্রূপ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু কদাচিৎ হয়ত কোনও কারণে উক্ত **ইচ্ছা বিলুপ্ত** হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যৌন-মিলন এবং স্বাভাবিক উপায়ে সন্তানোৎপাদন অসম্ভব।

স্নায়বিক পুরুষত্বহীনতা খুবই জটিল অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কারণেই ধ্বজভঙ্গ হয়। ইহার কারণ হয়ত অতি সামান্য কিন্তু পুরুষের মনে ইহাতে

স্বভাবত দারুণ দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। যাহাদের মেজাজ ভয়ানক খুঁতখুঁতে তাহারা যদি ঘটনাক্রমে কোন নোংরা, দুর্গন্ধ (সাথীর মুখে, দেহে বিছানায় বা ঘরে) অথবা অসুন্দর পরিবেষ্টনের মধ্যে বা ভয়ে ভয়ে বিহারে প্রবৃত্ত হইতে চায় তবে উহাতে কৃতকার্য হয় না। এরূপ পুরুষত্বহীনতা সম্পূর্ণ **সাময়িক** এবং **মানসিক** ব্যাপার।

পুরুষত্বহীনতা **অনেক ক্ষেত্রেই** একান্ত **মানসিক** ব্যাপার। কোনও কারণে (যথা, আত্মরতির মিথ্যা কুফল শুনিয়া অথবা পড়িয়া) যদি কাহারও মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে তাহার লিঙ্গ উত্থানক্ষম নহে তবে তাহাকে শীঘ্রই পুরুষত্বহীনতা পাইয়া বসে। বিবাহের পর প্রথম মিলন রাত্রে একবার নাকি একজন সুস্থদেহ যুবা স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে অক্ষম হয়। স্ত্রী বিরক্তিভরে স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করে। ফলে ঐ যুবা লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দ্বিধা, উৎকণ্ঠা, সংশয়, সঙ্কোচ, ও দুশ্চিন্তা বশত সম্পূর্ণরূপে যৌন-মিলনে অক্ষম হইয়া পড়ে—অবশ্য পত্নীরই সঙ্গে। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে এই সব ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতা মানসিক ব্যাপার। অবচেতন মনে কোনও অতি নিকট আত্মীয়ার প্রতি আসক্তি থাকিলেও স্ত্রীর সহিত যৌনক্রিয়ায় পুরুষ অসমর্থ হইয়া পড়ে।

আপন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমক্ষম অনেক পুরুষ বারবনিতা বা অন্য কাহারও সঙ্গে প্রথম প্রথম যৌন-মিলনে অক্ষম হইয়া পড়িতে পারে। কারণ, বিবাহেতর যৌন-মিলন যে নিতান্ত গর্হিত কার্য এই ধারণা অথবা রতিজ রোগের বা ধরা পড়িবার ভয় তাহার লালসা চরিতার্থ করিবার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ বিবাহের পূর্বে পরস্ত্রী অথবা পণ্যাস্ত্রী গমন করিবার জন্য নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া লজ্জিত ও কুণ্ঠিত থাকিলে স্ত্রীর সহিত যৌনমিলনে পুরুষের অক্ষমতা আসিতে পারে।

নীতিজ্ঞান ব্যতীত সঙ্গমে লিপ্ত থাকিবার বেলায় পাছে অন্য কেহ দেখিয়া ফেলে কিংবা সেখানে হঠাৎ কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, এই দুর্নামের কিংবা রোগ সংক্রমণের ভয়, শৈশবে মাতা বা মাতৃ স্থানীয়া কাহারও প্রতি নির্জ্ঞান মনে কাম লিপ্সা, শৈশবে কোন যৌন ব্যাপার দেখিয়া, অথবা কোনও কামুক বা কামুকীর দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া, ভয় ও ঘৃণায় অভিভূত হওয়া, বাল্যে কোনও যৌন-ক্রিয়ার জন্য ভীষণ শাস্তি পাওয়া—ইত্যাদি কারণেও পুরুষত্ব-হীনতার লক্ষণ (এবং ত্বরিৎস্খলন) প্রকাশ পাইতে পারে। বিবাহের পূর্বে

সমকামিতার (পুং মৈথুনের) অভ্যাস থাকিলেও পুরুষ স্ত্রীর সহিত যৌনক্রিয়ায় অশক্ত হইয়া পড়িতে পারে।

প্রতিকার

মানসিক—পুরুষত্বহীনতা ও দ্রুতস্খলন পীড়াদায়ক ও গ্লানিকর হইলেও উহা সাধারণত **সাময়িক** এবং উহার দূরীকরণ সম্ভবপর। এইসকল ক্ষেত্রে পুরুষের নিজের অপারগতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা বা ভয়, লজ্জা ও কুণ্ঠা দূর করিতে হয়। তাহার অক্ষমতার কারণ বিশ্লেষণ ও দূর করিয়া সমক্ষমতায় আস্থা স্থাপন করাইতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় (Pshycho-therapy) এ বিষয়ে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

(খ) **পুরুষাঙ্গের দৃঢ়তার অভাবজনিত পুরুষত্বহীনতা**—(১) আংশিক এবং (২) পূর্ণ—দুই-ই হইতে পারে। সাধারণত মানসিক কারণে আংশিক ও সাময়িক পুরুষত্বহীনতা ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কোনও কোনও সময় হয়ত মিলন সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু পুরুষত্বহীনতা কোনও **দৈহিক বিকল্পের** দরুনই ঘটিয়া থাকে।

ইহার মধ্যে জন্মগত কারণ, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন জননেন্দ্রিয়সমূহের বৈকল্য এবং নির্ণালী ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের মধ্যে কোনওটির রসক্ষরণের বৈলক্ষণ্য উল্লেখযোগ্য। তবে খুব কদাচিৎ এইরূপ হইয়া থাকে।

পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, বহুমূত্র, যক্ষ্মা, দেহে অতিমাত্রায় মেদ সঞ্চয়, অত্যধিক মাদক দ্রব্য সেবনে কিংবা অন্যান্য সাংঘাতিক পীড়ার আক্রমণ ইত্যাদি **নানা কারণে** আংশিক বা পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ ঘটে।

(গ) রতিজ রোগ নিবারণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা না করিয়া, অপর নারী (শুধু গণিকাই নয়) গমনের ফলে, তাহাদের মধ্যে কোনওটি হইলে, যদি শীঘ্র আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যথোচিত চিকিৎসা না করানো হয়, তাহা হইলে, গণোরিয়ার ফলে নর ও নারীর বন্ধ্যত্ব এবং সিফিলিসের ফলে নারীর পুনঃপুনঃ গর্ভস্রাব এবং মৃতবৎসা দোষ ঘটিতে পারে। (এই দুই রোগের প্রতিষেধ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ আমার যৌনবিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে আছে)।

(ঘ) যাহারা **অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর** তাহাদের **অতি শীঘ্র** বা স্ত্রীলোক **স্পর্শমাত্রই রেতঃপাত** হইয়া থাকে। কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলনের জন্য **একান্ত উন্মুখ** এবং বহুক্ষণ ধরিয়া উত্তেজিত পুরুষের তাহাকে স্পর্শ মাত্রই

অথবা সংযোগের পরক্ষণেই রেতঃপাত হইয়া যাইতে পারে। বহুক্ষণ যাবৎ কামক্রীড়ার পর সঙ্গমেও এইরূপ হইতে পারে।

ভয়, নীতিজ্ঞান, প্রতিকূল আবেষ্টনী ইত্যাদির জন্যও এইরূপ হইতে পারে। যে যে কারণে পুরুষাঙ্গ ইচ্ছামত দৃঢ়তাসম্পন্ন হইতে পারে না, ঐ সব কারণেও উহার দৃঢ়তা সত্ত্বেও স্পর্শমাত্রই রেতঃপাত হইতে পারে।* দৈবাৎ একবার এইরূপ হইলে অনেকে মনে করে যে তাহারা পুরুষত্বহীন। এই দুর্ভাবনাই তাহাদিগকে বাস্তবিকই ঐরূপ করিয়া তুলে। এই অবস্থার প্রতিকার কি করিয়া হইতে পারে তাহা আমার যৌনবিজ্ঞান ২য় খণ্ডের 'দাম্পত্য মিলনে প্রধান প্রধান সমস্যা' অধ্যায়ের 'রতিকালের স্থায়িত্ব' অনুচ্ছেদে 'রতিশক্তি সাধনায় শারীরিক কৌশল' এবং 'যৌন ক্ষমতায় বিশৃঙ্খল' শীর্ষক দুই অধ্যায়েও আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ হইলে আর স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ে উপযুক্তভাবে শুক্রকীট প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহা হইলে সন্তানোৎপাদন ব্যাহত হয়।

(২) সন্তানোৎপাদনে অক্ষমতা

সহজাত ব্যাধি কিংবা অঙ্গ-বৈকল্য জনিত পুরুষত্বহীনতায় পুরুষের মোটেই রেতঃপাত না হইতে পারে। রেতঃপাত মোটেই না হইলে উহাকে শুক্রহীনতা (Aspermia) বলে। অথবা উহা বহুক্ষণ পরে বা অতি অল্প পরিমাণে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সহবাস সুন্দরভাবেই হইয়া থাকে কিন্তু শুক্রকীট স্ত্রী অঙ্গের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও যথাযোগ্য আসন ও কৌশল গ্রহণ করিলে শুক্রকীট নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া গর্ভাধান সম্ভবপর। (†)

শুক্রের অপ্রাচুর্য না ঘটিলেও উহার কোন দোষ থাকিতে পারে। শুক্রে যদি শুক্রকীট না থাকে (Azoospermia) কিংবা শুক্রকীটের জীবনীশক্তি যদি এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে স্ত্রীর ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্বেই

* মনে রাখিতে হইবে যে, উত্তেজনার সময়ে যে বর্ণহীন চটচটে রস অল্প ক্ষরণ হইয়া লিঙ্গমুণ্ড পিচ্ছিল করে তাহা বীর্য নয়। নারী পুরুষ উভয়েরই (সঙ্গমকে সুগম করিবার জন্য) এইরূপ রস-ক্ষরণ হইয়া থাকে। ইহাতে মিলনের স্পৃহা বাড়ে বৈ কমে না। রেতঃপাত হইলে প্রকৃত শুক্র বাহির হয়। তাহার পরে কতকক্ষণ আর মিলনের স্পৃহা থাকে না।

(†) মিলনে এরূপ আসন ও কৌশল সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ আমার অন্য পুস্তক 'যৌন-বিজ্ঞান' এর ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

উহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিংবা যদি শুক্রকীট জীবনীশক্তি এবং গতিশীলতা-বিহীন হয় (Oligozoospermia) অথবা ১৬ কোটিরও কম বাহির হয় তবে সন্তানোৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

এই সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞ **চিকিৎসকের পরামর্শ** লওয়া একান্ত কর্তব্য।

চিকিৎসকগণও কিন্তু অনেক সময়ে শুক্র বিশ্লেষণ করিয়া সঠিকভাবে উহার দোষ ত্রুটির বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। প্রত্যেকবার একই ব্যক্তি হইতে একই প্রকার শুক্রপাত হয় না। নানা কারণে শুক্র বিভিন্ন সময়ে **বিভিন্নধর্মী** হইতে পারে। আবার শুক্রের রাসায়নিক প্রকৃতি স্ত্রীযোনি-নিঃসৃত রসের সংস্পর্শেও রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে। তাই পরীক্ষার জন্য, স্বামীর বীর্য আলাদা না লইয়া সহবাসের পর স্ত্রীর দেহ-মধ্য হইতে লওয়াই ভাল। একবার পরীক্ষা করিয়াই যদি শুক্রের কোনও দোষ ধরা পড়ে তবে ঐ জন্যই উক্ত ব্যক্তিকে পুরুষত্বহীন বলিয়া ঘোষণা করা নিরাপদ নহে।

আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব, নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক সর্তগুলি পূর্ণ হইলেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ঃ—

(১) ডিম্বকোষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক,

(২) ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর দিয়া ডিম্ব আসিবার মত ঐ নলের স্বাভাবিক অবস্থা ;

(৩) পুরুষের সতেজ শুক্রকীট ;

(৪) উক্ত ডিম্ব ও শুক্রকীটের সম্মিলন এবং

(৫) নারীর জরায়ু সন্তান-ধারণে সক্ষম।

নারীর বন্ধ্যাত্ব

নারী বন্ধ্যা হইতে পারে নানা কারণে। যথা ঃ—

(১) **যৌন-অঙ্গের জন্মগত কু-গঠন (Congenital defect)**। যথা ঃ

(ক) যোনিপথ একেবারেই না থাকা বা অসম্পূর্ণভাবে থাকা। অথবা পর্দাদ্বারা যোনিপথ সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকা।

(খ) **জরায়ুর** অনস্তিত্ব অথবা জরায়ুর ভ্রূণ সুলভ অবস্থা।

(গ) **ফ্যালোপিয়ান নলের** অনস্তিত্ব, আংশিক পরিণত অথবা নলের কোনও এক স্থানে বন্ধ থাকা।

উপরোক্ত যে কোনও কারণে বন্ধ্যাত্ব হইলে প্রতিকার প্রায়ই অসম্ভব।

(২) **অপেক্ষাকৃত অল্প কুগঠনের জন্য বন্ধ্যাত্ব** যথা :—

(ক) নিশ্ছিদ্র বা শক্ত সতীচ্ছদ। ইহাতে পূর্ণ স্বামী সহবাস সম্ভব হয় না। (শতকরা ৩।৪ ক্ষেত্রে বিবাহিতাদের মধ্যে অক্ষত সতীচ্ছদ দেখা যায়।)

(খ) লম্বা ও কোণাকৃতি (Conical) **জরায়ুগ্রীবা,** একটি আলপিন মাত্র যাইতে পারে এরূপ **জরায়ুমুখ** অথবা **জরায়ু** সম্মুখভাগে বেশীরকম **বাঁকিয়া** থাকা (Acute antiflexion)। মনে রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত বিকৃতি জরায়ুর শিশুসুলভ অবস্থারই (Infantile uterus) পরিচায়ক। জরায়ুর এই অবস্থা বজায় থাকিলে শুধু জরায়ুর অপুষ্টতার জন্যই বন্ধ্যাত্ব হইতে পারে।

অস্ত্রোপচারে ও উপযুক্ত চিকিৎসায় এই অবস্থাগুলির প্রতিকার সম্ভবপর।

(৩) **জরায়ুমুখ যদি যোনি-নালীর ঠিক সম্মুখে না থাকিয়া এদিক ওদিক অবস্থিত থাকে** তবে কখনও কখনও শুক্রকীট জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে প্রজনন-কার্যের অসুবিধা হইয়া থাকে। পুরুষের শুক্রস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই নারী যদি পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া উপুড় হইয়া কয়েক ঘণ্টা শুইয়া থাকে, তবে জরায়ু যোনি-নালীর অধিকতর সন্নিকট হওয়ায় জরায়ু-মুখ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। আরও আসনের বিবরণ পরবর্তী 'বন্ধ্যত্বের প্রতিকার' অনুচ্ছেদে দেখুন।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি নানা প্রকার হইতে পারে। অনেক সময় স্থানচ্যুতি সত্ত্বেও গর্ভাধান হইলে গর্ভপাত হইয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া ইহার প্রতিকার করা উচিত।

প্রস্রাব চাপিয়া রাখা মেয়েদের একটি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস। এই বদভ্যাসের ফলে উপরিস্থিত মূত্রাশয়ের চাপে জরায়ুর পারিপার্শ্বিক বন্ধনীসমূহের শিথিলতা ঘটে এবং **জরায়ু নীচে নামিয়া আসিতে বা স্থানচ্যুত হইতে পারে** (২১ নং চিত্র)। মেয়েদের উপদেশ দিয়া এই **কু-অভ্যাস হইতে মুক্ত করা উচিত।**

জরায়ুর স্থানচ্যুতি—প্রথম হইতেই বন্ধ্যা এইরূপ অনেক নারীর **জরায়ু পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া** পড়া অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় (২৩ ও ২৪ নং চিত্র)। অনেক ক্ষেত্রে **পুনঃপুনঃ গর্ভপাতের** ইহাই **কারণ।** জন্মগত গুরুতর স্থানচ্যুতি (Congentital acute retroversion) ও অপুষ্টতার জন্য বন্ধ্যাত্ব হওয়া স্বাভাবিক। অধিক বয়সে কোনও কারণে জরায়ু পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়া সত্ত্বেও যদি ফ্যালোপিয়ান নল দুইটি কোনরূপে বন্ধ না

হইয়া থাকে—তবে তাহাদের যে কেন বন্ধ্যাত্ব হইবে বুঝা কঠিন। তবে অনেক বন্ধ্যা নারীর জরায়ু অপারেশন দ্বারা (Gilliam's operation or its modification) স্বস্থানে ফিরাইয়া এবং বিশেষ প্রকার পেসারি দ্বারা আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করাতে সন্তান সম্ভাবনা হইতে দেখা গিয়াছে। কাজেই জরায়ু পশ্চাতে হেলিয়া পড়িলেই বন্ধ্যাত্ব হইতে পারে বলিয়া ধরা যায়।

২১ নং চিত্র—জরায়ুর নীচে নামা।

২২ নং চিত্র—জরায়ুতে অর্বুদ হওয়া।
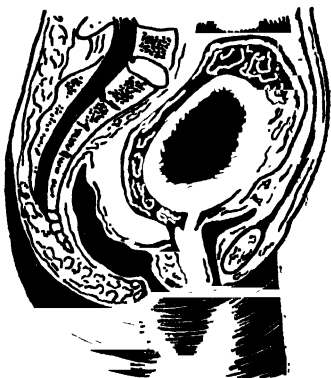
৪। **ফ্যালোপিয়ান নলের প্রদাহ** (Salpingitis)—বন্ধ্যাত্বের ইহা একটি অতি সাধারণ কারণ। অনেক ক্ষেত্রে শুধু এই কারণেই বন্ধ্যাত্ব হইয়া
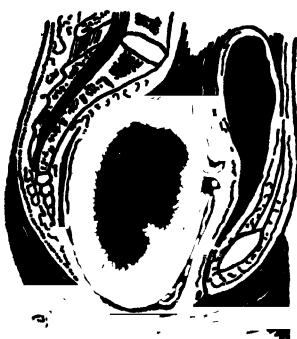
২৩ ও ২৪ নং চিত্র—জরায়ুর পিছনে হেলিয়া পড়া।

থাকে। বেশ্যাদের বন্ধ্যাত্বের ইহা একটি মুখ্য কারণ। এই প্রদাহ **গণোরিয়া, প্রসব বা গর্ভপাতের পর দুষ্ট বীজাণু** দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি

কারণেই হইয়া থাকে। **ফ্যালোপিয়ান নলের যক্ষ্মা**ও বন্ধ্যাত্বের একটি কারণ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ফ্যালোপিয়ান নলের পথ সুগম করিয়া বন্ধ্যাত্বের প্রতিকার করা যায় বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষত রোগ পুরাতন হইয়া গেলে, প্রতিকার করা যায় না।

৫। **জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লীর প্রদাহ** (Endometritis) এবং **জরায়ুগ্রীবার দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ** (Chronic inflammation of Cervix)। প্রথমটি বিশেষ দেখা যায় না, কাজেই ইহা বন্ধ্যাত্বের মুখ্য কারণ নহে। দ্বিতীয় অবস্থাটি শুক্রকীটের উর্ধ্বাভিযানে বাধা সৃষ্টি করিবে বলিয়া মনে হইলেও এই কারণে বন্ধ্যাত্ব দেখা যায় না বলিলেই হয়।

৬। **জরায়ুমুখ হইতে অধিকমাত্রায় শ্লেষ্মা স্রাব** হইলে তদ্বারা শুক্রকীট বিধৌত হইয়া যাইতে পারে। এই কারণও সামান্য চেষ্টায় দূরীভূত করা যাইতে পারে।

যে সমস্ত নারীর জরায়ুমুখ বেশীমাত্রায় শ্লেষ্মাবৃত হয়, চরমানন্দ লাভ ব্যতিরেকে তাহারা সন্তানলাভ করিতে পারে না। মিলনের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে আদর, সোহাগ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইলে এবং মিলনের সময় নারী একটু অধিক মাত্রায় সকর্মক হইলেই তাহার পক্ষে চরমানন্দ লাভ হইতে পারে। ইহার উপায় ও কৌশলের বিস্তৃত বর্ণনা আমার অন্য পুস্তক "যৌন-বিজ্ঞান" ২য় খণ্ডে করা হইয়াছে।

৭। নারীর যোনি-প্রাচীর হইতে যে রস ক্ষরিত হয়, সে রসে **অম্লজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া**। ঐ অম্ল জাতীয় নিঃস্রাব পুরুষের শুক্রকীট ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

কিছু পূর্বে শুক্রকীট সম্পর্কীয় একটি পরীক্ষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শুক্রকীটের গতি এবং নানাবিধ মিশ্রিত তরল পদার্থের (Solution) সংস্পর্শে আসিলে উহাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় অণু-বীক্ষণের সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করার ফল বলিয়াছি—লক্ষ্য করা গিয়াছে যে মাত্র এক বিন্দু অম্ল তরল পদার্থ বা সাধারণ অম্লধর্মী জল সজীব ও সচল শুক্রকীটের উপর ফেলিলে সেই মুহূর্তেই উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিপথ-নির্গত-রস অত্যধিক অম্লধর্মী তাহাদের যোনি মধ্যে শুক্রকীটসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফল দাঁড়ায় এই যে, ডিম্বকে প্রাণবন্ত করিবার জন্য আর কোন শুক্রকীট বাঁচিয়া থাকে না।

কোনও তরল পদার্থ **অম্ল** বা **ক্ষারধর্মী** কিনা ইহা সহজেই পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায়।

ডাক্তারী ঔষধালয়ে নীল ও লাল লিট্‌মাস (Litmus) পেপার পাওয়া যায়। দুই চারি পয়সা দামের উক্ত কাগজ খরিদ করুন। কিংবা চোষ (ব্লটিং) কাগজের উপর জবাফুল ঘর্ষণ করিয়া উহাকে রঙীন করিয়া লউন। ইহাতে লাল লিটমাস কাগজের কাজ হয়।

যে সব পদার্থ ক্ষারধর্মী তাহা উপরোক্ত লাল কাগজের সংস্পর্শে আসিবা-মাত্র **রক্ত বর্ণকে নীলবর্ণে** রূপান্তরিত করিবে আবার অম্লধর্মী পদার্থ **নীল বর্ণকে রক্ত বর্ণে** রূপান্তরিত করিবে।

এই অম্ল বা ক্ষার রস একটি অন্য আর একটিকে **প্রশমিত** করে।

যোনিপথ নির্গত রস অম্লধর্মী কি না তাহা ফ্রেঞ্চ-ক্যাপ (Freneh letter) পরিয়া সহবাস করিবার পরে সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। নিঃসৃত রসে তুলা ভিজাইয়া ঐরূপ কাগজের উপর ঘর্ষণ করিয়া তাহাদের বর্ণ পরিবর্তন করিলেই বুঝা যায়।

ক্ষারযুক্ত দ্রবণের (Solution) ডুশ দ্বারা যোনিপথ ধৌত করিলে অম্লধর্মী স্রাবের হানিজনক ক্রিয়ার **প্রশমন** হইতে পারে। তবে ডাক্তারের কাছে কোন্ ক্ষার এবং ক্ষার ও জলের পরিমাণ জানিয়া লইবেন।

৮। কয়েক প্রকার **শ্বেত প্রদরের** (Flour vaginalis) **স্রাবও** শুক্র-কীট ধ্বংস করিয়া বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি করে। উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা শ্বেতপ্রদরের চিকিৎসা করিলে উপকার হয়।

৯। **সহবাসে বেদনা** নানা **কারণে** হইতে পারে, যথা :—

(ক) **জরায়ু** পশ্চাদ্ভাগে হেলিয়া পড়া অবস্থা (Retroversion of Uterus, ২৩ ও ২৪ নং চিত্র)

(খ) **ডিম্বাশয়ের নানা ব্যাধি** এবং ডিম্বাশয় যখন নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে (বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্ধ (বা প্রত্যাহার) সঙ্গমের ফলে ডিম্বাশয় বেদনাযুক্ত ও বড় হইয়া রতিক্রিয়াকে স্ত্রীলোকের অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক করিতে পারে)।

(গ) তলপেটের কয়েকটি ব্যাধি, যথা :—মূত্রাধার বা মলদ্বারের রোগ।

(ঘ) ভগদেশের বিকৃতি (Abnormalities of vulva) ও তাহার অন্যান্য কয়েকটি ব্যাধি এবং ছিন্ন সতীচ্ছদের প্রদাহ।

(ঙ) ছিন্ন পেরিনিয়াম বা পেরিনিয়ামে অপারেশনের ঘা শুকাইবার পর যে নরম মাংস (স্কার টিস্যু, Scar tissue) গঠিত হয় তাহাও সহবাসে বেদনাদায়ক হইতে পারে।

যদি প্রসবের সময় পেরিনিয়ামের সহিত মলদ্বার পর্যন্ত ছিন্ন হইয়া থাকে এবং যদি ঐ স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা না হয়, তাহা হইলে কোষ্ঠের অন্তর্গত বস্তু নিচয় (Organisms) দ্বারা বীজাণুদুষণ হইতে পারে এবং তাহার ফলে বন্ধ্যাত্ব জন্মিতে পারে।

যদি চিকিৎসক **ছিন্ন পেরিনিয়াম** আবশুক অপেক্ষা **অধিক দূর পর্যন্ত সেলাই** করিয়া থাকেন, তাহা হইলে **সঙ্গমে বাধা** এবং তাহার ফলে **বেদনা** (ডিস্‌প্যারিউনিয়া) জন্মিতে পারে।

ছিন্ন পেরিনিয়াম (উপযুক্ত সার্জন দ্বারা) **সেলাই করাইয়া না লইলে** স্বামী বিরক্ত ও ক্রমশ প্রেমহীন হইয়া যাইতে পারেন, কারণ (ক) যোনিস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং (খ) মিলনে উপযুক্ত ঘর্ষণ সুখ লাভ হয় না।

পেরিনিয়াম **অধিক ছিন্ন** হইয়া থাকিলে, ছিন্ন স্থান হইতে পতিত শুক্র বাহির হইয়া আসে।

(চ) যোনি প্রাচীরের (Vaginal Walls) ব্যাধি ও প্রদাহ।

ইহা ব্যতীত সহবাসে বেদনার আরও ছোটখাটো কারণ থাকে, যথা, কোষ্ঠ-বদ্ধ মল থাকা, স্বামীর অথবা সহবাসের প্রতি ভয় বা ঘৃণা, যোনিমুখের আক্ষেপ বা খেঁচুনি (Spasm of the vaginal orfice)।

উপরোক্ত অবস্থাগুলির অধিকাংশই সুচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার দ্বারা প্রতিকারসাধ্য। এই রোগের একটি সহজ অথচ সন্থ ফলপ্রদ চিকিৎসার বিবরণ (বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ভি. বি. গ্রীন আর্মিটেজের লেখা) যৌন-বিজ্ঞান ২য় খণ্ডে (নারীর কামশীতলতার প্রতিকার প্রসঙ্গে) লিখিয়াছি।

(৯) **জরায়ুর** টিউমার (২২ নং চিত্র), জরায়ুর ক্যানসার বা অন্য কোনও প্রকার টিউমার বীজাণুদ্বারা সংক্রমিত হইলে যে দুষিত স্রাব বাহির হয় তাহা শুক্রকীটকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

(১০) **অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির** কার্য বৈলক্ষণ্য (Dysfunction of Endocrine glauds)—ডিম্বকোষ ঠিক মত কাজ না করার জন্য যে সব স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলমাল হয় তাহারা সাধারণত বন্ধ্যা হয়। অন্য কোনও গ্রন্থির

গোলমালেও বন্ধ্যাত্ব হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত হরমোন ঘটিত চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়।

(১১) কোনও **দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধি**। যক্ষ্মা ও মরবাস কর্ডিস (Morbus cordis)—এই দুইটি স্ত্রীলোকের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। অন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে।. উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা ব্যাধি দূর হইয়া শরীর সুস্থ হইলেই বন্ধ্যাত্বের প্রতিকার হইতে পারে।

(১২) কামশীতলতা, সঙ্গমে বিতৃষ্ণা (Frigidtiy) বা রতিজড়তা।

পুরুষের অজ্ঞতা অথবা স্বার্থপরতার দরুন, স্ত্রীর বাসনা উদ্দীপিত না করিয়াই বিহারে প্রবৃত্ত হওয়া, দুর্ব্যবহার, স্ত্রীলোকের মানসিক বিরক্তি ঘৃণা বা ধর্মভাবমূলক ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ, পাপবোধ, গ্লানি ইত্যাদি বহু কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হয়। "যৌনবিজ্ঞান" ২য় খণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ, অসংখ্য কারণাবলী এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় আছে।

এই অবস্থা সত্ত্বেও গর্ভাধান হয়; এমন কি জোর করিয়া বলাৎকার করিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। তবে এই অবস্থা গর্ভধারণের অনুকূল নহে।

(১৩) **যোনিমুখের আক্ষেপ** (Vaginismus)। ইহা সহবাসে নারীর ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও আপত্তিজনিত অবস্থা। সাধারণত ফুলশয্যায় বা প্রথম প্রথম অত্যাচারমূলক বিহার বা দুর্ব্যবহারে স্ত্রীর এই অবস্থা দেখা দেয়। ইহা হইলে স্বামী সহবাসের উপক্রম করিলেই যোনিমুখ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সহবাসে ব্যাঘাত ও বেদনা ঘটায়। ইহা প্রধানত মানসিক। স্ত্রীর মনের প্রতিকূল ভাব ফিরাইতে পারিলেই এই অবস্থার অবসান হয়। যোনির কুগঠন, জরায়ুগ্রীবার দূরে অবস্থিতি প্রভৃতি কারণে বীর্য জরায়ু মুখে পতিত না হইলে যে আসনগুলি অবলম্বনীয় বলিয়া 'বন্ধ্যাত্বের প্রতিকার' অনুচ্ছেদে, একটু পরে লেখা হইয়াছে, সেগুলি এই রোগের শারীরিক কারণাবলীর প্রতিষেধক।

(১৪) **খাদ্যাভাব**, অনুপযুক্ত আহার, অতিভোজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং শরীরের পরিপুষ্টির অভাবে ডিম্বের পরিপক্কতায় বিঘ্ন ঘটে। যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকার করা উচিত।

(১৫) অতিরিক্ত খেলাধূলা। রমণীরা পুরুষসুলভ খেলাধূলায় অতি-মাত্রায় মাতিয়া উঠিলে তাহাদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। বর্তমান

যুগে কোনও কোনও সমাজের রমণীরা মুক্ত মাঠে নানাপ্রকার কঠোর পরিশ্রম-সাধ্য ক্রীড়া-কৌতুকে আত্মনিয়োগ করিতেছে; ইহাতে যে তাহাদের সন্তান জন্মদানের স্বাভাবিক ক্ষমতা লোপ পাইতেছে তাহা মনে করা যাইতে পারে।

(১৬) খুব **ঠাণ্ডা** জলের অথবা বেশী **অম্ল** দ্রবণের **ডুশ** লওয়া।

(১৭) বিবাহের সময় হইতে **বহুবর্ষ** যাবৎ **ক্রমাগত** গর্ভনিবারণের জন্য যন্ত্র বা ঔষধ ব্যবহার করা হয়। ঐগুলি ব্যবহারের ফলে বন্ধ্যাত্ব ঘটে না ও ঘটিতে পারে না। কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর বয়সের পরে উর্বরতা কমিতে থাকে, সুতরাং যত অধিক দিন প্রথম গর্ভ স্থগিত রাখা হয় (জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদির ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেও) গর্ভ হইবার সম্ভাবনা ততই কম হয়।

(১৮) ঋতুকালে গুরু পরিশ্রম করা বা ঠাণ্ডা লাগানোর ফলে ভিতরে প্রদাহ (inflammation) হইলে বন্ধ্যাত্ব ঘটায়।

(১৯) বাতের ফলে যোনিরসে অম্লাধিক্য হয়, ফলে শুক্রকীটগুলি সেখানেই মরিয়া যায়। সহবাসের পূর্বে ক্ষার দ্রবণে ডুশ লইলে প্রতিকার হয়।

(২০) দীর্ঘকাল অতিরিক্ত তামাক, কফি, মদ, আফিম, মর্ফিয়া, কোকেন ভাং প্রভৃতি সেবন ও পান করা।

(২১) কয়েক পুরুষ যাবৎ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ (ইনব্রীডিং inbreeding)।

(২২) কোনও কোনও নারীর প্রসব পথে ট্রাইকোমোন্যাস (Tricomonas) নামে এক অতি ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণগ্রাহ্য জীবাণু থাকে। এইগুলি শুক্রকীটের শত্রুস্বরূপ। ইহারা বহুল সংখ্যায় ঐ স্থানে বাস করিয়া অস্বস্তি উৎপাদন (irritate) করার ফলে প্রচুর স্রাব হয়। চিকিৎসাদ্বারা এইগুলি নষ্ট করা যায়। ইহাদের উৎপত্তির কারণ জানা নাই।

(২৩) সহবাসের পরই উঠিয়া বসা, দাঁড়ানো অথবা অঙ্গ ধৌত করা।

(২৪) উর্বর সময়ে ডেটল, পটাশ পারমাঙ্গানেট্, ফটকিরি প্রভৃতি শুক্রকীট-নাশক দ্রবণে ডুশ লওয়া। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সংশোধনের জন্য ভিতরে পেসারি থাকিলে তাহাতে এইগুলি লাগিয়া থাকে। সুতরাং ঋতুমাসের মাঝের দশ দিনে এইরূপ ডুশ লওয়া উচিত নয়।

(২৫) ডিম্বাশয়ের সিষ্ট (Cyst)।

(২৬) জরায়ুগ্রীবা (সারভিক্স cervix) ডিম্ববাহীনল, অথবা জরায়ু মধ্যস্থ ঝিল্লীর টি. বি. হওয়া

(২৭) নারীদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের সর্বপ্রধান (অন্তত অর্ধেক ক্ষেত্রে) কারণ গণোরিয়ার পরবর্তী ফল।

(২৮) কর্ণমূল প্রদাহ (মাম্পস্ Mumps)।

(২৯) গর্ভপাতের ফলে বীজাণুদূষণ এবং তাহার দ্বারা ডিম্ববাহীনলের প্রদাহ হইয়া তাহার পথ বন্ধ হইতে পারে।

কোনও কোনও সন্তানকামী দম্পতি মনে করেন যে, গর্ভাধানের জন্য সমস্ত শুক্র ভিতের থাকিয়া যাওয়া আবশ্যক, সুতরাং সঙ্গমের পর অধিকাংশই বাহিরে গড়াইয়া আসে দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। এরূপ মনে করা ভুল।

উপরোক্ত কারণসমূহের একটিও সুস্পষ্ট না হইয়াও যদি সন্তান লাভ না হয় তবে যে সব দিনে গর্ভাধান হইবার সম্ভাবনা বেশী সেই সব দিনে দম্পতির মিলিত হওয়া উচিত। এই বিষয় পরে 'নারী জীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়' সম্বন্ধে, অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

নিঃসন্তান হওয়ার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাহারা বেশী দায়ী ?

ডাঃ নরম্যান হেয়ার তাঁহার Birth Control Methods এ লিখিয়াছিলেন যে নিঃসন্তান দম্পতিদের মধ্যে ছয় ভাগের এক ভাগ ক্ষেত্রে স্বামী দায়ী এবং বাকি পাঁচ ভাগের জন্য স্ত্রী দায়ী (অর্থাৎ স্বামী প্রায় শতকরা ১৬ এবং স্ত্রী প্রায় ৮৪ ক্ষেত্রে দায়ী) কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত The Journal of Sex Educationএর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর সংখ্যায় আছে যে, কয়েক সহস্র ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে স্বামীই শতকরা প্রায় ৬০ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ অর্ধেকেরও অধিক ক্ষেত্রে) দায়ী। মোটামুটি আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে পুরুষ ও নারী উভয়েই প্রায় সমান দায়ী।

পুরুষের বন্ধ্যাত্ব

গর্ভাধানের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে গর্ভাধানে নারীর ডিম্ব যেমন নির্দোষ হওয়া প্রয়োজন, পুরুষের শুক্রকীটও তেমনি সজীব হওয়া প্রয়োজন। শুক্রকীট সজীব শক্তিমান ও যথেষ্ট না থাকিলে তদ্দারা সন্তানোৎপাদনের কার্য চলিতে পারে না।

পুরুষের বন্ধ্যত্বের কারণ ঃ—

(১) অণ্ডকোষ না থাকা বা উহা থলিতে (Scrotum) না নামা। ক্বচিৎ এইরূপ হয়।

(২) অণ্ডকোষের পীড়া।

(৩) অপুষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত অণ্ডকোষ।

(৪) অণ্ডকোষের প্রদাহ।

(৫) নানা মানসিক ও শারীরিক কারণে পুরুষত্বহীনতা ও শুক্রকীটের অনস্তিত্ব বা অনুপযুক্ততা। এ বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা একটু পূর্বেই 'ধ্বজভঙ্গ' এবং 'সন্তানোৎপাদনে অক্ষমতা' অনুচ্ছেদে করিয়াছি।

কোনও কোনও স্বামী লজ্জা ও সঙ্কোচ-বশত পরীক্ষিত হইতে চাহেন না। কেহ মনে করেন যে যদি প্রমাণ হয় যে তাঁহারই দোষে তাঁহাদের সন্তানহীনতা তাহা হইলে তাঁহাদের স্ত্রীগণ গঞ্জনা দিবে, আবার কতক অজ্ঞতা-বশত তাঁহাদের যৌনযন্ত্রগুলি এবং বীর্য পরীক্ষার আবশ্যকতাই বুঝেন না। সুতরাং যে স্বামীরা পরীক্ষিত হইতে চাহেন না চিকিৎসকের উচিত তাঁহাদের আলাদা ডাকিয়া ইহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাদের ত্রুটি আবিষ্কৃত হইলে সে কথা একান্ত গোপনীয় বিবেচনা করা হইবে ইহার আশ্বাস দেওয়া।

(৬) অতি ক্ষুদ্র লিঙ্গ (অর্থাৎ উত্থিত অবস্থায় ৪ ইঞ্চিরও কম) বিশেষত স্ত্রীর যোনিনালী প্রশস্ত ও লম্বা হইলে নির্দিষ্ট স্থানে শুক্রকীট পৌঁছিতে পারে না। ইহাতে গর্ভের সম্ভাবনা কম থাকে ; গর্ভাধান একেবারে হয় না এমন নহে। সাধারণ আসনে স্ত্রীর নিতম্বের নীচে বালিশ রাখিলে কতকটা প্রতিকার হয়।

(৭) কোনও কোনও পুরুষের প্রস্রাবের দ্বার লিঙ্গের অগ্রভাগে না থাকিয়া লিঙ্গের মধ্যস্থলে, গোড়ায় অথবা অণ্ডকোষের থলি ও গুহ্যদ্বারের মাঝামাঝি থাকে। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছা, পুরুষাঙ্গের দৃঢ়তাপ্রাপ্তি ও যোনিপথে প্রবেশ, স্বাভাবিক সঙ্গম ও চরমানন্দ লাভ (Orgasm) সবই সম্ভব কিন্তু বীর্য যোনির বাহিরে পড়িবার সম্ভাবনা বেশী থাকায় গর্ভাধান হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। স্বামীর বীর্য কৃত্রিম উপায়ে যোনিপথে প্রবিষ্ট করাইয়া এরূপ বন্ধ্যত্বের প্রতিকার সম্ভব।

(৮) লিঙ্গের কুগঠন।

(৯) কঠিন রোগ। দুর্বলকারী পুরাতন রোগ।

(১০) খুব মোটা হওয়া।

(১১) শুক্রে কীট না থাকা, অথবা সুস্থ সতেজ কীট না থাকা কিংবা এক বারের স্খলিত শুক্রে ১৬ কোটিরও কম থাকা।

(১২) প্রষ্টেট গ্রন্থি অথবা শুক্রাশয়ের রোগ।

(১৩) পুরাতন যক্ষ্মা।

(১৪) অন্তঃস্রাবী বিনালী গ্রন্থিসমূহের গোলযোগ।

(১৫) শরীরের কোন স্থানে পুরাতন রোগ ও প্রদাহ।

(১৬) সহবাসের উপক্রমেই ভগের উপরে বা যোনিমুখে রেতঃপাত হওয়া। এই প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

(১৭) বহুকাল সম্ভোগ হইতে বিরত থাকা।

(১৮) পুষ্টিকর ও যথেষ্ট আহারের অভাব।

(১৯) সুরতে বীর্যপাত না হওয়া (অথচ স্বমেহনে বা নিদ্রাবস্থায় হয়)।

(২০) **সব চেয়ে প্রধান কারণ গণোরিয়া**। গণোরিয়ার বিষের প্রদাহের ফলে শুক্রবাহী নলের ভিতরের পথ বন্ধ হওয়ার জন্য শুক্রকীট বাহির হইতে পারে না। উহার ফলে জননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য দোষ ঘটিয়া বন্ধ্যত্ব সৃষ্টি করে। গণোরিয়ার আক্রমণ-হেতু নারীপুরুষ উভয়েই বন্ধ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ রোগ দ্বারা প্রধানত ও প্রথমত পুরুষই আক্রান্ত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার ডাঃ অ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ ও ডাঃ ডাকিন তাঁহাদের Sex Hygiene and Sex Education নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার ১৯১৭ সনের সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টে যে ১০৯২ জন গণোরিয়া-রোগীর উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৯৫৭ জন পুরুষ ও ১৩৫ জন স্ত্রীলোক। ঐ রিপোর্টে উল্লিখিত ৩৫৫ জন সিফিলিস রোগীর মধ্যে ২৬৭ জন পুরুষ ও ৮৭ জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের এই শ্রেণীর রোগ অনেক স্থলে গোপন রাখা হয় বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া সরকারের ঐ রিপোর্ট নির্ভুল নাও হইতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ঐ অনুপাত সত্য।

তাহা ছাড়া, গণোরিয়ার দ্বারা পুরুষের এপিডিডাইমিস আক্রান্ত হয় এবং ইহার দুইটিই আক্রান্ত হইলে শুক্রকীট-বাহী নলও বন্ধ হয়। গণোরিয়ার ফলে পুরুষের মুখশায়ী গ্রন্থি (Prostate gland) আক্রান্ত হইয়া অণ্ড হইতে মূত্রনালীতে শুক্রকীট গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহার ফলে পুরুষের রতি-শক্তি অটুট থাকা সত্ত্বেও বন্ধ্য হইয়া যায়। এই অবস্থায় পুরুষের যে শুক্র স্খলিত হয়, তাহা বস্তুত মুখশায়ী গ্রন্থির রস মাত্র, শুক্রকীটপূর্ণ খাঁটি শুক্র নহে। সুতরাং উহার দ্বারা সন্তান উৎপাদন হয় না।

নারীর পক্ষে প্রযোজ্য ৩৩ ও ৩৪ নং কারণ দুইটি পুরুষের বেলায়ও খাটে।

স্ত্রী এবং পুরুষের বন্ধ্যাত্বের বিবিধ কারণ আলোচিত হইল। আমরা এখন স্ত্রী-পুরুষ **উভয়ের** মিলনে গর্ভাধানের প্রতিকূল অবস্থাসমূহের উল্লেখ করিব।

(১) অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নভাবে রতিক্রিয়া করিলে, বিশেষত প্রসবের পূর্বে এবং অল্পই পরে প্রায় ১০ দিনের মধ্যে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে।

(২) অসঙ্গত আসনে রতিক্রিয়া করিলে শুক্রকীটের উপযুক্ত স্থানে প্রবেশে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

(৩) অনেক সময়ে অতিরিক্ত বিহারের ফলে যোনিমধ্যে শুক্রকীটের আধিক্যে (Spermatic staturation) উল্টা ফল হয় অর্থাৎ গর্ভাধানে ব্যাঘাত জন্মে। আবার ঘন ঘন রতিক্রিয়া করিলে প্রতি স্খলনে নির্গত শুক্রকীটের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে কয়েকদিন বিরত থাকিয়া গর্ভাধানের সব চেয়ে উপযুক্ত সময়ে পরিমিত রতিক্রিয়া করা উচিত। এই **উপযুক্ত সময়ের** আলোচনা শীঘ্রই করিতেছি।

অতিরিক্ত হস্তমৈথুন বা ঘন ঘন বিহারের ফলে পুরুষের স্খলিত বীর্যে সতেজ শুক্রকীটের অভাব ঘটে। অনেক সময়ে বীর্যে শুক্রকীট একেবারেই থাকে না। ইহা ব্যতীত কোনও রমণীর গর্ভাধান হওয়ার পর পুনঃ পুনঃ রতিক্রিয়ার ফলে গর্ভাধানের অতি প্রাথমিক অবস্থার জরায়ুগাত্রে প্রোথিত ডিম্ব স্থানচ্যুত হইয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে গর্ভাধানের সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্তও হইতে পারে। বেশ্যারা যে কম ক্ষেত্রে গর্ভবতী হয় ইহাই তাহার একটি কারণ বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস।

(৪) গর্ভকালে এবং প্রসবের কিছু কাল পরেই অসাবধানভাবে রতিক্রিয়া করিলে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় আঘাত-প্রাপ্ত এবং পেশীসমূহ ছিন্ন হইতে পারে।

(৫) বহুকাল স্বামী নিরুদ্ধ-সঙ্গম (Coitus interruptus) অভ্যাস করিলে স্ত্রীর উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়ার দরুন ডিম্বকোষের ক্রিয়া-বৈকল্য এবং এমন কি জরায়ুতে বা ডিম্বকোষ সংক্রান্ত টিউমার পর্যন্ত হইতে পারে।

(৬) জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য প্রক্রিয়াও অসাবধান এবং অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে। গর্ভ-নিবারণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুমোদিত হওয়া উচিত।

(৭) স্ত্রী-পুরুষের আঙ্গিক অসামঞ্জস্য হইলে গর্ভাধানে ব্যাঘাত ঘটে, যথা, পুরুষাঙ্গের খর্বতা ও যোনিনালীর দৈর্ঘ্য। মিলনের কৌশল অবলম্বনে ইহার প্রতিকার করা যায়।

(৮) স্ত্রী-পুরুষের মেজাজের অসামঞ্জস্য অর্থাৎ বনিবনাও না হইলে অনেক সময় দম্পতি অনুর্বর হয়। আবার ঐ স্ত্রীলোক অন্য পুরুষ এবং ঐ পুরুষ অন্য স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়া সন্তান লাভ করিতে পারে।

মিলনের সাধারণ কৌশল সকলেই জানে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে সুকৌশলের অজ্ঞতাহেতু দম্পতি নানা ভুল ভ্রান্তি করে এবং ইহার ফলে তাহারা পূর্ণ সুখ না পাইয়া অনেক অসুবিধা, অসুখ ও অশান্তি ভোগ করে।

প্রত্যেক মানুষই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাইয়া থাকে কিন্তু অসংখ্য লোক ভোজনের উপযুক্ত সময়, পরিমাণ, পদ্ধতি ইত্যাদির অবহেলা করিয়া স্বাস্থ্য এবং স্বস্তি উভয়ই হারাইয়া ফেলে নয় কি ?

স্বাস্থ্যসম্মত ও তৃপ্তিদায়ক মিলন শিক্ষণীয় বিষয়। আমার "যৌন-বিজ্ঞান" ২য় খণ্ডে ইহার সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে।

বন্ধ্যাত্বের বহুবিধ কারণের উল্লেখ করা হইল। এই সকল কারণ অনুধাবন করিলে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, "এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও, লোক-সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে কি করিয়া ?" বাস্তবিক পক্ষে অনেকের মতে প্রাণীদের মধ্যে **মানুষের উর্বরতা কমিয়া** যাইতেছে।

মানবজাতিতে উর্বরতা হ্রাস

পুরুষের মধ্যে অনুর্বরের অনুপাত ঠিক করা দুরূহ এবং অসম্ভবও বটে। সভ্যজগতে এই অনুপাত কাহারও মতে শতকরা ৮, আবার কাহারও মতে ৫৯! মোটের উপর বহু-সংখ্যক পুরুষই অনুর্বর থাকে কেহ সম্পূর্ণ, কেহ সাময়িক আবার কেহ আপেক্ষিক। বৃদ্ধের মধ্যে বেশীর ভাগই অনুর্বর।

পুরুষের মধ্যে সন্তান জন্মদানের **সবচেয়ে উপযুক্ত সময়** ২০ হইতে ৩০ বৎসর। এই সময় শুক্রকীট সবল থাকে ও প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হয়।

নারীরও **সব চেয়ে উপযুক্ত বয়স** ২০ হইতে ৩০। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে (ভারতবর্ষেও বটে) এই বয়স আমরা ১৮ হইতে ২৮ ধরিয়া লইতে পারি। এই বয়সে নারীর দৈহিক পরিপুষ্টি হয় এবং মানসিক স্থৈর্য আসে। ৩০ এর পূর্বেই প্রথমবার গর্ভধারণ করা উচিত।

ঋতুমাসের মধ্যে নারীর **গর্ভাধানের** সবচেয়ে উপযুক্ত **সময়** নির্ধারণেরও চেষ্টা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শীঘ্রই আলোচনা করিতেছি।

প্রত্যেক সুস্থ ও উর্বর নারীর পক্ষে জীবনে ৩০টি সন্তান জন্মদান সম্ভবপর! কিন্তু নানা কারণ পরম্পরায় তাহা হইয়া ওঠে না। অধুনা নারীদের এই ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমতি হয়।

ফরাসী গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ২,০০০,০০০ দম্পতির সন্তান হয় নাই; ২,৫০০,০০০ দম্পতির একটি করিয়া, ২,৩০০,০০০র ২টি করিয়া এবং মাত্র ১,০০০,০০০র তিনটির বেশী করিয়া সন্তান ছিল। ২০০ বৎসরে ফ্রান্সে প্রত্যেক দম্পতির সন্তানের সংখ্যা গড়ে ৭ হইতে ২টিতে নামিয়া আসিয়াছে।

অবশ্য ইহার জন্য গর্ভ-নিবারণের পদ্ধতি অবলম্বন কতকটা দায়ী, কিন্তু উহা কেবল ইদানীং এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। মার্শাল পেঁতা (Marshal Petain) ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারণের মধ্যে ফরাসী জাতির কম সন্তান লাভ অন্যতম বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন।

যৌন-বৈজ্ঞানিক স্কট (George Ryley Scott) সভ্যতা প্রসূত কৃত্রিম জীবনযাপন প্রণালী, নাগরিক জীবনে শরীর ও মনের উপর অতিরিক্ত ধকল, হুড়াহুড়ি-দৌড়াদৌড়ি, ভাবনা-চিন্তা, আর্থিক দুরবস্থা, বিশ্রাম এবং শিক্ষার অভাবকে মনুষ্যজাতির ক্রমবর্ধমান অনুর্বরতার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পাক-ভারতে জনসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তবে প্রসূতি-মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যুর হারও এখানে অতি উচ্চ। স্বাস্থ্যনীতি এবং গর্ভিণীর সেবা, ধাত্রী-বিদ্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে অজ্ঞতা পর্বতপ্রমাণ।

বন্ধ্যত্বের প্রতিকার

সন্তান লাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা যথাসময়ে বিবাহিত নরনারীর মধ্যে প্রবল হইয়া ওঠে। বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশে এই আকাঙ্ক্ষা হয়ত কতকটা চাপা থাকে কিন্তু সন্তান একেবারে না হউক এরূপ ইচ্ছা বোধ হয় কোনও পিতামাতাই পোষণ করেন না।

ইচ্ছাকৃত "জন্মনিয়ন্ত্রণ" সম্বন্ধে উক্ত নামধেয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "জন্মনিয়ন্ত্রণ" এর অর্থ

একটিমাত্র সন্তান লাভের ইচ্ছাকেও পিষিয়া মারা নয়; উপযুক্ত ব্যবধানে **ইচ্ছা এবং সুবিধা মত নির্দিষ্ট সংখ্যক পুত্রকন্যার জন্মদান করা।**

মাতৃত্বের সুতীব্র ক্ষুধা নারীকে পাগল করিয়া তোলে। পুরুষও একেবারে পিতৃত্বের ক্ষুধামুক্ত হইতে পারে না। পূর্বোল্লিখিত নানাবিধ কারণবশত অনেক ক্ষেত্রেই দম্পতি সন্তানলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

সন্তান-লাভেচ্ছু পিতামাতা চেষ্টা করিলে সুচিকিৎসক সাহায্যে পূর্ব বর্ণিত কারণসমূহের অধিকাংশই প্রতিকার করিয়া সন্তানের জন্ম সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারে। অবশ্য দুরারোগ্য ব্যাধি কিংবা শারীরিক বিকৃতি বা বৈকল্যের দরুন যদি সন্তানোৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তাহার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য বটে।

সন্তানোৎপাদনের উপযুক্ত সময়

নরনারীর জীবনে সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সময় বা স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা একটু পূর্বেই বলিয়াছি, এদেশে ১৮ হইতে ২৮ বৎসর বয়স্কা নারীর এবং ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মধ্যে এই ক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটে। বিবাহিত জীবনের প্রথম দুই বৎসরের মধ্যেই রমণীর গর্ভাধান হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। তাহার পরে ক্রমেই এই সম্ভাবনা হ্রাস পায়। স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী **অত্যধিক** বয়স্ক হইলে কচিৎ গর্ভাধান হইয়া থাকে। এইরূপ স্বামী হয়ত বা বন্ধ্য। যৌন-মিলনের ক্ষমতা থাকিলেই যে গর্ভাধান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

রমণীর প্রতি রজঃমাসের অধিকাংশ দিবসেই মিলনের ফলে গর্ভাধান হয় না। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে প্রতি আটাশ দিনের মধ্যে অন্তত কুড়ি দিন যে কোনও রমণী স্বভাবতই বন্ধ্যা অর্থাৎ এই কয়দিন তাহার গর্ভাধান হইতে পারে না। সুতরাং বাকী যে কয়দিন গর্ভাধান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই কয়দিনে মিলন সম্পাদিত হইলে গর্ভাধান হইতে পারে।

নারীর উর্বর ও অনুর্বর সময়ের ব্যাখ্যা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইতেছে। *

এই উর্বর সময়ের প্রত্যেক দিন এবং উক্ত সময়ের পূর্বের ও পরের ২।৩ দিনে সহবাস করিলে গর্ভাধান হইতে পারে।

---

* আমার 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' চতুর্থ সংস্করণ এবং Controlled Parenthoodএ এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তবে এই সূত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অন্য কয় দিন একেবারেই গর্ভাধান হইবে না ভাবিয়া নির্ভয়ে মিলিত হইলে সন্তান-লাভে অনিচ্ছুক দম্পতিরা ঠকিয়া যাইতে পারেন। কারণ, ডাঃ ভেল্ডি, ডিকিন্‌সন প্রমুখ কাহারও কাহারও মতে মাসের যে কোনও দিনে, এমন কি ঋতুস্রাবের সময়েও রতিক্রিয়ার ফলে গর্ভাধান হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে, শুক্রকীট নারীর দেহের মধ্যে ডিম্বের অপেক্ষায় বাঁচিয়া থাকে এবং ডিম্বস্ফোটনের পর ডিম্বগুলি একেবারে বাহির হইয়া যাইতেও সময় লাগে। সেইজন্য ঠিক ডিম্বস্ফোটনের তারিখ হইতে কয়েকদিন এদিক ওদিকের রতিক্রিয়ায় গর্ভাধান হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও কোনও কোনও কারণে ডিম্বস্ফোটনের সময় আগাইয়া পিছাইয়া যাইতে পারে। যথা, সুরতে তীব্র পুলক লাভ করিলে অকালে ডিম্বস্ফোটন হইতে পারে, আবার বিশেষ ভয়, শোক বা দুঃখ পাইলে ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব কিছুকাল বন্ধ থাকিতে পারে।

আসন কৌশলে গর্ভ সঞ্চার

পুরুষের বীর্য যদি যোনির শেষ প্রান্তে **ঠিক জরায়ুমুখে** স্খলিত হয় তবে গর্ভাধানের সম্ভাবনা বেশী হয়। কোনও কোনও রমণীর যোনিনালী এরূপভাবে গঠিত অথবা এরূপ দীর্ঘ যে বীর্য যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে না; আবার যদি **জরায়ু** কোনও কারণে **স্থানচ্যুত** হইয়া যায়, অথবা জরায়ুগ্রীবা অনেক নীচে অথবা পিছনে থাকে তাহা হইলেও বীর্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এই সব কারণেও গর্ভাধানের সম্ভাবনা লোপ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে মিলনের সময় এমনভাবে স্ত্রীপুরুষের অবস্থান বাঞ্ছনীয় যেন বীর্য যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে। যদি রমণী চিৎভাবে শায়িত অবস্থায় তাঁহার হাঁটুদ্বয় যথাসাধ্য নিজের বুকের দিকে টানিয়া লন অথবা রমণীর নিতম্বের নিম্নদেশে বালিশ স্থাপন করিয়া মিলিত হইলে অথবা পার্শ্বে শুইয়া জানুদ্বয় মুড়িয়া, চিবুক অবধি তুলিলে এবং স্বামী পিছন হইতে মিলিত হইলে গর্ভাধান প্রক্রিয়ার সাহায্য করা হয়, কারণ এই আসনগুলির দ্বারা দীর্ঘ যোনি হ্রস্ব হইয়া যায়। রমণী দক্ষিণ পার্শ্বে কাৎ হইয়া শুইয়া দক্ষিণ হাঁটু যথাসম্ভব টানিয়া লইয়া স্বামী সহবাসে রত হইলেও গর্ভাধান হইতে পারে। জরায়ু যদি এক পার্শ্বে বাঁকিয়া থাকে তবে এই প্রক্রিয়ায় তাহার আংশিক সংশোধন ঘটে। ডাঃ কিশের মতে জরায়ু পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া থাকিলে স্বামী-স্ত্রী বসা

অবস্থায় সামনাসামনি আসনে ফল পাইতে পারেন ; এই ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর উরুর উপর বসিবেন এবং তাঁহার গলা বা কাঁধ জড়াইয়া ধরিবেন। স্থূলকায়া রমণী এবং স্থূলকায় পুরুষের বেলায় রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিক বাধা জন্মে। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে ডাঃ কিশ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। স্ত্রী দক্ষিণ পার্শ্বে কাৎ হইয়া দক্ষিণ হাঁটু যথাসম্ভব বুকের দিকে টানিয়া শুইয়া থাকিবেন এবং স্বামী পিছন দিক হইতে মিলিত হইবেন।

স্বামী চিৎ হইয়া শুইলে স্ত্রী তাহার উপর মুখোমুখী বসিলেও উপকার হয়। আবার স্ত্রী বিছানায় মাথা, কনুই ও হাঁটু রাখিয়া নিতম্ব উঁচু করিয়া অবস্থান করিলে স্বামী স্ত্রীর পশ্চাৎ হইতে মিলিত হইতে পারেন।

আগাগোড়া এই আসনে সঙ্গম করা অসুবিধাজনক অথচ গর্ভাধানে এই আসনের উপযোগিতা যথেষ্ট। কাজেই স্বামীস্ত্রী তাঁহাদের পছন্দমতো ও সুবিধাজনক যে কোন আসনে সঙ্গম আরম্ভ করিয়া চরমানন্দ (স্বামীর) হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিলে এই আসন অবলম্বন করিবেন।

গর্ভাধানের সুবিধার জন্য সঙ্গমে যে আসনই অবলম্বন করা হউক না কেন শুধু জরায়ুগ্রীবায় বা জরায়ুমুখে বীর্যপাত হইলেই হইল না, নিষিক্ত শুক্র যাহাতে অনেকক্ষণ জরায়ুগ্রীবায় বা জরায়ুমুখের সংস্পর্শে থাকে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে স্ত্রী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া বীজ গ্রহণ করিবেন তিনি সঙ্গমান্তে স্বামী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও, ওই অবস্থায়ই (চিৎ হইয়া) যতক্ষণ সম্ভব (কমপক্ষে আধ ঘণ্টা) অবস্থান করিবেন—নিতম্বের নীচে বালিশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর সাহায্য হয়। যে স্ত্রী মস্তক, কনুই ও হাঁটু বিছানায় রাখিয়া নিতম্ব উঁচু করিয়া পশ্চাৎ হইতে স্বামীকে মিলিত হইতে দিবেন তিনিও স্বামীর বীর্যপাতের পর ঐ একই ভাবে যতক্ষণ সম্ভব থাকিবেন। যে স্ত্রী চিৎ স্বামীর উপরে বসিয়া সঙ্গম করিবেন তিনি যোনিমধ্যে স্বামীর বীর্যপাত অনুভব করিবামাত্র, স্বামীবক্ষে উপুড় হইয়া শুইবেন এবং সংযুক্ত অবস্থায়ই যতক্ষণ সম্ভব থাকিবেন। স্বামী ও স্ত্রী বসিয়া সঙ্গম করিলে বীর্যপাতের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী চিৎ হইয়া শুইবেন এবং স্ত্রী সংযুক্ত অবস্থাতেই স্বামীবক্ষে উপুড় হইবেন। স্বামীস্ত্রী পাশাপাশি সঙ্গমে রত হইলে সঙ্গমান্তে স্ত্রী একই অবস্থায় অথবা নিতম্বের নীচে বালিশ দিয়া চিৎ হইয়া, যতক্ষণ সম্ভব থাকিবেন। *

* মিলনে আসনকলা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা আমার যৌনবিজ্ঞান ২য় খণ্ডে করা হইয়াছে।

স্ত্রীর যোনিনালী অত্যধিক অম্লভাবাপন্ন হইলে তথায় নিঃসৃত পুরুষের শুক্রকীট অল্পক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। কাজেই গর্ভাধান হইতে পারে না। সঙ্গমের পূর্বে যোনিনালীতে ডাক্তারী ঔষধ Sodium Phosphate অথবা Soda bicarb এর ডুশ দিয়া নিলে উক্ত স্থানের অম্লভাব দূর হয় এবং শুক্রকীট স্বাভাবিক অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া গর্ভাধানে সাহায্য করিতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভোৎপাদন

কৃত্রিম উপায়ে পুরুষের শুক্র স্ত্রীর জরায়ুমুখে পাতিত করিয়াও গর্ভাধানের চেষ্টা করা যায়। ইহকে Artificial Insemination বলে।

অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রী সন্তানোৎপাদনক্ষম কিন্তু পুরুষ সন্তানোৎপাদনক্ষম হইলেও হয়ত ধ্বজভঙ্গের দরুন মিলনে অপারগ অথবা দীর্ঘ বা কুগঠিত যোনি, অথবা জরায়ুগ্রীবার অবস্থানের দোষে শুক্র জরায়ুমুখ হইতে দূরে পতিত হয়, অথবা যদিও স্বামীর স্বমেহনে বা নিদ্রাবস্থায় বীর্যস্খলন হয় কিন্তু মিলন সময়ে হয় না। আবার পুরুষ স্ত্রীলোকের মতই বন্ধ্যাত্ব-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন ;—হয়ত তাঁহার যৌনমিলন ক্ষমতা পুরাপুরিই রহিয়াছে কিন্তু শুক্রকীটে এমন কোন দোষ রহিয়াছে যে জন্য স্ত্রীর গর্ভাধান ঘটে না। পুরুষের শুক্রকীট নির্দোষ এবং স্বভাবত সতেজ ও গর্ভ সঞ্চারক্ষম হইলে, কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীর জরায়ুমুখে উহা নিক্ষেপ (ইন্‌জেক্ট) করিলে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। ইহাকে Artificial insemination by husband, সংক্ষেপে A. I. H বলে।

কিংবা স্ত্রী যদি দৈহিক কোনও কারণে যৌনমিলনে অপরাগ হন, অথবা যোনিপথের যদি কোন অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন পুরুষের শুক্রকীট ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্বেই নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলেও ঐরূপ উপায়ে জরায়ুমধ্যে শুক্র প্রবিষ্ট করাইয়া ইপ্সিত ফল পাওয়া যাইতে পারে।

স্ত্রীলোকের ডিম্বস্ফোটনের সময় মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করিয়া তাহার উর্বর সময়ে উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে ফল লাভ হইতে পারে। স্ত্রীলোকের উর্বর সময়ের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। অন্য সময়ে এই প্রক্রিয়া তত ফলপ্রদ হয় না।

জন্মবিজ্ঞান-বিশারদ কোন ডাক্তারের সাহায্যে এই কৃত্রিম প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। পুরুষ হস্ত ব্যবহার করিয়া কোনও পাত্রে শুক্রপাত করিবেন; অথবা যদি তিনি কোনও কারণে এই ভাবে শুক্রপাত করিতে না পারেন তবে তাঁহার অণ্ডকোষের কোথাও অস্ত্রোপচার করিয়া (কাটিয়া) শুক্র বাহির করিয়া লইতে হইবে। পরে সিরিঞ্জের (Syringe) সাহায্যে জরায়ু মধ্যে শুক্র নিক্ষেপ (ইন্‌জেক্ট) করিতে হইবে। ইহার পর স্ত্রী কিছুক্ষণ চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবেন। অতিরিক্ত পরিমাণে শুক্র জরায়ুতে ইন্‌জেক্ট করিলে উহার মধ্যে প্রদাহ অথবা বেদনা জন্মিতে পারে।

স্বামী বন্ধ্য থাকিলে, অপর কোনও সুস্থ পুরুষের শুক্র ইন্‌জেক্‌সন্ করিয়া স্ত্রী সন্তান লাভ করিতে পারেন। ইহাকে Artificial insemination by donor, সংক্ষেপে A. I. D. বলে।

অধুনা সভ্যজগতের উন্নত দেশসমূহে, (পাক-ভারতেও) সরকারী ব্যবস্থায় নানা কেন্দ্রে গৃহপালিত জন্তুদিগের বংশের উন্নতি বিধানের জন্য, বহু মাইল দূর হইতে উপযুক্ত পুং-জীবের শুক্র সংগ্রহ করিয়া, উপযুক্ত আধার ও তাপে রাখিয়া, বাষ্পীয় অথবা আকাশ-যানে অন্য দেশে প্রেরণ করিয়া উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী পশুর দেহে প্রবিষ্ট করিয়া, উন্নত ধরনের পশু সৃষ্টি করা হইতেছে। মানব জাতির মধ্যেও স্বামীর বীর্য নির্দোষ, অথচ তিনি উহা স্ত্রীর দেহের যথা স্থানে নিক্ষেপে অক্ষম হইলে, তাঁহার বীর্য কৃত্রিমভাবে নিষেক করা (পাক-ভারতেও) খুব প্রচলিত হইয়াছে, এমন কি, স্বামীর বীর্য দোষযুক্ত হইলে, অপর কোন যোগ্য পুরুষের বীজ লইয়া বন্ধ্য স্বামীর স্ত্রীর সন্তান কামনা পূর্ণ করারও বেশ প্রচলন হইয়াছে। ১৯৪১ সালে এ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই শেষোক্ত প্রণালীতে প্রায় ১০,০০০ শিশু জন্মিয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইএর কোনও কোনও চিকিৎসকও ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

চিকিৎসকের স্বামীর শুক্র লইয়া ইনজেক্ট করা তাঁহার এবং স্বামী-স্ত্রী সকলেরই পক্ষে হ্যাঙ্গাম ও কষ্টের ব্যাপার। এবং চিকিৎসকের গোচরে স্বমেহন দ্বারা বীর্যপাত করিতে হইবে, ফলাফল কি হয়, এই ভাবনায় স্বামী হয়ত ঐ ভাবে শুক্রস্খলনে অক্ষমও হইয়া পড়েন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়, এই বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিলাতের Allen and Hansbury কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত একটি সহজসাধ্য কাঁচের পিচকারিতে (Glass insemination syringe) স্বামী, স্ত্রীর উর্বর দিন গুলিতে, স্বীয় শুক্র দিবেন এবং স্ত্রী তাহা

নিজে, যথাযথ আসনে, জরায়ুমুখের নিকট পাতিত করিবেন। অবশ্য চিকিৎসক পূর্বাহ্ণে স্বামী স্ত্রীকে যথা কর্তব্য বুঝাইয়া দিবেন।

এই প্রণালীর (Self insemination) সুবিধা এই যে, ইহা কার্যকরী, ইহাতে বেদনা হয় না, গোপনীয়তা বজায় থাকে, ডাক্তারের সময় ও কষ্ট বাঁচিয়া যায়, সুতরাং গৃহস্থের ব্যয়ও কমই হয়।

বিবিধতথ্য

যৌন প্রজননের সুবিধা

বংশবৃদ্ধির জন্য যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে ; যথা ঃ—

(১) অযৌন বা যৌন মিলন-নিরপেক্ষ প্রজননে শারীরিক ক্ষয় অধিক পরিমাণে হয় কিন্তু যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় তাহা হয় না। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবদেহের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

(২) যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

(৩) যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় **পিতা** এবং **মাতার বংশানুক্রমিকতা** সন্তানে বর্তে। ইহাতে **বৈচিত্র্য** ও **উৎকর্ষের** সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৪) অযৌন প্রক্রিয়ায় মাতৃস্থানীয় জীবের শারীরিক কুগঠন বা অঙ্গবৈকল্য থাকিলে সন্তানের মধ্যে অনুরূপ দোষ, ত্রুটী বা চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে।

(৫) প্রবল যৌনবোধের তাড়নায় স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনমিলনে রত হয়। ইহাতে **দৈহিক** উত্তেজনা শান্ত ও পরম সুখানুভূতি হয় ; আবার প্রজননও সম্ভবপর হয়।

(৬) যৌনমিলনে **মানসিক আনন্দ লাভ হয়। ইহাই দাম্পত্য সুখের মূল উৎস।**

ডিম্বের আয়ু

ডিম্বকোষ হইতে ক্রমান্বয়ে একটি (কদাচিৎ একাধিক) করিয়া ডিম্ব নির্গত হইয়া ডিম্ববাহী নলের মধ্যে আসে এবং সেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে

প্রাণবন্ত হইবার উপযুক্ত থাকে। এই সময়টুকুর মধ্যে যদি পুরুষের শুক্রকীটের সহিত ডিম্বের মিলন ঘটে তবেই গর্ভাধান সম্ভবপর হয়। সাধারণত ফ্যালোপিয়ান নলেই এই মিলন হইয়া থাকে। মতান্তরে, **ডিম্বের প্রাণবন্ত হইবার সময় আরও বেশী।**

ভ্রূণ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির বাধা

উক্ত রূপ মিলন না হইলে ডিম্ব জরায়ু-গহ্বরে আসিয়া পড়িয়া থাকে এবং পরে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলনের পরেও প্রাণবন্ত ডিম্ব জরায়ু গহ্বরের অনুপযুক্ততা হেতু টিকিতে না পারিয়া স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। এরূপ হইলে আর গর্ভাধান হয় না।

উদ্ভিদ, ইতরজীব ও মনুষ্যের ভ্রূণ সৃষ্টির তুলনা

মানুষের প্রাণবন্ত ডিম্বের বিকাশ ও বৃদ্ধির সহিত উদ্ভিদ-জগতে বীজের ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধির তুলনা করা যাক।

আমরা ফুলের পরাগরেণুর স্ত্রীস্তবকে লাগিয়া যাওয়া, উহার ডিম্বাশয়ে পৌঁছান ইত্যাদি কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি এবং এই সংযোগে-ব্যাপারের প্রতিকৃতি চিত্রে দেখাইয়াছি। এই সংযোগের ফলে ফুলের ডিম্বাশয়ে অবস্থিত অসংখ্য ডিম্বক শুক্রকীট দ্বারা প্রাণবন্ত নারীর ডিম্বের মত উর্বরতাপ্রাপ্ত হইয়া **বীজে** পরিণত হয়।

কিন্তু নারীর প্রাণবন্ত ডিম্ব যেমন নারীরই **দেহাভ্যন্তরে** অর্থাৎ জরায়ু মধ্যে (কদাচিৎ অন্যত্রও) বিকশিত ও বর্ধিত হয়, গাছপালার বীজ **মাটিতে** বা ঐরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে চারায় পরিণত হয়। বীজ শুষ্ক অবস্থাতেও বহুদিন পর্যন্ত জীবন্ত থাকে বলিতে পারা যায়। বহুপ্রকার বীজ এই প্রকারে **দুই তিন শত বৎসর** পর্যন্ত প্রাণশক্তি রক্ষা করিতে পারে।

কিন্তু জীবজন্তুর প্রাণবন্ত ডিম্ব খুব বেশীদিন জীবিত থাকে না। কারণ, জীবকোষের স্থায়িত্ব তত বেশী নয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি মৎস্য, ভেক ও পক্ষীর ডিম্ব মাতার দেহের বাহিরে পরিপুষ্ট হইয়া নূতন জীবে পরিণত হয়। গরু, মহিষ ইত্যাদির শাবক আবার মানুষের মতই জরায়ু গহ্বরে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

শুক্রকীটের আয়ু

পুরুষের শুক্রকীট নারীর যোনিনালী এবং জরায়ুর মধ্যে মোটামুটি **৪৮ ঘণ্টা** পর্যন্ত **সতেজ** ও **কার্যক্ষম** থাকে। তবে কাহারও কাহারও মতে আরও বেশী সময় উহারা উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল নারীর যোনিনালীর রস একটু বেশী অম্লভাবাপন্ন, তাহাদের যোনিনালীতে শুক্রকীট-সমূহ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিস্তেজ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

যে সকল শুক্রকীট একেবারে জরায়ু গহ্বরে প্রবেশ করে, তাহারা ঐ স্থানের স্বাভাবিক ক্ষারধর্মী-রসের সংস্পর্শে অথবা ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর আরও দুই চারি দিন হয়ত স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকে।

এই উভয় কারণে সহবাসের সঙ্গে সঙ্গেই বা অব্যবহিত পরেই যে গর্ভাধান হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গর্ভাধান কিছুক্ষণ পরে হইবারই কথা।

ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব

ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে কাহারও গর্ভসঞ্চার হইয়াছে এরূপ কথা খুব কচিৎ হইলেও শুনা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে ডিম্বস্ফোটনের ব্যাপারের সঙ্গে ঋতুস্রাবের যোগাযোগ রহিয়াছে। ডিম্বস্ফোটন প্রথম আরম্ভ হওয়ার পনর দিন পর সাধারণত প্রথম ঋতুস্রাব হয়। তাই ঋতুস্রাবের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পাইলেও ডিম্বস্ফোটনের পরেই পুরুষ-সংসর্গে আসিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বালিকারা ঋতুস্রাবের পূর্বেই গর্ভবতী হইতে পারে। প্রথমবার ডিম্বস্ফোটনের অব্যবহিত পরেই গর্ভাধান হওয়ায় এবং সন্তান জন্মদানের পরেও পুনঃ পুনঃ ঐরূপ গর্ভ-সঞ্চার হওয়ায় এমনও নারী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বহু বৎসর পর্যন্ত ঋতুস্রাব দেখিতেই পায় নাই।

গর্ভাধানের সময়

অনেকের ধারণা যে ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার অব্যবহিত পরে পুরুষ সংসর্গে গর্ভাধান হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার অনেকদিন পর স্ত্রী-সহবাস করিলেও গর্ভাধান হইতে পারে। তবে একথা ঠিক যে ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার অব্যবহিত পরে স্ত্রীলোকের লালসা খুব তীব্র হইয়া ওঠে। গর্ভাধানের উপযুক্ত সময়ের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

বিবিধ যোনিস্রাব

নারীর ঋতুস্রাব সম্পর্কে **শ্বেত প্রদর** (Leucorrhoea) সম্বন্ধেও জানিয়া রাখা ভাল। সাধারণত যোনিগাত্রের ঝিল্লী, জরায়ুমুখ, জরায়ুগাত্র, ফ্যালোপিয়ান নল ইত্যাদি হইতে নিঃসৃত রসে যোনিনালী ভিজিয়া থাকে কিন্তু **নারীর সুস্থ অবস্থায় উহা হইতে কোন রসস্রাব হয় না**। তবে বহু নারী ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরেই অনেক সময় যোনিমুখ দিয়া এক প্রকার সাদা বা পীত বর্ণের আঠালো রস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া থাকে। অত্যধিক পরিশ্রম, স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি এই অবস্থাকে গুরুতর করিয়া তোলে। সাধারণত এইরূপ স্রাবের কারণ জননেন্দ্রিয়সমূহের দুষ্ট বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হওয়া। **গণোরিয়া**, প্রসব বা গর্ভস্রাবের পরে বীজাণু সংক্রমণ, জরায়ুমুখের ক্যানসার ইত্যাদি ইহার প্রধান কারণ।

অনেক সময়ে গর্ভনিবারণ উদ্দেশ্যে যোনি মধ্যে অপরিষ্কৃত রবার পেসারি রাখিয়া দেওয়ায় অথবা পরিষ্কার পেসারিও ক্রমান্বয়ে ২।৪ দিন ভিতরে রাখায় এই অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। স্থানচ্যুত জরায়ুর প্রতিকারকল্পে রবারের রিং পেসারি ব্যবহার করা হয়; এই পেসারির বহির্ভাগ ছিদ্রযুক্ত হইতে থাকে এবং জননেন্দ্রিয়সমূহের নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে দুর্গন্ধময় স্রাবের সূচনা করে। অনেক ক্ষেত্রে যোনিগাত্রে ক্ষত হইয়া উহা হইতে কিঞ্চিত রক্তস্রাবও হইতে পারে। কৃষ্ণাঙ্গিনী অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গিণী নারীদের মধ্যে শ্বেত প্রদরের আধিক্য দেখা যায়।

বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকের বেলায়ই অল্পবিস্তর শ্বেত প্রদরের ভাব দেখা যায়। সামান্য রকমের স্রাবের জন্য বিশেষ ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। পরিমিত বিশ্রাম, উপযুক্ত ব্যায়াম, মুক্ত বায়ু এবং মনের আনন্দ-জনিত স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে কতক ক্ষেত্রে আপনা হইতেই উহা সারিয়া যায়। গুরুতরভাবে দেখা দিলে ইহা **অবহেলা** করা ঠিক নয়; উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। সঠিক কারণ নির্ধারণ করিয়া চিকিৎসকেরা অনায়াসে এই রোগ প্রশমিত করিতে পারেন।

ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে ঋতুস্রাবের অশুচিতা

ইহুদীগণের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত আছে যে ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পর সাতদিন কেহ স্বামীসঙ্গ করিতে পারিবে না। এই রীতি ইহুদীরা পালন করিয়া

থাকেন। যদি কোনও কারণে কোনও স্ত্রীলোকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঋতুস্রাবও হয়, তবুও অন্তত যে পাঁচ দিন স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুস্রাব হইবার কথা ঐ পাঁচ দিনের সঙ্গে আরও সাত দিন যোগ করিয়া মোট বার দিন পরে সহবাসের বিধি আছে। ইহা **অযথা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।** এই প্রথায় ডিম্বস্ফোটনের কাছাকাছি সময় উহাদের মিলন হয় বলিয়া উহাদের নারীর মধ্যে গর্ভাধান বেশী হইয়া থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে ঋতুস্রাবের তিন দিন স্বামীসঙ্গ নিষিদ্ধ। ডাক্তারী মতেও এই মতবাদের অনেকটা সমর্থন পাওয়া যায়। উহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি।

বিনা সঙ্গমে গর্ভ

সুস্থ শুক্রকীটসমূহ অসাধারণ জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন এবং ভীষণ গতিশীল। কতক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে প্রকৃত যৌনমিলন ব্যতিরেকেও শুক্র কেবলমাত্র নারীর ভগদেশে স্থাপিত হইবার ফলেই গর্ভাধান হইয়াছে; সতীচ্ছদ ছিন্ন না হওয়ার দরুন হয়ত পুরুষের জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই, কিন্তু তবুও গর্ভাধান হইয়াছে। বয়স্থ ছেলে মেয়েরা অনেক সময়ে প্রকৃত সম্ভোগ এড়াইয়া মাত্র **বহির্যোনি সঙ্গম** করে। এইরূপ সংস্পর্শে শুক্রপাত হইলে কিশোরী বা যুবতী গর্ভবতী হইয়া যাইতে পারে একথা স্মরণ রাখা উচিত।

নারী জীবনে উর্বর ও 'নিরাপদ' সময়ের নিরুপণ ও তাহার সদ্ব্যবহার

বন্ধ্যত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করা হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারীজীবনে **উর্বর** ও **অনুর্বর** সময় বলিয়া **কোনও পর্যায়** আছে কি না তাহাই এখানে আমাদের আলোচ্য। নারীর ঋতুমাসের যে সময়টিতে সে গর্ভধারণ করিতে অক্ষম তাহাকে **নিরাপদ সময়** বলা হয়।

সুদূর অতীতকাল হইতেই এই কথা সুবিদিত যে, নারীর ঋতুমাসের কোনও কোনও সময়ে গর্ভধারণের সম্ভাবনা সমধিক ও অন্য সময়ে খুব কম। এ কথাও অনেকে বলিতেন যে, ঋতুমাসের মধ্যে এমন এক সময় আছে যখন গর্ভধারণের কোন আশঙ্কাই থাকে না। এই সময়টি নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত বহু চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। এই চেষ্টা যদি সফল হয় তবে দম্পতিদের পক্ষে তাহা যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'নিরাপদ সময়' গর্ভ নিবারণে এবং 'উর্বর সময়' গর্ভোৎপাদনে সহজেই উহাদের কাজে আসিবে।

সূত্রসমূহ

'নিরাপদ সময়' সম্পর্কে তথ্যাবলী :

(ক) প্রত্যেক স্বাভাবিক ও সন্তানোৎপদনক্ষম নারীর জীবনেও এমন এক সময় আছে যখন সে সাময়িকভাবে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। (সাবালিকা হইবার পূর্বে ও একেবারে ঋতু বন্ধ হইবার পরে প্রৌঢ়ত্বের শেষ দিকে নারীর পক্ষে গর্ভধারণের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অতএব সেই সব ক্ষেত্রে জন্ম-নিরোধ করিবার চেষ্টার কোনও আবশ্যকতাই থাকে না)।

(খ) মাসে মাত্র একবার নির্ধারিত পর্যায়ে ডিম্বস্ফোটনের সম্ভাব্যতা ;

(গ) ডিম্বস্ফোটনের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারা ;

(ঘ) ডিম্বের আয়ুষ্কাল ও তাহার প্রাণবন্ত হইবার ক্ষমতার দীর্ঘতা সম্বন্ধে নিভুল জ্ঞান লাভ করিতে পারা ;

(ঙ) স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিবার পর পুরুষের শুক্রকীট কতক্ষণ পর্যন্ত ডিম্বকে প্রাণবন্ত করিতে সক্ষম সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা।

এই তথ্যগুলি নির্ভুলভাবে জানিতে পারা সম্ভব হইলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িবে। সেই অবস্থায় গর্ভধারণের সময়টুকু বাদ দিয়া দম্পতিরা নির্ভাবনায় দাম্পত্যবিহার করিতে পারে।

উপরোক্ত তথ্যগুলির কয়েকটির অনিশ্চয়তার জন্য এককালে বহুলভাবে প্রচারিত 'নিরাপদ সময়' উহার জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে। বহু গবেষণার ফলে নিরাপদ সময়ের জনপ্রিয়তা আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

ডিম্বস্ফোটনের সময় ও সংখ্যা

ডিম্বস্ফোটনের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া এই ঃ নারীর ডিম্বকোষ দুইটিতে রক্ষিত ও ক্রম-পরিপুষ্ট অসংখ্য ডিম্বের মধ্যে একটি পরিপুষ্টি লাভের পর প্রজনন-পদ্ধতির কার্যক্রমে ডিম্বকোষ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ডিম্ববাহী নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে আসে। ইতিমধ্যে পুরুষের শুক্রকীট ডিম্বটিকে যদি সঞ্জীবিত না করে তবে উহা জরায়ু হইতে যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়, যদি করে তবে ডিম্বটি জরায়ুর প্রাচীরের গায়ে নিজের জায়গা করিয়া লয় এবং ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া ক্রমশ ভ্রূণ ও পরে সন্তানের আকার ধারণ করে।

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে একপ্রকার নির্ভুলভাবে জানা গিয়াছে যে ঋতুমাসের মধ্যে **মাত্র একবার** নারীর ডিম্বস্ফোটন হয়। ইহার ব্যতিক্রম কদাচিৎ দেখা যায় ; অতএব ব্যতিক্রমের কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

অতীতকালে ডিম্বস্ফোটনের সময় নির্দেশ লইয়া বহু মতবিরোধ দেখা গিয়াছে। পূর্বে যে সময়টিকে নিরাপদ বলিয়া মনে করা হইত আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে সে-সময়টিতেই গর্ভধারণের সম্ভাবনা সমধিক।

উর্বর ও নিরাপদ সময় সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা

আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাবিতেন, ঋতুস্রাব এবং ডিম্বস্ফোটনের সময় প্রায় এক এবং সে ধারণার বশবর্তী হইয়াই বিশ্বাস করিতেন যে ঋতুস্রাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিম্ব পরিপক্বতা লাভ করে। পৃথিবীর বহু দেশে এই **কৌতুকোদ্দীপক** বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ফলে, ঋতুস্রাবের **অব্যবহিত পরে** নারীর পক্ষে উর্বর এবং দুই ঋতুস্রাবের মাঝামাঝি সময়টিকে লোকেরা নিরাপদ বলিয়া মনে করিত। আধুনিক মত ইহার ঠিক বিপরীত।

'চেয়ারিং ক্রস (Chairing cross) হাঁসপাতালের সুবিজ্ঞ ডাক্তার এ্যামণ্ড রাউথ্ (Dr Amond Routh) 'জন্ম-হার কমিশন' (Birth Rate Commission) এর সম্মুখে মন্তব্য করেন, "এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহ যে, অধিক সংখ্যক নারী ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বে কিংবা পরে গর্ভধারণ করে।" অধুনা এই উভয় সময়কেই নিরাপদ সময় বলা হয়।

১৯২২ সালে সাদারল্যাণ্ড (Sutherland) বেশ জোরের সঙ্গে বলেন যে দুই ঋতুর মাঝামাঝি সময় সম্পূর্ণ না হইলেও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। অথচ বর্তমান মতে ইহাই উর্বর সময়।

আধুনিক মত

কার্ল্ হার্ট্ম্যান (Carl Hertman) বানরীর জীবন আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, যে, উহারা **ঋতুস্রাবের মাঝামাঝি সময়েই** সাধারণত গর্ভবতী হয়। (প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র বানরীরই নারীর মত মাসে একবার ঋতুস্রাব হয়)। নারীর ক্ষেত্রেও এমন হইবার সম্ভাবনা যে সুপ্রচুর, আধুনিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে তাহা দেখা গিয়াছে। জাপানের ওজিনো (Ogino) এবং অষ্ট্রিয়ার নাউস (Knaus) এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। নানা জটিল পরীক্ষার পর তাঁহারা উভয়েই নিম্নোক্ত তথ্যটি নির্ধারণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল অপর অনেক পণ্ডিত কর্তৃক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

তথ্যটি এই ঃ ঋতুস্রাবের ১৪।১৫ দিন আগে নারীর ডিম্বস্ফোটন হয়। ঠিক আগেকার ঋতুস্রাবের প্রথম দিন হইতে ডিম্বস্ফোটনের পূর্ববর্তী সময় ঋতুস্রাবের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা অনুযায়ী এবং অন্যান্য কারণে কম বেশী হইতে পারে। **কিন্তু ডিম্বস্ফোটনের পর হইতে পরবর্তী ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার সময়ের কখনও ব্যতিক্রম হয় না।** প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, ডিম্বস্ফোটনের চৌদ্দ দিন পরে পরবর্তী ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবেই—ইহার অন্যথা নাই।

এই কথাটি পরিষ্কার বুঝিতে হইবে এবং বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ডিম্ব ও শুক্রকীটের আয়ু

আজকাল জীব বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, অপ্রাণবন্ত ডিম্বের আয়ু খুব কম। ডিম্ববাহী নলে অনেকদিন ধরিয়া ডিম্ব পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ডিম্বস্ফোটনের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ডিম্বকে শুক্রকীট প্রাণবন্ত

করিতে **সক্ষম**। এই তথ্যটি সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, **ডিম্বস্ফোটনের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই 'নিরাপদ সময়' আরম্ভ হইল**। শুক্রকীট সম্বন্ধেও পরিষ্কারভাবে জানা গিয়াছে যে, যদিও সহবাসের বহু পরেও শুক্রকীট নারীর যোনিদেশের অভ্যন্তরে জীবিত থাকে তবুও জীবিত থাকিলেই যে ডিম্বকে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি উহাদের থাকে এমন নহে। **শুক্রকীটের ডিম্বকে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশী থাকে না**। সুতরাং 'নিরাপদ সময়' নির্ধারণ করিতে হইলে ডিম্বস্ফোটনের পূর্ববর্তী দুই দিন ও পরবর্তী একদিন বাদ দিলেই চলিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, মাসের মধ্যে মাত্র তিন দিন পুরুষ সংসর্গের ফলে নারী গর্ভধারণ করিতে পারে—ডিম্বস্ফোটনের পূর্ববর্তী দুই দিন এবং ডিম্ব-স্ফোটনের দিন। এই সময়ের পূর্বে ও পরে আরও একদিন করিয়া বাদ দিলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যে সকল নারীর ঋতুস্রাব ২৮ দিনের নিয়মিত ব্যবধানে এবং যাহাদের ২৮ দিনের কম বা বেশী ব্যবধানে কিন্তু নিয়মিতভাবে হয় তাহাদের পক্ষে এই তিনটি বা পাঁচটি দিন বাহির করা কঠিন নয়।

উর্বর দিনের (সুতরাং নিরাপদ সময়েরও) হিসাব করিবার প্রণালী :—

(১) যাহার **নিয়মিতভাবে ২৮ দিন পর পর ঋতু** হয় তাহার কোনও মাসের ১লা ঋতু আরম্ভ হইয়া থাকিলে পরবর্তী ঋতু সেই মাসের (১+২৮=) ২৯ এ হইবে সুতরাং ডিম্বস্ফোটন হইবে (২৯−১৪=) ১৫ই। ডিম্বাণু বাহির হইবার পূর্বে নারীদেহে প্রবিষ্ট শুক্রকীটের আয়ু (অর্থাৎ ডিম্বকে প্রাণবন্ত করিবার উপযুক্ত) বাবদ দুই দিন, ১৩ই ও ১৪ই, প্রাণবন্ত হইবার সময় বাবদ একদিন, অর্থাৎ ১৫ই—এই ১৩ই হইতে ১৫ই পর্যন্ত তিন দিন প্রকৃত উর্বর সময়। সাবধানতা হিসাবে, উক্ত সময়ের দুই সীমায় আরও এক এক দিন যোগ করিলে উর্বর সময় দাঁড়ায় ১২ই হইতে ১৬ই, এই ৫ দিন মাত্র। বাদ বাকি দিনগুলি নিরাপদ সময়। ১২ ও ১৬ হইতে যে দিন যত দূরবর্তী গর্ভনিবারণের পক্ষে সেটি তত বেশী নিরাপদ। ঋতু মাসের শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ ২২ হইতে ২৮—সব চেয়ে বেশী নিরাপদ।

যদি কোনও মাসের ১লা ছাড়া অপর কোনও দিন ঋতু আরম্ভ হয় এবং **নিয়মিত ঋতু মাস ২৮ দিনের কম বা বেশী** হয়, তাহা হইলে উর্বর দিন গণনার প্রণালী পর পৃষ্ঠায় দেখান হইল :—

(২) যাহার নিয়মিতভাবে ২৬ দিন অন্তর ঋতু হয় তাহার যদি ২০শে জুন ঋতু আরম্ভ হয় তবে পরবর্তী ঋতু আরম্ভ হইবে ১৬ই জুলাই। কারণ, জুন মাসের বাকি কয়টি দিন—২০এ হইতে ৩০এ হইল (৩০ – ১৯=) ১১ দিন। নিয়মিত ঋতুমাসের ২৬ দিন হইতে এই ১১ দিন বাদ গেলে থাকে (২৬ – ১১=) ১৫দিন। সুতরাং ২০এ জুন হইতে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত ২৬ দিনের একটি ঋতুমাস সম্পূর্ণ হইল। অতএব পরবর্তী ঋতু আরম্ভ হইবে ১৬ই জুলাইয়ে। সুতরাং, ডিম্বস্ফোটন হইবে ১৬ই জুলাই হইতে ১৪ দিন পূর্বে, অর্থাৎ, (১৬—১৪=) ২রা জুলাই-এ। অতএব প্রকৃত উর্বর সময় হইবে—শুক্রকীটের দুই দিন আয়ু বাবদ, ২রা জুলাই এর ২দিন পূর্ব হইতে, অর্থাৎ ৩০এ জুন হইতে ডিম্ব-স্ফোটনের দিন ২রা জুলাই অবধি। তথাপি, সমধিক নিরাপত্তার জন্য, প্রকৃত উর্বর দিনের উভয় সীমায় এক এক দিন যোগ করিয়া, ২৯এ জুন হইতে ৩রা জুলাই ধরা উচিত। এই দুই তারিখ হইতে যত দূরের তারিখ হইবে গর্ভ নিরারণের পক্ষে তাহা তত বেশী নিরাপদ। উক্ত ঋতু মাসের শেষ সপ্তাহ —অর্থাৎ, ৯ই হইতে ১৫ই জুলাই—সর্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ।

অসুবিধা হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে যখন ঋতুচক্রের সময় মাসে মাসে বদলায় এবং ঋতুস্রাবও খুব অনিয়মিতভাবে হয়। সে সব ক্ষেত্রেও অবশ্য গণনা করিয়া সেই কয়টি দিন স্থির করা সম্ভব।

যথা, কেউ যদি একবৎসর বা ছয়মাসের ঋতুস্রাবের তালিকা রাখিয়া থাকেন এবং ঋতুস্রাবের সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া 'নিরাপদ সময়' সহজেই নির্ণয় করিতে পারেন।

(১) পূর্ববর্তী ঋতুস্রাবের প্রথম দিনের তারিখগুলি পঞ্জিকায় বা ক্যালেণ্ডারে চিহ্নিত করিয়া অথবা কোন খাতায় লিখিয়া রাখুন। (২) সব চেয়ে অল্প ব্যবধানের দিন ধরিয়া এবং (৩) সব চেয়ে বেশী ব্যবধানের দিন ধরিয়া, সামনের দিকে গণনা করিয়া, পরবর্তী ঋতুর ও ডিম্বস্ফোটনের দুই দুইটি সম্ভাব্য তারিখ এবং (একটু পূর্বে দেওয়া দৃষ্টান্তের প্রণালী অনুযায়ী) দুইটি উর্বর সময় নিরুপণ করুন। প্রথম উর্বর সময়ের প্রথম তারিখ হইতে দ্বিতীয় উর্বর সময়ের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়কে সম্ভাব্য উর্বর সময় ধরিতে হইবে নীচে অনিয়মিত ঋতুবতীদের উর্বর সময় ও নিরাপদ সময় হিসাব করিবার একটি উদাহরণ দিতেছি। সামান্য মনোযোগ সহকারে উহা দেখিলে অল্প বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সহজে হিসাব প্রণালী বুঝিতে পারিবেন।

(ক) ধরুন জুন মাসের ১৭ তারিখে পূর্ববর্তী মাসিক **আরম্ভ হইয়াছিল।** আপনি প্রায় ১ বৎসরের লিখিত বিবরণ হইতে দেখিয়াছেন যে, আপনার দুই বারের ঋতুর মধ্যে সব চেয়ে অল্প ব্যবধান ২ দিন এবং সব চেয়ে দীর্ঘ ব্যবধান ৩১ দিনের। **২৭ দিন ব্যবধান ধরিলে,** পরবর্তী ঋতুস্রাবের তারিখ হইবে ১৪ই জুলাই, কারণ, ১৭ই হইতে ৩০এ জুন অবধি হয় (৩০ – ১৬ =) ১৪ দিন। ঋতুমাসের ২৭ দিন হইতে এই ১৪ দিন বাদ দিলে বাকি থাকে (২৭ – ১৪ =) ১৩ দিন। সুতরাং ১৩ই জুলাইএ ঋতুমাস শেষ হইবে। অতএব পরবর্তী ঋতু ১৪ই জুলাইএর পূর্বে নিশ্চয়ই আরম্ভ হইবে না। সুতরাং ডিম্বস্ফোটনও ১৪ই জুলাইএর ১৪ দিন পূর্বে, অর্থাৎ, ৩০এ জুনের পূর্বে হইবে না। অতএব সম্ভাব্য **উর্বর-সময়,** ৩০এ জুনের পূর্বের তিন দিন, ৩০এ ও তাহার পর দিন, অর্থাৎ, **২৭ জুন হইতে ১লা জুলাই** পর্যন্ত।

(খ) এই ভাবে **৩১ দিন ব্যবধান ধরিলে** পরবর্তী ঋতু আরম্ভের তারিখ হইবে ১৮ই জুলাই। কারণ, ১৭ই হইতে ৩০এ জুন অবধি হয় (৩০ – ১৬ =) ১৪ দিন। ঋতুমাসের ৩১ দিন হইতে এই ১৪ দিন বাদ দিলে বাকি থাকে (৩১ – ১৪ =) ১৭ দিন। সুতরাং ঋতুমাস শেষ হইবে ১৭ই জুলাই এবং পরবর্তী মাসিক আরম্ভ হইবে ১৮ই জুলাই। অতএব, ডিম্বস্ফোটন হইবে ১৮ই জুলাই হইতে ১৪ দিন পূর্বে, অর্থাৎ (১৮ – ১৪ =) ৪ঠা জুলাই। তাহা হইলে সম্ভাব্য **উর্বর সময়** হইবে ৪ঠা জুলাইএর পূর্বের তিন দিন, ৪ঠা জুলাই ও তাহার পর দিন অর্থাৎ **১লা জুলাই হইতে ৫ই জুলাই** অবধি।

দেখা গেল যে, ২৭ দিনের ঋতুমাস ধরিলে উর্বর সময় হয় ২৭ জুন হইতে ১লা জুলাই অবধি, এবং ৩১ দিনের ঋতুমাস ধরিলে উর্বর সময় হয় ১লা হইতে ৫ই জুলাই পর্যন্ত। অর্থাৎ, ন্যূনতম ঋতু মাস ধরিলে উর্বর সময় আরম্ভ হয় ২৭ জুনে এবং দীর্ঘতম ঋতুমাস ধরিলে উর্বর সময় শেষ হয় ৫ই জুলাইএ।

সুতরাং যাহার ঋতুমাসের দৈর্ঘ্য ২৭ হইতে ৩১ দিনের মধ্যে উঠা নামা করে, তাহার ঋতু ১৭ই জুন আরম্ভ হইলে **উর্বর সময়** ধরিতে হইবে ২৭এ জুন হইতে ৫ই জুলাই অবধি। যাঁহারা সন্তানকামী এই কয় দিনে তাঁহারা ঘন ঘন মিলিত হইবেন। যাঁহারা সন্তান জন্ম এড়াইতে চান তাঁহারা ঐ কয় দিন সযত্নে পরিহার করিবেন, অথবা গর্ভনিবারণের কোনও উত্তম প্রণালী যথাযথ ভাবে অবলম্বন করিবেন।

প্রত্যহ প্রাতে গাত্র তাপ লিখিয়া ডিম্বস্ফোটনের দিন নির্ণয়

দেখা গিয়াছে যে, ঋতুকালে এবং তাহার পর কিছুদিন (প্রায় ১ সপ্তাহ) পর্যন্ত দেহতাপ যত থাকে ডিম্বস্ফোটনের সময় তাহা অপেক্ষকৃত হ্রাস হয় এবং তাহার পরেই আবার হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত বৃদ্ধি, প্রায় ১৪ দিন অর্থাৎ পরবর্তী ঋতু আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত, প্রায় সেইরূপই বজায় থাকে। (শুধু তাহাই নয়, ডিম্বস্ফোটনের পর স্তন এবং অন্যান্য যৌন যন্ত্র ও অঙ্গগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল পরিবর্তন অল্প দিনই থাকে)।

সুতরাং প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্বে ভাল থার্মোমিটার দ্বারা মুখের তাপ দেখিয়া তাহা কোনও খাতায় লিখিয়া (অথবা গ্রাফ কাগজে অঙ্কিত করিয়া) রাখিলে, ঋতু আরম্ভের প্রথম দিন হইতে গণনা করিয়া, ১২ হইতে ১৬ দিনের মধ্যে যে দিন দেখা যাইবে যে হঠাৎ পূর্ব দিন অপেক্ষা কম তাপ এবং তাহার পর দিনই, শুধু পূর্ব দিন অপেক্ষাই নয়, ঋতু আরম্ভের দিন হইতে এ যাবৎ যত তাপ ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক হইল এবং এই বৃদ্ধি পরবর্তী ঋতু আরম্ভের দিন পর্যন্ত প্রায় এক ভাবেই বজায় থাকিল, তাহা হইলে দুই ঋতুর প্রায় মধ্য-বর্তী সময়ে যে দিনে তাপ হঠাৎ হ্রাস পাইয়া তাহার পর হইতে পূর্ব পূর্ব দিন অপেক্ষা অধিক রহিল সেই দিনই ডিম্বস্ফোটন হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

বরাবর (প্রতিমাসেই) এইভাবে প্রাতঃকালীন তাপ (Basal Body Temperature) দেখিয়া লিখিয়া যাইলে কয়েক মাসের হিসাব দেখিয়া, সাধারণত ঋতু আরম্ভের কত দিন পরে ডিম্বস্ফোটন হয় তাহা জানা যায়।

যাঁহারা উপস্থিত সন্তানের আগমন চাহেন না তাঁহারা উক্ত দিনের ২।৩ দিন পূর্ব হইতে এবং দৈনিক গাত্রতাপ লেখা খাতা (অথবা গ্রাফ কাগজ) হইতে ডিম্বস্ফোটনের দিন বুঝিয়া লইয়া তাহার পর দিন পর্যন্ত সহবাসে বিরত থাকিবেন, অথবা নির্ভরযোগ্য গর্ভনিবারণ পদ্ধতি অতি সাবধানে, অবলম্বন করিবেন। সন্তানকামী দম্পতি উক্ত কয় দিন প্রত্যহ তো বটেই সম্ভব হইলে, একাধিক বার মিলিত হইবেন।

উক্ত পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা

কিন্তু, বলা আবশ্যক যে, ডিম্বস্ফোটন ব্যতীত আরও নানা কারণে গাত্র-তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, যথা, ভাবাবেগ, মানসিক বিপর্যয়, হঠাৎ উত্তেজনা,

অধিক পরিশ্রম ইত্যাদি। সুতরাং, হঠাৎ গাত্রতাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি ডিম্বস্ফোটনের সময় নির্ভুল ভাবে নির্দেশ করে না। ইহা ব্যতীত, ডিম্বস্ফোটনের সময়ের এবং তাহার পরের তাপের হ্রাস বৃদ্ধি সামান্যই হয়।

সুবিধা ও অসুবিধা

(১) এ-কথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে, 'নিরাপদ সময়' বাহির করিবার চেষ্টা সর্বদাই প্রশংসনীয়। এই ব্যাপারে ভেল্ডি, ফিল্ডিং, নরম্যান হেয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত যৌন বৈজ্ঞানিকগণ আগে 'নিরাপদ সময়' এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার পুস্তকে নরম্যান হেয়ার মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ "পরস্পরবিরোধী মতামত উল্লেখ করিবার পর এখন আমাদের মনে স্বতই এ-প্রশ্ন জাগেঃ গর্ভ-নিরোধ যাঁরা করিতে চান তাঁরা 'নিরাপদ সময়'-এর প্রতি কতকটা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন? আমার মনে হয়, খুবই কম। এমন কোন দিন নাই যা কোনও না কোনও বৈজ্ঞানিক দ্বারা কোনও না কোনও যুক্তি অবলম্বনে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে নিরাপদ বলিয়া ঘোষিত না হইয়াছে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী বলিয়া তাঁহাদের কাহারও মতামতই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।"

বর্তমানে ডাক্তার হেয়ারের মতামত কি তাহা আমরা বলিতে পারি না। এ-ব্যাপারে এখনও গবেষণা চলিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে 'নিরাপদ্ সময়' সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইবে আশা করা যায়।

ডাক্তার ভেল্ডি 'Fertility and Sterility in Marriage' (১৯২৯) গ্রন্থে বলিয়াছেনঃ "নিরাপদ সময়'-এর স্বপক্ষে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। গর্ভধারণের পক্ষে কয়েকটি সময় বিশেষভাবে অনুকূল এ-কথা সত্য। এমনও বোধ হয় বলা যায় যে, ঋতুমাসের কয়েকটি দিনে কোনও কোনও নারী গর্ভধারণে অক্ষম তবুও সেই সময় বা দিন সঠিক নির্ধারণ করিবার কোন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।"

ডাক্তার ভেল্ডি সম্প্রতি তাঁহার মত বদলাইয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহার মত আরও অনেক গ্রন্থকার একটি বই লিখিয়া সেইটিই বছরের পর

বছর ছাপাইয়া চলেন, অথচ এ-কথা ভুলিয়া যান যে, ইতিমধ্যে হয়ত অনেক মূল্যবান গবেষণা হইয়াছে যা তাঁহাদের পুস্তকে স্থান পায় নাই।

যাঁহার মত যাহাই হউক না কেন 'নিরাপদ সময়' সম্বন্ধে লোকের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান এত সহজে নিবারিত হইবার নয়। বিজ্ঞান এত সহজে পরাজয় বরণ করিতে চায় না। স্কট (Scott) 'নিরাপদ সময়'-এর ধারণাকে অনেকটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন: "'নিরাপদ সময়'-এর সমস্ত অসুবিধা ও ক্রটীর কথা ধরিলেও নারী এ-সময়টি নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত সজাগ চেষ্টা করিতে পারেন এবং এর উপযোগিতা 'নিরুদ্ধ সঙ্গম'-এর সমব্যবহারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

মাইকেল ফিল্ডিং 'Parethood' নামক গ্রন্থের পূর্ব সংস্করণগুলিতে 'নিরাপদ সময়'-এর ধারণাকে দুএকটি কথায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত পুস্তকের অক্টোবর ১৯৪৪ সংস্করণে তিনি 'নিরাপদ সময়' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "অনেকে জোরের সঙ্গে এই পন্থার স্বপক্ষে বলেন যে, পন্থাটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য; বিপক্ষীয়েরা সমান জোরে এর অনির্ভরতা প্রচার করেন। প্রথম শ্রেণীর লোকদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে, তথাকথিত 'নিরাপদ সময়ে' সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণ হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়; দ্বিতীয় পক্ষের লোকদের এ-কথা মনে করা উচিৎ যে 'নিরাপদ সময়ে, সঙ্গমের ফলে কয়েক ক্ষেত্রে গর্ভধারণ হইলেই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহা হইবে এমন নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের এমন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বোধ হয় নাই যাহা কোনও না কোনও ক্ষেত্রে ব্যর্থ না হইয়াছে।"

(২) গর্ভধারণ সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক মূল্যবান গবেষণা ও তথ্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে। আমরা সে আলোচনা পরে করিতেছি।

(৩) গর্ভধারণের জটিল প্রক্রিয়ায় নারীর ডিম্বের গুরুত্ব সর্বথা স্বীকার্য। গর্ভধারণের সময় যাহাতে ডিম্বের সহিত শুক্রকীটের মিলনের কোনও বাধা না থাকে এবং গর্ভনিরোধের সময় যাহাতে শুক্রকীট কোনক্রমেই ডিম্বের সঙ্গে মিলিত না হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 'নিরাপদ সময়'-এর পন্থা রোমান্ ক্যাথলিকদের কাছে খুব প্রিয়। কারণ একমাত্র এই পন্থাই তাঁহাদের ধর্মে আঘাত না করিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কিন্তু জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মীয় কোনও অনুসাশন মানিবার বাধ্য-বাধকতা থাকা উচিত নহে।

(৪) ইহার একটি মস্ত সুবিধা এই যে, দম্পতিরা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যে সঙ্গম সুখ উপভোগ করিতে পারেন। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য প্রায় সব পন্থাগুলিই ব্যবহারের পক্ষে কম বেশী অসুবিধাকর।

(৫) 'নিরাপদ সময়' যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় এবং পন্থাটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হয় তবে যখন গর্ভধারণের সম্ভাবনা সমধিক খালি সেই সময়টুকু ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য সমস্ত পন্থাগুলিই বর্জন করা যাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে খরচ ও অসুবিধা দুই-ই অনেক কমিবে এবং খরচ কমিবার দরুন দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে তাহা স্বভাবতই অভিপ্রেত হইবে।

অসুবিধা

(১) ঋতুস্রাবের ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে নিয়মিত এমন বলা যায় না। অনিয়মিত ঋতুস্রাবে 'নিরাপদ সময়' নির্ধারণ করা রীতিমত আয়াসসাপেক্ষ। কারণ তখন ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে নানা রকমের যে হিসাব করিতে হয় সাধারণ নারীর সে ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। কেবল বুদ্ধিমতি নারীরাই উক্ত ক্ষেত্রে হিসাব করিয়া 'নিরাপদ সময়' বাহির করিতে পারেন।

(২) প্রসব, গুরুতর পীড়া বা মানসিক ব্যাধির পর অনেক সময় ঋতুস্রাব আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। বুদ্ধিমতী নারীরা পর্যন্ত ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই সব ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের পুনরাগমন পর্যন্ত 'নিরাপদ সময়'-এর সুবিধা লওয়া যাইতে পারে না। পুনরাগমনের পরেও অনেকদিন অপেক্ষা করিয়া নূতন ভাবে ধৈর্য ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা হিসাব করিতে হয়।

(৩) তথাকথিত 'নিরাপদ সময়ে'ও সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণ হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নরম্যান হেয়ারের অভিজ্ঞতা-লব্ধ মন্তব্য এই—"গত পনেরো বৎসরে এমন এক জন নারীরও সন্ধান আমি পাই নাই যিনি সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে কোন নিরাপদ সময়এর প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন; যে সব ক্ষেত্রে সফলতা দেখা গিয়াছিল তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রজনন-শক্তি কম ছিল; কারণ 'নিরাপদ সময়'-এর ব্যবহার ছাড়িয়া দিবার পরেও তাঁহাদের মধ্যে দু'একজনের বহু বিলম্বে গর্ভাধান হইয়াছিল, এবং বাকীজনের একেবারেই হয় নাই।"

(৪) তিনি বলেন যে, **ঋতুমাসের শেষ সপ্তাহে গর্ভাধান হওয়া প্রায় একপ্রকার অসম্ভব।** পরবর্তী গবেষণায় ইহার ভুল ধরা পড়িয়াছে।

অনেক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর আর, এল, ডিকিনসন (R. L. Dickinion) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যে কোনও দিনে গর্ভাধান হইতে পারে। পূর্ববর্তী ঋতুস্রাবের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সত্ত্বেও ১৩৪২টি ক্ষেত্রে একবার সঙ্গমের ফলেই গর্ভধারণ হইয়াছিল।

সঙ্গমের সময়		শতকরা গর্ভধারণের সংখ্যা
ঋতুমাসের	দ্বিতীয় দিবসে	৭·৪
"	চতুর্থ "	১৭·৬
"	চতুর্বিংশ "	১·৩
"	প্রথম সপ্তাহে	৩৭
"	দ্বিতীয় "	৩৫
"	তৃতীয় "	২০
"	চতুর্থ "	৮

বর্তমান লেখকের কয়েকজন বন্ধুও জানাইয়াছেন যে, তথাকথিত 'নিরাপদ সময়'-এর মধ্যে নাকি গর্ভাধান হইয়াছে।

(৪) অসাময়িক, বিলম্বিত কিংবা একই ঋতুমাসে একবারের বেশী ডিম্ব স্ফোটন, শুক্রকীটের দীর্ঘতর জীবন, ডিম্বে দীর্ঘতর প্রাণশক্তি এ-সবের কোনটারই সম্ভাবনা ঠিক উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

(৫) 'নিরাপদ সময়'-এর পূর্ণ নিরাপত্তা সম্বন্ধে যদি মনে খটকা থাকিয়া যায় তবে দম্পতির সংশয়, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ফলে জীবনে শান্তি ও স্বস্তি থাকে না।

(৬) যে সময় গর্ভধারণের সম্ভাবনা সমধিক তাহা এড়াইয়া চলিতে হইবে অথচ এই সময়ে নারীর কামলিপ্সা তীব্র হইতে পারে এবং পুরুষের পক্ষে তাহা তৃপ্ত না করা অন্যায় হইবে। পরন্তু সব পুরুষ এত দিন ধরিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে সক্ষম নাও হইতে পারে। সুতরাং তখন কেহ কেহ অতিরিক্ত মদ্যপান, ব্যভিচার বা গণিকাগমন করিতে পারে।

যে সব অসুবিধার কথা উল্লেখ করা গেল তার প্রত্যেকটারই জবাব দিবার চেষ্টা 'নিরাপদ সময়'-এর উদ্যোক্তরা করিতে পারেন।

(১) 'নিরাপদ সময়'-এর তথ্যাবলী এখনও অবশ্য বহুলাংশে গবেষণাধীন রহিয়াছে, কিন্তু আরও অভ্রান্তভাবে উহাদের স্থিরীকৃত করিবার জন্য যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পদ্ধতিটি পরখ করিয়া দেখিলে সুফল হইতে পারে।

(২) সন্তান-প্রসব প্রভৃতি ব্যাপারের পর অথবা অন্যান্য কারণে ঋতুবন্ধ হইলে, কিম্বা, **দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়** পূর্বাপেক্ষা কম-বেশী বা **প্রত্যেক বারে ভিন্নরূপ** হইতে থাকিলে নিম্নলিখিত ভাবে প্রায় ১২ মাস যাবৎ ঋতু আরম্ভের এবং পরবর্তী ঋতুর পূর্ব তারিখ একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়া ঋতুমাসের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করিতে হইবে ঃ—

ঋতু আরম্ভের তারিখ	পরবর্ত্তী ঋতুর পূর্ব তারিখ	ঋতুমাসের দৈর্ঘ্য
২রা জুলাই	৩০এ জুলাই	২৯
৩১এ ,,	২৮এ আগষ্ট	২৯
২৯এ আগষ্ট	২৪এ সেপ্টেম্বর	২৭

উক্ত ১২ মাস গর্ভনিবারণের কোনও উৎকৃষ্ট প্রণালী যথাযথ ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। এই ভাবে ঋতুমাসের (বা ঋতুচক্রের) ন্যূনতম ও দীর্ঘতম দিনের সংখ্যা নির্ণীত হইবার পর, ইতিপূর্বে দেখান হিসাবের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে শেষের প্রণালীতে হিসাব করিয়া সম্ভাব্য উর্বর দিন গুলি বাহির করিয়া অবাধ সম্ভোগে বিরত থাকিবেন।

(৩) 'নিরাপদ সময়'-এর স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নাই। একবার সঙ্গমের ফলেই গর্ভধারণ হইয়াছিল—ডিকিনসনের এ-কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে হইলে সঙ্গমের পূর্বে এবং পরে মেয়েদিগকে আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিনা দেখিতে হইবে। অন্য পুরুষ বা নিজ স্বামীর বারান্তরের সংসর্গের সম্ভাব্যতা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি ?

(৪) ৪নং অসুবিধাগুলির অনেকটাই এখনও বিরাজমান কিন্তু গবেষণা করিয়া সেগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ব্যতিক্রম সব ব্যাপারেই দেখা দেয়, তবে ব্যতিক্রমকে নিয়ম বলিয়া মানিলে চলিবে না।

(৫) অস্বস্তি জিনিষটি আপেক্ষিক। গর্ভধারণের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিতে হইলে স্বামী বা স্ত্রীর হয় অপারেশন করাইয়া বন্ধ্য হইতে হয়, নতুবা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পন্থার একসঙ্গে একটির বেশী ব্যবহার করিতে হয়। এ-সম্বন্ধে যাঁহাদের খটকা থাকিবে তাঁহারা এই পন্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া অন্য পদ্ধতিও ব্যবহার করিতে পারেন। গর্ভধারণ সম্বন্ধে যাঁহাদের এমন কিছু আশঙ্কা নাই তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে 'নিরাপদ সময়'-এর নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(৬) যে সময় গর্ভধারণের সম্ভাবনা সমধিক সে সময় সংসর্গ হইতে সম্পূর্ণ বিরতি লাভ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষিত পন্থা অনুসরণ করিলেই চলিবে। ধর্মীয় কারণে যাঁহারা অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করিতে অপারগ তাঁহারাও সঙ্গম বাদ দিয়া স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের নিবিড় দেহোপভোগ করিতে পারেন। তাহাতে উভয়েরই অনেকটা তৃপ্তি হইবে।

আমাদের মোটামুটি মন্তব্য এই :

(১) 'নিরাপদ সময়'-এর পরিকল্পনা এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ এবং ইহার স্বপক্ষে আরও বহু তথ্য ও প্রমাণ আহরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই তথ্যগুলি আরও অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হইলে জন্ম-নিরোধ ও সন্তান-লাভ উভয় দিকেই অজস্র উপকার হইবে।

(২) **সর্বসাধারণের ব্যবহারের** জন্য এখনও এই উপায়ের নির্দেশ দেওয়া **সঙ্গত হইবে না**। যত্ন ও কৌশলের সঙ্গে হিসাব করিবার পর কেবলমাত্র বুদ্ধিমান দম্পতিরাই এর উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(৩) যখন গর্ভধারণ কিছুতেই কাম্য নয় তখন কেবল মাত্র এ ব্যবস্থার উপর আস্থা স্থাপন করা কদাপি সমীচীন হইবে না। **যে ক্ষেত্রে গর্ভাধান এমন কিছু আশঙ্কার ব্যাপার নয় সে ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার পরীক্ষা চলিতে পারে এবং চলা উচিত।**

লেখক তাঁহার পাঠক পাঠিকার নিকট হইতে এ পন্থার উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত মতামত শুনিতে ইচ্ছুক থাকিবেন।

তাঁহারা নিম্নোক্ত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন: ঋতুস্রাবের পূর্বে মাত্র এক সপ্তাহ অবাধে মিলিত হউন। অন্যান্য সময় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করুন। প্রত্যেক তিন চার বা বেশী মাস পরে অবাধ সম্ভোগ সুখের মাত্রা একদিন করিয়া বাড়াইয়া দিন এবং এই পরীক্ষার কোন্ মাসে গর্ভধারণ হয় তাহা সঠিকভাবে লক্ষ্য করুন। বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া আমাকে জানান।

অথবা ঋতুস্রাব থামিবার পর তিন দিন অবাধ সম্ভোগসুখ উপভোগ করুন। প্রত্যেক তিন বা চার মাস পরে এক এক দিন করিয়া যোগ করিবার পরে কোন্ মাসে গর্ভধারণ হয় যত্নের সঙ্গে হিসাব রাখুন ও ঠিক ঠিক লিখুন। কারণ এই ব্যাপারে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৪) বিজ্ঞান 'নিরাপদ সময়'-এর তথ্যাবলীকে আরও গবেষণা ও পরীক্ষার পর যখন সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে মাত্র তখনই সর্বসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে পন্থাটি অনুকূল হইবে। **তাহার পূর্বে নয়।**

গর্ভোৎপাদনে উর্বর সময়ের ব্যবহার

কিন্তু গর্ভোৎপাদন ব্যাপারে এই তথ্যগুলি আশু ব্যবহারোপোযোগী। যাঁহাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানলাভ সম্ভবপর হইতেছে না, তাঁহারা (স্বামী স্ত্রী) উভয়েই সুস্থ ও স্বাভাবিক হইলে পূর্বোক্তমতে ডিম্বস্ফোটনের দিন গণনা করিয়া উর্বর সময়টিতে দাম্পত্য-বিহারের মাত্রা বাড়াইলে সুফল পাইবেন আশা করা যায়। অর্থাৎ দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী কয়দিনই গর্ভাধানের উপযুক্ত উর্বর সময় মনে করিয়া সংসর্গ করিতে পারেন। বন্ধ্যাত্ব অধ্যায়ে বিবৃত ক্ষেত্র গুলিতে কৃত্রিম ভাবে স্বামী বা অন্য পুরুষের শুক্রকীট নারীর জরায়ুমুখে ইনজেকসন করিয়া গর্ভোৎপাদন করিবার পদ্ধতিতেও এই উর্বর সময়ের সুযোগ লইতে হয় নতুবা চেষ্টা বিফল হইতে পারে।

(১১)

গর্ভাধান—কল্পিত ও প্রকৃত

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার

কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস চিরকাল মানুষকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছে। ভূত, প্রেত, পরী, জিন, যাদুকর ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্ব কল্পনা মানুষকে এমন ভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, অনেক বিষয়েই তাহাদের বিচার-বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তা, নৈতিক সাহস, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ইত্যাদি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। কুসংস্কার মূলত অজ্ঞতা-প্রসূত; যাহা কিছু দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় এবং আপাতত অতিপ্রাকৃত বলিয়া মনে হয় তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া মানুষের দুর্বল মনে কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার নাগপাশ তাহাকে পিষিয়া মারিয়াছে। ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তন্ত্র-মন্ত্র, কবচ, যাদু, দরগায় শিরণি এবং মন্দিরে পূজা, বলি বা 'হত্যা' দেওয়া কত প্রকার সম্ভব-অসম্ভব উপায় বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের মনকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। কত ভক্ত ফকীর, সাধু, সন্ন্যাসী, ওঝা, হাতুড়ে ডাক্তার ঘরে পড়া হোমিওপ্যাথ কবিরাজ এবং হেকিম যে সরলপ্রাণ মানুষকে ফাঁকি দিয়া আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

গ্রামাঞ্চলে কলেরা বা বসন্তের প্রকোপ হইলে গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলিয়া ফকীর নিযুক্ত করে অথবা ওলাবিবি ওলাইচণ্ডী ও শীতলা মাতার পূজা দেয়। ফকীরের সারারাত জাগিয়া হাঁকাহাঁকিতে লোকের মনে একটি অমূলক প্রবোধ জাগে,—হয়ত যে দৈত্য-দানব বা ভূত-প্রেত কলেরা আমদানী করিয়াছে সে ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! পৌষ মাসে যখন পল্লী অঞ্চলে ধান কাটিবার সময় হয় তখন একদল লোককে ভিক্ষার ঝুলি এবং শিঙা হাতে বাড়ী বাড়ী হাঁক ডাক দিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা নাকি তন্ত্রমন্ত্রবলে শিলাবৃষ্টি থামাইয়া থাকে!

গর্ভাধান সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার

রজঃস্বলা নারীকে ঘিরিয়া কত কুসংস্কার জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার আভাষ আমি পূর্ব অধ্যায়ে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। অস্বাভাবিক উপায়ে **কুমারীর গর্ভবতী** হওয়া, **স্বপ্নযোগে গর্ভ-সঞ্চার,** মাদুলী, তাবিজ, কবজ বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাবে রোগ নিরাময়, **সন্তান-লাভ** ইত্যাদি বহুবিধ আজগুবি ধারণা মানুষের মনে অজ্ঞতা হেতুই বদ্ধমূল হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও রহিয়া গিয়াছে।

মধ্যযুগে * ইওরোপে ডাইনী এবং যাদুকরীর অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিত। মহাকবি সেকস্‌পিয়ারও অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। দৈত্য-দানবের সঙ্গে দল পাকাইয়া ইওরোপের একদল নারী ঐ যুগে নানাপ্রকার যাদু বা অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিত বলিয়া লোকের মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। তন্ত্রমন্ত্র, কবচ এবং মাদুলীর সাহায্যে ইহারা নাকি মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে, ভীষণ ক্ষতিসাধন করিতে এবং ঝড়ঝঞ্ঝা উত্থিত করিতে পারিত। ইহারা নাকি শস্যাদি এবং গো মহিষাদি বিনষ্ট করিতে, শয়তানের সাহায্যে প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইতে, আপনাদের বাসনা চরিতার্থ করিতে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্যক্‌ অবগত হইতে পারিত। ইহারা নাকি সম্মার্জনীর উপর ভর করিয়া বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে ও প্রয়োজন বোধে ইতর জীবে রূপান্তরিত হইতে পারিত।

আমাদের দেশে **ইন্দ্রজাল** বিদ্যার অন্তর্গত **মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, ভূত, প্রেত** বা **ডাইনীর** ভর করা, শিশুদের পেঁচোয় পাওয়া (আসলে কাটা নাভিতে ধনুষ্টঙ্কারের বিষ লাগায় ঐ রোগ প্রকাশ) প্রভৃতিতে এখনও বিশ্বাস আছে। ছোটকালে আমার নিজের মন্ত্রে-তন্ত্রে এত বিশ্বাস ছিল যে ভূত-প্রেত ছাড়ানোর মন্ত্রে প্রায় ৩।৪ খানা খাতা পূর্ণ করিয়াছিলাম!

বস্তুত পক্ষে সমস্ত ইন্দ্রজাল, ভূত, প্রেত তাড়াইবার ফিকির ইত্যাদি অন্ধবিশ্বাস, এবং অনেক ক্ষেত্রে—কপটতার এবং অর্থ, যশ, সম্মান ও প্রতিপত্তি-লাভের লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঠক-পাঠিকা এই সকল কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবেন, আমি ইহাই আশা করি।

---

*রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) হইতে ইওরোপে সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের নব অভ্যুদয়ের (অর্থাৎ Renaissance রেনেসাসে'র) পূর্ব পর্যন্ত সময়কে (১৪৫০ খৃঃ) ইওরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ (middle age) বলে।

কুচক্রী রাসপুটীন

কুখ্যাত, কুচক্রী, মানুষরূপী শয়তান **রাসপুটীনের** (Rasputin) কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহার জীবনেতিহাস অতি বৈচিত্রময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ। * নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার দুঃসাহসিক জীবনের প্রথম অধ্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, তদীয় চাহনী এবং সম্মোহনী (Hypnotic) ইঙ্গিতে সাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করা এবং অলৌকিক ক্ষমতা বলে রোগ নিরাময়, ভবিষ্যদ্বাণী, **নিঃসন্তানকে সন্তান দান** ইত্যাদি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের মনে বিশ্বাস জন্মানো তাহার পক্ষে খুবই সম্ভবপর। রাসপুটীন রাশিয়ার জারিনার (czarina, জারপত্নী) দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—ছোট বড় আরও অনেক রমণী তাহার অসাধারণ সম্মোহনী শক্তির কবলে পতিত হইল। ভণ্ড, লম্পট রাসপুটীন, কল্পিত অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসিনী অসংখ্য নারী সম্ভোগ করিবার সুযোগ হেলায় পরিত্যাগ করে নাই। দুর্ভাগা রমণীকুলকে সে এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিত যে, তাহার সংস্পর্শে না আসিলে তাহাদের উদ্ধার নাই কিংবা ঈশ্বরের দয়া তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না! কত রমণী যে তাহার লালসা তৃপ্ত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভকালে রাসপুটীন রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যাপারেও আশাতীত প্রভাব বিস্তার করে;—জারিনার সাহায্যেই তাহার পক্ষে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হইয়াছিল। রাশিয়ার অধিবাসিগণ তাহার কার্যকলাপে ভয়ানক বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল এবং চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে তাহাকে হত্যা করা হইল।

এইত গেল রুশ সাম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য রমণীর কথা। সাধারণ মানব-সমাজেও যে রাসপুটীনের মত ভণ্ড তপস্বী কত আছে তাহার খোঁজ কে রাখে? আজো অসৎ প্রকৃতির অসংখ্য লোক মানুষের মনে কোন বিশেষ ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মাইয়া সুযোগ মত তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিতেছে!

অলৌকিক গর্ভ

এই পুস্তকে পূর্বেই কুমারীর প্রজননের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নস্তরের কতিপয় জীবের মধ্যেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

*ইহার কীর্তিকলাপের কিছু পরিচয় Rasputin and the Empress নামক চলচ্চিত্রে পাইবেন।

কিন্তু মানব সমাজেও কুমারীর বা অপৈত্রিক প্রজনন সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেক গাঁজাখুরী গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যৌনমিলন নোংরা ও অপবিত্র বিবেচিত হইত বলিয়া অথবা জারজ জন্ম ঢাকিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত বহু অবতার, মহাপুরুষ, দার্শনিক, ধর্ম-প্রচারক, মহাবীর ইত্যাদি কুমারীর অথবা বিবাহিতা নারীর বিনা পতি সংযোগে জন্ম ইত্যকার দাবী করা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ, জরোষ্টার (Zoroaster), টলেমী (Ptolemy), কনফ্যুসিয়াস (Confucius), প্লেটো (Plato), জুলিয়াস সিজার (Julius caesar), মহাবীর, আলেকজাণ্ডার (Alexander), যীশু খৃষ্ট (Christ), রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতির পুরাণ ও উপাখ্যানে দেব-দেবতাদের স্ত্রী থাকার এবং বহু নারী সংসর্গ করার কথা রহিয়াছে। বাইবেলে স্বর্গীয় জীবেরাও মানবনারীর সহিত সংসর্গ করিতে পারে এরূপ ধারণা দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ড এবং মধ্য ইওরোপের কোন কোন দেশে ডাইনী সন্দেহ করিয়া বহু রমণীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। এই সকল ডাইনী নামধারী রমণীকুল প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্বীকার করিয়াছে যে, স্বর্গীয় দূত, শয়তান কিংবা কোন দৈত্য দানব গোপনে এক অদ্ভুত বর্ণনাতীত জীবের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং ফলে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ স্বীকারোক্তি করার ফলে বিচারে তাহাদের ডাইনী সাব্যস্ত করা হইবে এবং সেইজন্য তাহাদের বধ করা হইবে জানিয়াও তাহারা অকপটে এরূপ অদ্ভুত কল্পিত কাহিনী প্রকাশ করিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও ইংল্যাণ্ডের কোনও এক ডাইনীর বিচারে প্রকাশিত হয় যে, ক্রমাগত তিন বৎসর কোনও এক দানবের সঙ্গে সহবাসের ফলে রমণী পর পর তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। সম্ভবত অসতীর কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহারা এরূপ বলিত।

বাস্তবিকই কি কোনও অতিপ্রাকৃত জীব, ভূত-প্রেত, শয়তান, দৈত্য-দানব বা ঈশ্বরের কোন অশরীরী প্রতিনিধি রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়? স্বর্গ হইতে এক ঝলক দিব্যালোক আসিয়া যীশুমাতা মেরীকে **গর্ভবতী** করিয়া দিল, পেটে বাতাস প্রবেশ করার ফলে ক্ষুদিরামের স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন ও পঞ্চপাণ্ডবের জননী কুন্তী ও মাদ্রী দেবতাদের দ্বারা **সন্তানবতী** হইতে পারিয়াছিলেন ইত্যাদি **কাল্পনিক গল্পের** উদ্ভব কি ভাবে হইল তাহা ভাবিবার বিষয়।

পুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শমাত্র, পুরুষের আরাম কেদারায় বসিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া অথবা পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া সদ্য ঋতুমতী নারী গর্ভবতী হইয়াছে এরূপ অলীক রূপকথা ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষেও এককালে প্রচলিত ছিল। সেই সব নারীগণ অবৈধ গর্ভের কথা চাপা দিবার জন্য এরূপ কথা বলিত এবং অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা তাহাই বিশ্বাস করিত।

মধ্যযুগে খৃষ্টীয় এবং বৌদ্ধ জগতে অগণিত সন্ন্যাসীদের মঠ, সন্নাসিনীদের আশ্রম এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিহারে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী মুক্তি-সাধনায় নিরত থাকিত। পঞ্চদশ শতকে ফ্রান্সের আশ্রমবাসিনী রমণীগণ মঠাধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ করিত যে, স্বপ্নের ভূতপ্রেত আসিয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ধর্ষণ করিয়া যায়। বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যেও স্বভাবতই আদিরসের পরিবেশন, প্রেম নিবেদন এবং নৈশ অভিসার চলিত। ফলে গর্ভ-সঞ্চার হইলে তাহা বিনাশের চেষ্টা করা হইত এবং উক্ত চেষ্টা বিফল হইলে সমস্ত দোষ চাপান হইত অপদেবতা ও পুরুষের পোষাক, বিছানা প্রভৃতি স্পর্শ করার উপর।

বিজ্ঞানের অভিমত

প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করা যাক ঃ

(১) ভূতপ্রেত, শয়তান, জিন, দেবতা কিংবা ঈশ্বরের কোনও প্রতিনিধি কোন দিনই সশরীরে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া মানবী সম্ভোগ করে না। ইহাদের অস্তিত্বই কাল্পনিক।

বস্তুত পুরুষের দ্বারাই নারী সন্তানবতী হইয়া থাকে ইহাই বিজ্ঞানের মত। অন্ধ ভক্তেরা ভক্তির পাত্রকে বাড়াইয়া তুলিবার বা ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত করিবার এবং পদস্খলিতা নারী অথবা উপায়হীন আত্মীয় স্বজনের কলঙ্ক ঢাকিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আজগুবি গল্পের অবতারণা ও প্রচার করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আসল পিতার নাম গোপন বা উহার ক্রিয়াকলাপকে গোপন করিবার চেষ্টাও করা হয়।

(২) কতকক্ষেত্রে জারজ সন্তান জীবনে প্রতিষ্ঠাবান বা মহান হইয়া গেলে ভক্তেরা তাঁহাদের পিতৃত্ব দেবতায় বা ঐশ্বরিক উৎসে আরোপ করে। এরূপ ক্ষেত্রে দিব্যালোক বা দুত, ফিরিস্তার মধ্যস্থতার প্রমাণ খাড়া করা হইয়া থাকে।

(৩) পুরাতন ধর্মগ্রন্থে বা উপাখ্যান আদিতে স্বর্গীয় জীবদের বা দৈত্য-দানবের মানবী সম্ভোগের কথা থাকাতে অনেক নারীর মতিভ্রম হইত বা হয়। ইহারা কাল্পনিক স্বপ্নে নিজেদের ধর্ষিতা হইতে দেখে। অবিরত ঐরূপ ধ্যান-ধারণা করিতে করিতে তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় এবং তাহারা নিজেদের ডাইনী শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়া থাকে। অপর কতক নারী অবৈধ গর্ভ হইয়া পড়িলে, নিজ দোষ ঢাকিবার জন্য, ঐরূপ প্রচলিত উপাখ্যানের সুবিধা লইয়া, ঐ ধরণের গল্প রচনা করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন করে।

আমাদের **'ভুল দেখা** অনেকটা **'ভুল ভাবা'র** উপর নির্ভর করে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে পথে পড়িয়া থাকা দড়িকে সাপ মনে করা এবং বাতাসে উহা নড়িলে সাপই দৌড়াইতেছে এরূপ বোধ হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। জ্যোৎস্না রাত্রে বাতাসে গাছের পাতা নড়িলে তাহার ছায়ার নড়া-চড়া দেখিয়া প্রেতিনীর ঘোমটা নড়িতেছে মনে হইতে পারে।

ইহাকে ইংরাজিতে Illusion বলে। মনে এইরূপ ভাব বদ্ধমূল হইয়া গেলে বাড়ির বাহির হইলেই রাস্তায় সাপ দেখা ও ভয় পাওয়া বারে বারেই ঘটিতে পারে। এই অবস্থাকে Delusion বলে। যাহারা ভীরু তাহারা একেবারে ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত দৃশ্য বা মূর্তি দেখিতে পারে। ইহাতে **চক্ষুর ভ্রম** হয় মাত্র। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানঘাটে ভূত চলাফেরা করে এ কথা বিশ্বাস করিলে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি বিকট দৃশ্যাবলী দেখিতেও পারে। ইহাকে Hallucination বলে। বস্তুত ঐরূপ ব্যক্তি ঐরূপ দৃশ্য **দেখে না** কিন্তু **দেখে বলিয়া মনে করে মাত্র**। ইহা চোখের ও মনের ভ্রম।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম ভাগে নায়ক শ্রীকান্তের বাজী রাখিয়া শ্মশানে যাওয়ার সময় নানারূপ দৃশ্য দেখা ও শব্দ শোনার কথা মনে করুন। কোন ভীরু অন্ধবিশ্বাসী লোক ঐগুলি ভূতের কাণ্ড বলিয়াই মনে করিত।

নারীরা অন্ধবিশ্বাস বশত ভূত, প্রেত, জিন বা ফিরিস্তায় বিশ্বাস করিলে উহাদের পক্ষে লম্পট ধর্ষককে নিদ্রার ঘোরে ঐরূপ ভুল দেখা বা কাল্পনিক সম্ভোগ মনে করা আশ্চর্য নয়।

ইহাতে নারীর ভয়, বিক্ষোভ, উত্তেজনা, আনন্দবোধ এমন কি সহবাসজনিত চরম আনন্দ লাভও হইতে পারে। এমন কি কাল্পনিক গর্ভেরও লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু **বাস্তব গর্ভের সঞ্চার হইতে পারে না।**

(৪) **বাস্তব গর্ভসঞ্চারের জন্য পুরুষ সংসর্গ চাই।** সুতরাং যেখানে বাস্তব গর্ভসঞ্চার হয় সেখানে ধরিয়া লইতে হইবে ঃ

(ক) কোনও কুচক্রী পুরুষ নারীকে ঘুমন্ত বা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সম্ভোগ করিয়াছে। দৈত্য, দানবের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারে প্রতারণা করাও অসম্ভব নয়।

(খ) ধূর্ত-নারী চালাকী করিয়া বা অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় লজ্জা গোপন করিবার জন্য নানারূপ কল্পিত কাহিনী উদ্ভাবন করিয়া সরলপ্রাণ আত্মীয়-স্বজন কিংবা বিশ্বাসপ্রবণ সমাজের চক্ষে ধূলি দিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অসহায়া নারীর উপায় কি? আধুনিক যুগেও ভূতপ্রেতের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া স্ত্রী পুরুষের অবৈধ আচরণকে গোপন করিবার চেষ্টা যে না করা হয় এমন নহে। কোনও সুযোগে প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত মিলন ঘটে, প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভ-সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন উপায়? অসহায়া নারী তখন ভান করিয়া ভূতাক্রান্ত হয়।

আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য বিস্তারিত ভাবে প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা করা হইল না। নিম্নে অতি সংক্ষেপে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার বসুর "একান্ত গোপনীয়" পুস্তকে উল্লিখিত একটি সত্য ঘটনা উদ্ধৃত করা হইল।

......আড়াই বৎসরের একটি কন্যা লইয়া পল্লীগ্রামের জনৈক রমণী বিধবা হইয়াছিল; বয়স তাহার কুড়ি একুশের বেশী হইবে না। স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পর হইতেই সে প্রায় প্রত্যহ নাকি মৃত স্বামীকে স্বপ্নে দেখিতে পাইত। একদিন মৃত স্বামী নাকি স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বধূকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি এখনও পার্থিব কামনা এবং বাসনার অতীত হন নাই; রক্ত মাংসের মানুষের মতই তাঁহার ভোগের ইচ্ছা আছে।

পরদিন প্রভাতে জাগিয়া বধূটি সর্বাঙ্গে রমণের চিহ্ন দেখিতে পাইল! সে নাকি নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে পূর্ব রাত্রে তাহার মৃত স্বামীর সঙ্গে স্বপ্নে মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বধূটি এই ব্যাপার বড় জা এবং ননদকে খুলিয়া বলিল। উক্ত বধূটি যে ঘরে শয়ন করিত ঐ ঘরে তাহার শাশুড়ী এবং প্রায় পরিণত বয়স্ক সুস্থকায় **ভাসুর পুত্রও** শয়ন করিত।

কিছুদিন পরে বধূটির গর্ভলক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল। পাড়ার লোকের মনে বিশ্বাস জন্মান হইল যে, স্বপ্নাবস্থায় মৃত স্বামীর সঙ্গে সহবাসের ফলেই গর্ভাধান হইয়াছে! সকলে বধূটিকে নির্দোষ বলিয়া মানিয়া নিল। যথাসময়ে সে একটী সুশ্রী পুত্র সন্তান প্রসব করিল।.........

উক্ত বধূর পুত্র সন্তানটির পিতা কোন ভূত, প্রেত, অতিপ্রাকৃত জীব বা মৃত স্বামীর রূপান্তরিত কোন প্রেতাত্মা নয়। উক্ত ভাসুর পুত্রের সঙ্গে অথবা অন্য কোনও রক্ত-মাংসের **মানুষের** সঙ্গে তাহার **মিলন ঘটিয়াছে** এবং লোক লজ্জা ভয়ে একটি **মিথ্যা কাহিনীর** সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(গ) অবতার বা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত লোকদের ভক্ত ও শিষ্যেরা সাধারণ দেহ মিলনকে ভ্রান্তভাবে ঘৃণ্য, নোংরা ও পাপজনক মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের গুরু বা প্রভুর জন্ম দেহমিলন ব্যতিরেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে হইয়াছে এইরূপ প্রচার করেন। যীশুখৃষ্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার স্ত্রী সারদামণি ('শ্রীমা') প্রভৃতির জন্ম কাহিনী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

ভূত, প্রেতের পৌরাণিক কাহিনী আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে লোকের মনে কি করিয়া স্থান পায় ইহা আশ্চর্যেরই বিষয়। মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা গর্ভোৎপাদন করিতে পারে না। **ভূতের অস্তিত্ব মোটেই নাই**; কিংবা থাকিলেও মানুষের জীবনের সঙ্গে তাহার **কোনও সম্পর্ক নাই**।

মিথ্যা কল্পিত কাহিনী ব্যতীতও মানব মনের এক বা একাধিক প্রদমিত ইচ্ছার বিকৃত স্ফুরণ কখনও কখনও বা কাল্পনিক মূর্তি ধারণ করিয়া ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আবেগশীল, ভয়কাতর রমণীরা পুনঃ পুনঃ কোনও এক বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে করিতে আত্মাভিভাবন (auto-suggestion) বা আত্ম-সম্মোহনের আবেশে কল্পিত ছায়া বা মূর্তির অস্তিত্ব অনুভব করে কিংবা আবিষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। একটু পূর্বে কি করিয়া এই সকল ভুল ধারণা হয় তাহা বলিয়াছি।

কাল্পনিক গর্ভ

সন্তানকামী রমণী ক্রমাগত গর্ভের বিষয় চিন্তা করিয়া স্বপ্নসঙ্গমের ফলে হয়ত বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে **কাল্পনিক গর্ভের** সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র। **এসব ব্যাপারে ভূত-প্রেতের কোন হাত নাই।**

মাঝে মাঝে কাল্পনিক গর্ভ এদেশে এবং অন্যান্য দেশের মেয়েদের মধ্যে হইতে দেখা যায়। বাঞ্ছিত গর্ভের বিষয় গভীর চিন্তা করিবার ফলে কিংবা গর্ভভীতি হইতেও কাল্পনিক গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। ভূত-প্রেতের অলীক কল্পনায় বিভোর রমণীর মন স্বতই মিথ্যা গর্ভরূপ অবাঞ্ছিত ব্যাধিতে ভুগিতে পারে। অবশ্য লজ্জাজনক কোনও ঘটনা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে ভূত-প্রেত বা অন্য কোনও অতিপ্রাকৃত জীবের উপর যে দোষ চাপান হয় তাহার বিষয় স্বতন্ত্র।

কোনও কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হইলেই অনেকে আশা বা ভয় করিয়া বসে, নিশ্চয়ই ইহা গর্ভলক্ষণ। তখন রমণী হয়ত কাল্পনিক গর্ভাধানের স্বপ্ন দেখে। গর্ভের বাহ্য-লক্ষণও দুই চারিটা তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, যথা, অরুচি, বমন, উদরের আকার-বৃদ্ধি (মেদবৃদ্ধিজনিত) এবং সর্বশেষে বাস্তবিকই একেবারে বেদনা! কিন্তু পরে জানা যায় যে, হয়ত কয়েক দিন তাহার **কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই**। কোষ্ঠ-কাঠিন্য সারাইবার পরে দেখা যায় যে আবার স্বাভাবিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে। অনেক রমণীর ঋতুস্রাব নানা কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে কিন্তু পরে আবার যথারীতি আরম্ভ হয়।

কাল্পনিক গর্ভের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

ইংল্যাণ্ডের **রাণী মেরী** ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। স্পেনের রাজা ফিলিপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। রাণী অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিতেও তিনি কসুর করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর একজন ক্যাথলিক ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন করে ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। কিন্তু তদবধি তাঁহার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। পুত্র সন্তানের জন্য তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। হঠাৎ তাঁহার ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া গেল; স্তনদ্বয় স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠিল; এবং বৃন্তদ্বয়ের চতুষ্পার্শ ক্রমশ বিবর্ণ হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে তাঁহার ভীষণ বমি-বমি ভাব দেখা দিল এবং তলপেট বৃহদাকার ধারণ করিল।

তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে এই ধারণা রাজপরিবারের সকলের মনে বদ্ধমূল হইল। রাণী মেরী রাজকার্য ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য কাঁথ জামা, টুপী ইত্যাদি সেলাইএ মন দিলেন। নবম মাসের শেষ ভাগে একদিন রাত্রে হঠাৎ টাওয়ার অব লণ্ডন হইতে মঙ্গলসূচক ঘণ্টাধ্বনি করা হইল

রাণীর প্রসব বেদনার খবর পোপের নিকট পৌঁছাইতে রাজদূত ধাবিত হইল। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ সেন্ট্ পলের গীর্জায় নবজাত শিশুর উদ্দেশে আশীর্বাদ সূচক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিবেন মনে করিয়া অনেকে সেখানে দৌড়াইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ কি! **কৃত্রিম প্রসব বেদনা** মুহূর্ত মধ্যে দূর হইয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া রাণীর মিথ্যা গর্ভের কথা শুনিল। লজ্জায় দুঃখে এবং গভীর অনুশোচনায় রাণীর হিষ্টিরিয়া দেখা দিল।

সম্প্রতি আমার একজন সহকর্মীর স্ত্রী বহুদিন পরে পুনরায় গর্ভবতী হইয়াছেন এই ধারণা করিয়া বসেন। স্ত্রীটির বয়স প্রায় ৪০।৪১ বৎসর হইবে। ঋতুবন্ধ, উদর বড় হওয়া এবং এমন কি পেটের মধ্যে নড়াচড়ার লক্ষণও নাকি পরিলক্ষিত হয়! নিতান্ত সংরক্ষণশীল হওয়ায় ডাক্তার বা ধাত্রী-দের পরামর্শ লওয়া সমীচীন মনে করা হয় নাই। অবশেষে দশম মাসে প্রসবের সমস্ত আয়োজন পর্যন্ত করা হয়! যখন একাদশ মাসও অতিক্রান্ত হইয়া যাইতে লাগিল, তখন এক বান্ধবীর কথায় চৈতন্য হইল! ডাক্তার দেখিয়া গর্ভের কোনও অস্তিত্বই পাইলেন না! ইহার পরে তাড়াতাড়ি পেট কমিয়া স্ত্রীটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিলেন!

প্রকৃত গর্ভাধান

প্রকৃত গর্ভাধান একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। **পূর্ব অধ্যায়েই** আমি প্রকৃত গর্ভাধানের প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য এখানে সংক্ষেপে উহার পুনরালোচনা করিব মাত্র।

(১) সাধারণত মিলনে পুরুষের **শুক্র** নারীর যোনিনালীতে স্খলিত হয়।

(২) শুক্রস্থিত অসংখ্য **শুক্রকীট** বিচরণ করিতে করিতে জরায়ুমুখ হইয়া জরায়ুমধ্যে এবং তাহার দুই পার্শ্বস্থ দুইটি **ডিম্ববাহী নলে** পৌঁছে।

(৩) নারীর **ডিম্ব ডিম্বাশয়** হইতে বাহির হইয়া **ডিম্ববাহী নলের** ভিতর দিয়া জরায়ুর দিকে আসিতে থাকে।

(৪) শুক্রকীটগুলি উক্ত নলের মধ্যে ডিম্বের সংস্পর্শে আসিলে সাধারণত একটি মাত্র শুক্রকীট উহাতে ঢুকিয়া যায় এবং ডিম্বটিকে প্রাণবন্ত করে।

(৫) প্রাণবন্ত ডিম্ব তখন বিভক্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে জরায়ু মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং জরায়ুর কোমল (বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল) গাত্রে প্রোথিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৬) ইহার পরে জরায়ু মধ্যেই ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি হইতে থাকে।

প্রাণবন্ত ডিম্ব জরায়ুমধ্যে স্থানলাভ করার সময় হইতেই নারীর গর্ভাধান হইল বা নারী গর্ভবতী হইল বলা যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা

পাঠক-পাঠিকারা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি **বিভিন্ন**, সুনির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সংজ্ঞা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন এবং স্মরণ রাখিবেন।

যখন উচ্চস্তরের বিভিন্ন লিঙ্গের দুইটি প্রাণী, বিশেষ করিয়া বংশবৃদ্ধির প্রাকালে (Breeding season), একে অন্যের সঙ্গকামনা করিয়া পরস্পরের প্রতি **যৌন আকর্ষণ** বশত একত্র হয়, তখন তাহাকে **যৌন-সাহচর্য** (Mating) বলা হয়।

পরস্পরের বাসনা উদ্দীপিত করিবার জন্য উহাদের **নৃত্য, সাজ-সজ্জা** বা **গানের অভিনয়কে** আমরা **যৌন-উপগমন কেলি**, আদর, সোহাগ, কামক্রীড়া, **প্রেমক্রীড়া** বা **শৃঙ্গার** (Courtship) বলিতে পারি।

উহাদের **পরস্পরে উপগত** হওয়াকে **যৌনমিলন, গমন, মিলন, রতিক্রিয়া, সুরত, সঙ্গম, সহবাস, বিহার, রমণ,** সংসর্গ (Pairing, Coitus, Cohabitation, Copulation, Mating বা Sexual intercourse) প্রভৃতি বলা হয়।

পুরুষের সুস্থ শুক্রকীটপূর্ণ শুক্র নারীর জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হওয়াকে **শুক্রগ্রহণ** (Insemination) বলে।

উদ্ভিদ্‌জগতে পুংপুষ্প হইতে পুষ্পরেণু স্ত্রীস্তবকে লাগিয়া যাওয়াকে **পরাগ সংযোগ** (Pollination) বলে।

নারীর **ডিম্বকোষ** হইতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ডিম্বের বহির্গমনকে **ডিম্বস্ফোটন** (Ovulation) বলা হয়।

শুক্রকীট ডিম্বে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে উর্বর বা প্রাণবন্ত করিয়া ভ্রূণ সৃষ্ট হওয়াকে **ডিম্বের উর্বরতাপ্রাপ্তি** (Fertilisation) বলা হয়।

এরূপ প্রাণবন্ত ডিম্বকে **আদিম ভ্রূণ** (Zygote) বলা হয়।

প্রাণবন্ত ডিম্ব জরায়ু মধ্যে **প্রোথিত** হইলে নারীর **গর্ভাধান** (Imperegenation) হইল বলা যায়।

জরায়ুগাত্রে ভ্রূণের প্রোথিত হওয়াকে **বাসা বাঁধা** (Nidation) বলে।

গর্ভাধানের **পর** হইতে **প্রসবকাল পর্যন্ত সময়কে গর্ভকাল** (Period of gestaion) বলা হয়।

প্রসব বেদনাকে 'ব্যথা' (Labour) বলা হয়।

সন্তানের **ভূমিষ্ঠ হওয়াকে প্রসব** (Parturition বা delivery) বলা হয়।

জরায়ু ব্যতীত **অন্যখানেও** প্রাণবন্ত ডিম্ব স্থান লাভ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং কচিৎ হইয়াও থাকে। ইহাকে **আস্থানিক গর্ভ** (Extra-uterine pregnancy) বলা হয়।

তিন মাসের মধ্যে অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসবকে **গর্ভপাত,** (Aborotion) **তিন** হইতে সাত মাসের মধ্যে হইলে **গর্ভ নষ্ট** (Miscarriage), এবং **অষ্টম বা নবম** মাসে অকালে বা **পূর্ব্বাহ্ণে প্রসব** (Premature delivery) বলা হয়।

প্রসবের প্রারম্ভে **জরায়ুর নীচে নামা** কে (Obliquity of the uterus at term) বলে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রসবের সময় **সন্তানের নিম্নমুখী** ও **জরায়ুর ঊর্ধমুখী** চাপকে (General Intra-uterine pressure) বলা হয়।

প্রসবের প্রথম স্তরে **জরায়ু মুখের উন্মুক্ত হওয়া** কে (Dialation of cervix in primipara) বলে।

গর্ভস্থ ফুল কে (Placenta) এবং **নাভিরজ্জুকে** (Umbilical cord) বলা হয়।

(উপরোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে করিয়াছি। সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট দেখুন।)

গর্ভ লক্ষণ ও নির্ধারণ

পুরাকালে গর্ভ নির্ণয়ের প্রণালী

গর্ভাধান হওয়া মাত্রই যে নারী বা পুরুষ বুঝিতে পারে, তাহা নহে। **সাধারণত তাহারা বুঝিতেই পারে না যে কখন গর্ভাধান হইল।** পুরাকালে গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পরীক্ষা অবলম্বন করা হইত। এ স্থলে দুই একটির বিবরণ দিতেছি।

(১) একটি পিতলের পাত্রে সন্ধ্যাকালে গর্ভিণীর মূত্র রাখিয়া সারারাত্রি উহার মধ্যে একটা লোহার পেরেক ডুবাইয়া রাখা হইত। যদি প্রকৃত গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকিত তবে পেরেকটি নাকি লাল হইয়া যাইত।

(২) কোনও কোনও দেশে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রমণীর কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলা হইত। ফোঁটাগুলি যদি পাত্রের তলায় ডুবিয়া যাইত তবে উহা গর্ভিণীর রক্ত বলিয়া সাব্যস্ত করা হইত।

(৩) কোথায়ও চক্ষে ঈষৎ মেটে সিঁদুর দেওয়া হইত। যদি কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইত যে, রমণী চক্ষের পাতার নীচে উত্তাপ বোধ করে না, তবে ধরিয়া লওয়া হইত সে গর্ভবতী।

(৪) কোনও কোনও ধাত্রী স্ত্রীলোকের যোনির ভিতর রসুন কিংবা কোনও সুগন্ধি দ্রব্য রাখিত। এইভাবে শরীরের নিম্নভাগ হইতে উপরের দিকে নাকি গন্ধ ছড়াইত। রমণী সেই দ্রব্যের গন্ধ পাইলে মনে করা হইত সে গর্ভবতী।

এই সকল সূত্রের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। প্রাচীন কালে নানা দেশে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি অপরাধী কি না নির্ণয়ের উপায়গুলির মতই মিথ্যা।

প্রকৃত গর্ভ লক্ষণাদি

ভ্রূণের ক্রমবিকাশের সহিত গর্ভধারিণীর শরীরে যে সমস্ত লক্ষণের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে, উহাকে **গর্ভ লক্ষণ** বলা হয়।

সন্তান ধারণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবের দিন পর্যন্ত সময়কে গর্ভকাল বলা হয়। বিভিন্ন নারীর গর্ভকালের সময় বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু সাধারণত গর্ভের স্থিতিকাল শেষ ঋতুর প্রথম দিন হইতে দশ ঋতু মাস বা দশ চান্দ্র মাস অর্থাৎ ২৮০ দিন।

এই দশ মাসের প্রত্যেক মাসেই নারীদেহে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বহু পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন সময় ও অবস্থাবিশেষে সর্ব দেহের উপর হইলেও সাধারণত জননেন্দ্রিয়সমূহেই পরিবর্তনের প্রকোপ বেশী হয়।

ঋতুবন্ধ। সর্বপ্রথম গর্ভলক্ষণ মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া। স্বাস্থ্যবতী নারী মাত্রেরই গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক বন্ধ হইয়া যায়। রুগ্না ও দুর্বলা নারীতে এই অবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে। ইহাদের বেলায় গর্ভাধান ব্যতিরেকেও ঋতুস্রাব বন্ধ হইতে পারে এবং গর্ভাধানের পরেও প্রথম তিন মাস পর্যন্ত অল্প অল্প মাসিক স্রাব হইতে পারে। নানা কারণে সাময়িকভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া আবার যে যথারীতি আরম্ভ হইতে পারে এ কথার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। কিন্তু দুই একটি বিশেষ রুগ্না স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর সকলেরই, বিশেষ করিয়া যদি পূর্বে নিয়মিত ভাবে উহা হইয়া থাকে এবং গর্ভনিবারণের চেষ্টা না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উহা বন্ধ হওয়াকে গর্ভলক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রসবের পর সন্তানকে দুধ দিবার সময়ে অনেক নারীরই ২।৪ মাস মাসিক বন্ধ থাকে। আবার মাসিক আরম্ভ না হইবার পূর্বেই যে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না এমন নহে। ডিম্বস্ফোটন হওয়ার পরে এবং মাসিক আরম্ভ হইবার পূর্বেই গর্ভসঞ্চার হইয়া গেলে আর মাসিক দেখা দিবে না। এই অবস্থায় **ঋতুবন্ধের** লক্ষণ আর ধর্তব্য হইবে না। অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া গর্ভনির্ধারণ করিতে হইবে

গা-বমি। গর্ভসঞ্চারের সপ্তাহেই (অর্থাৎ প্রথম ঋতুবন্ধের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে) চারি হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। এই বমন-ভাব সাধারণত প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর হইয়া থাকে। যদি দিনের মধ্যে একাধিক বার হয়, অথবা দেড় মাসের বেশী থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার কারণ স্নায়বিক ও মানসিক, কেবলমাত্র শারীরিক নয়।

প্রথম গর্ভিণীদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর এই অবস্থা হয়। পরবর্তী গর্ভকালে সাধারণত ইহা কম দেখা যায় এবং একেবারে নাও হইতে পারে।

জরায়ু এবং হজম-ক্রিয়ায় সাহায্যকারী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই জরায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর মুখে ক্রমাগত জল উঠে, থুথু ফেলিতে ইচ্ছা করে এবং মাথা ধরে; অনেক সময় বমিও হইয়া থাকে। **শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি গর্ভিণীর মোটেই গা-বমি ভাব হয় না।**

দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গা-বমি-বমি ভাব দেখা যায়; অথচ সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই ভাবের উদ্রেক হওয়ার কোনও কারণই নাই। **স্বাস্থ্যবতী** নারীর পক্ষে এই ভাবের উদ্রেক হইবার কোনও **শরীরগত কারণ** নাই; সাবধানতার সহিত **নিয়ম** পালন করিলে গর্ভিণী **অনায়াসে রেহাই** পাইতে পারে।

গা-বমি ভাব নিবারণের নিয়মাবলী

পরিচ্ছদ—বালিকাদের করসেট বা শক্ত কোমরবন্ধ পরিবার কদভ্যাস এই ভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং গর্ভিণীর সকল প্রকারের ভারী বা আঁটসাট জামা-কাপড় বা কোমরবন্ধ পরিধান বর্জন করা উচিত। হাল্কা জামা বা কাপড় পরিতে হইবে। **উঁচু-হীলের জুতা পরিত্যাগ** করিয়া সাধারণ জুতা, শ্লিপার, চটি বা চপ্পল পরা উচিত। গায়ের কাপড় এত ঢিলা হওয়া উচিত যাহাতে একটি প্রজাপতি শরীরের সর্বস্থানে সহজে বিচরণ করিতে পারে।

(২) **খাদ্য**—গুরুপাক এবং অতিরিক্ত সিদ্ধ করা খাদ্য-দ্রব্য বর্জনীয়। লঘুপাক এবং সহজপাচ্য জিনিষ খাওয়া উচিত। খাদ্যের মধ্য হইতে স্নেহপদার্থ বা চর্বিজাতীয় সব কিছু (যথা তৈল, বনস্পতি, ঘি, মালাই, মাখন, ঘৃত) বাদ দিয়া কার্বোহাইড্রেট্ এর (অর্থাৎ শ্বেতসারের যথা চাউল, আটা, আলু, গুড় প্রভৃতির) পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে হয়।

(৩) **কমলার রস**—প্রত্যুষে চায়ের বদলে দুই তিনটি কমলা লেবুর রস গ্রহণ করা উচিত।*

* জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন: "এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ মনে পড়িয়া গেল। আমার পরিচিতা জনৈকা যুবতী তাহার প্রথম গর্ভাবস্থায় অনেকদিন পর্যন্ত বমন ও গা-বমি-বমিতে ভুগিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী এবং প্রায় পূর্ণগর্ভা। এবার একদিনের জন্যও তাহার বমি দূরের কথা, গা-বমি-বমি ভাবও হয় নাই। অনুসন্ধানে জানা গেল, তাঁহার স্বামী (কিছু না জানিয়াও) প্রত্যহ সকালে স্বহস্তে এক গ্লাস কমলা লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতেন।"

(৪) **সাহস**—ডাঃ ভেল্ডির মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিরক্তিকর অবস্থার সহিত গর্ভিণীর মনের সম্পর্ক রহিয়াছে। "অনেকেরই হইয়া থাকে, সুতরাং আমারও হইবে"—এই ধারণা ও বিশ্বাসের ফলে সামান্য শরীরগত উত্তেজনাতেই ইহার উদ্রেক হয়। এই জন্য বারবার এইরূপ চিন্তাই করিতে হয়—"অনেকেরই তো হয় না, আমি যদি যোগ্য ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ সযত্নে পালন করিয়া চলি তবে আমারও হইবে না। "আমি সুস্থ আছি ও আরাম বোধ করিতেছি।" ফলকথা, গর্ভিণী এই অবস্থার কথা **ভুলিয়া** থাকিতে চেষ্টা করিবে।*

তবে বাস্তবিকই কোন শারীরিক কারণে এই অবস্থার **গুরুতর** উপসর্গ দেখা দিলে, **ডাক্তারের পরামর্শ** গ্রহণ করিতে অবহেলা করিতে নাই।

(৫) **শয্যাত্যাগের পূর্বে**—সামান্য ক্ষেত্রে, বিছানা হইতে উঠিবার পূর্বে কিছু খাওয়া ভাল (যথা, পাতলা বা নরম চা, বিস্কুট, টোষ্ট, ডিমের পোচ—ঘিয়ে অথবা জলে—অর্ধসিদ্ধ ডিম অথবা ডিমের অমলেট, নারিকেল-মুড়ি, ঘিয়ে-ভাজা চিঁড়া রাত্রে ভিজান ছোলার সহিত আদা ও লবণ, অথবা গুড়, কমলার রস, দুধ, সাগুদানা, অল্প ফেন-সমেত ভাত, রুটি অথবা লুচি) এবং খাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরে খুব **আস্তে আস্তে** গাত্রোত্থান করা উচিত।

প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্বেই এক গ্লাস জলের সহিত অর্ধ-চা-চামচ পরিমাণ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট মিশাইয়া সেবন করিলে অনেক সময় এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত জল পান করিলে বমি হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে পাকস্থলী ধৌত হইয়া যায় এবং সারাদিন আর বমি হয় না।

(৬) **বিশ্রাম** করিলে এবং তলপেটে হাত বুলাইলে (Massage) অনেক সময় উপশম হয়।

(৭) স্মেলিং সল্ট্ (Smelling salt) কিংবা পেপারমিণ্ট্ (Peppermint—সাধারণ ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য)—ব্যবহারে উপকার হয়।

---

* জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখেন "এ প্রসঙ্গেও একটি উদাহরণ মনে পড়িয়া গেল। জনৈকা প্রথম গর্ভিণীর গর্ভের ৪র্থ বা ৫ম সপ্তাহের পর পর দুই দিন গা-বমি ও একদিন বমন হয়। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে তিনি গর্ভিণী নহেন এবং ঐ অবস্থা তাঁহার জ্বরজনিত দুর্বলতার জন্য হইয়াছে। ঋতুবন্ধেরও ঐরূপ একটি কারণ দর্শান হয়। ইহার পর তাঁহার আর একদিনও গা-বমি বা বমন হয় নাই। পরে অবশ্য তিনি জানিতে পারেন যে তিনি গর্ভবতী।

(৮) সিকি ছটাক (অর্ধ আউন্স) Mead's Casec অথবা Plasmon (অর্ধ পাইণ্ট) পাঁচ ছটাক দুধের সহিত মিশাইয়া সকালে গাত্রোত্থান এবং রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে গ্রহণ করিলে উপকার হয়। ইহা তিন, চার বা ততোধিক দিন সেব্য। প্রথমবার গ্রহণে বমি হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেবন করিতে হয়।
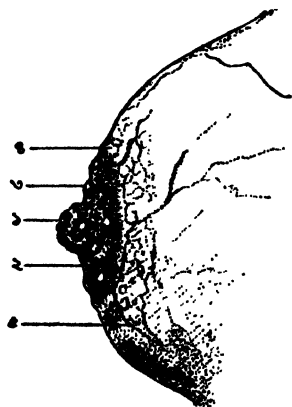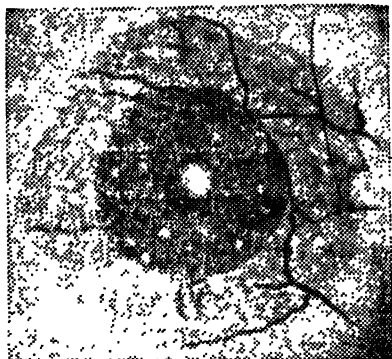
(২৫ নং চিত্র) (২৬ নং চিত্র)

গর্ভাবস্থায় স্তনে ভ্যালা পড়া

১। স্তনবৃন্ত ২। কালো রঙের ভ্যালা ৩। মণ্টগোমারী ফলিক্ল

৪। ফিকা বাদামী ভ্যালা ৫। স্ফীত শিরা।

(৯) অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার গর্ভিণীর স্থানচ্যুত জরায়ু স্বস্থানে ফিরাইয়া দিলে অথবা সামান্য কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই এই অবস্থার উপশম হয়। ফিলিপের মিল্ক অফ ম্যাগ্নেশিয়া সর্বোত্তম।

স্তন—প্রথম গর্ভিণীদের গর্ভসঞ্চারের প্রথম মাসেই স্তন ভারী বোধ হয়। স্তন ক্রমশ বড় হইতে থাকে এবং স্তনের বোঁটার চারি পার্শ্বস্থ ফিকা বাদামী রংএর চক্রটি কাল ও বড় হইতে থাকে। ইহাকে **ভ্যালাপড়া** বলে। (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য) তৃতীয় মাসে স্তন টিপিলে জলের বা আঠার ন্যায় একপ্রকার স্রাব নির্গত হয়। এই স্রাব প্রথম প্রথম জলের মত স্বচ্ছ থাকে পরে ঘন ও শ্বেতাভ হইয়া থাকে।

প্রথমবার গর্ভবতী বলিয়া কাহাকেও সন্দেহ হইলে তাহার স্তন টিপিলে এই দুধ বাহির হইলে গর্ভ সুনিশ্চিত বলিয়া ধরা যায়।

তলপেট—প্রথম দুই মাসে পেট সমান হইয়া যায় ও নাভি ভিতরে ঢুকিয়া যায়। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাসেই তলপেট ভারী বোধ হয়। চতুর্থ মাসে তলপেটে কিছুক্ষণ হাত রাখিলে একটি শক্ত জিনিষ অনুভূত হয়; ইহাই জরায়ু। মাসে মাসে ভ্রূণের আকার বৃদ্ধি হওয়ায় জরায়ু ফুটবলের ব্লাডারের মত হইতে থাকে। জরায়ুর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর পেটও বড় হইতে থাকে। চতুর্থ মাসের মধ্যভাগ হইতে নবম মাস পর্যন্ত গর্ভিণীর উদর দৃশ্যত ক্রমবর্ধিত হইতে থাকে এবং নাভি ক্রমশ ঠেলিয়া বাহির হয়। পঞ্চম

(২৭ নং চিত্র)

চিত্রে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি সপ্তাহের হিসাব। ৯ মাসের (৩৬) পর ১০ মাসে (৪০) জরায়ুর নীচে নামিয়া আসা লক্ষ্য করুন।
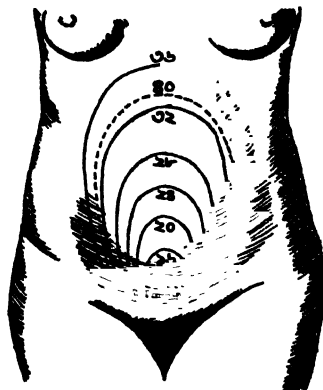
মাসে জরায়ু নাভিকেন্দ্রের তিন আঙ্গুল নীচে থাকে। ষষ্ঠ মাসে জরায়ু নাভিকেন্দ্র পর্যন্ত বর্ধিত হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তম মাসে নাভির তিন আঙ্গুল উপরে এবং নবম মাসে বক্ষপঞ্জর পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। দশম মাসে পেট ঝুলিয়া পড়ে এবং বক্ষপঞ্জর হইতে প্রায় তিন ইঞ্চি নীচে নামিয়া আসে। (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য) এই জন্য তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনেকটা কমিয়া যায়।

মিথ্যাগর্ভ—পেটে টিউমার বা গুল্ম হইলে, কিংবা পেটে জল বা বায়ু জমিলেও উপরোক্তরূপে পেট বড় হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে স্তনে ভ্যালা-গড়া, গা-বমি করা, বা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি অন্যান্য গর্ভলক্ষণের সমন্বয় দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে অনেক সময়ে গর্ভ হইয়াছে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে ইহাদের এক বা একাধিক লক্ষণও দেখা দিতে পারে (পূর্ববর্ণিত **'কাল্পনিক গর্ভ'** দ্রষ্টব্য।

তলপেট বড় ও ভারী হইয়া উঠিলে **উপযুক্ত প্রকারের** বেল্ট, ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধনী ব্যবহার করা উচিত। এরূপ করিলে জরায়ু বা ভ্রূণের নামিয়া আসা বা

স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা হইতে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। অনুপযুক্ত বন্ধনী ব্যবহারে আবার সুফলের পরিবর্তে কুফল হইতে পারে। বাজারে বহু রকমের ভাল কর্সেট্ পাওয়া যায়।

স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভেন্ডির মতে, তলপেটের পেশীসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত বন্ধনীর ব্যবহার করা উচিত। তিনি তাঁহার Ideal Birth পুস্তকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"The abdomen must be protected in good time, before the muscles are over-stretched, by a well fitting displaceable corset."

ম্যাবেল্ লিডিয়ার্ড্ (Mabel Liddiard) মাতৃমঙ্গল ও প্রসূতি পরিচর্যা কার্যে প্রায় সারাজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার অতি মূল্যবান পুস্তক The Mothercraft Manual এ বন্ধনী (Suspender support) পরিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি দরিদ্র লোকদের জন্য বাড়ীতে অল্প মূল্যে এইরূপ বন্ধনী (Maternity corset) তৈয়ারী করিয়া লইবার প্রণালীর কথাও লিখিয়াছেন।

মোটের উপর যাহাদের সঙ্গতি এবং সুবিধা আছে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত বন্ধনী কিনিয়া বা তৈয়ার করিয়া ডাক্তারকে দেখাইয়া লইয়া ব্যবহার করাই ভাল। ইহাতে আরাম বোধ এবং জরায়ু স্বস্থানে রক্ষিত হয়।

গর্ভ-দাগ। গর্ভিণীর শরীরের নানা স্থানে বিবর্ণ দাগ দেখা দেয়। স্তনের বোঁটার চারদিকে কাল দাগ পড়ে এবং শিরা-উপশিরাগুলি কাল এবং প্রতীয়মান হয়। তলপেটের শিরা উপশিরাগুলিও এমনই দেখায় এবং নাভি হইতে বস্তিপ্রদেশ পর্যন্ত মেটে রংএর একটি লাইন দেখা দেয়। উরুর সংযোগ-স্থলে, মুখে এবং গলায়ও অনেক ক্ষেত্রে দাগ পড়ে। প্রসবের পরে এই সকল দাগ মিলাইয়া যায় তবে কখনও কখনও কিছু চিহ্ন থাকিয়া যায়। স্তন ও তলপেট বড় হইতে থাকায় উভয় জায়গার চামড়ায় টান বা চাপ পড়ে।

ওই টান বা চাপের দরুন স্তনের ও পেটের (বিশেষ করিয়া তলপেটের) উপরে ফাটা ফাটা চিরস্থায়ী কতকগুলি দাগ হয়; উরুতে, উরু ও তলপেটের সংযোগস্থলে ও নিতম্বেও এই দাগ হইতে পারে। এই দাগগুলি চিরস্থায়ী বলিয়া স্ত্রীসৌন্দর্যের বিশেষত বক্ষ সৌন্দর্যের হানিকর। বক্ষ সৌন্দর্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি তাহার কারণ বর্তমান কালে শিক্ষিত মহলে অনেকেই স্তনবন্ধনী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া স্তনের আকৃতি বজায় রাখিতে ও স্তনের

নিম্নাভিমুখী হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন। কেহ অনেকাংশে সফলকাম হইলেও এই সব দাগের জন্য স্তন সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায় (যেমন বসন্তের দাগে মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।)

প্রতিকার—দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লেখিকা বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌সের মতে গর্ভের **৪র্থ মাসে** (ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ সপ্তাহ) **সপ্তাহে একবার** এবং **৫ম মাস** (অর্থাৎ ১৭শ সপ্তাহের আরম্ভ) হইতে প্রত্যহই যদি স্তনদ্বয়ে, পেটে, উরুর সংযোগস্থলে ও নিতম্বে অলিভ অয়েল (olive oil, যে কোনও ডাক্তারখানায় প্রাপ্তব্য, মূল্যও সুলভ) মালিশ করা যায় তাহা হইলে তাঁহার মতে এই দাগগুলি হইবে না। এক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন, "আমি দুইটি ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রথমটিকে তাহার গর্ভের ৭ম মাস হইতে প্রত্যহ অলিভ অয়েল মালিশের পরামর্শ দিয়াছিলাম। অপরটিকে তাহার গর্ভের ৫ মাস হইতে আমার পরামর্শ অনুযায়ী তাহার স্বামী স্বহস্তে অলিভ অয়েল মালিশ করিয়া দিতেন। দুই জনেরই উরুর সংযোগস্থলে মাত্র কয়েকটি করিয়া দাগ হইয়াছিল। সমগ্র পেটে, বক্ষে বা নিতম্বে কোন দাগ হয় নাই। দুইটির কোনটিতেই মেরী ষ্টোপ্‌সের উপদেশ সম্পূর্ণ পালন করা হয় নাই। প্রথমটির অনেক দেরীতে মালিশ আরম্ভ হয়, দ্বিতীয়টিরও ৪র্থ মাসে মালিশ হয় নাই, ৫ম মাসে আরম্ভ হয়, আবার ৮ম মাসে অনিবার্য কারণে প্রায় ১৫ দিন মালিশ বন্ধ ছিল অন্যথায় বোধ হয় ওই কয়টি দাগও হইত না। প্রসবের পরে ইহাদের দুজনের পেট দেখিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না যে তাহাদের সন্তান হইয়াছে।" আমরা প্রত্যেক প্রথম গর্ভিণীকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শরীর ও রূপ—গর্ভাবস্থায় মেয়েদের শারীরিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে ;—অধিকাংশের গায়ের রং অধিকতর ফরসা এবং মনোহর, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলতর এবং দৃষ্টি সজীবতাপূর্ণ হইয়া থাকে। মাথার কেশরাশি সতেজে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং কেশপতন বন্ধ হইয়া যায়। শরীরের উত্তাপ এবং ওজন বৃদ্ধি পায় ; এই ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রমপরিণতির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। মোটের উপর, স্বভাবত সুন্দরীদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য-সম্পদ গর্ভাবস্থায় আরও বৃদ্ধি পায়।

মুখমণ্ডল—একপ্রকার রক্তহীনতার (relative anemia) জন্য অধিকাংশ [illegible] মুখমণ্ডলের রঙ গর্ভাবস্থায় ফিকা হইয়া যায় এবং

এষ্ট্রোজেন হরমোনের আধিক্যের জন্য মুখে মেচেতার মত কতকগুলি দাগ প্রকাশ পায়। গর্ভাধানের কয়েক মাসের মধ্যে অতিরিক্ত শারীরিক ধকলের দরুন এরূপ ঘটিয়া থাকে।

প্রস্রাব—মূত্রাধার (bladder) জরায়ুর উপরেই থাকে। জরায়ু যেরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে মূত্রাধারে তেমনি বেশী বেশী চাপ পড়ে। এইজন্য প্রথম তিন মাসে প্রস্রাবের বেগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিন মাস পূর্ণ হইবার পর হইতে ক্রমবর্ধমান জরায়ু (ভ্রূণ সমেত) উপর পেটের দিকে উঠিতে থাকায় এই বেগ আর থাকে না। গর্ভের শেষের দিকে জরায়ু পুনরায় নীচে নামিয়া আসায় আবার ঐরূপ হয়।

রতিবাসনা—যে সকল ক্ষেত্রে দম্পতির যৌনজীবন সুখী ও সদ্ভাবপূর্ণ সেখানে গর্ভসঞ্চারের প্রথমাবস্থায় কয়েক মাস রমণীর বাসনা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু সাধারণত গর্ভের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমেই সহবাসে অনিচ্ছা এবং স্বামী-সাহচর্যে বিতৃষ্ণার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মন ও মেজাজ—কোনও কোনও গর্ভিণী অযথা ভীত, উগ্র, খিট্‌খিটে, অস্থির ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। আবার কোনও কোনও অশান্ত মেয়েও গর্ভাবস্থায় সম্পূর্ণ শান্তস্বভাবা হইয়া পড়ে। কিন্তু জরায়ু-সংক্রান্ত কোনও ব্যাধির দরুনও কতক স্ত্রীলোকের উক্তরূপ স্নায়বিক বিকার ঘটিতে পারে। এইগুলি যে গর্ভের প্রকৃত লক্ষণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

প্রসব পথ ও জরায়ু—গর্ভসঞ্চারে ছয় সপ্তাহের মধ্যে যোনিপথ দিয়া প্রচুর পরিমাণে একরূপ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। উহার স্বাভাবিক রঙ গোলাপী হইলেও পেট বড় হইতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাপও ক্রমশ বাড়িতে থাকায় এখানকার শিরাগুলিতে (veins) মলিন রক্ত সঞ্চয় বশত উহা প্রথমে অল্প বেগুনী বা নীল, পরে গাঢ় বেগুনী বা নীলবর্ণ হয়। যোনি-পথে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া গর্ভগ্রীবা স্পর্শ করিলে উহা অধিকতর কোমল বোধ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এক সঙ্গে কয়েকটি লক্ষণ দেখিলে তবেই গর্ভ নিশ্চয় করা যায়। কারণ, ঋতুবন্ধ অনেক কারণে হইতে পারে। আবার, জরায়ুর উপরে (১৩৪ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ২৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বা ভিতরে মাংসপিণ্ড (অর্বুদ, Fibroid ফিব্‌রয়েড্‌ বা Mole) জন্মিলে ঋতুবন্ধ তো হইবেই, তাহা ছাড়া, (১) পেট বড় হইবে, (২) যোনিপথের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া

তাহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত জরায়ুমুখ অনুভব করিলে উহা গর্ভের সময়ের মতই নরম বোধ হইবে, (৩) এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার পর্যন্ত হইতে পারে।

নিশ্চিত গর্ভলক্ষণ

এতক্ষণ যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইল তন্মধ্যে কোনওটি বা কয়েকটি একত্রেও **নিশ্চিত** গর্ভলক্ষণ নহে। অন্য যে যে উপায় দ্বারা গর্ভ নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারা যায় তাহার মধ্যে ভ্রূণের নড়া-চড়া, হৃদস্পন্দন, হস্তদ্বারা তাহার আকৃতি অনুভব এবং রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা প্রধান।

সন্তানের অঙ্গচালনা—সাধারণত পঞ্চম মাসের শেষভাগে অভিজ্ঞা গর্ভিণী সন্তানের নড়া-চড়া অনুভব করিতে পারে। প্রথম গর্ভিণীদের বুঝিতে আরও দেরী হয়। জলের ভিতরে যেমন মাছ নড়াচড়া করে জরায়ুর মধ্যে জল থাকায় সন্তানও সেইরূপ নড়া-চড়া করিতে পারে। স্পষ্টভাবে বার বার টের পাওয়া গর্ভের নিশ্চিত লক্ষণ। পঞ্চম মাসের শেষভাগে গর্ভিণীর পেটের উপর হাত রাখিলে গর্ভিণী ভিন্ন অন্যেও সন্তানের অঙ্গচালনা অনুভব করিতে পারে। গর্ভিণীর পেটে কান রাখিলে অথবা ডাক্তারদের বুক পরীক্ষার যন্ত্র দিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা গর্ভ-নির্ধারণের একটি **সুনিশ্চিত** উপায়।

ভ্রূণের হৃদস্পন্দন—৬ষ্ঠ মাসের শেষেই (২৪শ সপ্তাহে) বক্ষ পরীক্ষার যন্ত্র (Stethescope) দ্বারা সন্তানের হৃদস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়। যত দিন যাইবে ততই ইহা শোনা সহজসাধ্য হইবে। তবে ইহার অবস্থান খুঁজিয়া বাহির করা এবং অন্যান্য প্রকার শব্দ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ইহা বুঝিতে পারা কিছুটা অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা-সাপেক্ষ। ইহা যে একটি নিশ্চিত গর্ভলক্ষণ শুধু তাহাই নহে, গর্ভিণীর অসুস্থাবস্থায় অথবা প্রসবকালে ইহা দ্বারা ভ্রূণের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

হস্তদ্বারা ভ্রূণের আকৃতি অনুভব—পেটের উপর হাত দিয়া ভ্রূণের আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভব করিতে পারাও গর্ভের একটি সুনিশ্চিত সন্ধান দেয়।

রঞ্জন-রশ্মিদ্বারা পরীক্ষা—আজকাল "রঞ্জন-রশ্মির" (X-Ray) সাহায্যে মানবদেহের অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফটো তোলা যায়। শরীরের কোথাও কোনও হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা আভ্যন্তরিক কোন

ক্ষত, টিউমার বা অঙ্গবৈকল্যের ফটো তুলিয়া উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

গর্ভের চতুর্থ মাসের মধ্যভাগ হইতে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে অনুকূল অবস্থায় গর্ভস্থ ভ্রূণের কঙ্কালের ফটো তোলা যায়; ৬ষ্ঠ মাসে শতকরা ৫টি ভ্রূণের অবিকল ছায়া ফটোতে অঙ্কিত হয়। ফটোতে দেখা গেলে গর্ভে ভ্রূণের নিশ্চিত অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যে কেবল ধারণা করা যায় না তাহা নহে; অধিকন্তু ভ্রূণের অঙ্গ-সংস্থান ও অবস্থিতি, যমজ সন্তানের অস্তিত্ব, ভ্রূণের মোটামুটি বয়স প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকটা ধারণা জন্মে।

অনেকবার রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করিলে গর্ভিণী এবং ভ্রূণের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। মুহূর্তকাল মধ্যেই অবশ্য পরীক্ষা শেষ করা যায় এবং তাহাতে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ৪র্থ মাসের পূর্বে গর্ভ বুঝিবার কোনও নিশ্চিত উপায় নাই। অনেক সময় ১, ২ বা ৩ মাসের ঋতু বন্ধের জন্য অনেকে চিকিৎসকের নিকট পুনরায় ঋতুস্রাব আরম্ভের ব্যবস্থা লইতে অথবা ইহা গর্ভ কি না জানিতে আসেন। এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। ঋতু বন্ধের প্রথম তিন মাসের মধ্যে গর্ভ-নিরূপণের জন্যও কয়েকটি পরীক্ষা আছে।

(১) Aschheim-zondek Test (এ্যাশহেইম্ জণ্ডেক্ পরীক্ষা)—গর্ভবতী রমণীর প্রস্রাবের মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখভাগ হইতে নিঃসৃত হরমোনের ন্যায় এক প্রকার হরমোন প্রচুর পাওয়া যায়। স্ত্রীর ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়া প্রাণবন্ত হইয়া জরায়ুগাত্রে ঠিকভাবে প্রোথিত হইলেই পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে প্রচুর হরমোন নিঃসৃত হইতে থাকে। গর্ভরক্ষার জন্য যে পরিমাণ দরকারী তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। পরীক্ষাধীন নারীর মূত্র অপ্রাপ্ত-বয়স্ক স্ত্রী খরগোস বা ইঁদুরের শরীরে ইন্‌জেক্ট করিতে হয়। ঐ জন্তুর ডিম্বকোষের ডিম্বগুলি অসময়ে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলেই প্রমাণ হয় যে উক্ত রমণী গর্ভবতী। দুই দিন পরে জন্তুগুলিকে অজ্ঞান করিয়া তাহাদের পেট চিরিয়া দেখিতে হয়। কলিকাতার কোনও কোনও ডাক্তার এই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। Freidmann এই পরীক্ষার যে উন্নত প্রণালী আবিষ্কার করেন তাহা তাঁহার নামে খ্যাত।

(২) Vitamin C Test—এই ব্যবস্থায় প্রতিদিন নারীর প্রস্রাব লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। সাধারণ লোকের দ্বারা বা যেখানে সেখানে ইহা সম্ভবপর নহে।

(৩) Soskin Test—Prostigmine (প্রস্‌টিগ্‌মাইন) মাংসপেশীতে (intramuscularly) এক সি সি. প্রত্যহ তিনদিন দেওয়া হইলে নারী গর্ভবতী না হইলে শেষ ইনজেক্‌সানের তিনদিনের মধ্যেই তাহার ঋতুস্রাব পুনরায় দেখা দিবে। যদি ঋতুস্রাব না হয় তাহা হইলে শতকরা ৮৬ হইতে ৯০ ক্ষেত্রে গর্ভ থাকা প্রমাণিত হয়। ইহার একমাত্র অসুবিধা এই যে গর্ভ না হইয়া কোনও বিনালী অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির গোলযোগের জন্য ঋতুবন্ধ হইলে ইহা কার্যকরী হয় না। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। কদাচিৎ এই ভাবে পরীক্ষা করা হয়। ইহাতে কলিকাতায় ১৫৲ হইতে ২০৲ খরচ পড়ে।

(৪) Duogyon or Disecron— দুইদিন প্রত্যহ একটি ইন্‌জেক্‌সান দিতে হয়। যদি ৪।৫ দিন পরেও ঋতুস্রাব না হয় তাহা হইলে গর্ভ প্রায় নিশ্চিত মনে হয়। ইহাতে কলিকাতায় ২০৲ হইতে ২৫৲ খরচ পড়ে।

(৫) **ভেক দ্বারা পরীক্ষা**—যদি পায়ে নখযুক্ত ভেককে (claw-footed toad) একটি বড় মুখ বিশিষ্ট বোতলে রাখা হয় তাহা হইলে সে কখনও ডিম্ব পাড়িবে না। কিন্তু যদি কোনও গর্ভবতীর ২০০ সি. সি. পরিমাণ মূত্র হইতে প্রস্তুত নির্যাস; এক বা দুই সি. সি. (cubic centemeter সংক্ষেপে c. c.) তাহার ক্লোয়াকার প্রান্তের নিকট, ডরস্যাল লিম্ফ স্যাকের (dorsal lymph sac) মধ্যে, (তাহার মস্তকের দিকে) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে এবং উক্ত ইনজেক্‌সানের ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাহার উক্ত ক্লোয়াকার প্রান্ত (cloacal labia) বেগুনী বর্ণ ধারণ করে ও স্ফীত দেখায়। উক্ত ভেকের ২।১ ফোঁটা মূত্র একটি পিপেট্‌ (pipet) দ্বারা বাহির করিয়া লইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে যদি তাহাতে শুক্রকীট দেখা যায় তাহা হইলে জানিতে হইবে সেই নারী গর্ভবতী।

নির্দিষ্ট দিনে ঋতু না হইবার (অর্থাৎ গর্ভাধানের) মাত্র ২।১ দিন পরেও এই পরীক্ষা ফলদায়ক। দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল জানা যায়। ইহার জন্য কলিকাতায় মাত্র ১০৲ টাকা খরচ পড়ে। পাক-ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই জাতীয় ভেক বেশ বাঁচিতে এবং বংশবৃদ্ধি করিতে পারে।

(৬) **নারী-হরমোন দ্বারা পরীক্ষা**—গর্ভবতী বলিয়া সন্দেহকৃত নারীকে ২০ দিন যাবৎ প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় ১ মিলিগ্রাম করিয়া ষ্টিল্‌বেস্‌টেরল (Stilboesterol) সেবন করাইতে হয়। যদি সাত দিনের মধ্যেও ঋতুস্রাব না হয় তাহা হইলে খুব সম্ভব সে গর্ভবতী। ইহা Duogyonএর মতই ফলদায়ী, কিন্তু ইহাতে বেশী সময় লাগে তবে ইহাতে খরচ খুব অল্পই হয়।

(৭) **প্রত্যহ সকালে গাত্রতাপ লিখিয়া পরীক্ষা**—'নারীজীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়ের নিরূপণ' সম্বন্ধে অধ্যায়ে 'প্রত্যহ প্রাতে গাত্রতাপ লিখিয়া ডিম্বস্ফোটনের দিন নির্ণয়' অনুচ্ছেদের শেষে লিখিয়াছি যে উক্ত পদ্ধতি নির্ভুল নয়। কিন্তু উক্ত হিসাব হইতে সহজে ও বিনা ব্যয়ে গর্ভ হইয়াছে কি না তাহা বুঝা যায়। কারণ, ডিম্বস্ফোটনের পর গাত্রতাপের যে বৃদ্ধি হয়, গর্ভ হইলে বেশ কিছুদিন যাবৎ সেই বৃদ্ধি বজায় থাকে, এমন কি (সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি সহকারে) তাহা অপেক্ষাও অধিক হয়। সুতরাং ডিম্বস্ফোটনের পর যদি শয্যাত্যাগের পূর্বের প্রাতঃকালীন গাত্রতাপ, ক্রমাগত ১৬ দিন যাবৎ, ৯৯°এর কাছাকাছি উঠিয়া থাকে তাহা হইলে গর্ভ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। গর্ভের চতুর্থ মাসে আবার উক্ত গাত্রতাপ কমিয়া যায়। ইহার কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। এই পদ্ধতি, গর্ভ নির্ণয়ের অপর পদ্ধতিগুলির মতই নির্ভর যোগ্য।

(৮) রকমফের (modified) Abram's Box ব্যবহার করিয়া এক প্রকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করা হয়, শেষ বার ঋতু হইবার সাত সপ্তাহ পরে এই পরীক্ষা সফল হয়, তাহার পূর্বে নয়।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা

ভাল ফল পাইতে হইলে গাছের যত্ন দরকার

সাধারণত আমরা মনে করি যে জন্মের পর হইতেই শিশুর জীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেও মাতার জঠরে তাহাকে নয় মাসের অধিক থাকিতে হয়। শিশুর বিষয় ভাবিতে গেলে এই সময়ের কথা ভুলিলে চলিবে না। এই সময়ে গর্ভিণীর শরীর ও মন ভাল থাকিলে তাহার গর্ভের সন্তানেরও স্বাস্থ্য ভাল হয়। সেই জন্য এই বিষয়ে সকলের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এই কারণেই শিশুর যত্ন সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে গর্ভিণীর শরীর ভাল রাখা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভুল বিশ্বাস ও ভয়

প্রসবের বিপদ—মেয়েরা প্রায়ই অপর মেয়েদের মুখে শুনিতে পায় যে গর্ভের ও প্রসবের সময় নানা কষ্ট, বিপদ ও রোগ হয়। ইহার ফলে এই দুই ব্যাপারে সাধারণত যে অসুস্থতা বা কষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভয় জন্মিয়া যায় এবং এই **ভয় ও দুর্ভাবনার জন্যই** অনেক রোগ কষ্ট ও বিপদ হয়। এই জন্য কোনও ক্ষেত্রে বেশী কষ্ট ও বিপদ হইলেও সে বিষয়ে কাহারও নিকট গল্প করিতে নাই।

বেশী বয়সে প্রথম প্রসব—সাধারণত যাহাদের তিরিশের পর প্রথম গর্ভ হয় তাহারা মনে করে যে প্রসবে খুব কষ্ট ও বিপদ হইবে। আধুনিক ডাক্তারগণ মনে করেন যে, অপরদের অপেক্ষা ইহাদের একটু বেশী কষ্ট ও বিপদের যে সম্ভাবনা আছে তাহা দূর করা যায়। ইহা ঠিক যে কুড়ির কোঠা অপেক্ষা তিরিশের কোঠায় সন্তান প্রসবে একটু দেরি হয়, কারণ বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের টিস্যু (Tissue) গুলি ক্রমশ কম নমনীয় হইয়া আসে, কিন্তু বেশীক্ষণ প্রসব বেদনা ভোগের জন্য যে ক্লান্তি ও অবসাদ হয় তাহা নিবারণের উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, অধিক বয়সে প্রসবের পর পেরিনিয়াম্ সেলাই করার প্রয়োজনের সম্ভাবনা কিছু বেশী থাকে কিন্তু তাহাতে ঠিক মত শুশ্রূষা হইলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শরীর সহজে সুস্থ হয়।

দীর্ঘকাল প্রসব বেদনা ভোগের ভয়—অনেকক্ষণ, এমন কি এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসব বেদনা ভোগ করার গল্পও শোনা যায়। বাস্তবিকপক্ষে কখনও কখনও হয়ত পাঁচ মিনিট পর পর কয়েক ঘণ্টা যাবৎ অল্প বেদনা বোধ হয়, পরে প্রায় ১২ ঘণ্টা আর বেদনা আসে না। প্রকৃত বেদনা হইবার কয়েকদিন পূর্বে ক্রমাগত এই রকম বেদনা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। গর্ভাবস্থায় দুজনের খোরাকী খাওয়া উচিত সেকালের এই ভুল ধারণার জন্য বেশী বেশী খাওয়া ও অপথ্য করার জন্য কখনও কখনও গর্ভের সন্তান অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া যাইত। বেশী কষ্ট হওয়ার ইহা একটি কারণ। যাহাই হউক, প্রসবে দেরি হইবার সব চেয়ে বড় কারণ হইল ভয়। মাতার অপঘাত হইলে তিনি গ্রহণ দেখিলে বা তরকারি প্রভৃতি কুটিলে শিশুর গায়ে দাগ হয় এই বিশ্বাসও ঠিক নয়, তবে গর্ভিণীর মন প্রফুল্ল ও শরীর ভাল রাখার জন্য তাহাকে যথাসাধ্য কোনও ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে দেওয়া উচিত নয়।

সকালে গা বমি ভাব না হইলে প্রসবে কষ্ট—এই ধারণার স্বপক্ষে কোনও তথ্য বা প্রমাণ নাই। বরং বমি বমি ভাব না হইলে বোঝায় যে গর্ভিণীর শরীর ও মন সুস্থ, সুতরাং তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ ভাবেই প্রসব হইবার সম্ভাবনা।

গর্ভে সন্তান নড়িবার সময় অজ্ঞান হওয়া—মাঝে মাঝে এ রকম কথাও শোনা যায়; তবে শতকরা একটিরও কম ক্ষেত্রে এমন হয়। প্রথম প্রথম ভ্রূণের নড়াচড়া এত আস্তে হয় যে প্রায় টেরই পাওয়া যায় না, এবং তাহার জন্য কোনও কুফল হয় না। প্রায় দেখা যায় যে সন্তানের নড়া টের পাইলে গর্ভিণীরা দম বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া থাকে যাহাতে আবার নড়া টের পাওয়া যায়। এ রকম মায়েদের অজ্ঞান হইবার কথা নয়।

ডিঙ্গি মারিয়া কিছু করার বিপদ—অনেকে ভাবে ও বলে যে ডিঙ্গি মারিয়া কিছু করিলে (যেমন উঁচু তাক বা আলনার উপরে কিছু রাখা অথবা নামানো) বস্তি প্রদেশের (Pelvis) ক্ষতি হয়, এমন কি ভ্রূণের গলায় নাড়ী পর্যন্ত জড়াইয়া যাইতে পারে! সহজে প্রসব হওয়ার জন্য গর্ভের শেষের তিন মাসে ডিম্বকোষ হইতে প্রোজেস্টেরণ হরমোনের প্রভাবে জরায়ু ও বস্তি প্রদেশের হাড়গুলির বন্ধনী (ligaments) ক্রমশ নরম হইয়া যায় এবং কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে প্রসবের সময় শিশুর বাহির হইবার স্থান কিঞ্চিৎ অধিক হয়। হাড়ের জোড়গুলির কাঠিন্য (rigidity) কমিয়

যাওয়ায় গর্ভিণী এই সময়ে বেশী ভারী ও মেহনতের কাজ করিতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। ঐ রস রক্তের সঙ্গে গিয়া শরীরের অপর জায়গাগুলিকেও নরম ও ঢিলা করিয়া দেয়। তাই পেটের অন্ত্রগুলি ঢিলা হওয়াতে পেট ভাল পরিষ্কার হয় না, রক্তকোষগুলির দেওয়ালের পেশীগুলি নরম ও ঢিলা হওয়ার জন্য শরীরের অনেক জায়গার **শিরাগুলি ফোলে** মলদ্বারে এমন হইলে সেই রোগকে **অর্শ** বলে। এই ভাবে জগতে মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল বরাবর জড়াইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ জোর (Strain) না পড়িলে অথবা ধাক্কা (Jerk) না লাগিলে কখনও ঐ সব হাড় সরিয়া যাইতে পারে না। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ একটি জল (amniotic fluid) ভরা থলির (chorion) মধ্যে থাকে; সুতরাং গর্ভিণী ধীরে ধীরে ডিঙ্গি মারিয়া দাঁড়াইলে ভ্রূণের গলায় নাড়ী কি প্রকারে জড়াইতে পারে? গর্ভিণী ডিগবাজি খাইলে তবেই ভ্রূণের থাকার অবস্থা (position) বদলাইয়া যাইতে পারে।

গর্ভিণী পড়িয়া যাওয়াতে ভ্রূণের অনিষ্ট—আসলে গর্ভিণী পড়িয়া গেলে ভ্রূণের ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম। অবশ্য খুব গুরুতর ভাবে পড়িলে ক্ষতি হইতে পারে। বিলাতের একটি মাতৃসদনের ডাক্তার Cyril V. Pink M.R.C.S.,L.R.C.P., তাঁহার The Foundations of Motherhood (১৯৪১) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, জনৈক গর্ভিণী প্রসবের সময়ের কাছাকাছি মোটরের ধাক্কায় পড়িয়া যায়, মোটরের চাকা তাহার শরীরের একেবারে পাশে আসিয়া পড়ায় তলপেটের উপরকার চামড়া বেশ খানিকটা ছড়িয়া যায়। দুই সপ্তাহ পরে যথা সময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। প্রসবের পর দেখা গেল যে শিশুটি সব রকমেই সুস্থ ও স্বাভাবিক, তাহার শরীরে কোথাও চোট লাগার চিহ্ন নাই।

পরের বারের প্রসবে বিপদের সম্ভাবনা—কখনও কখনও গর্ভিণী ডাক্তারকে বলেন যে কয়েক বছর পূর্বে কোন অসুখ হওয়ায় সেই রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জনৈক ডাক্তার তাহাকে বলিয়াছিলেন যে ইহার পর গর্ভ হইলে তাহার প্রাণের ভয় আছে। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গর্ভিণীদের কোনও বিপদই হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিলে শরীরের নিজেকে শুধরাইয়া লইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কখনও কখনও অসাধ্য সাধন করে। তাহা ছাড়া, বিশেষজ্ঞদের, নিজের বিষয় ছাড়া অপর বিষয়ে মতামতের উপর বিশেষ নির্ভর করা যায় না। পূর্বে প্রসবের

সময় যে সব কষ্ট ও বিপদ হইত আজকাল গর্ভের ও প্রসবের সময় উপযুক্ত যত্ন লইয়া সে সবই প্রায় দূর করা সম্ভব হইয়াছে।

সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ—সন্তান পাওয়ার আগ্রহ ও তাহার জন্য যথাসাধ্য সবকিছু ভাল ভাবে করার উৎসাহই গর্ভিণীকে অনেক কষ্ট, রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষা করে। এ রকম মায়েদের সন্তানের কদাচিৎ কোনও বিশেষ দোষ থাকে। মাঝে মাঝে কোনও শিশু হয়তো অকালে জন্মায় অথবা তাহার দেহে কোনও বিষ থাকে কিন্তু উপযুক্ত যত্ন লইলে ও চিকিৎসা করাইলে এ সবের প্রতিকার করা যায়।

গর্ভ বরং শরীর ভাল করে—ইহা স্থির বিশ্বাস করা উচিত যে, গর্ভ অসুস্থ অবস্থা নয়, বরং এ সময় শরীর ও স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়া যায় আর এসময়ে ঠিকভাবে চলিলে প্রসবে বিশেষ কষ্ট হয় না। দেখা গিয়াছে যে, গর্ভিণী ঠিক নিয়মে চলিলে অনেক দিনের পুরাতন রোগ—এমন কি যক্ষা পর্যন্ত—এ সময়ে আরোগ্য হয়। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় জীবনী শক্তি যে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে দেখি না তাহার কারণ, আর্থিক দুশ্চিন্তা এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভয়।

গর্ভিণীর রুচি-বিকৃতি

গর্ভিণী-জীবনের একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সে সময় গর্ভিণীরা অনেক কুখাদ্য এমন কি অখাদ্য খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে। হ্যাভলক এলিস এমন অনেক ইংরাজ গর্ভিণীর কথা বলিয়াছেন যাহারা কয়লা, বালুকা ও ভস্ম খাইতে ভালবাসে। আবার অনেকে মলমূত্র, মাকড়সা, আরশুলা প্রভৃতি খাইবার জন্য ব্যাকুল হয় এমনও নাকি দেখা গিয়াছে।

এ সবকে নিতান্ত বিরল ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইলেও গর্ভাবস্থায় যে নারীর মধ্যে বিরাট একটি রুচি-বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের নারীগণকে গর্ভাবস্থায় তেঁতুল, লবণ, কাঠকয়লা, চাখড়ি, চাউল, গম, পোড়া শুপারী, ঝাল, টক্‌, এমন কি পোড়ামাটি, পাতখোলা, ভাঁড়, খুরি প্রভৃতির টুকরা অত্যধিক পরিমাণে খাইতে দেখা যায়।

কারণ—কোনও কোনও লোকের অভিমত এই যে, গর্ভাবস্থায় নারী-দেহে ঔপাদানিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় যে সমস্ত উপাদানের অধিক প্রয়োজন হয়, নারী সেই সমস্ত উপাদানের জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে। আবার অন্য এক মত এই

যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের রুচি অনুসারেই গর্ভিণীর রুচি-বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। গর্ভিণী সাধারণত শিশুদের খাদ্যের প্রতিই আগ্রহ দেখাইয়া থাকে। কাহারও আবার অভিমত এই যে, গর্ভিণী যাহা কিছু খাইতে চায়, সে সমস্তই খাইতে দিলে সে গা-বমি প্রভৃতি প্রাতঃকালীন গ্লানি হইতে রক্ষা পায়। এই সকল অভিমতের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। কোনও কোনও আধুনিক চিকিৎসকের মতে হজমের গোলযোগই ইহার প্রধান কারণ।

কারণ যাহাই হউক, গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ও ভ্রূণের কল্যাণের জন্য যেগুলি হানিকর নয় সেগুলি অল্প পরিমাণে দিয়া, সহানুভূতির সহিত সে বিকৃত রুচিরও যথাসম্ভব তৃপ্তিসাধন করা উচিত।

গর্ভিণীর দায়িত্ব এবং গর্ভাবস্থায় বিধিনিষেধ

গর্ভিণীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব অনেক। ভাবী বংশধরের যে জননী, ভাবী মাতৃত্বের গৌরবে যে গৌরবান্বিতা, সে একদিকে যেমন ভাগ্যবতী আবার অন্যদিকে তেমন দায়িত্বের গুরুভার বহনকারিণী। কাজেই মাতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তাহাকে একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হইতে হয়। সুস্থ, সবল ও সুন্দর সন্তান লাভের প্রতীক্ষায় তাহাকে দীর্ঘদিন কাটাইতে হয়; স্বাস্থ্য-সম্মত নানা বিধান তাহাকে পালন করিতে হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে যাহাতে শিশু স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া ওঠে সেইজন্য গর্ভিণীকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। সুস্থ, সবল সন্তান লাভ করিতে হইলে **ভাবী মাতাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিতে** মনোযোগী হইতে হইবে।

মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখানো

গর্ভের গোড়া হইতেই (অন্তত তৃতীয় মাসে নিশ্চয়ই) কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গিয়া তাঁহার পরামর্শ মত চলা উচিত। প্রতি মাসে অন্তত একবার মূত্র পরীক্ষা করানো দরকার। সাত মাস হইতে আরও ঘন ঘন (যেমন ডাক্তার বলেন) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান দরকার। ইহার সুবিধা :—

(১) মন হইতে ভয় ভাবনা দূর করা যায়।

(২) নানা উপসর্গ অথবা কোন রোগ হইলে তাহার শীঘ্র প্রতিকার করা সম্ভব হয়। রোগগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইল :—রক্তদুষ্টি

(toxaemia), রক্তহীনতা, গর্মী অর্থাৎ উপদংশ বা সিফিলিস, বুকের (হার্টের) অসুখ ও এ্যালবুমিনুরিয়া। ইহার পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

(৩) গর্ভের কতকগুলি খারাপ অবস্থা ও রোগ আছে যেগুলি শুধু ডাক্তারেরাই ধরিতে ও সারাইতে পারেন। সেগুলি সময় মত ধরিয়া প্রতিকার না করিলে গর্ভিণী কিংবা সন্তান অথবা উভয়েই মারা যাইতে পারে।

(৪) **প্রস্রাব পরীক্ষা করানো**—ডাক্তার, নার্স বা পাশ করা ধাত্রীর নিকটে প্রতি মাসে যাইবার সময় সকালের প্রথম প্রস্রাবের খানিকটা শিশিতে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন **এ্যালবুমিনুরিয়া** হইয়াছে কি না। প্রথম অবস্থায় ধরা পড়িলে ইহার প্রতিকার করা সম্ভব হয়, নতুবা ক্রমশ এই সব **লক্ষণ** প্রকাশ পায়—মাথাব্যথা, পা ফোলা, ঝাপসা দৃষ্টি, তলপেটে ব্যথা, বমি প্রভৃতি। তখন শীঘ্র ভাল চিকিৎসা না হইলে ফিট্ হইয়া গর্ভিণী মারা যায়। এই মারাত্মক অবস্থাকে এক্লাম্‌শিয়া (eclampsia) বলে।

(৫) প্রসবের ৪।৫ সপ্তাহ আগে ডাক্তার দেখিবেন যে সন্তান ঠিক অবস্থায় (মাথা নীচে করিয়া) আছে কি না। তাহার পাছা নীচের দিকে থাকিলে সহজে ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। তাহা না করিলে প্রসবের সময় কষ্ট হয়।

(৬) গর্ভের শেষের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি দেখিবেন যে বস্তিকোটরের ভিতরের গর্ত (যাহার মধ্য দিয়া শিশুর মাথা জরায়ু হইতে নামিয়া প্রসব পথে আসে, Pelvis) শিশুর মাথা গলিবার মত বড় কিনা। যদি একটু ছোট হয় তবে ক্যাষ্টর অয়েল ও কুইনাইন দিলে কাজ হইতে পারে। যদি এত ছোট হয় যে ইহাতেও ফল হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ আগে ঔষধ দিয়া প্রসব বেদনা ঘটাইলে সুবিধা হয়, কারণ তখন ভ্রূণ ছোট থাকে। যদি এরূপ ছোট শিশু আসার পক্ষেও পথটি ছোট বোধ হয় তাহা হইলে ডাক্তার উপযুক্ত সময়ে, তলপেট কাটিয়া সন্তান বাহির (Caesarean operation) করার ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) রক্তের চাপ ও সাধারণ স্বাস্থ্যও পরীক্ষা করিয়া পরামর্শ দিবেন।

(৮) কবে নাগাদ প্রসব হইতে পারে তাহা বলিয়া দিবেন।

চিকিৎসক গর্ভিণীর শরীর পরীক্ষা করিয়াই ইহা কতকটা বলিতে পারেন, আরও নিশ্চিতভাবে বলিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন যে শেষ বার কবে ঋতু আরম্ভ হইয়াছিল।

ঋতুকালের হিসাব রাখা—ইহার ঠিক ঠিক জবাব দিবার জন্য (এবং অনেক রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের সাহায্য লইতে ও গর্ভাধানের অনুকূল 'উর্বর সময়' অথবা গর্ভ নিবারণের জন্য 'নিরাপদ সময়' নির্ণয় করিতে হইলে) সব মেয়েরই উচিত, নীচে যে ছক দেখান হইল তাহার প্রথম তিন স্তম্ভ একটি খাতায় আঁকিয়া প্রত্যেকবার ঋতু আরম্ভ ও শেষের তারিখ ও দুই ঋতুর মধ্যে ব্যবধানের কাল লিখিয়া রাখা। নমুনা স্বরূপ ছয় মাসের কাল্পনিক তারিখ ও ঋতুমাসের বহর নীচে দেখান হইল।

ঋতু আরম্ভের তারিখ	পরবর্তী ঋতু আরম্ভের আগের তারিখ	ঋতুমাসের দৈর্ঘ্য (উভয় তারিখ ধরিয়া)	ঋতুমাসের দৈর্ঘ্য হিসাবের প্রণালী
২রা জুলাই	২৯এ জুলাই	২৮ দিন	২রা হইতে ২৯শে জুলাই =২৮ দিন।
৩০এ জুলাই	২৭এ আগষ্ট	২৯	৩০ ও ৩১ জুলাই=২ দিন। ২+আগষ্টের ২৭ দিন (২+২৭) ২৯ দিন।
২৮এ আগষ্ট	২৩এ সেপ্টেম্বর	২৭	২৮ হইতে ৩১ আগষ্ট=৪ দিন। ৪+সেপ্টেম্বরের ২৩ দিন=২৭ দিন।
২৪এ সেপ্টেম্বর	২৩এ অক্টোবর	৩০	২৪ হইতে ৩০এ সেপ্টেম্বর =৭ দিন। ৭+অক্টোবরের ২৩ দিন=৩০ দিন।
২৪এ অক্টোবর	১৮ই নভেম্বর	২৬	২৪এ হইতে ৩১এ অক্টোবর ৮ দিন। ৮+নভেম্বরের ১৮ দিন=২৬ দিন।
১৯এ নভেম্বর	১৯এ ডিসেম্বর	৩১	১৯ হইতে ৩০এ নভেম্বর =১২ দিন। ১২+ডিসেম্বরের ১৯ দিন ৩১ দিন।

অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ

আমি এ-সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম কিন্তু **এদেশে** উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা কোথায় ? কোটি কোটি নারীর পক্ষে **যোগ্য ডাক্তারের অভাব,** ডাক্তার পাওয়া গেলেও **টাকার অভাব,** উভয়ের সুবিধা থাকিলেও **অজ্ঞতা, আলস্য, কুসংস্কার** ও **লজ্জার** দরুন গর্ভিণীদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু করিতে অনিচ্ছা, গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগসমূহের কারণ, প্রতিষেধ, প্রতিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণত অভিভাবকদের ঘোর অজ্ঞতা, উপেক্ষা ও **উদাসীনতা** এবং **"ভাগ্যে যাহা আছে হইবে"** এইরূপ ধারণা ইত্যাদি কারণের সীমা নাই। অথচ মাতার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ বংশধরের হিতের জন্য এইরূপ সুপরামর্শ গ্রহণ কত আবশ্যকীয়।

আমাদের দেশে অদৃষ্টবাদ সকল শ্রেণীরই অকল্যাণ করিয়া থাকে : "খোদা যা করে" "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?" "মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?" "ভগবান দিয়েছিলেন, তাঁর জিনিষ, যখন ইচ্ছা হল, তিনিই নিলেন, "আমাদের মত পাপীর ঘরে সে স্বর্গের ফুল থাকবে কেন, আমাদের পাপে যে শুকিয়ে গেল" ইত্যাদি বুলি আওড়াইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অসংখ্য পরিবারের অভ্যাস। ইহারই দরুন যেখানে বিনামূল্যে পরীক্ষা করিবার ও পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা আছে সেখানেও অনেকে অবহেলা করিয়া, ঐরূপ পরীক্ষা ও পরামর্শের সুযোগ নেন না। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

অজ্ঞতা, দুর্বলতা ও পরাধীনতা প্রসূত, তমোগুণ আলস্যমূলক এই অদৃষ্টবাদ সর্বপ্রকার বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা ও চেষ্টা যত্নের পরিপন্থী। আন্তরিক নিষ্ঠাবান্ অদৃষ্টবাদীর পক্ষে নিজের বা আত্মীয়ের রোগে, মকদ্দমায়, পরীক্ষায়, চাষে, ব্যবসায়, চাকরিতে—অর্থাৎ সকল কাজেই—উদ্যোগ, উদ্যম, আয়োজন, তদ্বির চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করা নিরর্থক। কিন্তু কেহই ঐ সব সময়ে ভাবনা, চিন্তা চেষ্টা ও যত্ন ছাড়ে না। শুধু কোনও কোনও কাজে, যাহাতে নিজের বিশেষ স্বার্থ বা আগ্রহ নাই, আলস্য ও অজ্ঞতার সাফাইরূপে, তাহাতেই অদৃষ্টের দোহাই দেয় পুরাপুরি সত্যই কপাল মানিলে এই পুস্তকের মত কোনও 'কেজো' পুস্তক—যাহা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা লাভ এবং উন্নত শান্তিময় জীবন যাপনে সাহায্য করার জন্য লেখা যাহা পড়িয়া পূর্বের অভ্যাস ও পদ্ধতিসমূহ ছাড়িয়া নূতন এবং উন্নতগুলি অবলম্বন করা আবশ্যক—লেখার বা পড়ার কোন আবশ্যকতা বা সার্থকতা থাকে না।

এই অদৃষ্টবাদী মনোভাব এদেশের ঘোর অনিষ্ট করিতেছে। যে সময় ভারত স্বাধীন ও প্রধান ছিল, যখন এ দেশবাসীর শক্তি, সাহস, উদ্যম, তেজ ও বীর্য ছিল তখনকার রচিত 'হিতোপদেশ'এর এই মন্ত্র আজ এই অধঃপতিত দেশের অধিবাসীদের নিয়ত জপ করিতে অনুরোধ করি :—

'উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।'

অর্থাৎ, "যে পুরুষ উদ্যোগী, লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। 'ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে', এ কথা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে। অতএব স্বীয় শক্তি দ্বারা দৈবকে দূর করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। সবিশেষ যত্ন করিলেও যদি কার্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে আর দোষ কি?" যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণের ৪র্থ হইতে ১০ম সর্গ অবধি বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে নানা ভাবে উপদেশ দিয়া দৈবখণ্ডন ও পুরুষকার স্থাপন করিয়াছেন।

ডাঃ ভেল্ডি তাঁহার Ideal Birth পুস্তকে এ বিষয়ে জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টকে সজাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে **প্রত্যেক গর্ভিণীই যাহাতে এইরূপ সৎপরামর্শের সুযোগ পায় তাহার সুবিধা দেশ ও দশের করিতেই** হইবে। *

ডাঃ ভেল্ডি বলেন, "It should not only be made possible but easy *for every pregnant woman without exception* to put herself under guidance of this kind. Where it cannot be done privately, Town clinics or advisory bureaux for pregnant women should be instituted ; and suitable publicity *should continually impress on* women how *exceedingly important* it is both for themselves and for their children that they should make use of the opportunities provided for this guidance.

"*No country* should hesitate over the expenses of this propaganda and these advisory bureaux. Not only is it in its own best interests for any country to be able to incorporate the children into the nation alive and uninjured, but also it saves itself the far greater expense of public provision for mothers and children injured unnecessary. (The italics are mine.)

খাদ্যতত্ত্ব

গর্ভিণী ও অপরদের অবশ্য জ্ঞাতব্য

আমরা খাইয়াই জীবন ধারণ করি। সমস্ত জীবজগতেই খাদ্যের অন্বেষণ ও ব্যবহার চলিতেছে। তবে মানুষ বুদ্ধিবলে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য অধুনা জানিতে পারিয়াছে।

আমরা সকল পাঠক-পাঠিকার জন্যই (গর্ভিণীর জন্য বিশেষ করিয়া) সাধারণ জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য বিষয়সমূহ এখানে সংযোজনা করিলাম।

লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালীরা এ সব বিষয়ে কত উদাসীন !

কি কি খাইবেন—**ঢেঁকি** ছাঁটা চালের **ফেন না গালা** ভাত ; ডাল ; **জাঁতায়** পেষা কিম্বা কলে **মোটা** করে পেষা গমের **না ছাঁকা** আটার রুটি, লুচি বা পরোটা ; সুজির হালুয়া ; সব রকম **টাটকা** তরিতরকারী ও শাক পাতা বেশী করিয়া (তাহার মধ্যে প্রায় **অর্দ্ধেক** কাঁচা অবস্থায়) ; **মাংস** (খাইতে ইচ্ছা হইলে) **অল্প** পরিমাণে, জন্তুর **মাংসের অপেক্ষা** তাহার শরীরের ভিতরের **যন্ত্রগুলি**, যেমন মেটে (যকৃত), গুরদা (Kidney কিড্‌নী) প্রভৃতি, ছোট ও বড় মাছ ; অর্দ্ধেক সিদ্ধ, কাঁচা (দুধে মেশান) বা পোচ করা **ডিম** প্রত্যহ ২।১টি ; গরু বা ছাগলের **দুধ** প্রত্যহ এক সের হইতে দেড় সের ; যত সম্ভব হয়, **তাজা** ও **পাকা ফল** ; যে সব জিনিসে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) এ, বি$_1$, বি$_2$ প্রভৃতি সি, ডি ও ই ; চুন (ক্যালশিয়াম) ও লোহা অধিক আছে প্রত্যহ যত বেশী সম্ভব (শীতকালে পাঁচ পোয়া হইতে গ্রীষ্ম কালে ২॥• সের পর্যন্ত) ; জল ও তরল জিনিস, যেমন শরবত, ঘোল, বার্লির জল, ভাতের ফ্যান প্রভৃতি। এই সব ছাড়া প্রত্যহ কিছু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (Vitamin B Complex) এর বড়ি বা ক্যাপস্যুল, ঈয়েষ্ট (Yeast) এর বড়ি বা চূর্ণ ও কড্‌লিভার অয়েল অবশ্য খাওয়া উচিত।

পুষ্টিকর খাদ্য—(১) **ডলিয়া**-গম পরিষ্কার করিয়া, শুষ্ক খোলায় অল্প ভাজিয়া, ডাল ভাঙা যাঁতায় অল্প ভাঙিয়া লইয়া জলে প্রায় ৪৫ মিনিট সিদ্ধ

করিয়া, দুগ্ধ ও মধু অথবা দুগ্ধ ও গুড় অথবা দুগ্ধ ও চিনি অথবা শুধু গুড় অথবা শুধু চিনি অথবা শুধু লবণ দিয়া প্রত্যহ খাইতে হয়। উত্তর ভারতে অধিকাংশ দুর্বল বা রুগ্ন লোকেরা এটি ব্যবহার করেন। (উপকারিতা হিসাবে মধু সব চেয়ে ভাল, তাহার পর গুড় ও শাদা চিনি হইল অধম)।

(২) প্রথম দিন আখের রস এক পোয়া; দ্বিতীয় দিন ৭।৮টি বাদাম রাত্রে ভিজাইয়া (কোনো কোনো বাদাম অত্যন্ত তিক্ত হয়, ভিজাইবার পূর্বে প্রত্যেকটির শাঁস হইতে একটি ছোট টুকরা চাখিয়া দেখা উচিত) সকালে পিষিয়া, তাহাতে মিছরী ও সামান্য দুধ মিশ্রিত করিয়া; তৃতীয় দিন মাঝারি আকারের দুইটি কমলা লেবুর বিচি ফেলিয়া তাহার কোয়াগুলির খোসা সমেত খাইবেন। এইভাবে সারা গর্ভকালে পর্যায়ক্রমে ঐ তিনটি জিনিস খাওয়াইতে হয়। শীতকালে আখের রস ও বাদাম বাঁটার সহিত এক চামচ মধু মেশান উচিত।

কি কি খাইবেন না—একেবারে টাটকা পাঁউরুটি, কেক প্রভৃতি; **বেশী** মশলা, পেঁয়াজ বা ভিনিগার; সব রকম নেশার জিনিস যেমন মদ, তাড়ি, বেশী দোক্তা, জর্দা বা সুর্তি, বেশী ও কড়া চা বা কফি; বেশী ভাজা বা পোড়া; বেশী ঘি, লঙ্কা সরষে বাঁটা বা রসুন দিয়া রাঁধা তরকারী; বেশী মাংস, শুটকি মাছ, লোনা ইলিশ, কচ্ছপ বা কাছিমের মাংস; বাসি কড়কড়ে বা পান্তা ভাত বা রুটি; বেশী মেঠাই, কেক, চকোলেট প্রভৃতি পেষ্ট্রি (pastries); বেশী তিক্ত বা টক; পোলাও, ইলিশ, চিতল, আড় প্রভৃতি তেল চর্বিওয়ালা মাছ। এই সব জিনিসে অম্বল, বুক জ্বালা বা বদহজম হয়।

খাইবার সাধারণ নিয়ম

(১) **সহজ পাচ্য**—যে জিনিস ও পরিমাণ যত সহজে হজম হয় তাহাই খাওয়া উচিত।

(২) **মাঝখানে খাওয়া**—দুইবার নিয়মিত সময়ের আহারের মধ্যে টুকি-টাকি, এটা-ওটা খাওয়া মোটেই উচিত নয়।

(৩) **অর্ধেক জান্তব প্রোটিন**—দিনের মধ্যে যতটা প্রোটিন (protein মাংস বাড়াইবার মত জিনিস, যেমন ডাল, শিম, বরবটি, সয়াবীন, বাদাম, মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম) খাওয়া হয় তাহার অর্ধেক জন্তুদের শরীর হইতে পাওয়া প্রোটিন হওয়া চাই।

(৪) **ছিবড়া ও আঁশ যুক্ত খাদ্য** (Roughages)—খাবারের মধ্যে যথেষ্ট এ রকম জিনিস (যথা, শাক, তরকারি, ফল, গমের ভুষি, বেলের বিচি ও শিরা প্রভৃতি) থাকা চাই। ইহাদের আঁশ ও ছিবড়া হজম হইয়া শরীর পুষ্টি করে না, কিন্তু মল বৃদ্ধি করে ও মলকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া বাহির করার কাজে অনেক সাহায্য করে। এই সব খাইলে পেট পরিষ্কার হওয়ার সুবিধা হয়, কোষ্ঠবদ্ধতা হয় না।

(৫) **আহারের সময় জলপান**—খাওয়ার সময় জলপান না করাই ভাল, বিশেষ অসুবিধা হইলে অল্প পান করিবেন। খাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে ইচ্ছা মত জল পান করিতে পারেন। আরও আধঘণ্টা পর হইতে তৃষ্ণা না পাইলেও যখন তখন মনে পড়িলেই, ঔষধ হিসাবে জলপান করা ভাল।

আহারের সময় বেশী জলপানের অপকার—(ক) খাওয়ার সময় বেশী জল পান করিলে খাবার পাতলা হইয়া যাওয়ায় সেগুলি বেশী চিবাইবার দরকার হয় না, ফলে তাড়াতাড়ি গেলা হয়, ইহাতে সেগুলির বড় বড় টুকরা পেটে যায়, তাহাদের সহিত লালা কমই মিশিতে পায়। (খ) ইহারা পেটে যাওয়ার পর যেটুকু জারক রস বাহির হয় জল তাহাকেও পাতলা করিয়া দেয় ফলে ভাল হজম হয় না। এবং (গ) খাবার পেটে যাওয়াতে পেটের নীচের দিকের দরজা (Pyloric valve) বন্ধ হইয়া যাওয়াতে পেট অযথা বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে তাই অসোয়াস্তি বোধ হয় ও হজমেরও ব্যাঘাত হয়। এই জন্য ভাতের সঙ্গে বেশী ঝোল, আর ভাত বা রুটির সঙ্গে বেশী ডাল মাখা উচিত নয়, কারণ, তাহাতে ভাল চিবানো হয় না, তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলা হয়। রুটিতে ঘি মাখাইয়া ও ডালে না ভিজাইয়া শুধু তরকারি দিয়াই খাওয়া ভাল। অবশ্য পরে প্রোটিন ও ভিটামিনপূর্ণ একটি উপকারী খাদ্য হিসাবে ডাল আলাদা ভাবে খাওয়া উচিত।

(৬) **খুব চিবাইয়া ও আস্তে আস্তে খাওয়া**—অনেকক্ষণ ধরিয়া চিবাইয়া খাইলে খাদ্যের টুকরা খুব ছোট ছোট হইয়া যায় ও সেগুলির সহিত মুখের লালা অনেকটাও ভালভাবে মিশে। ইহার ফলে ঐগুলি পেটে গেলে সেখানকার পাচক রসও বেশী বাহির হইয়া তাহার সহিত মিশে ও খাবার ভাল হজম হয়।

কম চিবানো ও কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে নানা রোগ—খাওয়ার অনিয়মে বা কম চিবাইয়া খাইলে অনেক সময় প্রোটিন প্রভৃতির টুকরা বড় (মোটা) অন্ত্রের (Large intestines) মধ্যে পচিয়া অনেক রকম অপকারী জিনিস জন্মায়, সেগুলি রক্তের সঙ্গে মিশিলে ফোড়া, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি হয়। বড় অন্ত্রের মধ্যে বেশী পচন ক্রিয়া হইলে আলস্য, মাথা ধরা, দুর্বলতা প্রভৃতি হয়। সেখানে বেশী দিন ধরিয়া খুব পচন ক্রিয়া হইতে থাকিলে মানুষ অকালে জরাগ্রস্থ হয়।

(৭) **তরকারির খোসা**—না ফেলাই ভাল, কারণ খোসাতে ও তার ঠিক নীচেই দুটি উপকারী উপাদান সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে।

(৮) **রুচিকর খাবার**—যাহা খাইতে ইচ্ছা বা আগ্রহ আছে ও যাহা ভাল লাগে তাহাই খাওয়া উচিত। যাহাতে রুচি নাই তাহা অপেক্ষা যাহাতে রুচি আছে এমন জিনিস খাইলে সহজে হজম হয় কারণ তাহা দেখিলে ও খাইলে মুখ হইতে বেশী লালা ঝরে ও তাহার জন্য পেটের ভিতরে হজমী রসও (gastric juice) বেশী বাহির হয়।

(৯) **খাওয়ার আগে**—(ক) স্নান করা ভাল কারণ ঠাণ্ডাতে শরীরের ভাঙা গড়া (metabolism) বেশী হয়, তাই বেশী (ক্যালোরি বা তাপাংক যুক্ত) খাবারের দরকার হয়। এই জন্যই ঠাণ্ডা জলে স্নান করা বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াইবার পর (ও শীতকালে) ক্ষুধা বাড়ে। (খ) একটু ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস প্রভৃতির ঝোল (অভাবে জল) খাইলে পাকস্থলীর রস বেশী বাহির হয় বা হজম ভাল হয়।

(১০) **খাওয়ার সময় বা কিছু পরে**—(ক) শরীর বা মনের কোনও পরিশ্রম করিলে হজমের ব্যাঘাত হয় কারণ যে অঙ্গের বা যন্ত্রের মেহনত হয় সেখানে বেশী রক্ত চলাচল হয় অথচ তখন হজমের জন্য পাকস্থলীতেই প্রচুর রক্ত চলাচল হওয়া দরকার। (খ) ঐ কারণেই তখন স্নান করা উচিত নয় কারণ তাহা হইলে গায়ের চা[illegible] গরম করার জন্য সেদিকে রক্ত চলিতে আরম্ভ করে।

(১১) **খাওয়া বদলান**—প্রত্যহ একই রকম জিনিস না খাইয়া, এক একদিন এক এক রকম জিনিস খাওয়াই ভাল কারণ একঘেয়ে খাবার কারোই ভাল লাগে না বিশেষত গর্ভের সময় অরুচি প্রভৃতি অবস্থায়।

অনেক বাড়ীর গিন্নীরা ভাবিয়াই পান না যে কি করিয়া তাহারা

জল খাবার ও পুরো খাবারের রকমফের করিতে পারেন। পল্লীগ্রামে অনেক বাড়ীতেই সারা বছর সকলকে জল খাবার হিসাবে ফ্যান-ভাত ও আলু, কুমড়া, বেগুন বা কাঁঠাল বিচি ভাতে, কিম্বা বাসি ভাত বা পান্তাভাতের সঙ্গে কাগুন্দি, তেঁতুল, লঙ্কার আচার বা লঙ্কা-পোড়া, নতুবা মুড়ি বা চিড়ে, বা কোনও সস্তা ফল মূল দেওয়া হয়।

বর্ষাকালে যখন চারদিক জলে ডুবিয়া যাওয়াতে বাহিরে হওয়া মুস্কিল হয় তখন অবশ্য বাধ্য হইয়া প্রায় সব বাড়ীতেই খিচুড়ী, ডাল, ভাত, শাকপাতার ঝোল বা কুমড়ার ডালনা ইত্যাদি ক্রমাগত খাইয়া যাইতে হয়।

কিন্তু বড় বড় শহরে বারোমাসই নানা রকম তরি তরকারি পাওয়া যায়। শহরবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সংসারে **কি ভাবে জল খাবার ও পুরো খাবারের রকম ফের করা যাইতে পারে,** পথ প্রদর্শন হিসাবে তাহার এক **সপ্তাহের তালিকা** নীচে দেওয়া হইল। সংসারে আয় ব্যয় এবং গর্ভিণীরও বাড়ীর আর সকলের রুচি, শরীরের অবস্থা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এবং যে সব জিনিস পাওয়া যায় সেই অনুসারে অদল বদল করিয়া লইবেন :—

সপ্তাহের সাত দিন রকম রকম খাবারের ছক

সকালের জলখাবার	দুপুরের আহার	বিকালের জলখাবার	রাত্রির আহার
রবি বুধবার বিকালের মত। (২১০ পৃষ্ঠা দেখুন)	মটর বা ছোলার ডাল, (তাহার মধ্যে আলু, নারিকেল, টম্যাটো (বিলিতি বেগুন) কুমড়ার ডগা, ডাঁটা প্রভৃতি দেওয়া যায়)। কুমড়া, আলু, উচ্ছে, ঢ্যাঁড়শ, বা পটল ভাতে; অথবা শুক্তুনি বা তিক্ত ঝোল; মাছ বা মাংসের কালিয়া।	পায়েস, পিঠে বা বাড়ীর তৈরী কোনও মিঠাই।	রোজ রাত্রিতে ভাত খাওয়া অভ্যাস থাকিলেও, আজ রুটি, আটার লুচি বা পরোটা। যদি রোজ রাত্রে রুটি বা লুচি খাওয়া হয় তবে আজ ভাত।

সকালের জলখাবার	দুপুরের আহার	বিকালের জলখাবার	রাত্রির আহার
সোম মাখন মাখান পাঁউরুটির ফালি (টোষ্ট) বা ডিমের পোচ, বা ফল বা অঙ্কুর বাহির হওয়া ভিজা ছোলা, আদা ও নুন দিয়া অথবা গম-সিদ্ধ (দলিয়া)।	মুসুর ডাল, ডাঁটা চচ্চড়ি, রুই কাতলা প্রভৃতি তৈলহীন মাছের ঝোল।	ফলমূল, খেজুর, স্যালাড বা রুটি, পরোটা বা আটার লুচি ও তরকারী, বাদাম, কিশ্‌মিশ্‌ আখরোট ও মধু।	ভাজার বদলে তরকারি ভাতে, ডালনা বা কালিয়া।
মঙ্গল ক্রীম ক্র্যাকার, বার্লি বা এরারুটের বিস্কুট বা চিড়ে ভাজা বা পাঁপড় ভাজা বা আধ সিদ্ধ ডিম ও স্যালাড (২১২ পৃষ্ঠা)।	উচ্ছে ভাতে বা চচ্চড়ি, কাঁচা বা ভাজা মুগের ডাল, আলু, পটল, বেগুন প্রভৃতির তরকারি; শাকের ঝোল ও মাছের ঝোল। পালং প্রভৃতি শাক, ভাজা ছাড়া, আর যে কোনো প্রকারে।	—ঐ— বা গুড় দিয়া কল বাহির হওয়া ভিজা ছোলা, ছানা, চিনি বা গম-সিদ্ধ (দলিয়া)।	ভাজার বদলে আলু-পিঁয়াজ বা চ্যাঁড়স-আলু বা আলু-কুমড়োর চচ্চড়ি বা ছক্কা ও ছোট মাছের ঝোল বা জন্তুর মেটে (মেটুলি)।

সকালের জলখাবার	দুপুরের আহার	বিকালের জলখাবার	রাত্রির আহার
বুধ সোমবারের মত কিম্বা আলু বা রাঙ্গালু সিদ্ধ লবণ ও গোল-মরিচ দিয়া, অথবা মোহন ভোগ (হালুয়া) বা ঝোল।	থোড়, মোচা, হঁচড় বা কপির তরকারি, মুসুর ডাল, আলুভাতে বা কচি কুমড়া ভাতে বা বেগুন পোড়া; কই, শিঙ্গী, মাগুর, ভেটকি বা চিংড়ী মাছের ঝোল, কিম্বা কই মাছের তেল-ঝাল।	বাড়ীর তৈরী কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, ডালপুরি, রাধাবল্লভি, বেগুনি, ডালের বড়া, পেঁয়াজের বড়া প্রভৃতি বা স্যালাড, খেজুর বা কিশ্‌মিশ্‌ আখরোট, বাদাম ও মধু।	ভাজার বদলে ভাতে, পোড়া, ছোট মাছের ঝোল বা ঝাল।
বৃহস্পতি মুড়ি ও নারিকেল কোরা, মুড়ি ও কড়াইশুঁটি সিদ্ধ বা ছোলা সিদ্ধ বা ছোলা ভাজা বা চীনেবাদাম ভাজা, কিম্বা লবণ ও গুঁড়া মশলা মাখান কড়াই শুঁটি আলু বা ফুলকপি প্রভৃতি সিদ্ধ।	শুক্তুনি বা তিক্ত ঝোল বা বড়ি-বড়া-ডাঁটা-কচি কুমড়া প্রভৃতি দিয়া ঝোল; কিম্বা বেগুনের তরকারি; আলু, কচু বা ডাল ভাতে। জন্তর মেটে (মেটুলি) (ভাল নয়)।	সোমবারের মত, অথবা ঘোল বা মোহনভোগ (হালুয়া) বা গম-সিদ্ধ (দুলিয়া)।	নিরামিষ ঝোল ও মঙ্গল-বারের মত একটি চচ্চড়ি ও শাকের নূতন রকম।

সকালের জলখাবার	দুপুরের আহার	বিকালের জলখাবার	রাত্রির আহার
শুক্র বুধবারের মত।	মোচার ঘণ্ট বা কপির ডালনা বা কপির চচ্চড়ি বা পটল চচ্চড়ি বা কুমড়ার ডালনা; মুগ বা মটর বা বিউলির (কলাইএর) ডাল; কই, রুই, শিঙ্গী ও মাগুর ছাড়া যে কোনও মাছের ঝোল। ভাজা বা ভাতে নয়। পালং প্রভৃতি শাকের, ভাজা ছাড়া, যে কোনও রান্না।	সোমবারের মত।	দুপুরের মতো। কিম্বা বিউলির (কড়াইএর) ডালের সঙ্গে পোস্ত চচ্চড়ি।
শনি বাড়ীর তৈরী কোনো মিঠাই, কিম্বা রুটি, পরোটা বা আটার লুচি ও চচ্চড়ি, কিম্বা কল বাহির হওয়া ভিজা ছোলা গুড় দিয়া।	মুসুর, অড়হর, কাঁচা মুগ বা ভাজা মুগের ডাল; আলু, বেগুন, থোড়, ঢ্যাঁড়স, পটল, পেঁপে, ডুমুর, কুমড়া, পটল, ফুলকপি প্রভৃতির তরকারি; নারিকেলের বড়া, মাছের মধ্যে কোনও একটি বা দুইটির পাতলা ঝোল ছোট ট্যাংরা, মৌরলা, খলসে, খয়রা, পাবদা, চাঁদা, ভ্যাদা (-রয়না), পুঁটি প্রভৃতি।	চিড়া, দধি ও তাহার সহিত কলা, আম বা কাঁঠাল ও স্যালাড অথবা গম-সিদ্ধ (ডালিয়া)।	যে কোনও ভাতে। আলু-পটলের বা কুমড়ার ডালনা, পালং প্রভৃতি শাক, ভাজা ছাড়া অন্য কিছু জন্তুর মেটে (মেটুলি)।

বিবিধ মন্তব্য (ক) ইলিশ মাছ শস্তা হইলেও বেশী খাইবেন না। সপ্তাহে একদিন মাছ বন্ধ রাখা ভাল। সব বারেই ইলিশের ঝোল না করিয়া এক একদিন রসা পাতুড়ি, দই-ইলিশ, ঝাল বা কোর্মা করিবেন।

(খ) শীতকাল ছাড়া অন্য সময় একবেলা অম্বল আর এক বেলা পাতি বা কাগজি লেবুর রস খাইবেন। কাঁচা তেঁতুল, পাকা তেঁতুল, কাঁচা আম, আমড়া, চালতা, জলপাই, আমসি বা আলু বোখারা দিয়া এক একদিন অম্বল রাঁধা যায়। মাঝে মাঝে আচার, চাটনি বা জেলি বেশ মুখরোচক, বিশেষত গরম ও বর্ষাকালে এবং অরুচির সময়।

(গ) যেদিন জলখাবার হিসাবে ডিমের অমলেট বা পোচ খাইবেন সেদিন তাহার সহিত কিছু স্যালাডও খাইবেন।

(ঘ) যেদিন মুসুর বা ছোলার ডাল হইবে সেদিনও ভাতের সহিত কিছু স্যালাড দেওয়া ভাল।

(ঙ) রোজ দুপুরে ভাতের সহিত প্রথমে একটু খাঁটি ঘি খাইবেন ও শেষের দিকে দধি। হেমন্ত ও শীতকালে মাঝে মাঝে কাবাব, চপ, কাটলেট, মাছের ফ্রাই প্রভৃতি অল্প করিয়া খাওয়া যায়। বারোমাসই মাঝে মাঝে ছানার পায়েস বা ডালনা, পুডিং, কেক প্রভৃতি অল্প পরিমাণে খাইবেন।

(চ) ইহা ছাড়া রোজ আধ সের হইতে দেড় সের দুগ্ধ পান করিবেন।

(ছ) কিছু পরে ভিটামিনগুলির ছক এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ দেখিয়া খাবার জিনিস বাছিয়া লইবেন।

স্যালাডের উপকরণ—স্যালাডের শাক (পাতা), বাঁধাকপির সবুজ পাতা, বিলিতি বেগুন (টম্যাটো), গাজর, লেটুস, সেলারি, পেঁয়াজ, মুলো, আদা, শসা, কাকুড়ি, বরবটি, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি। এগুলি কাঁচা (ধুইয়া) টুকরা করিয়া কাটিয়া পাতি লেবুর রস (অভাবে ভিনিগার) লবণ, চিনি, গোল-মরিচ প্রভৃতি মিশাইয়া রুচিমত সুস্বাদু করিয়া খাইতে হয়। এটি খুব উপকারী। প্রায় রোজই খাওয়া ভাল।

(১৩) **ঘুমের আগেই খাওয়া**—রাত্রে শোওয়ার ঠিক আগে কিছু না খাওয়াই ভাল। কোনও কোনও ডাক্তার পর্যন্ত রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস দুগ্ধ বা অন্য কিছু খাইতে বলেন। যাঁহাদের ঐ সময়ে কিছু খাওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাঁহারা দুগ্ধ বা কোনও ভারি জিনিস না

খাইয়া কোনও ফল বা ফলের রস খাইতে পারেন। কিন্তু এইগুলিও পেট প্রভৃতি (পাকস্থলী) যন্ত্রকে কিছু খাটায়। এই জন্য রাত্রে ঘুমের আগে কিছু না খাওয়াই ভাল। ফলের রস বরং সকালে জল খাবারের প্রায় আধ ঘণ্টা আগে খাওয়া ভাল।

(১৪) **হজম না হইলে**—গর্ভিণীর হজম শক্তি কম থাকিলে তাহাকে সাদাসিধা ও হালকা খাবার খাইতে দেওয়া উচিত, তবে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীর পুষ্টির জন্য যে সব উপাদান যতটা দরকার তাহা যেন তাহার খাবারে থাকে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যথা :—

সকালে—ফল, পাঁউরুটির টোষ্ট ও গরম দুধ। সহ্য হইলে এই দুগ্ধে ডিম ফোটাইয়া মিশাইতে পারা যায় নতুবা নয়।

দুপুরে—রাঁধা বা কাঁচা তরকারি ও শাক পাতা—ইহার সহিত ইচ্ছা করিলে আলুপোড়া (baked), দুধ বা মাঠা (ঘোল), মটরশুঁটি, কড়াইশুঁটি, বরবটি বা শীম সিদ্ধ (puree) কিংবা মুসুর (lentil) প্রভৃতির ঝোল ও টোষ্ট, হাতে গড়া রুটি বা ভাত।

বিকালে—ফলের রস বা তরকারির ঝোল।

রাত্রে—ভাত বা রুটি, কিংবা দুইটিই ; ফল, দুধ, মধু কিংবা খেজুর।

(১৫) **বেশী মোটা হইয়া পড়িলে**—যদি সব রকম দরকারী জিনিস খাইবার সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে যেমন ক্ষুধা হয় সেই মত খাইলেই ঠিক পথে চলা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন সারবান (concentrated) জিনিস এত বেশী না খাওয়া হয় যাহাতে গর্ভিণী বেশী মোটা হইয়া পড়েন। অবশ্য সাধারণত এ অবস্থায় শরীরের ওজন কিছু বাড়েই।

ওজনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি—সাত সেরের মধ্যে, কিংবা গর্ভের আগের ওজনের তের ভাগের এক ভাগ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভারী হইতে দেখা যায়। তাহার ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়। গর্ভিণী বেশী মোটা হইয়া পড়িলে, যদিও অপর গর্ভিণীদের মতই প্রচুর তরি-তরকারী, শাকপাতা ও ফল, রোজ অন্তত তিন পোয়া দুধ ও গমের ভুষি (চোক্যর), বাদ-না দেওয়া আটার হাতে গড়া রুটি বা (লালচে brown) পাঁউরুটি বা ঢেঁকি ছাঁটা চালের ফেন-না-গালা ভাত খাইবেন, কিন্তু সারবান (concentrated) খাদ্যবস্তুর পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। যেমন সাধারণ দুগ্ধ পান না করিয়া

মাখন তোলা দুগ্ধ বা মাঠা (ঘোল) খাইবেন, এবং ঘি, মাখন, চর্বি, চিনি, মিঠাই, কেক প্রভৃতির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। *

(১৬) **বেশী খাওয়া**—অনেকে মনে করেন যে গর্ভিণীর অপর সময় অপেক্ষা প্রায় দুইগুণ খাওয়া উচিত, কারণ তাহার খাওয়া হইতেই তাহার নিজের ও গর্ভের সন্তানের শরীর পোষণ করিতে হইবে। এই ধারণা যে একেবারেই ভুল এ কথা মায়ের ও ভ্রূণের শরীরের ওজন তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে। এই বিশেষ সঙ্কটময় অবস্থায় অতিরিক্ত খাওয়া বড়ই নির্বোধের মত ও বিপদজনক, কারণ, ক্ষুধা না লাগিলে ও ভাল হজম না হওয়ার পরও বেশী বেশী খাইলে ঃ—(ক) পেটের যন্ত্রপাতিকে (লিভার, কিডনী প্রভৃতি) বেশী পরিশ্রম করানো হয়, তাহার ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়। শরীরের অপর সব যন্ত্রের মত পাকস্থলীও বেশী পরিশ্রমে ও অনিয়মে কমজোর হইয়া পড়ে। (খ) পেটে বায়ু হয় (পেট ফাঁপে) ও পেটে ব্যথা হয়। এই ব্যথাকে অনেকে প্রসবের বা গর্ভপাতের ব্যথা ভাবিয়া ভুল করে, তাহার ফলে অনর্থক গর্ভিণী ও বাড়ীর আর সকলের ভয় ও ভাবনা হয়। (গ) শরীরের মধ্যে বিষের সঞ্চার হয়। এই অবস্থাকে (toxæmia) টক্‌সিমিয়া বলে। (ঘ) এই জন্যই অনেক সময়ে গর্ভিণী বেশী খাওয়া সত্ত্বেও তাহার সন্তানের জন্মের সময়ের ওজন গড়পড়তা শিশুদের ওজন অপেক্ষা কম হয়।

তবে ক্ষুধা ও হজম শক্তি বুঝিয়া এই সময়ে ও শিশুকে দুধ দেওয়ার কয় মাস অপর সময় অপেক্ষা মাংস বৃদ্ধিকারী প্রোটিন (Protein) বেশী খাইতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই প্রোটিনের মধ্যে অর্ধেক দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। জরায়ুর পেশীগুলি ও ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য এই অতিরিক্ত প্রোটিন দরকার।

(১৭) **কম বা খারাপ খাওয়া**—কোনও কোনও গর্ভিণী এই ভাবিয়া অল্প আহার করেন যে তাহার ফলে গর্ভের সন্তান ছোট হইবে, সুতরাং প্রসবের সময়ে কষ্ট কম হইবে। ইহা ঠিক নয়। এইজন্য অথবা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বা অবহেলার জন্য উপযুক্ত আহার্য না পাইলে (ক) গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ও শরীর খারাপ হয়। (খ) গর্ভের সন্তানেরও শরীর ও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। জন্মের পর বড় হইবার সময় তাহার দাঁত খারাপ হয়, স্নায়ু (বা নাড়ী), তন্ত্র সুস্থ ও স্বাভাবিক (Stable) হয় না, তাহার শরীরে রোগাক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা

* যাঁহারা এমনিতেই মোটা তাঁহাদের রোগা হইবার উপায় 'যৌনবিজ্ঞান' ২য় খণ্ড আছে।

থাকে না, (গ) তাহার জন্মের পর দুর্বল ও রুগ্ন মা তাহার উপযুক্ত রকম সেবা-যত্ন করিতে না পারায় ও বেশী দিন বুকের দুধ না দিতে পারায় সেও রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে ও বেশী দিন বাঁচে না।

(১৮) **[illegible] থাকিলে**—এই সকল জিনিষ খাইবেন :—(ক) গমের ভূষি সমেত মোটা আটার রুটি, লুচি বা মেটে রংএর পাঁউরুটি। (খ) প্রচুর রাঁধা ও কাঁচা তরিতরকারী ও শাক পাতা। (গ) প্রচুর পাকা ফল, (কতক বিচি ও সরু শিরা সমেত) যেমন বেল, পেঁপে, কুল, কলা, পেয়ারা, আপেল, নাসপাতি, কিশ্‌মিশ্‌, মনাক্কা, খেজুর, বড় ও মিষ্টি যজ্ঞ ডুমুর (fig), আম আতা, কমলা লেবু ও তাহার খোসা ও আলু বোখারা।

(১৯) **বেশীবার অল্প করিয়া খাওয়া**—যদি দেখেন যে পূর্বে পেট ভরিয়া খাইলে যতখানি খাই:তন এখন তত খাইলে কষ্ট হয় তবে ২।৩ ঘণ্টা পর পর অল্প অল্প খাইবেন।

(২০) **সব রকম খাদ্যবস্তু উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া**—(Balanced diet) যে সব খাদ্যবস্তু ও তাহাদের উপাদানের গুণাগুণ লেখা হইল সেগুলি মনে রাখিয়া এমন ভাবে খাদ্যবস্তু বাছিয়া লইতে হইবে ও তাহাদের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে যাহাতে শরীর সব রকম প্রয়োজনীয় উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে পায়। এখানে মোটামুটি পথ নির্দেশ করার জন্য বলা যায় যে, খাইতে যত টাকা খরচ করিতে পারা যায় তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ নীচে লেখা পাঁচ রকম খাদ্যবস্তুর প্রত্যেকটির জন্য খরচ করা উচিত। (ক) শাক সব্জী ও ফল, (খ) দুগ্ধ, দধি, ঘোল, ননী, ছানা, খোয়া, ক্ষীর, পায়েস, পনির প্রভৃতি, (গ) মাছ, মাংস, ও ডিম, (ঘ) চাল, চিড়া, মুড়ি, খৈ, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি (ঙ) তেল, ঘি, মাখন, গুড়, ও মশলা।

খাদ্যদ্রব্যের উপাদান

পরিমাণের দিক দিয়া আমাদের খাবারে চার রকম বড় উপাদান আছে।

(১) **শ্বেতসার শ্রেণীর**, যথা—চাল, আটা, বার্লি, আলু প্রভৃতি।

(২) **শর্করা শ্রেণীর**, যথা—গুড়, চিনি, গ্লুকোজ (Glucose), খেজুর, মধু, ল্যাকটোজ (Lactose) বা দুগ্ধ শর্করা প্রভৃতি।

(৩) **চর্বি শ্রেণীর** (স্নেহপদার্থ) যথা—তেল, ঘি, মাখন, ননী, চর্বি প্রভৃতি।

(৪) **আমিষ শ্রেণীর** (প্রোটিন) যথা—(ক) প্রাণীজ—যেমন, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দৈ, ঘোল, মালাই, পনির প্রভৃতি ও (খ) উদ্ভিজ্জ—যেমন সয়াবিন, ডাল, শিম, বরবটি, কড়াইশুটি প্রভৃতি।

ইহাদের কাজ—(১), (২) ও (৩) পরিশ্রম করায় শক্তি দেয় ও শরীরকে গরম রাখে। বেশী খাইলে চর্বি এমন কি বহুমূত্রও হয়। তাহা ছাড়া (৩) নং শ্রেণীর খাদ্যবস্তু গুলি ক্লোমযন্ত্র (Pancreas) কে ঠিকভাবে চালায় ও কোষ্ঠবদ্ধ হইতে দেয় না। (৪) নং শ্রেণীর খাদ্যবস্তু শরীরের মাংস ভিতরের যন্ত্রগুলি ও হাড় তৈরী করে এবং শরীর গঠন ও মেরামতীর কাজ করে। ইহা পেশী, কোষ প্রভৃতির প্রধান উপাদান। জীবের জীবনীশক্তি প্রধানত ইহারই উপর নির্ভর করে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা প্রাণীজ প্রোটিনই হজম করা সহজ।

(১) শ্রেণী নং অন্তর্গত লুচি, টোষ্ট, মুড়ি, খই ও চিড়ে ভাজা (ডেকৃষ্ট্রিনীভূত dextrinised) বলিয়া সহজে হজম হয়।

শ্বেতসার শ্রেণীর খাদ্যবস্তুর সহিত স্নেহপদার্থ খাইলে—ভাল হজম হয়। কারণ, শ্বেতসার ক্লোমরসে (pancreatic juiceএ) ভাল হজম হয়, এবং স্নেহপদার্থ ক্লোমরস ক্ষরণে সাহায্য করে। এই জন্য বাঙালীদের ভাতে ঘি বা মাখন খাওয়া ও পশ্চিমাদের রুটিতে ঘি ও সাহেবদের টোষ্টে মাখন মাখানোর রীতি উপকারী। শস্য ও ভাত প্রভৃতি শ্বেতসারকে ৩০।৪০ মিনিট ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা উচিত।

স্নেহপদার্থ কত দরকার—যাহারা মাঝারি রকম পরিশ্রম করে তাহাদের প্রত্যহ সাড়ে পাঁচ হইতে ৭ তোলা এবং গর্ভিণী ও যাহারা কোলের ছেলেকে নিজের দুধ খাওয়ায় তাহাদের রোজ ৯ তোলা বা তাহার বেশী এইগুলি দরকার।

প্রোটিন কত দরকার—বয়স্ক লোকদের প্রত্যহ ৯ তোলা (আধ পোয়ার কিছু কম) প্রোটিন দরকার। ইহার অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ (প্রায় তিন তোলা) প্রাণীজ প্রোটিন হওয়া উচিত। সাধারণ অবস্থায় মেয়েদের শরীরের ওজন যত সের রোজ তত গ্রাম (১১ গ্রামে ১ তোলা) প্রোটিন খাইলে ঠিক হয়। দৃষ্টান্ত—একজন মহিলার ওজন দেড় মন (৬০ সের), হইলে তাহার রোজ ৬০ গ্রাম, অর্থাৎ, ৬০÷১১=প্রায় সাড়ে পাঁচ তোলা প্রোটিন দরকার।

গর্ভিণী ও প্রসূতিদের অন্য সময় অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রোটিন দরকার। ইহাদের জন্য যকৃত (মেটুলী বা মেটে), কিড্‌নী (গুরদা), ডিম ও দুধের প্রোটিন বিশেষ উপকারী। প্রোটিন যুক্ত খাবার একেবারে অনেকটা খাওয়া অপেক্ষা কয়েকবারে অল্প অল্প করিয়া খাইলে বেশী পরিমাণ হজম করা যায়।

ছেলে মেয়েদের—রোজ আড়াই হইতে পাঁচা পোয়া দুধ ও জন্তু বা পাখীর মাংস, মাছ বা ডিম (মাছ বা মাংস ও ডিম দুইই হইলে আরও ভাল) দেওয়া উচিত।

নিরামিষ খাদ্যবস্তুতে প্রোটিন—একুশটি নিরামিষ খাদ্যবস্তুতে প্রোটিনের শতকরা অনুপাত ক্রম নিম্নহার অনুযায়ী নীচে দেখান হইল :—

খাদ্যবস্তু	শতকরা অনুপাত	খাদ্যবস্তু	শতকরা অনুপাত	খাদ্যবস্তু	শতকরা অনুপাত
সয়াবিন	৪০	ছোলা	২২	গোল আলু	২
খেঁসারী	৩২	সিম	২১	ফুলকপি	২
মসুর	২৫	আটা	১৪	বাঁধাকপি	২
বরবটি	২৪	ময়দা	১১	পটল	¾ (পৌন)
সোনামুগ	২৪	আতপ চাল	৭	বেগুন	½ (অর্দ্ধেক)
মাষ কলাই	২৩	সিদ্ধ চাল	৭	কাঁচকলা	ঐ
মটর	২২	পালং শাক	২	মানকচু	¼ (সিকি)

সবচেয়ে ভাল ধরণের প্রোটিন আছে—দুধ, পনির, ডিম, জন্তু ও পাখীদের মাংস ও মাছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন আছে শুষ্ক শুঁটি (peas), শিম, (beans), বরবটি (lentils), বাদাম, আখরোট প্রভৃতিতে (nuts)। শুধু উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে শরীর রক্ষার উপযোগী সব রকম প্রোটিন উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে হইলে অনেক বেশী রকম খাদ্য অনেক বেশী পরিমাণে খাওয়া দরকার। কিন্তু তাহাতে হজমের যন্ত্রপাতির উপর অযথা অত্যাচার হইবেই।

দুধ, মাংস ও মাছের প্রোটিনের সবটাই হজম হয়, কিন্তু চাল, গোল আলু, ডাল, গম ও ভুট্টার প্রোটিন যথাক্রমে শতকরা ৮৮,৭৯,৫৬,৪০ ও ৩০ ভাগ মাত্র হজম হয়।

আমিষে প্রোটিন—মাছে শতকরা ১৫.হইতে ২৫ ভাগ থাকে। সিঙ্গী মাছে খুব বেশী। ডিমের সাদা ভাগে ১১।১২ ও কুসুমে প্রায় ১৫ ভাগ আছে।

এই চার রকম উপাদানযুক্ত খাবার অল্প পরিশ্রমী একজন লোকের গড়পড়তা কতটা দরকার তাহা নীচে দেওয়া হইল :—

প্রোটিন—	১০০ গ্রাম = ৯ তোলা =	৪১০	ক্যালোরি (বা তাপাংক)
স্নেহ পদার্থ	৬০ " = ৫½ তোলা =	৫৫৮	"
শ্বেতসার ও চিনি জাতীয় জিনিস	৫৫০ " = ১০ ছটাক =	২২২৫	"
	মোট	৩১৯৩	

যে **মাঝারি রকম পরিশ্রম** করে তাহার খাদ্যবস্তুতে দৈনিক ৩৫০০ ক্যালোরি ও যে **কঠিন পরিশ্রম** করে তাহার খাদ্যবস্তুতে ৪৫০০ হইতে ৯০০০ ক্যালোরি দরকার। যাহার যত মোট ক্যালোরী দরকার সে ঐ তিন প্রকার খাবারে, উপরের অনুপাতে, ভাগ করিয়া লইবে। কয়েকটি খাদ্যবস্তুতে এই সব জিনিস কত আছে তাহা পরে একটি ছকে দেখান হইয়াছে।

এই কয় রকম স্থূল উপাদান ছাড়া আমাদের খাদ্যবস্তুতে আরও কতক জিনিষ খুব অল্প পরিমাণে থাকে, সেগুলি না হইলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না। যেমন কয়েক রকম **খাদ্যপ্রাণ** বা ভাইটামিন, **চুন, লোহা** প্রভৃতি কয়েকটি **ধাতব লবণ** (mineral salts) জাতের উপাদান। এই সব উপাদান সাধারণ রকম পরিশ্রমী লোকের রোজ কতটা দরকার সেটা কিছু পরে 'দুধ' অনুচ্ছেদে পাইবেন।

ওজন লওয়া

গর্ভিণীর শরীরের ওজন শেষ তিন মাস প্রতি সপ্তাহে লওয়া দরকার। যদি হঠাৎ ২।৩ সের (৪।৫ পাউণ্ড) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ধরা পড়ে তাহা হইলে খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং ডাক্তার দেখান উচিত, কারণ হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি তড়কার (Eclampsia) পূর্ব লক্ষণ। তখন অন্যান্য খাদ্য কমাইয়া কেবল দুধ পান এবং পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলে ওজন আবার দ্রুত হ্রাস পায় ও তড়কার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তড়কার অন্যান্য লক্ষণের কথা পরে বলা হইতেছে।

---

* ১৫° ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) গরম জলকে ১৬° ডিগ্রি গরম করিয়া তুলিতে যতটা তাপ দরকার হয় সেই তাপকে 'ক্যালোরি' বলে। কোন খাদ্যবস্তু খাইলে শরীরে যতটা তাপ যোগায় সেই তাপকে ক্যালোরির মাপে প্রকাশ করা হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা

কোষ্ঠবদ্ধতা একটি সাধারণ রোগ হইলেও শরীরের পক্ষে ইহা বিশেষ অপকারী। গর্ভিণীর ইহা হইলে চিন্তার কারণ হয়।

প্রতিদিন দুইবার পেট পরিষ্কার হওয়াই ভাল, তবে যদি একদিন অন্তরও নরম মলত্যাগ হয় তবে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। নহিলে ঃ

(ক) পরিমিত খাওয়া ও ব্যায়াম করা উচিত।

(খ) রোজ খোলা বাতাসে বেড়ানো উচিত। তাহার সুবিধা না থাকিলে ত বটেই, থাকিলেও বেড়ানো ছাড়া ঘরের মধ্যে কতকগুলি খালি হাতে ব্যায়াম করা উচিত।

(গ) প্রচুর জল পান করিতে হইবে সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া ও রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে এক গেলাস অল্প গরম জল, সুবিধা হইলে তাহাতে লেবুর রস দিয়া খাইতে হইবে। সকালে জলযোগ করার এক ঘণ্টা হইতে আধ ঘণ্টা পূর্বে এক গেলাস ঠাণ্ডা বা অল্প গরম জল ও সম্ভব হইলে একটি (সিদ্ধ না করা) আপেল। পুরো খাওয়ার ২।১ ঘণ্টা পর হইতে তৃষ্ণা না হইলেও, যখন তখন মনে পড়িলেই ঔষধ হিসাবে জল পান করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যহ জলযোগের পর **সকালে ও বিকালে** একই **নির্দিষ্ট** সময়ে মলত্যাগের তাগিদ না থাকিলেও, পায়খানায় গিয়া খানিকক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যহ কিছুক্ষণ তলপেটের ডান দিকের নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া আঙুলগুলি দিয়া একটু চাপিয়া একটু উপরে আনিয়া, বাম দিকের নীচে অবধি মালিশ করিতে হইবে।

টোটকা ও মুষ্টিযোগ

এই সব নিয়ম পালন করিয়া গেলেও যদি যথেষ্ট উপকার না হয় তবে ওগুলি ছাড়া এই সব **সহজ ও পরীক্ষিত দেশী মুষ্টিযোগের** মধ্যে কোনও একটি অথবা একাধিক ব্যবহার করিবেন ঃ—

(১) গোটা দশেক মনাক্কা (বড় কিশ্‌মিশ্‌) বা খেজুর দুধে সিদ্ধ করিয়া দুধ অল্প গরম থাকিতে দুধ সমেত রোজ খাওয়া।

(২) ত্রিফলার জল—রাত্রে একটি বড় হরিতকী ভাঙিয়া বিচি ফেলিয়া দিয়া, খোলার ছোট ছোট টুকরা করিয়া শুষ্ক আমলকী ও বহেড়া (তিনটই

মশলার দোকানে 'ত্রিফলা' নামে বিক্রয় হয়) সমান পরিমাণে লইয়া আধ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে উহার জল ছাঁকিয়া কিছুদিন খাইবেন।

(৩) এক তোলা ইশবগুলের ভূষি, কিছু অল্প গরম দুধ, অথবা শরবতের সহিত প্রত্যহ সকালে বা রাত্রে শুইবার পূর্বে কিছুদিন খাইবেন।

(৪) একটি ছোট কাপ ভরা গমের ভূষি গরম জল, মধু বা ফলের রসের সহিত প্রত্যহ ২।৪ মাস খাওয়া। যদিও এই ভূষিতে ছিবড়ে বা আঁশযুক্ত কোন জিনিস (roughage) নাই তবুও ইহাতে ভিটামিন বি ১ ও কয়েকটি ধাতব লবণ থাকায় ইহা ধীরে ধীরে অন্ত্রের শেষ ভাগকে (colon) ক্রিয়াশীল (revitalise) করিয়া তোলে। এই জন্য ইহা ব্যবহারে কয়েক মাসেই কোষ্ঠবদ্ধতা সারে। সেই জন্য ইহার সহিত অপর হাল্কা জোলাপের ঔষধও খাইয়া যাইতে হইবে। ২।১ মাস পরে ইহার পরিমাণ ক্রমশ কমাইতে পারা যায় ও আরও ২।১ মাস পরে একেবারে বন্ধ করিতে পারা যায়। গমের ভূষিতে যে ভিটামিন বি ও ধাতব লবণগুলি আছে তাহাদের উপকার পাইবার জন্য গর্ভাবস্থায় রোজ চারি হইতে আট চা চামচ (a tablespoon or two) ইহা খাইয়া যাওয়া ভাল।

(৫) দিনে ২।৩ বার, খাইবার পূর্বে, চা চামচের ২ চামচ (desert-spoonful) তিসি জলে মিশাইয়া খাওয়া।

(৬) দৈ ও মাঠা অন্ত্রের নলের শেষের দিকে (colon) উপকারী জীবাণুদের বাড়িতে সাহায্য করে, তাই এই দুইটিও ভাল

(৭) ২।৩ চামচ ইশবগুল অথবা তাহার ভূষি (পরিস্কার করিয়া) ৩।৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পাতি লেবুর রস ও চিনি, অথবা শুধু চিনির সহিত দৈনিক খাওয়া।

ডাক্তারী জোলাপ—উপরে লেখা উপায়গুলিতে সুফল না পাইলে নরম জোলাপ লইবেন। **কখনও কড়া জোলাপ লইবেন না।** যেমন রেড়ির তেল, ম্যাগসালফ্ (Magsulph), সোডিসাল্ফ্ (Sodi sulph) ক্রোটন তেল (Croton oil), ক্যালোমেল (Calomel), ফেনপ্থ্যালিন (Phenopthelein), কলোসিন্থ (Colocynth), কালাদানী (Aloes), Epsom salt প্রভৃতি।

তিসি (flaxseed) জলে সিদ্ধ করিয়া হড়হড়ে ভাবের হইলে, তাহা দিয়া এনিমা (enema) বা ডুশ লইবেন। শেষেরটিই ভাল। এনিমার সুবিধা

না থাকিলে ডাক্তারী নরম জোলাপগুলির মধ্যে কোনওটি ব্যবহার করিবেন।

(১) ফিলিপের মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া সবচেয়ে ভাল।

(২) লিকুইড্ ক্যাস্কারা ইভাকুয়্যাণ্ট পেটেণ্ট ঔষধ দিনে তিন বার ৫ হইতে ১০ ফোঁটা।

(৩) রাত্রে শুইবার পূর্বে তরল প্যারাফিন চা এর চামচের ২ হইতে ৮ চামচ (যেমন ডাক্তার বলেন) কিম্বা Pulv Liquorice Compound (এর প্রধান উপাদান যষ্টি মধু) চা চামচের দুই চামচ এক পেয়ালা গরম দুধ বা জলে মিশাইয়া খাওয়া খারাপ নয়।

(৪) **ফলের লবণও**—ভাল। Eno's Fruit Salt ভাল জিনিষ।

(৫) **গ্লিসারিন**—আধ আউন্স ও জলপাইএর তেল মিশাইয়া ভোর বেলায় খাইলে ২।৩ ঘণ্টা পরে পেট পরিস্কার হইয়া যায়।

হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া (বয়রা) রাত্রে জলে ভিজানো ইশবগুল, কোনও মিষ্ট সহযোগে, প্রাতে অথবা রাত্রে শয়নের পূর্বে ইশবগুলের ভূষি দুধ, শরবত বা জলের সহিত বড় হরিতকীচূর্ণ প্রভৃতি খাওয়া; এবং **অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া মাঝে মাঝে এনিমা (ডুশ) লওয়া উচিত।** তরল প্যারাফিন, ফিলিপ্স মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া, ফলজাত লবণ (Fruit salt) প্রভৃতি মৃদু বিরেচক মাঝে মাঝে লওয়া যাইতে পারে।

ডাক্তারখানায় প্রাপ্তব্য Hoemato-sar-saparilla নামক ঔষধ ব্যবহারে মলমূত্র পরিষ্কার থাকে ও ক্ষুধা হয়। ৬০ ফোঁটা (১ ড্রাম) ঔষধ আধ ছটাক (২॥ তোলা) জলের সঙ্গে প্রত্যহ আহারান্তে দুই বেলা খাইতে হয়। এক সপ্তাহ হইতে দ্বিগুণ মাত্রায় (১২০ ফোঁটা—২ ড্রাম) করিয়া সেবন করিতে হয়। শিশির গায়ে সেবন-বিধি থাকে। আদা ও লবণ অথবা গুড় সহযোগে ভিজা ছোলা খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ইহা আহার ও ঔষধ উভয়েরই কাজ করে।

গর্ভধারণে ও গর্ভাবস্থায় বিধি নিষেধ

গর্ভধারণ অনুচিত কখন

(১) ১৬ বৎসর বয়সের নীচে সন্তান জন্মাইলে প্রসবের সময় মায়েরা ও জন্মের পর শিশুরা বেশী মরে। না মরিলেও এ রকম শিশুদের স্বাস্থ্য অনেক সময় খারাপ হয়।

(২) ৩০।৩৫ এর পর গর্ভ ও প্রসবের সময়ে নানা গোলযোগ হইতে পারে।

(৩) প্রায় বৎসর বৎসর সন্তান হইলে মায়ের স্বাস্থ্য ও চেহারা খারাপ হইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর ভাল রকম যত্ন করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না, ফলে মৃত্যুও বেশী হয়।*

(৪) স্বাস্থ্য খুব খারাপ থাকিলে।

(৫) কোন শক্ত ও পুরাতন রোগ থাকিলে। যেমন ক্ষয়কাশ (যক্ষা বা টি. বি.); বহুমূত্র (মধুমেহ, diabetes) কুষ্ঠ; হৃৎপিণ্ডের রোগ; যদি পিতার সামান্য কাটিয়া যাওয়ার স্থান হইতে ক্রমাগত রক্ত পড়িয়া যাওয়া (হেমোফিলিয়া hoemophila) রোগ থাকে; খারাপ ধরণের রক্তশূন্যতা (pernicious anaemia); বস্তি প্রদেশের হাড়ের খারাপ গঠন; তরুণ গরমি (উপদংশ বা সিফিলিস); প্রমেহ বা গণোরিয়া; শিরদাঁড়ার বিশেষ রকম কুগঠন; বস্তি প্রদেশের মাঝের হাড়ের গর্ত ছোট হওয়া (যার জন্য প্রসব বেদনা উঠিলেও সন্তান বাহির হইতে পারে না); পাগলামি; মৃগী, নানা মানসিক রোগ (যেমন mania ছিট) melancholia (বিষাদবায়ু), Schizophrenia (বৈরাগ্য), প্রভৃতি; জড় বুদ্ধি (হাবা বোবা ভাব বা দুর্বলচিত্ত হওয়া); কালা-বোবা; বংশগত পক্ষাঘাত ধরণের স্নায়বিক রোগ; কালা (শুনিতে না পাওয়া); হাঁপানি; বংশগত পাণ্ডু (কামলা বা ন্যাবা বা জণ্ডিস jaundice) গলগণ্ড প্রভৃতি

*আবশ্যক মত গর্ভ নিবারণ করিবার আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়গুলির জন্য আমার 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' কিংবা 'যৌনবিজ্ঞান' ২য় খণ্ড দেখুন।

রোগের বংশগতি—এই রোগগুলির মধ্যে কোনও কোনওটির. বংশগতি সম্বন্ধে কিছু দরকারী কথা সংক্ষেপে বলা দরকার।

যক্ষা—অনেক সময় গর্ভকালে এ রোগ বাড়ে না, কিন্তু প্রসবের পর তাড়াতাড়ি বাড়ে, বিশেষত সন্তানকে নিজের দুধ খাওয়াইবার পর। **মাতা হইতে গর্ভস্থ সন্তানে এ রোগ যায় না**, কিন্তু যক্ষা রোগীর সন্তানদের স্বাস্থ্য খারাপ থাকে এবং ঐ রোগগ্রস্ত মাতা বা পিতার কাছে থাকিলে তাঁহাদের স্পর্শন, চুম্বন প্রভৃতির জন্য সন্তানদের সহজেই ঐ রোগ হয়। যক্ষা রোগিণীর গর্ভ হইয়া পড়িলে তাহাকে বরাবর ডাক্তারের তদারকে রাখিতে হইবে। ডাক্তার উচিত বিবেচনা করিলে তখনি অস্ত্রোপচারে ভ্রূণ বাহির করিয়া দিবেন, কিংবা গর্ভিণীকে কষ্টের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য গর্ভের শেষের দিকে, পূর্ণ সময়ের পূর্বে প্রসব করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

বহুমূত্র—শতকরা ২৫।৩০ জন রোগীর ছেলে মেয়েদের এ রোগ হয়। রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে যত বেশী বা কম লোকের এই রোগ থাকে তাহার সন্তানদের এই রোগ হইবার তত বেশী বা কম সম্ভাবনা।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—গর্ভ ও প্রসবের ফলে হৃৎপিণ্ডের উপর খুব জোর পড়ে। এই রোগ থাকা সত্ত্বেও গর্ভ হইয়া পড়িলে কি করা উচিত এ বিষয়ে 'যক্ষা' সম্বন্ধে প্যারার শেষে যাহা লেখা হইয়াছে সেই কথাই খাটে।

তরুণ সিফিলিস—পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাতার—ইহা হইয়া থাকিলে ২।৪ বার গর্ভপাত হয় ও (ক্রমশ গর্ভের বেশী বেশী দিনে) ক্রমে পুরাতন হওয়ায়, বিষের তেজ কমিয়া আসিলে, পরে ২।১ বার মৃত সন্তান জন্মায়, শেষে স্বাস্থ্যহীন, সিফিলিসগ্রস্ত ও অল্পায়ু সন্তান জন্মায় তাহার পর সুস্থ ছেলে হয়।

যদি মাতার ঐ রোগ হইবার পর দশ বৎসর হইয়া গিয়া থাকে, কিম্বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা হইয়া থাকে তবে সুস্থ সবল সন্তান জন্মাইতে পারে।

যদি গর্ভের পূর্বে বা পরে মাতার এই রোগ হইয়া পড়ে তবে গর্ভের আগে অথবা সারা গর্ভকালে, সুচিকিৎসা চলিলে ভাল সন্তান জন্মাইতে পারে।

গর্ভের যত শেষের দিকে ঐ রোগ হইবে সন্তানের উহা হইবার তত সম্ভাবনা। কেবল পিতার এই রোগ থাকিলে অথচ মাতার না হইলে, ভ্রূণের শরীরে এই বিষ যায় না, ফলে ভাল সন্তান জন্মাইতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কাহারও

এই রোগ হইলে দেহ মিলন ত দূরের কথা চুম্বনেও অপরের এই রোগ হইতে পারে। সুতরাং সাবধান!

যদি গর্ভিণীর **প্রদরের** উপদ্রব থাকে, তবে স্নিগ্ধ পচন-নাশক ঔষধ (যথা পারমাংগানেট অব পটাশ) দ্বারা **চিকিৎসকের উপদেশ মত** প্রত্যহ একবার করিয়া ডুশ গ্রহণ করা আবশ্যক। **ডুশগ্রহণের জলের চাপ খুব মৃদু হওয়া প্রয়োজন**। অর্থাৎ ডুশের জলপাত্রটি নিতম্ব হইতে দেড় হস্তের অধিক উচ্চে থাকিবে না।

গণোরিয়া—এই রোগ সন্তানে বর্তে না বটে তবে প্রসবের সময়ে ইহার **পুঁজ সন্তানের চোখে লাগিয়া ২।৪ দিনের মধ্যে আঁতুড়েই সে অন্ধ হইয়া যায়**। তবে জন্মাইবার সময়ে তাহার শুধু মাথা বাহির হইবামাত্র যদি যদি দুই চোখ গরম জলে ফোটানো বোরিক তুলা, অভাবে গরম জলে ফোটান পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ভাল করিয়া মুছাইয়া জন্মাইবার পর প্রত্যেক চোখে এক এক ফোঁটা সিল্‌ভার নাইট্রেট্ লোশন (%Silver Nitrate Lotion) দিলে আর সে ভয় থাকে না।

পাগলামি প্রভৃতি মানসিক রোগ—Schizophrenia (সব জিনিস ও মানুষে অনাসক্তি, সুখ-দুঃখ বোধ হীনতা, অলংলগ্ন কথা বলা কিংবা চুপ করিয়া জড়ের মত থাকা), mania (ছিট), melancholia (বিষাদ বায়ু), জড় বুদ্ধি হাবা প্রভৃতি মাতার অথবা পিতার **সারিয়া গেলেও সন্তানদের হইবার খুবই সম্ভাবনা**। যদি এক পক্ষের এই রোগ থাকে কিন্তু অপর পক্ষে নির্দোষ হয়, কিন্তু তাহার পরিবারে কাহারও থাকে তাহা হইলেও সন্তানদের ইহা হইবার খুবই সম্ভাবনা। যদি দুইজনই নির্দোষ হয় কিন্তু দুইজনেরই নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কাহারও থাকে তাহা হইলেও সন্তানদের হইবার বেশ সম্ভাবনা থাকে। যদি দুজনই নির্দোষ এবং একজনের নিকট আত্মীয় বা বাপ ও মায়ের বংশ নির্দোষ হইয়া থাকে কিন্তু অপর পক্ষের কোনও কুলে কাহারও ছিল এইরূপ অবস্থায় সন্তানদের সাবধানে ও সযত্নে মানুষ করিলে তাহারা সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে পারে।

মৃগী—সন্তানদের হইবার খুবই সম্ভাবনা।

কালা-বোবা—স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই কালা-বোবা হইলে সন্তানরাও হইবে। যদি একজন কালাবোবা কিন্তু অপরজন নিজে ও তাহার পিতৃ ও মাতৃকুল নির্দোষ হয় তবে সন্তানদের হইবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু কোনও কোনও

সন্তান ঐ দোষের বাহক (carriers) হইতে পারে, অর্থাৎ তাহারা নিজেরা কালা-বোবা না হইলেও বীজ শরীরে থাকার দরুন তাহাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ হইবে। যদি দুইটি পরিবারের কেহ কেহ কালাবোবা হন এবং তাহাদের মধ্যে এক পরিবারের ছেলের সঙ্গে অপর পরিবারের মেয়ের বিবাহ হয়, তবে, এই পাত্র পাত্রী দুইজনেই ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের সন্তানদের মধ্যে কাহারো কাহারো এই দোষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে।

স্নায়বিক রোগ—বংশগত পক্ষাঘাতের মত কতকগুলি রোগ বংশপরম্পরায় হইয়া থাকে, কিন্তু অপর কতকগুলি কমই হয়।

শুনিতে না পাওয়া—(Otosclerosis) যদি স্বামী বা স্ত্রী শুধু একজনই বধির হন, কিন্তু তাঁহার বংশে আর কেহ বধির না হন তাহা হইলে সন্তানদের বধির হইবার সম্ভাবনা কম। যদি দুইজনের কেহই বধির না হন কিন্তু তাঁহাদের দুই জনেরই বংশে কেহ কেহ বধির থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানদের বধির হইবার খুবই সম্ভাবনা

হাঁপানি—সন্তানদের হইবার প্রবণতা খুব বেশী।

গলগণ্ড—সন্তানদের হইবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু পিতার থাকিলে সম্ভাবনা খুব কম।

ক্যান্সার—ছোঁয়াচে বা বংশগত নয়, তবে সাংঘাতিক বটে।

রক্তহীনতা—(Anaemia) বংশগত নয়।

মুত্রাশয়ের (বৃক্ক বা কিডনী kidney) রোগসমূহ—বংশগত নয়।

চর্মরোগগুলি—অধিকাংশই ছোঁয়াচে ও সন্তানদের হয়, কিন্তু বংশগতগুলি বিপজ্জনক নয়।

সারকথা। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইবে যে :—

(১) বিবাহের পূর্বে এই সকলের মধ্যে কোনও রোগ হইয়া থাকিলে না সারা পর্যন্ত বিবাহ করা উচিত নহে। **পাগলামি ছাড়া** অপর রোগগুলি সারিয়া গেলে তবেই বিবাহ করা যায়।

(২) বিবাহের পর এইসব রোগ হইলে, যতদিন না সারে ততদিন পর্যন্ত যাহাতে সন্তান না হয় তাহার জন্য খুব সাবধানে গর্ভ নিবারণের আধুনিক কোনও একটি বা এক সঙ্গে একাধিক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩) যে পরিবারে বা বংশে উহাদের মধ্যে কোনও রোগ আছে সেই পরিবারে বিবাহ করা উচিত নয়।

(৪) এই জন্য এমন কোনও পরিবারের খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে তাহাদের সন্তানদের সেই রোগ প্রবল আকারে দেখা দিতে পারে।

যদি রোগিণীর গর্ভ হইয়া পড়ে—যদি ঐ সকল রোগের কোনও রোগিণীর গর্ভ হইয়া পড়ে, কিংবা গর্ভের সময় হয়, তবে গর্ভিণীকে সর্বদা ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। তিনি উচিত মনে করিলে অস্ত্রোপচারে গর্ভ নষ্ট করিবেন, ইহার নাম Dilating and Curetting—সংক্ষেপে D. C. operation কিংবা গর্ভের শেষের দিকে, প্রসবের সময়ের পূর্বে ঔষধ বা যন্ত্রের সাহায্যে প্রসব করাইবেন।

অস্ত্রোপচারে বন্ধ্যা করিয়া দেওয়া—যদি ডাক্তারের মতে (১) বংশগত রোগ লইয়া সন্তান জন্মাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিংবা (২) পূর্বে গর্ভ বা প্রসবের সময় কোনও বিপজ্জনক অবস্থা হইয়া থাকে এবং পরের বারও সে রকম হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে, ডাক্তারকে অনুরোধ করিলে ও তিনি উচিত বিবেচনা করিলে, দুইদিকের ডিম্বানুবাহীনল কাটিয়া ও বাঁধিয়া দিয়া নারীকে বন্ধ্যা করিয়া দিতে পারেন। এই অস্ত্রোপচারের নাম Salpingectomy ইহা হাসপাতালে করানোই ভাল। ইহা করাইলে দম্পতির (১) আর গর্ভ নিবারণের জন্য কোনও যন্ত্র বা ঔষধ ব্যবহার করার খরচ ও হাঙ্গাম করিতে হইবে না। (২) ইহাতে স্বামী ও স্ত্রী চিরকালের মত গর্ভের ভয় ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন। (৩) যৌন জীবনে কোনও অসুবিধা বা গোলযোগ হয় না। এবং (৪) তলপেটের কোনও রোগের জন্য অস্ত্র করাইবার দরকার থাকিলে ঐ সঙ্গে ইহাও করানো যায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—দৈহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য রীতিমত স্নানাদি করা আবশ্যক। স্নানের পূর্বে সর্বশরীরে খাঁটি সরিষার তৈল মালিশ করা উপকারী। পরিষ্কার সামান্য গরম জলে জননেন্দ্রিয় দৈনিক দুইবার করিয়া ধৌত করা দরকার। ডেটল (Dettol), লাইসল (Lysol) প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।

পোষাক-পরিচ্ছদ—গর্ভাবস্থায় পোষাক-পরিচ্ছদ এমন ঢিলা হওয়া দরকার, যাহাতে পেটের অথবা অন্য কোন অঙ্গের উপর কোনও প্রকার চাপ না পড়ে। যদি উদর অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুলিয়া পড়ে তবে বন্ধনী দ্বারা পেট বাঁধিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কাজকর্ম—গর্ভাবস্থায় কোনও প্রকার শ্রান্তিজনক কঠোর গৃহকর্ম বা ব্যায়াম করা উচিত নহে। তাই বলিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমও বর্জন করা মোটেই উচিত নহে। সাংসারিক দৈনন্দিন কর্তব্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ ও লঘু ব্যায়াম গর্ভিণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে রক্ত-চলাচলের প্রতিবন্ধকতা জন্মে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের প্রসব অতি সহজে হইয়া থাকে। অলসতা পরিহার করিয়া শরীরকে কর্মক্ষম রাখা উচিত। আমার এক আত্মীয়া তিন বারই গর্ভাবস্থায় প্রসবের ১২।১৪ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নড়িয়া চড়িয়া কাজকর্ম করিয়া বেড়াইয়াছেন। সিঁড়ি বাহিয়া উঠানামাও (অবশ্য আস্তে আস্তে) করিয়াছে। ইহাতে তাহার প্রসব অতি সহজে হইয়াছে।

তবে **অত্যধিক পরিশ্রমের** কোনও কাজ বা ব্যায়াম করা উচিত নহে।

গর্ভকালের শেষার্ধে রেলপথে বহুদূর যাতায়াত বা খারাপ রাস্তায় মোটার ভ্রমণ করা উচিত নহে। ঋতুস্রাবের সমসাময়িককালে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে, কারণ গর্ভপাতের আশঙ্কা এই সময়েই বেশী।

যে সমস্ত কার্য বা দৃশ্যে উত্তেজনা, ক্রোধ, বিরক্তি ও নৈরাশ্যের উদ্রেক হয়, সেই সমস্ত দৃশ্য ও কার্য হইতে গর্ভিণীকে যথাসম্ভব দূরে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। জননীর মানসিক অবস্থা সন্তানের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই যে, মানসিক অবস্থা যদি জননীর স্বাস্থ্যের বা সাধারণভাবে শরীরের অনিষ্ট করে, তবে সেজন্য সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হইয়া পড়ে। প্রসবকালে কষ্ট হইয়াছে এমন সকল দৃষ্টান্তের কথা বা বিঘ্ন হইতে পারে এমন আশঙ্কা পরিত্যাজ্য।

বিশ্রাম ও নিদ্রা—গর্ভাবস্থায় অধিক নিদ্রা ও বিশ্রামের দরকার। রাত্রি-জাগরণ একেবারেই করিতে নাই। দিবানিদ্রা যথাসম্ভব বর্জন করিতে হইবে। তবে এক আধটু একেবারে মন্দ নয়। ভোজনান্তেই শয়ন করা উচিত নয়। শয়ন-গৃহে বায়ু চলাচল, রৌদ্র প্রবেশ ইত্যাদি স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম পালন গর্ভিণীর জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্বাস্থ্যনীতির সাধারণ নিয়ম সকলের পালনীয় বটে, কিন্তু গর্ভিণীর পক্ষে অবশ্য পালনীয়। কারণ, সাধারণ অবস্থায় স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘনের কুফল আমরা দেরিতে ভোগ করি এবং অনেক সময় অবস্থাবিশেষে বাঁচিয়াও যাই; কিন্তু

গর্ভিণীর বেলায় তাহা হয় না। গর্ভিণীর সমস্ত দেহযন্ত্র গর্ভাবস্থায় এমন একটি সাময়িক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় যে, ঐ সময় দেহ-যন্ত্রসমূহের বিশেষ যত্ন লওয়া ও তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া তাহার অনিয়ম ও অত্যাচারের ফল শুধু সেই নয়, সন্তানও ভোগ করে।

স্তনের যত্ন—গর্ভিণীর স্তনের বিশেষ যত্ন লওয়া দরকার। গর্ভিণীর পক্ষে স্তনের যত্ন লওয়া প্রয়োজন, একথা অনেকেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। সন্তান-জন্মের পর পূর্ণ একটি বৎসর জননীর স্তনের বোঁটার উপর উৎপীড়ন হইয়া থাকে। স্তন সেই উৎপীড়ন সহ্য করিবার মত যথেষ্ট শক্ত না হইলে সন্তানের মাড়ির পেষণে স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায় এবং তাহাতে ঘা হয়। এই অবস্থায় স্তনে বেদনা বা ঘা হইলে জননী ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই যে বিষম বিপদের কথা তাহা বলাই বাহুল্য।

সাধারণ অবস্থায় স্তনের যত্ন সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। গর্ভাবস্থায় স্তনের নিম্নলিখিতভাবে যথেষ্ট যত্ন লওয়া উচিত :—

(১) **পরিচ্ছন্নতা**—প্রতিদিন কয়েকবার ঠাণ্ডা জল দিয়া উহাদের ধুইতে হয়। ইহার পরেই নয়, অপর সময়ে, স্তনের বোঁটা গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া উহাতে একটু তৈল বা ভেসেলীন লাগাইয়া রাখা উচিত।

(২) **বোঁটা বাহির করা**—স্তনের গায়ে বোঁটা বসিয়া গেলে আঙুল দিয়া টানিয়া বাহির করিয়া রাখিতে হয়।

(৩) **আকৃতি ভাল রাখা**—স্তন ভারী বোধ হইলে এবং হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, উপযুক্ত "স্তন-বন্ধনী" (Supporter) দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখিকা বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেরী ষ্টোপ্‌স্ দুঃখ করিয়াছেন যে, এই সাবধানতা অবলম্বন না করার দরুন বহু স্ত্রীলোকের স্তনের আকৃতি সন্তানধারণের পরে নষ্ট হইয়া যায় এবং স্তন হেলিয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদের সৌন্দর্যের একটি বড় অঙ্গের হানি হয়। সন্তানধারণের পরে স্তন হেলিয়া পড়াই স্বাভাবিক এইরূপ ধারণা এই যুগে পরিত্যজ্য। বাজারে অনেক প্রকারের 'স্তন-বন্ধনী', কাঁচুলী বা Brassiare কিনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে সেইগুলিই উপযুক্ত যে গুলি স্তনের ভার ধরিয়া (Supports) এবং ঈষৎ উপরে তুলিয়া রাখে কিন্তু চাপিয়া ধরে না।

(৪) **ঘা নিবারণ**—প্রসবের দুইমাস পূর্ব হইতে সকালে ও সন্ধ্যায় ৫ মিনিট করিয়া অল্প গরম জলে স্তনের বোঁটা ভিজাইলে ঘা হইতে পরিত্রাণ

পাওয়া যায়। ব্র্যাণ্ডি অথবা স্পিরিট অথবা জলের সহিত এইগুলি মিশাইয়া লাগানো উচিত নয়, কারণ, উহাতে বোঁটা শক্ত হইয়া যায়।

প্রস্রাব পরীক্ষা—গর্ভাবস্থায় পঞ্চম মাস হইতে মাসে দুইবার এবং অষ্টম মাস হইতে সপ্তাহে একবার প্রস্রাব পরীক্ষা করানো দরকার। ইহা দ্বারা Eclampsiaর সম্ভাবনা আছে কি না পূর্বে বুঝিতে পারা যায় এবং যথাসময়ে সাবধান হইলে উহা আর হয় না।

গর্ভাবস্থায় সহবাস

গর্ভাবস্থায় স্বামী সহবাস করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সমস্ত নারীর ইতিপূর্বে দুই একবার গর্ভপাত হইয়াছে, গর্ভাবস্থায় তাহাদের পক্ষে বিশেষত গর্ভ না হইলে যে সব সময়ে ঋতুস্রাব হইতে পারিত সেই সময়ে শুধু অসঙ্গত। যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল ও বাসনার তীব্রতা আছে, তাহারা উভয়ের প্রীতিরক্ষা ও প্রণয় বর্ধন এবং স্বামীর স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য অবশ্যই সহবাস করিতে পারে। তবে মৃদু ভাবেও পেটে চাপ না পড়ে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সাধারণত কি হইয়া থাকে

সাধারণত লোকে গর্ভাবস্থায় কতটা সহবাস করে ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বার্লিনের ডাঃ কার্ল রুজ (Carl Ruge) একটি হাসপাতালের ৪১০ জন প্রস্থূতির নিকট হইতে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

গর্ভাবস্থায় সহবাস	কতজন	শতকরা
সমস্ত সময় রতিবিরতি ছিল	০	০
শেষ দুই মাসেও সহবাস করিয়াছেন	৩২২	৭৮·৫
" চার সপ্তাহেও " "	...	৫৩·৯
" সপ্তাহে " "	...	৩১
" তিন দিনের মধ্যে "	৮২	২০
" দিনেও সহবাস "	৩৯	৯·৫

পৌনপৌনিকতা	কতজন	শতকরা
সপ্তাহে ২ বা ততোধিক দিন সহবাস	....	৬০
„ ৩ বা „ „ „	...	২৪'৬
প্রত্যহ সহবাস	২৪	৫'৯
দিনে একাধিকবার সহবাস	৬	...

শেষোক্তেরা বলিয়াছিলেন যে, ইহার জন্য তাঁহাদের কোন অসুখ করে নাই। কিন্তু ডাঃ রুজ গর্ভের শেষ দুই মাস সহবাসের ফলে নানা উপসর্গে জননী ও সন্তানের ক্ষতি হইতে দেখিয়াছেন, যথা—ভ্রূণের আবরক ঝিল্লী অকালে ছিন্ন হওয়া, অকাল প্রসব, জ্বর (প্রসবের সময়ে ও পরে)। যে ৮২ জন গর্ভের শেষ তিনদিনের মধ্যেও সহবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ১৭ জনের কয়েকদিন হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খুব জ্বর হইয়াছিল।

কি করা উচিত

প্রাচীন যৌন-বিশেষজ্ঞগণের একটি অভিমত দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, গর্ভাবস্থায় মিলন অবিধেয়। কিন্তু আধুনিক যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ একথা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উহা করা যাইতে পারে।

ইহার দুইটি প্রধান কারণ আছে।

প্রথমত—আমরা অনেকেই এক বিবাহের পক্ষপাতী। দাম্পত্য সম্পর্কের বাহিরের সম্ভোগকেও নিন্দনীয় মনে করা হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় ও আঁতুড় ঘরে থাকার ১০ মাস স্বামীর পক্ষে নিবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু দু'এক বৎসর পর পর একাদিক্রমে প্রায় এক বৎসর সহবাস হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র। সাধারণ রতিশক্তিশালী পুরুষ ইহা পারিবে না; অতিরিক্ত মাত্রায় শক্তিশালী পুরুষের ত কথাই নাই। অতএব গর্ভাবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ করিতে গেলে পুরুষের পক্ষে যৌন-নিষ্ঠা পালন করাকে অনাবশ্যকভাবে কঠিন করা হয়। দাম্পত্য-সুখের পক্ষে ইহা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে।

এইরূপ কঠোরতা করিলে অনেক স্বামীই পরস্ত্রী বা বারনারী-গমনে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হইবে। ইহার ফলে সমাজে রতিজ রোগের ও অবৈধ গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা বাড়িবে এবং পুরুষেরা মদ্যপান ও অপব্যয়ে অভ্যস্ত ও সংশ্লিষ্ট নারীরা আত্মহত্যা, ভ্রূণ, শিশুহত্যা গণিকাবৃত্তির পাপে লিপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়ত—অনেক নারীর গর্ভাবস্থায় রতিবাসনা অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় রতিবাসনা পূর্ণ না করা স্বামীর পক্ষে কর্তব্য-বিচ্যুতি হইবে।

কোনও কোনও যৌন-বৈজ্ঞানিক গর্ভাবস্থায় যথেচ্ছ মিলনের পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই সময়ে গর্ভ হওয়ার আশঙ্কায় জন্মনিরোধক প্রণালী অবলম্বন এবং তজ্জন্য সুখ ও সোয়াস্তির হানি ও খরচের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া, নারী-পুরুষ নির্ভয়ে, নির্ঝঞ্ঝাটে ও পূর্ণ সুখে সঙ্গম করিতে পারে।

এই সকল কারণে গর্ভাবস্থায় মিলনের সুবিধা আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মিলনের ফলে যে ভ্রূণ এবং গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যদিও মেরী ষ্টোপ্‌স্ ও ভেল্ডির মতে শুক্র শোষণে নারীর শারীরিক উন্নতি হয়, তথাপি পার্শলে, নরম্যান হেয়ার, ষ্টোন প্রভৃতি ডাক্তারেরা এ কথা স্বীকার করেন না।

১। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে যথেচ্ছ মিলনের ফলে **ভ্রূণের স্থানচ্যুতি** ঘটিতে পারে এবং **গর্ভপাতের** আশঙ্কা থাকে। স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় সপ্তম মাসের শেষ পর্যন্ত সাবধানে সহবাস চলিতে পারে। তবে গর্ভপাতের দোষ থাকিলে উহা মোটে সঙ্গত নয়; অবশ্য ডাক্তার যদি এ বিষয়ে অভয় দেন তবে স্বতন্ত্র কথা। শেষদিকে যখন ভ্রূণ আকারে বড় হইয়া ওঠে তখন রতিক্রিয়া একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কিংবা অন্তত পক্ষে যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলা অতীব প্রয়োজন। তাহা না হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে।

২। মোটামুটি একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, সারা গর্ভাবস্থায় সহবাস খুবই কমাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক পুরুষই এই অবস্থায় নারীর মনোভাব ও দেহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। স্ত্রী যদি মিলনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখায়, তবে তাহার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে। কারণ, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর মনোবাসনা অপূর্ণ রাখা কিংবা তাহাকে কোনও কারণে বিষণ্ণ বা অসুখী থাকিতে দেওয়া উচিত হইবে না। তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছা না থাকিলেও যদি স্বামী সহবাস ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার মনে এই ভাবিয়া কষ্ট হইতে পারে যে, স্বামীর বুঝি এখন তাঁহাকে আর ভাল লাগিতেছে না, তিনি অনাদর ও অযত্ন করিতেছেন। এই সব কারণের জন্য হ্যাভলক এলিস, এলেন কী, মেরী ষ্টোপ্‌স্ সকলেই গর্ভাবস্থায় সহবাস সম্বন্ধে পুরুষকে খুব সাবধান ও

সহৃদয় হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ডক্টর মেরী ষ্টোপ্‌স্‌ নিজে নারী এবং নারী-মনোবৃত্তি লইয়া খুবই ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন বলিয়া আমরা এ বিষয়ে তাঁহার মতকে গুরুত্ব দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন সাধারণত সকল নারী গর্ভাবস্থার কোনও এক সময়ে সহবাসের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া ওঠে। এই সময়ে কিছুতেই উহা করা উচিত নহে।

৩। গর্ভাবস্থায় সহবাস করা গেলেও **সাধারণ আসনে** কিছুতেই মিলিত হওয়া উচিত নহে। যাহাতে জরায়ুতে আঘাত লাগে বা নারীর পেটের উপর চাপ পড়ে গর্ভাবস্থায় এইরূপ আসন **সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য**। কাৎভাবে শায়িত নারীর পশ্চাৎ হইতে অথবা সামনাসামনি বসিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া বসাইয়া সঙ্গম করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বিভিন্ন আসনের উপযোগীতা আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।*

৪। গর্ভাবস্থায় সকল সময়েই সহবাসের পূর্বে যাহাতে নারী-পুরুষের উভয়ের জননেন্দ্রিয় পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন থাকে তাহা দেখিতে হইবে। এই অবস্থায় নারীর জননেন্দ্রিয়সমূহে বাহির হইতে কীটাণু (Bacteria) প্রবিষ্ট হওয়া বিশেষ বিপজ্জনক।

৫। গর্ভাবস্থায়, পূর্ব অভ্যাস বা নিয়ম অনুসারে যে যে সময়ে ঋতু হইবার কথা, প্রতি মাসের সেই ৩।৪ দিন বিরত থাকা ভাল। কারণ, তখন চাপ লাগিলে অথবা স্ত্রীর তীব্র পুলকলাভ হইলে গর্ভ নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

৬। অঙ্গ সঞ্চালন মৃদুভাবেই করা উচিত সজোরে নয়।

মোট কথা, গর্ভাবস্থায় পূর্বোক্তভাবে সাবধানতা ও ধৈর্য অবলম্বন করা স্বামীর শুধু সহৃদয়তা ও সহানুভূতিরই নিদর্শন নহে, তাহার দায়িত্বজ্ঞান সম্ভূত মহান কর্তব্য।

আবার নারীরও পুরুষের ভাব লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। স্বাভাবিক রতিশক্তিসম্পন্ন স্বামীকে সহবাস হইতে বিরত রাখিলেও স্ত্রীর উহাকে অন্যবিধ যৌন-সাহচর্য হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত হইবে না। অনেকে এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর গাত্রস্পর্শনে, এমন কি, উরুদ্বয়ের ফাঁকে, স্বামীকে রতিতৃপ্তি লাভের সুযোগ দিবার পরামর্শ দেন। ইহা দাম্পত্য প্রীতির জন্য অনেক সময়েই (যথা ঋতুর সময়ে) প্রয়োজন হইয়া থাকে।

---

* যৌন-বিজ্ঞান—২য় খণ্ড পরিবর্ধিত ১৯৫৫ সংস্করণে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে।

জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন, "এই প্যারাগ্রাফে বর্ণিত উপদেশ পালন করিলে অনেক স্ত্রীই তাঁহাদের নিজ স্বামীকে অনর্থক মনোকষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া ও স্বামীর যৌন-নিষ্ঠা পালনে সহায়তা করিয়া তাঁহার মনে প্রেমের গভীর নিদর্শন রাখিতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা হয় না। আমার যে রোগিণীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার গর্ভাবস্থায় মাঝে মাঝে একমাস দুইমাস করিয়া সমগ্রভাবে প্রায় ৫ মাস স্বামী সহবাস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইনি এরূপ সহৃদয়া ও স্বামীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না যে এইরূপ সময়ে মাঝে মাঝে নিজে যাচিয়া তাঁহার নিজ হস্তে অথবা দুই উরুর মধ্যে অথবা স্তনের নিম্নে স্বামীকে রতিতৃপ্তিলাভ করাইতেন। এরূপ রমণী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী।" **আমি ডাক্তার বন্ধুর সহিত সম্পূর্ণ এক মত।**

গর্ভিণীর প্রতি স্বামীরও কর্তব্য রহিয়াছে :

(১) দোষত্রুটী দেখাইয়া বা ঝগড়া-ঝাটি করিয়া যেন স্ত্রীকে উত্তেজিত অথবা দুঃখিত না করা।

(২) স্ত্রী সকালে বিছানা হইতে উঠিবার পূর্বে তাহাকে এক কাপ পানীয় দেওয়া—যেমন চা, কোকো, ওভাল্‌টিন্, দুধ বা কমলা লেবুর রস।

(৩) গৃহকর্মে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা।

(৪) আশা, ভরসা, আনন্দ ও উৎসাহের কথা বলা।

(৫) সংসারের আর্থিক অবস্থা, নিজের চাকরি, ব্যবসা প্রভৃতির দুঃখ, কষ্ট, বিপদ ও দুর্ভাবনার কথা তাহার কানে না তোলা।

(৬) বাড়ীর ঝি চাকরাণী, আত্মীয়া ও যেসব স্ত্রীলোক বাড়ীতে যাওয়া আসা করে সকলকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া যেন কেহ কোনও কষ্ট-প্রসবের গল্প না করে ও কাহাকেও করিতে না দেয়। কোনও কোনও স্ত্রীলোকের এই বদাভ্যাস আছে যে গর্ভিণীদের কাছে তাহাদের জানা ও শোনা সমস্ত জটিল প্রসবের বিস্তারিত কাহিনী শুনিয়া বেড়ানো। সব রকম দুর্ভাবনা ও ভয় গর্ভিণীর শক্তি ও সাহস নষ্ট ও পরিণামে ঘোর অনিষ্ট করে। **সুপ্রসবের ঔষধের** বিজ্ঞাপন দেখিয়া বা কাহারও কাছে শুনিয়া কখনও এরকম ঔষধ ব্যবহার করিবেন না। ইহাদের অধিকাংশই দামী এবং বাজে। এই পুস্তকে বর্ণিত নিয়মগুলি পালন করাই সুপ্রসবের প্রকৃত উপায়।

সুপ্রসবের মাদুলী—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী মনীষী ভলতেয়ারকে একবার একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হ্যাঁ মশাই! এ কথা কি সত্যি

যে মন্ত্রবলে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায় ?” তিনি বলেন, “হ্যাঁ, তবে মন্ত্রের সঙ্গে অনেকটা আর্সেনিক (সেঁকো বিষ) থাকা উচিত।”

আমিও সেই রকম বলি যে, যদি আপনার মাদুলী, তাবিজ, কবজ, মন্ত্র, ঝাড়-ফুক, গুরু, পুরোহিত, মোল্লা, দেবতা প্রভৃতির ক্ষমতা, আশীর্বাদ ও কৃপায় বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে মনের বিশ্বাস, আশা, ভরসা, জোর প্রভৃতি কিছু কাজ করিতে পারে বই কি। তবে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদ সর্বনাশের মূল।

আমি নিজেই বহু তাবীজ, কবচ, ঝাড়-ফুক, দিতাম ও করিতাম কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ঐ সকল ব্যবস্থা আর টিকে বলিয়া মনে করি না।

বর্তমান যুগে সুসভ্য দেশগুলিতে কোনও ঔষধের—যেমন পেনিসিলিন, সাল্ফাবর্গের ঔষধগুলি, ষ্ট্রেপটোমাইসিন্, ক্লোরোমাইসিটিন্ প্রভৃতির কার্যকারিতায় তখনই বিশ্বাস করা হয় যখন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ডাক্তার, কোনও রোগের বিভিন্ন ধরনের ও অবস্থার কয়েক শত রোগীকে সেই ঔষধ দিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহাদের ফলাফল নিরপেক্ষভাবে সযত্নে লিখিয়া রাখেন ও প্রকাশ করেন। কোন মন্ত্র বা মাদুলীর এই ভাবে পরীক্ষা করা হয় না। ২।১০ জনের উপকার হইয়াছে এই খবর উহাদের উপকারিতার কোনও প্রমাণ নয়, কারণ (১) অনেকেরই বিনা মন্ত্র বা মাদুলীতেই সুপ্রসব হইয়া থাকে, (২) কত জনের ওগুলি ব্যবহার করা সত্ত্বেও প্রসবে কষ্ট ও বিপদ হইয়াছে সে খবর অপরের কানে আসে না। যাহারা ভাল হয় সে পূর্ব বিশ্বাস মত ভাবে যে এই মন্ত্র বা মাদুলীর জন্যই আমার ভাল হইল। যাহার হয় না সে উহাদের দোষ দেয় না, তাহার বিশ্বাসও টলে না—সে দোষ দেয় নিজের কপালের, অদৃষ্টের অর্থাৎ কর্মফলের !

গর্ভাবস্থায় ব্যাধি

ব্যাতিক্রমের সম্ভাব্যতা

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নারীর পক্ষে গর্ভধারণ ও প্রসব-কার্যও স্বাভাবিক হইবার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা হেতু জনসাধারণের অধিকাংশেরই স্বাস্থ্য এত খারাপ যে, আমাদের নারীজাতির অনেককেই গর্ভাবস্থায় কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই সমস্ত অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যক্তি বা অবস্থা-বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত অস্বাভাবিক অবস্থাগুলি কোনও কোনও গর্ভিণীর অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে ঃ

১। রক্তস্রাব ;
২। অত্যন্ত বমি ;
৩। হাত পা ও মুখে শোথ ;
৪। প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া ;
৫। সর্বদা মাথা ঘোরা ও মাথা ধরা ;
৬। চোখে ঝাপসা দেখা ;
৭। চোখমুখ হলুদবর্ণ হওয়া ;
৮। উঠিতে বসিতে ও চলাফেরা করিতে হাঁপানো ;
৯। সর্বদা তন্দ্রা ও অনিদ্রা ;
১০। রক্তহীনতা ;
১১। আমাশয় অজীর্ণ ও জ্বর ,
১২। গর্ভে সন্তান নড়া-চড়া না করা।
১৩। শিরাস্ফীতি। ১৪। অর্শ।

১ হইতে ৭ এবং ১২ নং ব্যাধি-লক্ষণ বিশেষ ভয়ের বিষয়। অবহেলা করিলে নানা বিপদ ঘটিতে পারে। কাজেই প্রারম্ভে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া গর্ভের অন্যতম লক্ষণ। গর্ভাবস্থায় যদি **জরায়ু হইতে রক্তস্রাব** হয় তবে তাহাকে অস্বাভাবিক লক্ষণ মনে করিতে হইবে। ঋতু স্রাব বন্ধ থাকিয়া হঠাৎ আবার ঋতু দেখা দিয়াছে এরূপ মনে করিয়া উক্তস্রাব অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বড় একটা হয় না। কিন্তু কোনও কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে গর্ভ নষ্ট হইয়া গেলে জরায়ুর মধ্যে আঙ্গুরের মত এক জাতীয় পদার্থ জন্মে। এই অবস্থায় জরায়ু হইতে পাতলা রক্তস্রাব বা রক্তাক্ত জলীয় পদার্থ নির্গত

হইতে পারে এবং যথা সময়ে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া জরায়ু হইতে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। এই সময়ে কোন কোন গর্ভিণীর রক্তস্রাব অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। ফলে কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তারের সাহায্যে রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বমি বমি ভাব—শেষ ঋতু হইবার ৫।৬ সপ্তাহ পর হইতে গর্ভের তৃতীয় মাস অবধি সকালে বিছানা হইতে উঠিবার সময়েই বা তাহার পরে এইরূপ হয়। বেলা বাড়িলে সাধারণত এ ভাব আর থাকে না। কিন্তু কাহারও কাহারও দিনের মধ্যে অন্য সময়ে আবার হয়।

বমির ধরণ—কখনও কখনও বমির সঙ্গে তরল বর্ণহীন জিনিস বাহির হয়। পেটে খাদ্যের অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও উহার সঙ্গে বাহির হয়। রাঁধা খাবার কিংবা বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতির গন্ধে ইহা বাড়ে।

কারণ—(১) **শারীরিক**—বেশী মাংস খাওয়া বা পরিশ্রমের দরুন ক্লান্তি সত্ত্বেও বিশ্রাম না করা প্রভৃতি এবং অনেক মাস বা কাল ধরিয়া শরীরে বিষ জমা হওয়া।

(ক) **মানসিক**—(২) মা-মাসীরা মেয়েদের চরিত্রহানি ও অবৈধ গর্ভ হইতে বাঁচাইবার জন্যে ছোট বেলা হইতে তাহাদের শিখান যে পুরুষের সঙ্গে দেহ মিলন নোংরা, ঘৃণ্য ও ঘোরতর পাপ। অনেক বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষা দেওয়া ও এ সম্বন্ধে সকল রকম আলোচনাকে নিন্দনীয় বলিয়া বারণ করার ফলে এই ধারণা মেয়েদের মনে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে বিবাহের পরও উহা দূর হয় না, ফলে নিজেকে গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারিলে, এই শিক্ষা পাওয়া অধিকাংশ মেয়ের এই ভাবিয়া ভারী লজ্জা হয় যে, এবার তাহার পাপের কথা সকলেই জানিতে পারিবে। তাই আত্মীয়-স্বজনকে তাহাদের মুখ দেখাইতে লজ্জা হয়। এই লজ্জাই এই সকলের অসুস্থতা রূপে দেখা দেয়।

(খ) আবার এমনও দেখা যায় যে কোনও এক বিশেষ লোক, যাহাকে বিশেষ ভয় বা লজ্জা করা হয়, তাহার নিকটে থাকিলেই ইহা হয়, অপরদের নিকটে হয় না। দৃষ্টান্ত—জনৈক বধূর শাশুড়ী জবরদস্ত গোছের মহিলা ছিলেন। তিনিই সংসারের টাকা ইচ্ছামত খরচ করিতেন। তিনি এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন যে তাঁহার ছেলের আরও ভাল বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। এই শাশুড়ীর সান্নিধ্যে গর্ভবতী বধূটির এমন গা বমি রোগ হইল যে তাহাকে অধিকাংশ সময়ই শুইয়া থাকিতে হইত। শেষে অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া সে

বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। আর সেই দিনই ঐ অসুখ সারিয়া গেল! সেখানে মাস খানেক থাকার পর শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার আবার এমন বমি হইতে লাগিল যে এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার পূর্ব্বের কথা শুনিয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন সেখানে সে আবার ভাল হইয়া গেল।

(গ) এইরূপ মনে করা, 'সকলের এ অবস্থায় গা-বমি হয় আমারও হইবে।'

প্রতিকার (ক) মন ঠিক করা—আসলে অনেক মেয়ের ইহা মোটেই হয় না। সেইজন্য বারবার এই কথাই ভাবা উচিত যে 'অনেকেরই ত হয় না, আমি বরাবর স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে এসেছি, উপকারী ও পুষ্টিকর জিনিষই খেয়েছি, বেশী মাংস খাইনি, কাঁচা তরি-তরকারী ও ফল প্রায়ই খেয়েছি, সুতরাং আমারও হবে না।

(খ) যাহাদের বেশী ভয় বা লজ্জা করে তাহাদের নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে দূরে এবং যাহারা ভালবাসে ও যাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে পারা যায় তাহাদের সঙ্গেই থাকা উচিত।

(গ) বারবার এই কথা ভাবা উচিত যে 'স্বামীর সঙ্গে দেহ-মিলন মন্দ, লজ্জার বিষয় বা পাপ নয়। এর দ্বারা, সৃষ্টিধারা বজায় রাখা হয়। আমার বাবা, মা প্রভৃতি গুরুজন, অবতার, মহাপুরুষ, নবী প্রভৃতি সকলেই এরই ফলে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং গর্ভবতী হওয়া লজ্জার কথা নয়, মা হওয়াই মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় গৌরবের কথা।' ইত্যাদি

(ঘ) এই রোগ সম্বন্ধে যত কম চিন্তা করা যায় তত সহজেই ইহা সারে।

পথ্য (ক) সকালে বিছানা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই এক গ্লাস গরম জল, ফিকে পাতলা চা, বা কমলা লেবুর রস খাওয়া।

(খ) কিছু পরে, আস্তে আস্তে উঠিয়া ধীরে ধীরে কাপড় পরা, কিংবা উঠিবার আগেই কুড়কুড়ে (crisp) টোষ্ট, বিস্কুট, বা কমলার রস খাওয়া।

(গ) Meads Casec কিংবা Plasmon সিকি ছটাক (আধ আউন্স) এক পোয়া দুধের সঙ্গে সকালে উঠিবার ও রাত্রে শুইবার পূর্বে ৩।৪ দিন খাওয়া।

(ঘ) কিছু খাইয়া বমি হইয়া গেলে এক ঘণ্টা পরে আবার কিছু খাওয়া।

(ঙ) দিনে অল্প সময় পর পর অল্প অল্প শুকনো জিনিষ খাওয়া।

(চ) খাবারের সঙ্গে জল, দুধ প্রভৃতি না খাইয়া দুইবার খাওয়ার মাঝে ঐ সব খাওয়া উচিত। দিনেও যদি বমি ভাব বা বমি থাকে তবে এই নিয়ম খুবই ভাল।

(ছ) তরল জিনিসের বা ডাল, ভাত বা রুটির সঙ্গে গ্লুকোজ খাওয়া।

(জ) বেশী বমি হইলে শুধু কমলা, আনারস, টম্যাটো প্রভৃতি ফলের রস খাইবেন, রোজ পেট পরিষ্কার রাখিবেন ও শুইয়া থাকিবেন। মাছ, মাংস না খাইয়া কাঁচা তরি-তরকারী ও ফল রাঁধা জিনিসের চেয়ে বেশী খাইবেন।

সাংঘাতিক রকমের বমি—প্রথম তিন মাসে সকালে যে বমি ভাব বা বমি হয় তাহা হইতে ইহা একেবারে আলাদা রোগ। ইহা হইলে কিছু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বমি হয়। ফলে গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টির কথা দূরে থাকুক, নিজে বাঁচিয়া থাকার মতও পেটে কিছু থাকে না।

এই রোগ সাধারণত খুব কম জনেরই গর্ভের শেষ মাসগুলিতে হয়। ইহা হইলে সকল সময়েই বমি হয়।

আনুষাঙ্গিক লক্ষণ—হাত ও পায়ের গোছ ফুলিয়া থাকা, (গর্ভের শেষের দিকে প্রায়ই যে ফোলা দেখা যায় তাহার সহিত ইহার ভুল করিবেন না) বরাবর খুব মাথা ব্যথা ও যোনি দিয়া রক্তস্রাব হওয়া।

পরিণাম—রোগা ও দুর্বল হইয়া যাওয়া, বমির জন্য সর্বদা অস্বস্তি, ছটফট করা, গা জ্বালা করা ও জ্বর। শেষে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

প্রতিকার—শীঘ্র হাসপাতালে ভর্তি করা কিংবা ডাক্তার দেখানো।

হাত ,পা বা মুখ ফোলা, মাথা ধরা বা ঘোরা; চোখে ঝাপসা দেখা; চলাফেরার সময়ে খুব হাঁপাইয়া পড়া; প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলির যে কোনও একটি দেখা দিলে বুঝিতে হইবে গর্ভিণীর শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। শরীরে বিষের মাত্রা বেশী হইলে গর্ভিণী ফিট্ হইয়া পড়ে। তখন হাত, পা, চোখ, মুখ জোরে কাঁপিতে থাকে ; নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এবং নানাপ্রকার অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই রোগটির নাম এক্লাম্শিয়া (Eclampsia) প্রথমবার যাহারা গর্ভবতী হয় সাধারণত তাহাদের ক্ষেত্রেই এই রোগের আক্রমণ বেশী হয় ; তবে অন্যান্যবার গর্ভের সময়ও যে না হয় এমন নয়।

ফিটের লক্ষণ—ইতিপূর্বে 'মূত্র পরীক্ষা' প্রসঙ্গে এই রোগের ফিটের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে, মুখমণ্ডল, জিহ্বা, অথবা অন্যান্য অঙ্গে আকুঞ্চন বা খেঁচুনি হয়। তাহার পর প্রায় ২০ সেকেণ্ড যাবৎ শরীর শক্ত হয় এবং শ্বাস বন্ধ থাকে। দেহ খিলানের মত উঁচু হইয়া ওঠায় শুধু মস্তক এবং গোড়ালির উপর শরীরের ভার থাকে। মুখমণ্ডল নীল হইয়া যায় এবং দৃঢ়বদ্ধ দুই পাটি

দন্তের মধ্যে পড়িয়া জিহ্বা দংশিত হইতে পারে। তাহার পর সারা শরীরের পেশীগুলির অনিয়মিত আকুঞ্চন হয় এবং মুখ দিয়া ফেনা ওঠে। এই অবস্থা দুই হইতে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত থাকে। তাহার পর রোগিণীর নিদ্রা বা আচ্ছন্ন ভাব হয়, অথবা সে অচেতন হইয়া (coma) পড়ে।

ফিটের শুশ্রূষা

অবিলম্বে দাঁতের পাটির মধ্যে পেন্সিল, কাপড় জড়ানো চামচ, অথবা ঐরূপ কিছু দিতে হইবে যাহাতে দাঁত, মাড়ী বা জিহ্বা জখম না হয় এবং রোগিণী নিজের জিহ্বা দংশন করিতে না পারে। পরে তাহার হাতের নিকট হইতে এমন সমস্ত দ্রব্য সরাইতে হইবে যাহা দিয়া সে নিজেকে আঘাত করিতে পারে। অতঃপর সাড়ী, সায়া, কাঁচুলী, ব্লাউজ প্রভৃতি সমস্ত দৃঢ়বন্ধনযুক্ত বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিবেন। তাহার মস্তক বিছানার এক পার্শ্বে কাৎ করিয়া দিতে হইবে, কারণ মুখ উঁচু থাকিলে জিহ্বা গলার মধ্যে পড়িয়া গিয়া শ্বাসরুদ্ধ ইহাতে পারে। ফিটের পর সমস্ত কথাবার্তা এবং গোলযোগ বন্ধ করিতে হইবে। রোগিণীকে শান্তিতে গরমে ও আরামে থাকিতে দিবেন। সে যাহাতে শব্দ শুনিতে না পায় সে জন্য তাহার কানে তুলা গুঁজিয়া দিবেন কারণ, গোলযোগ হইলে তাহার আবার ফিট হইতে পারে। তাহাকে শান্তিতে গরমে ও আরামে থাকিতে দিবেন।

অতি শীঘ্র উপযুক্ত ডাক্তার দেখাইবেন।

রক্তহীনতার দরুন গর্ভিণীর মুখ, চোখ, ঠোঁট ফ্যাকাশে দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে হাত পাও ফুলিয়া যায়। নড়াচড়া করিতে হাঁপানী ওঠে এবং মুখে ঘা হয়। এই অবস্থায় প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কিংবা অব্যবহিত পরে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতাহেতু গর্ভিণী অনেক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গর্ভাবস্থায় **আমাশয় অজীর্ণ** ও **জ্বর** প্রভৃতি যে কোন রোগের সময় মত সুচিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেকের **কুসংস্কার** আছে যে, গর্ভিণীকে ডাক্তারী ঔষধ খাওয়াইলে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ঠিক নয়। রোগভেদে বিভিন্ন ঔষধ বা ইন্‌জেক্‌শনের ফলে গর্ভ নষ্ট হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। রোগ, শোক, পতন. আঘাত (প্রধানত উপদংশ) ইত্যাদির জন্যই সাধারণত গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।

অজীর্ণ ও বুক জ্বালা

কিছুদিন যাবৎ হজম করা শক্ত কিংবা শরীরে অম্ল তৈয়ার করে এমন সব খাদ্য খাওয়ার জন্য পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অম্ল ভাব হইলে ইহা হয়।

লক্ষণ—গলায় ঝাল বা টক বোধ এবং গলা দিয়া অম্ল বা তিক্ত তরল জিনিস বাহির হওয়া। সাধারণত গর্ভের শেষ তিন মাসে ও সন্ধ্যাবেলায় ইহা হইয়া থাকে এবং বিছানায় শুইলে বাড়ে।

ঔষধ—জ্বালার সময় একটু আরাম পাইবার জন্য ও রাত্রে ঘুম হইবার জন্য (ক) চা চামচের আধ চামচ সোডা বাইকার্ব ; কিংবা (খ) এক চামচ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া আধ গ্লাস জলের সহিত মিশাইয়া ধীরে ধীরে ছোট চুমুকে খাওয়া (গ) সোডামিণ্টের বড়ী (ট্যাবলেট) চোষা কিংবা (ঘ) Bisodol ধরনের অম্ল নিবারক ঔষধ খাওয়া।

প্রতিকার—কিন্তু **আসল ও স্থায়ী প্রতিকার** হইল :—

(ক) পেট পরিষ্কার রাখা ('কোষ্ঠবদ্ধতা' অনুচ্ছেদ দেখুন)।

(খ) বাড়ির বাহিরে খোলা জায়গায় বেড়ান প্রভৃতি ব্যায়াম।

(গ) যে সব জিনিষ শরীরে অম্ল তৈয়ার করে সে গুলি কম ও যেগুলি ক্ষার তৈয়ার করে সে গুলি বেশী করিয়া খাওয়া (খাদ্যতত্ত্ব অধ্যায় দেখুন। মোটা-মুটি বলা যায় যে মাছ, মাংস, শাদা চিনি, ময়দা দিয়া তৈয়ারী কোনও জিনিস যেমন (লুচি, নিমকি ; খাজা, গজা প্রভৃতি মিষ্টি, শাদা পাঁউরুটি, বিস্কুট শরীরে টক সৃষ্টি করে। গুড়, সব রকম ফল, কাঁচা শাক, তরকারী ভিসি টাটকা আনারস, আপেল এবং খোসা না ছাড়ান, ও ঝোল না ফেলা কোন রাঁধা তরকারী শরীরে ক্ষার তৈয়ার করে। গুড় ও আলু এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী।

অপথ্য—ঝাল ও বেশী মশলা দেওয়া খাবার।

গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু

গর্ভের **পঞ্চম মাস** হইতেই গর্ভে সন্তানের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। অষ্টম মাস হইতে নড়াচড়া ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে কারণ ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে পেটের মধ্যে নড়াচড়া করিবার স্থানও কমিতে থাকে। তবুও দশ মাস পর্যন্ত গাভিণী এই নড়াচড়া টের পায়। কোন কারণে গর্ভস্থ ভ্রূণ মরিয়া গেলেও টের না পাওয়া যাইতে পারে।

লক্ষণ বহুদিন যাবৎ নড়াচড়া একেবারে বন্ধ থাকা, পেট ক্রমশ ছোট হওয়া, পেট ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়া, গর্ভিণীর মুখে দুর্গন্ধ হওয়া, কাল দুর্গন্ধ স্রাব, স্তন ছোট হইয়া যাওয়া ও তাহাতে খাঁজপড়া, জ্বর হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে **ভ্রূণ বাঁচিয়া নাই** বুঝিতে হইবে।

মৃত সন্তান ৮।৯ মাস পর্যন্ত পেটের মধ্যে থাকিতে পারে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। স্বাভাবিক রীতিতে প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া মৃত সন্তান বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যদি মৃত সন্তান গর্ভে থাকা কালে গর্ভিণীর শরীর খারাপ বোধ হয়, মুখে দুর্গন্ধ কিংবা জ্বর হয় তাহা হইলে ডাক্তার দেখানো উচিত। নতুবা গর্ভিণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

গর্ভের শেষের দিকে পেটের শিরাগুলির (veins) উপর জরায়ুর চাপে বা ভারে শিরাগুলি সাধারণত ফোলে। পায়ের ফোলা শিরাগুলির উপর কাপড় জড়াইয়া (ব্যাণ্ডেজ) চিৎ হইয়া শুইয়া পা লম্বাভাবে একটু উঁচু করিয়া রাখিলে উপশম হয়। দ্বিপ্রহরে বা বিকালে প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ করিতে হয়। মোজা পরিলে গার্টার ব্যবহার করা উচিত নয়।

স্বাভাবিক পরিমাণে **মূত্রাদি নির্গমের অভাব**; কোনও প্রকার **শক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য**; **শিরাদির স্ফীতি**; **উদরের অস্বাভাবিক স্ফীতি**; **নিদ্রাহীনতা** ইত্যাদি ব্যাধি-লক্ষণও অবহেলা করিতে নাই।

অনিদ্রা

এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'বিশ্রাম ও ঘুম' অনুচ্ছেদ দেখুন। গর্ভের শেষ ২।৩ মাসে অল্প অল্প অনিদ্রা হয়। বাড়াবাড়ি হইলে ডাক্তারের পরামর্শ মত ঘুমের ঔষধ (Sedative) খাওয়া যায়। রাত্রে শুইবার আগে এক কাপ্ বেঞ্জার্‌স্ ফুড (Bengers Food) অথবা হরলিক্‌স পান করিলে এবং দিনের বেলায় যথেষ্ট বিশ্রাম হইলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

অর্শ

লক্ষণ—গর্ভাবস্থায় যেমন পায়ের শিরা ফুলিতে পারে তেমনই কাহারও কাহারও মলদ্বারের শিরাও ফোলে। ইহাতে অস্বস্তি ও বেদনা বোধ হয় ও বাহ্যের পর অল্প রক্তপাত হয়।

কারণ—রক্ত চলাচল ভাল না হওয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা। জরায়ু বাড়িতে থাকায় তাহার চাপে শরীরের নীচের দিক হইতে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইতে বাধা পাইলে প্রধানত গর্ভের শেষ দুই মাসে ইহা হয়। গর্ভাবস্থায় প্রতিকার করা হইলে এ সময়ের অর্শ সন্তান হইবার পর সারিয়া যায়।

প্রতিকার—(১) মলদ্বার ঠাণ্ডা জলে ধোওয়া; (২) ভিতরে ও বাহিরে আইওডেক্স (Iodex) মলম লাগানো; (৩) দিনে দুইবার পায়খানায় যাওয়া; (৪) কোষ্ঠবদ্ধতা সারাইবার জন্য পূর্বে বর্ণিত উপায়গুলি অবলম্বন করা ও ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার করা; (৫) অনেকক্ষণ শুইয়া বিশ্রাম করা; (৬) যাহাতে রক্ত চলাচল হয় তাহাই করা, যেমন প্রদাহ ও বেদনার জন্য, অসম্ভব না হইলে, খোলা জায়গায় বেড়ানো; (৭) বাহ্যের পর সাবান ও অল্প গরম জলে মলদ্বার খোওয়া; (৮) একটু পরে 'পায়ের শিরাস্ফীতি' অনুচ্ছেদে উহার প্রতিকারের জন্য যাহা লেখা হইয়াছে সে গুলি করা।

নিষেধ—(১) লবন (salt) জাতী পেট পরিষ্কারের ঔষধ ব্যবহার করা: কারণ তাহাতে অর্শ বাড়ে, (২) বাহ্যের সময় কোঁথ দেওয়া।

খিল ধরা

কারণ—(১) বস্তিপ্রদেশ হইতে পায়ের দিকে যে সব নার্ভ (স্নায়ু বা নাড়ী) আছে তাহাদের উপর ক্রমশ বড় ও ভাড়ী জরায়ুর চাপ পড়া। তল-পেটের পেশীগুলি ঢিলা হওয়ার ফলে জরায়ু প্রভৃতি নীচে নামিয়া পড়িলে এই চাপ আরও বাড়ে। (২) শরীরে চুনের (ক্যালশিয়ামের) অভাব।

গর্ভের শেষের তিন মাসে ইহা হইয়া থাকে।

রাত্রে বাড়িলে—(১) কোনও বালিশ কুশন প্রভৃতির উপর পা একটু উঁচু করিয়া রাখিবেন; কিংবা (২) খাটের পায়ের দিকের পায়া দুইটির নীচে ইঁট প্রভৃতি দিয়া উঁচু করিবেন।

প্রতিকার—(১) যেখানে খিল ধরিয়াছে সেখানে আস্তে আস্তে হাত দিয়া ঘষা (২) একবার গরম ও তাহার পর ঠাণ্ডা জল ঢালা অথবা গামছা বা তোয়ালে ক্রমান্বয়ে গরম ও ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া মোছানো, (৩) চুন (ক্যালশিয়াম) যে সব জিনিসে আছে সে সব বেশী করিয়া খাওয়া। মনে রাখিবেন যে ডাক্তারী ঔষধের দোকানের ক্যালশিয়াম-ঘটিত নানা পেটেণ্ট ঔষধের বড়ী খাওয়া অপেক্ষা চুন-ঘটিত খাদ্যবস্তু খাওয়া ঢের ভাল। ঝোল প্রভৃতিতে শাক, তরকারী প্রভৃতি

সিদ্ধ করা জল মিশাইয়া খাওয়া। উহাতে দেহের পক্ষে দরকারী উপাদান থাকে। (৪) দিনের বেলায় গর্ভভার সামলাইবার জন্য ঠিক মাপের পেটি (abdominal belt) পরিধান করা।

বাড়াবাড়ি হইলে—পাশ করা ডাক্তার, নার্স বা ধাইকে দেখাইবেন।

জ্বরের প্রবল উত্তাপের জন্য গর্ভপাত হইতে পারে, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন খাওয়াইলে কিংবা উহার ইন্‌জেক্‌শান্‌ দিলে গর্ভপাত হয় না। কখনও কখনও এই রোগে ঐ ঔষধ ব্যবহারের পর গর্ভপাত হইল দেখিয়া এই ভুল ধারণা জন্মে যে ঐ জন্যই উহা হইল, কিন্তু আসলে উহা উৎকট জ্বরের জন্যই হইয়াছিল।

দাঁত খারাপ হওয়া

গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি তৈয়ারীর জন্য গর্ভাবস্থায় শরীরে বেশী ক্যালশিয়াম দরকার হয়; গর্ভিণী খাদ্য বা ঔষধের সঙ্গে যথেষ্ট ক্যালশিয়াম না পাইলেও সন্তানের হাড় ঠিক তৈয়ারী হইয়া যাইবেই, ফলে গর্ভিণীর নিজের হাড় মজবুত রাখার জন্য যতটা দরকার তাহাতেই ঘাটতি পড়িবে, ফলে তাহার দাঁত খারাপ হইবে। কখনও এমন হয় যে খাদ্য বা ঔষধের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌শিয়াম লওয়া হইতেছে অথচ তাহার শরীর ঠিক ভাবে হজম (assimilate) করিতে পারিতেছে না।

শরীরে ক্যালশিয়াম কম হইলে মাথার চুল বেশী উঠা, নখ সহজে ভাঙ্গিয়া যাওয়া কিংবা দাঁতের ক্ষয় (decay) হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

প্রতিকার—প্রায় অর্ধেক খাবার কাঁচা খাইলে ভিটামিনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আকাশে কয়েকদিন যাবৎ মেঘ থাকায় ভিটামিন ডি পাইবার জন্য খালি গায়ে রোদ লাগাইবার সুবিধা না হইলে (১) সপ্তাহে ৫ দিন রোজ পাঁচ ফোটা করিয়া রেডিওস্টল (Radiostal) খাওয়া উচিত কিংবা (২) বিশেষ ধরণের ল্যাম্পের সাহায্যে গায়ে অতি-বেগুণী রশ্মি (ultra-violet rays) লাগাইতে পারা যায় (৩) যদি আর কোনও কারণে গর্ভস্রাবের ভয় না থাকে তবে পুঁজভরা, পচা, ক্ষয়প্রবণ বা খুব ব্যথা হওয়া খারাপ দাঁত তুলিয়া ফেলানোই ভাল। কারণ উহা হইতে যতটা বিপদের

ভয় তাহা অপেক্ষা মুখে পচা জায়গা (septic focus) থাকায় পরবর্তী মাস গুলিতে গর্ভের সন্তানের বেশী অনিষ্ট হয়। শুধু মাড়ীর উপর পচন (sepsis) আরম্ভ হইয়া থাকিলে মালিশ ও যথাযথ খাদ্য ব্যবহারে সারিয়া যায়। কিন্তু যদি মাড়ীর গর্তে পচন সুরু হইয়া থাকে তবে দাঁত তোলানোই উচিত। ক্ষয় হওয়া দাঁত গর্ভের গোড়ার দিকেই মেরামত করিয়া লওয়া উচিত ও তারপর ২।৩ মাস অন্তর অন্তর দাঁতের ডাক্তারকে দেখানো উচিত। কোনও গর্ত বা হাড়ে দূষিত বীজাণু সংক্রমণ হইয়াছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে এক্সরে ফটো লওয়া উচিত।

নিবারণ—গর্ভ অবস্থায় দাঁতে অসুবিধা বোধ করিলে মাঝে মাঝে ডেন্টিষ্ট্‌কে দাঁত দেখানো উচিত।

পায়ের শিরা ফোলা

লক্ষণ—হাঁটুর নীচে বা হাঁটুর পিছন দিকে শিরাগুলি ফোলা, বড় হওয়া ও তাহাতে ব্যথা হওয়া এবং তাহাদের উপর আস্তে অঙ্গুলি বুলাইলে বড় বড় বিচির মত বোধ হয়। অনেকক্ষণ দাঁড়াইলে ইহা বাড়ে।

আসল কারণ—অনেক দিন হইতে শরীরে বিষ জমা হইতে থাকা।

গৌণ কারণ—মোজার আঁট হওয়া গার্টার, শাড়ী, শায়ার দড়ি, করসেট প্রভৃতি শক্ত করিয়া বাঁধা বা পরা। ইহার ফলে পা হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্ত যাইতে বাধা পায়। ফলে পায়ের ঐ শিরায় রক্ত জমা হইয়া সেগুলি ফোলে।

পরিণাম—শিরা বেশী ফুলিলে ফাটিয়া যাইতে পারে।

প্রতিষেধ—বেশীক্ষণ না দাঁড়ানো, কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন, যাহাতে ক্লান্তি বোধ না হয় অথচ শরীরে রক্ত চলাচল হয় এরূপ অল্প বেড়ানো। কাপড়-চোপড় ঢিলা ভাবে পরা। ভাল পেটি (maternity belt) পরিয়া গর্ভের ভার পায়ের উপর না পড়িতে দিলে এ রোগ হইবে না।

প্রতিকার—রোজ শুইয়া বিশ্রাম করা, শুইবার সময় বালিশের উপরে পা রাখিয়া উঁচু করা, অথবা খাটের পায়ের দিকে ইঁট প্রভৃতি দিয়া উঁচু করা, চেয়ারে বসার সময় চেয়ার সমান উঁচু কোনও টুলের উপর পা রাখা, সকালে বিছানা হইতে উঠিবার পূর্বে পাতলা, হাল্‌কা ইল্যাসটিক্ মোজা পরা। বেশী দিন এ রোগ থাকিলে বা মুখ সামান্যও ফুলিলে (কিডনীর কাজ ভাল না হওয়ার লক্ষণ) ডাক্তার দেখাইবেন।

প্রস্রাব না হওয়া

তৃতীয় মাসে জরায়ু বাড়িয়া বস্তিকোটর হইতে উঠিয়া পেটের মধ্যে আসে। কিন্তু কখনও কখনও জরায়ু পিছন ঠেলিয়া থাকার (২৪ ও ২৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) জন্য কিম্বা উহাতে অর্বুদ (tumour) হওয়ার জন্য (২৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) উহা বস্তিকোটরের মধ্যেই রহিয়া যায়। জরায়ু সেখানেই বাড়িবার ফলে উহা প্রস্রাবের থলিকে উপরে ঠেলিয়া ধরে এবং মূত্রনালী ও মলনালী চাপিয়া রাখে। গর্ভের গোড়ার দিকেই ডাক্তার দেখাইলে তিনি জরায়ুর অবস্থান ঠিক আছে কি না দেখিয়া এবং না থাকিলে ঠিক করিয়া দেন। তাহা হইলে এ অবস্থা আসিতেই পারে না। এ রকম হইবার পরও জরায়ু ঠিক জায়গায় আনা যায়, কিন্তু বেশী দেরীতে সে চেষ্টা করিলে প্রায়ই গর্ভস্রাব হইয়া যায়।

বার বার প্রস্রাব হওয়া

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে ক্রমবর্ধমান জরায়ু মূত্রের থলির উপর চাপ দেয় বলিয়া এমন হয়। তৃতীয় মাসের পর জরায়ু যখন পেটের মধ্যে উঠিয়া পড়ে তখন ইহা কমিয়া যায়। গর্ভের শেষ কয়েক সপ্তাহে সন্তানের মাথা প্রস্রাবের থলির উপর চাপ দেয় বলিয়া পুনরায় ইহা হয়। ইহাতে ভয়ের কিছু নাই।

এ সম্বন্ধে ভাবনা করিলে বরং ইহা বাড়ে। ইহার জন্য, পূর্বে যে প্রচুর জল খাইতে বলা হইয়াছে তাহার পরিমাণ কমানো উচিত নয়। সন্ধ্যা ছয়টা অবধি যত পারা যায় তত জল খাওয়া উচিত। যদি রাত্রে বারবার উঠিবার জন্য ঘুমের ব্যাঘাত হয় তবে ছয়টার পর কম জল খাইলেই হইবে।

পেট ব্যথা

গর্ভের শেষের ৪।৫ মাসে, মাঝে মাঝে ইহা হইয়া থাকে। এই ব্যথা কোনও বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ নহে।

কারণ—পেটের যন্ত্রপাতির উপর বর্ধিত জরায়ুর চাপ পড়।

পরিণাম—ভয়ের কিছুই নাই, তবে খুব বেশী ব্যথা হইলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাইতে হইবে।

যদি অল্পদিন পূর্বে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হইয়া থাকে এবং তাহা অস্ত্রোপচার না হইলেও জোড়গুলিতে টান পড়ায় ব্যথা হয়। কিছুদিন পূর্বে যদি পেটে

কোনও অস্ত্রোপ্রচার হইয়া থাকে তবে তাহার ঘায়ের দাগে ক্রমবর্ধমান জরায়ুর চাড় লাগায় অস্বোয়াস্তি বোধ হয়।

মেজাজ খারাপ হওয়া

ছয় মাসের কাছাকাছি কাহারও কাহারও নানা রকম মানসিক বিপর্যয় দেখা যায়। যেমন, আগেকার সুশীলা ও প্রেমময়ী স্ত্রী হয়ত স্বামী প্রভৃতি প্রিয়-জনের সঙ্গে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করেন। কেউ বা মন-মরা হইয়া আত্মহত্যার কথাও ভাবিতে থাকেন। খামখেয়ালী ক্ষুধাও প্রায়ই দেখা যায়। এ রকম কিছু হইলে আত্মীয়-স্বজনের উচিত ধৈর্য ধরিয়া সহানুভূতির সহিত সদয় ব্যবহার করা, কথা ও আচরণে গর্ভিণীকে তুষ্ট রাখা ও তাঁহার দোষ ত্রুটি ক্ষমা করা। সন্তান হইবার পর এ-ভাব আর থাকে না।

শরীর বিষাইয়া যাওয়া

কারণ—কিছু পূর্বে বর্ণিত 'গর্ভপাতের প্রবণতা'র কারণ দেখুন।

লক্ষণ—অল্প হইলে গায়ের চামড়ায় গরম ও অসোয়াস্তি (irritation) বোধ হয়, পায়ের গোছ, বিশেষত মুখমণ্ডল, ফোলে। সকালে চোখের পাতা বড় ও ভারি বোধ হয়, অল্প পরিশ্রমেই হাঁপ ধরে, ক্লান্তি বোধ হয়, ক্ষুধা থাকে না, গর্ভের শেষের দিকে গা বমি ভাব, ঝাপসা দৃষ্টি, চোখের সামনে হঠাৎ আলো দেখা প্রভৃতি হয়। কিছুদিন পরে হাতের আঙ্গুল ফোলে। আঙ্গুলে আংটি থাকিলে উহা আঁট হইয়া যাওয়ায় ইহা বুঝা যায়।

ভাল চিকিৎসা না হইলে ও নিয়মে না চলিলে ক্রমশ শরীরের বিষ আরও বাড়িয়া রক্তের চাপ বাড়ে, প্রস্রাব কমিয়া যায়, প্রস্রাবে এ্যালবুমেন দেখা যায়, মাথা ব্যথা, তলপেট ব্যথা, বমি, খেঁচুনি (Convulsions) ও অচৈতন্য অবস্থা (coma) হয়। এসব সাংঘাতিক অবস্থা। এই অবস্থার রোগের নাম হইল এ্যালবুমিনুরিয়া (albuminuria)। ইহার বাড়াবাড়ি অবস্থার নাম এক্ল্যাম্‌শিয়া (eclampsia)।

সারা গর্ভাবস্থায় শরীরে অল্প সল্প বিষ (টক্‌সিমিয়া) থাকিলে ঠিক সময়ের ২।১ সপ্তাহ পূর্বে দেড় বা দুই সের ওজনের সন্তান জন্মায়। অনেক ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের সময় মরিয়া যায়।

প্রতিকার—মাছ, মাংস ছাড়া, নুন যথাসম্ভব কম খাওয়া, তরি-তরকারী, শাক-সব্জী (তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক কাঁচা), দুধ, দৈ, ঘোল, মাঠা প্রভৃতি খাওয়া। জল ও সব রকম তরল জিনিস বেশী করিয়া খাওয়া, যাহাতে বেশী প্রস্রাবের সঙ্গে পেট পরিস্কার হইয়া যায় ('কোষ্ঠবদ্ধতা' অনুচ্ছেদ দেখুন)। উপযুক্ত পথ্যাদিতে ভাল ফল না পাইলে জোলাপের ঔষধ খাওয়া অপেক্ষা এনিমা নেওয়াই ভাল। যাহাতে খুব ঘাম হইয়া তাহার সহিত বিষ বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। যথাসম্ভব খোলা বাতাসে থাকা ও বেড়ানো, ২।১ সপ্তাহ দুপুরে ঘণ্টাখানেক শুইয়া বিশ্রাম, রাত ন'টায় শুইতে যাওয়া, কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী গিয়া কয়েক দিনের জন্য কাজ হইতে ছুটি লওয়া।

শরীরে বিষের পরিমাণ বাড়িবার ফলে ফিট্ হইলে তাহার শুশ্রূষার জন্য 'ফিটের শুশ্রূষা' অনুচ্ছেদ দেখুন।

বেশী দুর্গন্ধ বা জ্বালাকর স্রাব

স্বাভাবিক স্রাব—গর্ভের শেষের দিকে স্ত্রী অঙ্গে রক্তের বেশী যোগান হইবার জন্য প্রায়ই কিছু স্রাব হয়। যদি ইহার কোনও রং না থাকে অর্থাৎ সাদা বা ফিঁকা হলুদ (pale) হয় এবং তাহাতে কোনও দুর্গন্ধ না থাকে তাহা হইলে তাহা স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

খারাপ স্রাব—স্রাবের পরিমাণ খুব বেশী, রং খারাপ, দুর্গন্ধময় কিংবা অস্বস্তিকর (irritating) হইলে বুঝিতে হইবে যে কোনও খারাপ বীজাণু ভিতরে ঢুকিয়াছে কিম্বা শরীরে বিষ জমা (টক্‌সিমিয়া) হইয়াছে, যাহার জন্য মা ও গর্ভের সন্তান উভয়েরই বিপদ হইতে পারে।

প্রতিকার—টক্‌সিমিয়ার অপর লক্ষণ, ফল ও প্রতিকারের উপায়ের জন্য 'শরীর বিষাইয়া যাওয়া' অনুচ্ছেদ দেখুন। ডাক্তার দেখান।

রক্তহীনতা

লক্ষণ—মুখ, চোখের নীচের পাতা ফোলা, ঠোঁট ও হাতের নখ ফ্যাকাসে দেখায়। হাত, পা ফোলে, নড়াচড়া করিতে হাঁপ ধরে ও মুখে ঘা হয়।

পরিণাম—বেশী রক্তহীন অবস্থায় প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে সন্তান জন্মাই-বার পূর্বেই কিংবা তাহার পরেই হার্ট দুর্বল থাকায় অনেক গর্ভিণীর মৃত্যু হয়।

প্রতিকার—গর্ভিণীকে রক্তহীন মনে হইলেই ডাক্তার দেখাইবেন।

শেষের দিকের কষ্ট

গর্ভিণীর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সেই অনুযায়ী চলিলে আর কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু কাহারও কাহারও অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, কিংবা একই ভাবে ২।১ ঘণ্টা বসিয়া থাকিলে শেষের কয়েক সপ্তাহে আড়ষ্ট ভাব ও অস্বস্তিবোধ হইতে পারে। এ রকম হইলে ঠিক মাপসই পেটি (abdominal belt) বাঁধিলে খুব সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য খাইতে হইবে, সকল প্রকার বাড়াবাড়ি বন্ধ করিতে হইবে, দুপুরের আহারের পর ২।১ ঘণ্টা শুইয়া বিশ্রাম করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বেশীর ভাগই ফল, কাঁচা তরি-তরকারী ও শাক-সব্জী হইলেই ভাল হয়।

ডাক্তারী ঔষধ

গর্ভিণীকে ডাক্তারী ঔষধ দিতে নাই এ ধারণা ভুল। ডাক্তারী ঔষধে (এমন কি ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন খাওয়াইবার বা ইন্‌জেকশান্ দিবার ফলেও) গর্ভ নষ্ট হয় না। যে রোগের জন্য ডাক্তারী চিকিৎসা চলিয়াছিল (যেমন, আমাশয়ের বেগ, জ্বরের প্রবল তাপ, প্রভৃতি) তাহার জন্য কিম্বা গভীর শোক, বেশী আঘাত, উপদংশ প্রভৃতির জন্যই গর্ভ নষ্ট হয়।

ভয়ের কিছুই নাই

এই সকল অধ্যায়ে অনেক রকম রোগের কথা পড়িয়া কোনও পাঠিকা যেন ভাবিবেন না যে তাঁহার এই সব রোগই হইবে, কিংবা সামান্য অসুস্থ ভাব দেখিয়া মনে করিবেন না যে তাঁহার কোন বড় রোগ হইতে যাইতেছে। সকল প্রকার গর্ভিণীদের সাহায্য করিবার জন্যই এই সকল রোগের কথা লেখার প্রয়োজন ছিল।

বাস্তব পক্ষে **অধিকাংশ নারীই সারা গর্ভকাল বেশ ভাল ভাবেই কাটান।** প্রকৃত পক্ষে অনেক স্ত্রীলোক অপর সব সময় অপেক্ষা **এই সময়েই বেশী ভাল থাকেন।**

মাতৃমঙ্গল ও জাতীয় কল্যাণ

অবহেলার কুফল

যখনই গর্ভিণীর কোন ব্যাধির সূচনা দেখা দেয় তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। অবহেলা করিলে সামান্য ব্যাধিও মারাত্মক হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। ইহাদের **যে কোনও একটি লক্ষণ অবহেলা করিলে গর্ভিণীর মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।**

জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন—দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাহেতু আমাদের দেশের অনেকেই কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারায় রোগিণীর অবহেলা হয় ইহাও ঠিক কথা। কিন্তু বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ থাকিতেও শিক্ষিতদের মধ্যেও **শুধু অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অবহেলার ফলে** কত জীবন যে অকালে নষ্ট হয় তাহা ভাবিলে মনে হয় যে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের জীবনের কোন মূল্যই নাই, তাহাদের জীবন লইয়া যেন ছিনি-মিনি খেলা হয়। এই প্রসঙ্গে বহু উদাহরণের মধ্যে একটিমাত্র মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

"ভদ্রঘরের একজন দরিদ্র বিধবা অবস্থা বিপর্যয়ে বাধ্য হইয়া কলিকাতার কোন ধনীগৃহে পাচিকার কাজ করিতেন এবং সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যার পল্লীগ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। কন্যা প্রথমবার গর্ভবতী হইলে পাড়াগাঁয়ে প্রসবে যদি কোন বিপদ-আপদ হয় এই চিন্তায় বিধবা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। যে বাড়ীতে তিনি কাজ করিতেন তাঁহাদের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি মনের আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভরসা দিলেন "সে জন্য আপনি ভাবছেন কেন? আপনার মেয়েকে আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে আসুন। কাছেই বড় হাসপাতাল (কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের স্যার কেদারনাথ মেটারনিটী ওয়ার্ড) আছে, সেখানে সময়মতো ওকে ভর্তি ক'রে দিলেই আর কোন ভাবনা থাকবে না।" ইহাতে পরম ভরসা পাইয়া বিধবা জামাতাকে লিখিয়া কন্যাকে তাঁহার কাছে

আনাইলেন। কিছুদিন পর মেয়েটির পা ফোলা দেখা দিল, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, প্রস্রাবও কম হয়। মেয়ের মা ভয় পাইয়া কন্যাকে হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়া আনার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাড়ীর গৃহিণীকে সকাতর অনুরোধ করিলেন এবং সকালে একদিন ছুটি পাইলে নিজেই মেয়েকে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে দেখাইয়া আনিতে পারেন একথাও বলিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "কি আর এমন হয়েছে, পোয়াতিদের ওরকম হয়েই থাকে, অত কথায় কথায় ব্যস্ত হ'লে কি চলে—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি" ইত্যাদি। বিধবার আবেদন নিবেদন বাড়ীর সকলের নিকটই ব্যর্থ হইল—হাসপাতালে লইয়া গিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া আনার কোন ব্যবস্থাই হইল না। ইহার পর একদিন হঠাৎ ফিট্ আরম্ভ হইল। কয়েকবার ফিট্ হইবার পর বাড়ীর সকলের চৈতন্য হইল এবং তখন অজ্ঞান অবস্থায় রোগিণী ও তাহার মাকে লইয়া গৃহকর্তার এক পুত্র হাসপাতালে আসে। আমি তখন সেখানকার হাউস সার্জেন এবং ঐ সময় ডিউটিতে ছিলাম। রোগিণীকে তৎক্ষণাৎ ভর্তি করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল।.......দ্বিতীয় দিন রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায়ই প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে বোঝা গেল। উপযুক্ত সময়ে ফরসেপ্সের সাহায্যে একটি মৃত সন্তান প্রসব করানো হইল। আশা করা গিয়াছিল, এইবার অবস্থা ভালর দিকে যাইবে। কিন্তু কিছুই করা গেল না—পরদিন অজ্ঞান অবস্থায়ই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিধবার একমাত্র সন্তান, ফুলের মত নির্মল একটি সপ্তদশী তরুণী, শিক্ষিত হইলেও এই বিষয়ে অজ্ঞ ধনীর অবহেলার জন্য অকালে প্রাণত্যাগ করিল। ইহা দারিদ্র্য বা অশিক্ষা-প্রসূত অবহেলা নহে। মনে আছে, সেই ধনীপুত্রকে 'খুনী' আখ্যা দিয়া যথেষ্ট কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ধনীপুত্র কোন উত্তর করে নাই—রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। বিধবার সেই বুক-ফাটা বিলাপধ্বনি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই।"

অবশ্য অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যহেতু এ বিষয়ে আমাদের দেশের অনেকেই যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারে না। প্রথম হইতে আলোচিত বিধি-নিষেধগুলি পালন করিলে অবস্থা মোটেই জটিল হয় না এবং চিকিৎসক ডাকিবার কোনও প্রয়োজনও হয় না। অনিয়ম ও অবহেলার ফলে রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করানো অপেক্ষা [illegible] ও সাবধানতা দ্বারা রোগ নিবারণ অনেক ভাল। একথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

গর্ভিণীর স্বাস্থ্য

আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে, প্রসূতি পুনর্জন্ম লাভ করে। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রসবকার্যে প্রসূতির পক্ষে মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা কোনও গতিকে বাঁচিয়া যায়, তাহাদের বাঁচিয়া থাকাকে পুনর্জন্ম বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে এই মনোভাব সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে আমাদের দেশে অসংখ্য গর্ভিণীর মৃত্যু। স্বাস্থ্যনীতির নিয়মাদি রীতিমত পালন এবং প্রয়োজন মত চিকিৎসা ও পরিচর্যা হইলে প্রসবকার্য মল-মূত্র ত্যাগের ন্যায় অন্যান্য প্রাকৃতিক বিধান অপেক্ষা খুব বেশী বিপজ্জনক নহে। অস্বাস্থ্যকর স্থান, খাদ্য-দ্রব্য ও অভ্যাস শুধু যে প্রসূতির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে, তাহা নহে, তদ্দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানেরও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। সন্তানের শারীরিক গঠন কতকাংশে প্রসূতির অভ্যাস ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় আমরা স্বাস্থ্যনীতির দু'একটি সূত্র অমান্য করিয়া চলিলেও সত্বর তাহার কুফল ভোগ করি না কিন্তু গর্ভিণী সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ফল ভোগ করে। সুতরাং **গর্ভাবস্থায় যত্নের সহিত স্বাস্থ্যনীতি পালন** করিয়া চলা উচিত।

গর্ভিণী-মৃত্যু

১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলা-গভর্ণমেণ্ট গর্ভিণী মৃত্যু সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার (বিবৃতি) জারী করিয়াছিলেন। তাহাতে সরকার বলিয়াছেন, **অন্যান্য দেশের তুলনায় গর্ভিণী এবং প্রসূতি-মৃত্যু ভারতবর্ষে অনেক বেশী**। এতৎসম্পর্কে সরকার যে তুলনামূলক হিসাব দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় :—

	প্রতি হাজারে মরে		প্রতি হাজারে মরে
হল্যাণ্ড	২·৪	সুইজারল্যাণ্ড	৪ ৪
ফ্রান্স	২·৫	অষ্ট্রেলিয়া	৪·৫
সুইডেন	২·৬	আয়ার্ল্যাণ্ড	৪·৮
ডেনমার্ক	২·৬	স্কটল্যাণ্ড	৬·৬
নরওয়ে	২·৮	আমেরিকা	৮·৩
ইটালী	২·৮	**ভারতবর্ষ**	**২৪·৫**
জাপান	২·৮	**আসামের চা-বাগান**	**৪·২**
ইংল্যাণ্ড	৪		

উক্ত সরকারী ইস্তাহারে আরও প্রকাশ, ডাঃ মার্গারেট ব্যালফোর (Dr. Margaret Balfour) ও সার জন মেগো (Sir John Megaw) এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলায় গর্ভিণীরা সাধারণত এক্লাম্‌শিয়া (Eclampsia) ও দিল্লী, পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে অষ্টিওমেলেশিয়া (Osteomalacia) রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। সার জন মেগোর সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর দুই লক্ষ গর্ভিণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৯৩১ সনের আদমশুমারীর সময় প্রসূতিদের যে হিসাব করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ভারতের প্রত্যেক নারী গড়ে ৪·২ জন সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। *

এই সূত্র ধরিয়া উক্ত সরকারী ইস্তাহারে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সার জন মেগোর প্রদত্ত হাজার করা ২৪·৫ জনের হিসাব ঠিক নহে; প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে একশত প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিতেছে।

বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ১৯৩৬ সনের যে স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, ১৯৩৬ সনে বঙ্গদেশে মোট ১৬,৫৮১ জন ১৯৩৫ সনে মোট ১৫,৬০৮ জন নারী গর্ভ ও প্রসব-সংশ্লিষ্ট কারণে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে এই সংখ্যা ১৭,৮৭৫তে উঠিয়াছিল। প্রতি ১০০০ সন্তান-প্রসবে এই মৃত্যুর হার ১০ ছিল। ১৯৩৮ সনেও এই সংখ্যা ও হার প্রায় সমান সমান ছিল। ১৯৪০ সনে ১৫৭৫৮ এবং ১৯৪১ সনে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪৮০৩।

স্বাস্থ্য-বিবরণীতে একথাও বলা হইয়াছে, **প্রকৃত মৃত্যু-সংখ্যা আরও বেশী হইবে**; কারণ গণনা-প্রণালী সব ক্ষেত্রে নির্ভুল নয়।

---

* তৃতীয় গর্ভের পর হইতে মৃত্যুর আশঙ্কা পরবর্তী প্রত্যেক গর্ভে ক্রমশ বাড়ে। প্রত্যেক গর্ভে মৃত্যুর আশঙ্কা অনুপাত এইরূপ:

১ম—১২·৫	৪র্থ—৭·৫	৮ম ও ৯ম—১২·৫
২য়—৮	৫ম—৮	১০ম ও ১১শ—১৮
৩য়—৭	৬ষ্ঠ ও ৭ম—১১	১২শ ও পরের—৩৪

১৯৪১ সনে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪৮০৩ হাজারে প্রায় ৯ জন।

১৯৪০ „ „ „ „ „ ১৫৭৫৮ „ „ „ „।

এ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে যে উপায়ে শিশুমৃত্যু ক্রমশ কমিয়াছে সেই সেই কারণেই সেখানে প্রসবের সময়ে মায়েদের মৃত্যুও এই ভাবে কমিয়াছে :—১৯৩৩ সনে ছিল হাজার করা ৬ জন, কিন্তু ১৯৪৬ সনে প্রায় দেড় জন মাত্র। গত ২৫ বৎসরে সেখানে প্রসূতি মৃত্যু ক্রমশ কমিয়া আগেকার সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়াছে, অর্থাৎ প্রসব করা এখন পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ বেশী নিরাপদ হইয়াছে।

ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ গর্ভিণী প্রসবের সময়ে মারা যায়। অন্য ভাবে বলা যায় যে, প্রতি এক হাজার গর্ভিণীর মধ্যে ২০ জন ঐ সময়ে মরে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য ছাড়া ইহার আরও একটি কারণ এই যে, ভারতে প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্য মোটে একজন ডাক্তার আছে, কিন্তু বিলাতে আছে প্রতি এক হাজারের জন্য একজন। তাহা ছাড়া ভারতের প্রায় শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে থাকে অথচ শতকরা ৯০ জন ডাক্তার শহরে থাকে।

মৃত্যু-হারের এই আধিক্যের কারণ বহু হইলেও প্রসূতি-পরিচর্যা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই যে তন্মধ্যে প্রধান, সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রসূতি-মৃত্যু-হারের এই আধিক্য হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, যে সমস্ত প্রসূতি রোগে ভুগিয়া মৃত্যুর হাত হইতে কোনও রকমে রক্ষা পায়, তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল নহে। **গর্ভিণী ও প্রসূতিগণের স্বাস্থ্যের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।** গর্ভিণী ও প্রসূতি-চর্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হইলে **গর্ভাধান, গর্ভাবস্থা, প্রসব, প্রসূতি-পরিচর্যা ও সমস্ত যৌন-ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।**

গর্ভিণীর মন

মনের সহিত শরীরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে মন খারাপ থাকিলে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়া পড়ে। সুখাদ্যও ঘৃণা বা বিরক্তির সহিত ভোজন করিলে অনর্থ ঘটায়।

গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্মদান বিষয়েও মনের ক্রিয়া ও ভাব যথেষ্ট। ডাঃ ভেল্ডি এ সম্বন্ধে মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন :

"নারীকে মনের দিক দিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক এবং ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকাল হইতেই মাতৃত্বের সাধ বালিকার মধ্যে জাগ্রত করিতে

হইবে, কুমারীকে এই কর্তব্যপালনে প্রস্তুত এবং নারীকে সাগ্রহে এই মহান্ কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।”

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেশে দম্পতির ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। “জন্মনিয়ন্ত্রণ” সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান হইলে দম্পতিরা ইচ্ছা, অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া উপযুক্ত সময়ে সন্তানলাভে ব্রতী হইতে পারিবে এবং তখন স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিবেষ্টন এবং আনন্দময় মানসিক পরিস্থিতির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

স্বেচ্ছায় গর্ভধারণ করিলেই গর্ভিণীর মন প্রফুল্ল এবং আগ্রহে আবিষ্ট থাকিবে; গর্ভকাল ও প্রসবের অস্বাচ্ছন্দ্যকে সে তুচ্ছ করিয়া ভুলিয়া যাইতে পারিবে; শরীরের উপর মনের ক্রিয়াও সব দিক দিয়া অনুকূল হইবে।

গর্ভিণীর শরীর ও মনের অবস্থা যে রকমই থাকুক, আত্মীয়-স্বজন, ডাক্তার, ধাত্রী সকলেরই কর্তব্য তাহাকে অভয়, প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেওয়া। জীবনের ভাল দিকটাই তাহাকে দেখাইতে হইবে। সকল প্রকার ক্রোধ, হিংসা ও উত্তেজনামূলক অবস্থা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। ভাল বই, সুন্দর চিত্র এবং দরদী বান্ধবীর সাহচর্য তাহাকে মানসিক স্বস্তি দিবে। **প্রসব সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবকাশ দিতে নাই** এবং ভীতিপ্রদ গল্প বা দৃষ্টান্তের উল্লেখ সর্বদা পরিহার্য। কঠিন প্রসবের গল্প বা ধাত্রীবিদ্যার পুস্তকের বর্ণনা তাহাকে শোনানো বা পড়িতে দেওয়া অনুচিত। যে সকল নারী গর্ভিণীর কাছে যান বা যাইতে পারেন তাঁহাদের সকলকে এ বিষয়ে বিশেষ নিষেধ করিতে হইবে।

আয়ুর্বেদে গর্ভিণীচর্যা

সুপ্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-সভ্যতা ভারতবাসী তথা জগৎবাসীকে অনেক উপাদেয় বস্তু দান করিয়া আসিতেছে। আয়ুর্বেদে উল্লিখিত চিকিৎসা-প্রণালীর কোনও কোনও বিষয় আধুনিক উন্নত সভ্যতার যুগেও অচল হইয়া পড়ে নাই। গর্ভাধানের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মাবলী এবং গর্ভিণীর অবশ্য পালনীয় আদেশ ও উপদেশ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে যথেষ্ট আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। যানবাহনাদিতে গমনাগমন, দিবা-নিদ্রা, * গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, স্বামীসঙ্গ †

* দিবা-নিদ্রা একেবারে নিষেধের সঙ্গত কারণ নাই।

† স্বামীসঙ্গ একেবারে বর্জন করার দরকার নাই। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রভৃতি গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল, সাধ্যমত সাধারণ শ্রমজনক কার্য এ অবস্থায় অনুমোদন করা হইত।

তাহা ছাড়া গর্ভাধানের পর বিভিন্ন মাসে নানারূপ সংস্কারাদি পালনের বিধি রহিয়াছে। গর্ভাধানের তৃতীয় মাসে পুংসবন, চতুর্থ মাসে সীমান্তোন্নয়ন, পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত এবং নবম মাসে সাধভক্ষণ-সংস্কার পালন করা হইত। একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই সব সংস্কারের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল **গর্ভিণীর মানসিক প্রফুল্লতা সম্পাদন** এবং তাহাকে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করা। আধুনিক যুগের ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তারগণও বলেন যে, গর্ভিণীকে উৎসাহের বাণী শ্রবণ করানো এবং তাহাকে আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যেই হয়ত অর্থপূর্ণ মন্ত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা বিভিন্ন সংস্কার নিষ্পন্ন হইত। তবে এই সকল মন্ত্রতন্ত্র ছাড়িয়া শুধু আমোদ ও উৎসাহজনক অনুষ্ঠানাদিই ভাল।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গর্ভিণীর খাদ্যাখাদ্য বিচার বিশ্লেষণেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার এবং প্রসবের পর জরায়ু ও পাকাশয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য ও গর্ভিণীর হজম করিবার শক্তি ক্ষীণ থাকিলে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য সকল ব্যবস্থাই যে বিজ্ঞান-সম্মত এমন নহে।

কিন্তু আয়ুর্বেদে উক্ত বিধিব্যবস্থা যতই নিখুঁত এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত মনে হউক না কেন, আমরা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের উন্নততর আবহাওয়ায় বাস করিয়া এখন আর প্রাচীন আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারি না। দিন দিনই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির অনন্ত সম্ভাবনা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইকে স্পষ্টতররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। পরিবর্তনশীল জগৎ ৫,০০০ হাজার বৎসর পূর্বে যেখানে ছিল আজ আর সেখানে বসিয়া নাই। কাজেই অতীত যুগের বিধি ব্যবস্থা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্দোষ ও ফলপ্রদ প্রমাণিত হইলেও আমরা কি নূতন এবং উন্নততর **বিজ্ঞানসমম্মত বিধিব্যবস্থাকে** সাদরে বরণ করিব না? পূর্বকালে শারীর-বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলা যায় না; কাজেই শব-ব্যবচ্ছেদ, অণুবীক্ষণ, এক্‌স-রে প্রভৃতির ব্যবহার, অসংখ্য লিখিত রোগীতত্ত্ব, সূক্ষ্মবিশ্লেষণ এবং বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষা প্রসূত জ্ঞানের অভাবে গর্ভাধান, গর্ভিণীর স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা, আঁতুড় ঘর, প্রসব, সন্তান-পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীনকালের লোকের

জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-সাধনালব্ধ শতমুখী জ্ঞানের তুলনায় নগণ্য বলিয়া মনে হয়।

মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রচেষ্টা

ভারতে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম সূচনা দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তখন জেলা হাসপাতালসমূহে ধাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে বিশেষ কোনও সুফল না হওয়ায় ঐ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা হয়। ১৮৮০ হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য অমৃতসরে একজন পাদ্রীমেম, মিস হিউলেট্ (Miss Hewlett) কর্তৃক একটি স্কুল পরিচালিত হয়। ধাত্রীদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভাল ব্যবস্থা থাকায় এই স্কুলের নমুনায় কোয়েটা, নাগপুর, হায়দারাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটি স্কুল খোলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত বড় বড় সহরে শিক্ষিতা মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত।

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন (Lord Curzon) দেশময় চাঁদা তুলিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড (Victoria Memorial Scholarship Fund) প্রতিষ্ঠা এবং বহু ধাত্রীশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৯১৮ সাল হইতে এই অনুষ্ঠান ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার দিকে খুব জোর দেন এবং ১৯২০ সালে দিল্লীতে নানা কেন্দ্র হইতে সভ্য নিমন্ত্রণ করিয়া একটি মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

অতঃপর কলিকাতা ও বোম্বাইতেও এরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর লেডী চেম্‌স্‌ফোর্ড সর্বভারতীয় মাতৃ ও শিশুমঙ্গল লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় শিশুসপ্তাহ (Indian Baby Week) পালন করা হয় এবং ১৯২৭ সালে সর্বভারতীয় মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কন্‌ফারেন্সের (All-India Conference on Maternity and Child Welfare) অধিবেশন হয়।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে **নিখিল ভারত স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা কংগ্রেসের** তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়** উহার উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বহু প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। আচার্য রায় উদ্বোধন বক্তৃতা প্রসঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির সহিত উহার মাতৃকুল এবং

শিশুদের স্বাস্থ্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে নারীদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর খুব কমই দেওয়া হয়। ফলে এই দেশে অধিকাংশ মাতাই · দুর্বল ও কৃশ এবং দুই একটি সন্তান-সন্ততি হওয়ার পর তাঁহারা ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু প্রায় অক্ষম ও পঙ্গু হইয়া পড়েন। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রসবকালে প্রতি হাজারে মাত্র ৫ জন প্রসূতি মারা যায়; অথচ ভারতবর্ষে ঐ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২০ জন, উপরন্তু ৩০ লক্ষ মাতা গর্ভসঞ্চার ও প্রসূতি অবস্থার ফলে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে পঙ্গু ও অক্ষম হইয়া পড়েন। **এই সব কথা বিবেচনা করিলে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।**......আমাদের দেশে প্রসূতির পরিচর্যা ও যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং কতকগুলি বড় সহর ব্যতীত অন্যান্য স্থানে প্রসূতিদের যথোপযুক্ত পরিচর্যাদির ব্যবস্থা এ পর্যন্ত খুব কমই করা হইয়াছে; ধাত্রীদের সংখ্যা অত্যল্প এবং হাসপাতালে প্রসূতিদের শয্যার (বেড) সংখ্যা আরও কম। ১৯৩৬ সালে সহর অঞ্চলসমূহে ৮৪,৮৫৫টি প্রসব হয়, অথচ সহরগুলিতে বিভিন্ন হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩টি; পল্লীঅঞ্চলে ৫,৫৮৪,৩৫১টি প্রসব হয়। এই দিক দিয়া মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের অবস্থা বাংলা অপেক্ষা অনেক ভাল। ঐ বৎসরে বাংলা দেশে মাত্র ৬৩৩ জন ধাত্রী ছিলেন; অথচ বোম্বাই প্রদেশে ২৬৩৫ ও মাদ্রাজে ১,৩১৩ জন ধাত্রী ছিলেন। বাংলা দেশে পল্লী অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পল্লী অঞ্চলের প্রসূতি এবং ধাত্রীকেন্দ্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং **বহু সংখ্যক প্রসব অশিক্ষিতা দাইদের** দ্বারা করানো হয়। উহার ফলে প্রসূতি-মৃত্যুর হার অধিক। সম্প্রতি জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলি প্রসূতি পরিচর্যার ব্যবস্থা করিতে কিছু মনোযোগী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "স্ত্রীরোগ এবং ধাত্রীবিদ্যাবিশারদদের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা দুইটি বড় সমস্যা এই যে, প্রথমত ভারতের মাতৃকুলের মধ্যে এই সব ব্যাপারে যে বিপুল **অজ্ঞতা** ও **কুসংস্কার** বিদ্যমান তাহা **দূরীকরণ** এবং দ্বিতীয়ত **মাতাদের প্রসবের পূর্বে ও পরে যাহাতে ক্রমশ অধিকতর যত্ন নেওয়া হয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা** করার সমস্যা। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার চিকিৎসকগণের পক্ষে মাতাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্র ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় মাতাদের মন হইতে ঐ

অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য **আন্তরিক** আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিতে হইবে। স্কুল,কলেজ, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল এসোসিয়েশন ও কাউন্সিলগুলির মধ্য দিয়া, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র রেডিও, ছায়াচিত্র ইত্যাদির মারফত এবং প্রচারপত্র বিলি করিয়া ভারতের সর্বত্র সুদূর পল্লীকুটিরে মাতাদের মন হইতে **কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূরীকরণের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে**। তারপর যাহাতে গর্ভাবস্থায় মেয়েদের যথোচিত যত্ন লওয়া হয়, তজ্জন্য **জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে অধিকতর সচেতন** করিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবেই প্রসূতিদের মৃত্যুর হার সর্বনিম্নস্তরে আনা সম্ভব হইবে।”

সভাপতি ডাঃ পুরন্দর বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই দেশের চিকিৎসা-শিক্ষার পাঠ্য-বিষয়সমূহে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিদ্যার অংশ সাধারণ চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার তুলনায় কম করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, দেশের অধিকাংশই পল্লীবাসী ; সুতরাং তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে যাহাতে **দেশের পল্লী ও সহর অঞ্চলে সর্বত্র প্রসূতি ও শিশুমঙ্গলকেন্দ্র স্থাপিত হয়,** তজ্জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত।

উক্ত কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের চেষ্টায় কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে “মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল” বিষয়ে প্রদর্শনার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার কর্ণেল চ্যাটার্জি এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত মডেল তথ্যসম্বলিত চার্ট প্রভৃতি বাংলা, হিন্দি এবং উর্দুতে তৈয়ারী করা হয়। যাহাতে সহজে বুঝা যায়, সেই জন্য অতি সহজবোধ্য ভাষায় এই সকল ব্যবস্থা করা হয়।

দেশের **অগণিত প্রসূতি এবং শিশুর মঙ্গল বিধানার্থে** এই জাতীয় **প্রদর্শনীর** আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক। মাতৃমঙ্গল ও শিশুপরিচর্যা ব্যাপারে আচার্য রায়, ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, কর্ণেল চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামতের মূল্য অনেকখানি। আশা করা যায়, **অদূর ভবিষ্যতে** বাংলা দেশের জনসাধারণের মনোযোগ এদিকে আরও বেশী আকৃষ্ট হইবে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে প্রসূতি এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর। জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে মাতৃজাতির সর্বাঙ্গীন সুখ শান্তি এবং স্বাস্থ্যসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে।

আমাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ

আমাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ এই যে, পাক-ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, সমাজ সেবক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ ও পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী এই দুই দেশেই যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সে চেষ্টা করিতে থাকুন।

(১) **মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র**—শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি এলাকায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এই সকল কেন্দ্রের কাজ হইবে ঃ—

(ক) প্রত্যেক গর্ভিণীকে স্বাস্থ্যরক্ষা, গর্ভাবস্থা, প্রসব, শিশুপালন প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্ত দরকারি উপদেশ দেওয়া।

(খ) গর্ভকালে গর্ভিণীর কোনও রোগ লে তাহার চিকিৎসা এবং অন্যান্য দরকারি ব্যাপারের বন্দোবস্ত করা।

(গ) যাহাতে অস্বাভাবিক প্রসবের ভয় দূর হয় ও গর্ভিণী ঠিক সময় মত হাসপাতালে ভর্তি হন তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করা।

(২) **প্রোটেক্‌শান্ কার্ড**—প্রত্যেক গর্ভিণীকে একটি 'প্রোটেক্‌শান্ কার্ড' দেওয়া উচিত। এই কার্ড দেখাইলে ঃ—

(ক) গর্ভিণী ট্রাম, বাস, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি যানবাহনে সকলের আগে উঠিতে ও সকলের চেয়ে ভাল জায়গায় বসিতে পাইবেন।

(খ) তাঁহাকে দোকান, ষ্টেশন, সিনেমা প্রভৃতি জায়গায় অপরদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াইতে হইবে না। সকলের আগে সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

(গ) কর্মস্থলে তাঁহাকে হালকা কাজ দেওয়া হইবে।

(ঘ) তিনি বাড়তি রেশন পাইবেন।

(ঙ) হাসপাতাল ও কেন্দ্রগুলিতে তিনি সকলের আগে পরামর্শ ও চিকিৎসা পাইবেন।

(৩) **প্রসবের পূর্বে ও পরে ছুটি**—পুরা বেতনে প্রসবের পূর্বে ৩৫ দিন ও পরে ৪২ দিন (মোট ৭৭ দিন) ছুটি দেওয়া হইবে।

(৪) প্রসবের পর যতদিন পর্যন্ত না ডাক্তারদের মতে মা কাজে যোগ দিবার যোগ্য হইবেন ততদিন পর্যন্ত চাকরিতে যোগ না দিয়া তাহার বিশ্রাম করার অধিকার থাকিবে।

(৫) গর্ভের চতুর্থ মাস হইতে বাড়তি সময় (Overtime) কাজ করা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৬) যতদিন শিশু মার দুধ খাইবে ততদিন :—

(ক) চাকরির সময়ের মধ্যে প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর, কাজের জায়গার কাছেই, উপযুক্ত নার্সদের তত্ত্বাবধানে, শিশুসদনে রাখা সন্তানকে নিজের দুধ খাওয়াইবার জন্য আধঘণ্টা ছুটি পাইবেন।

(খ) মাতাকে রাত্রে কাজ করিতে হইবে না।

(৭) গর্ভের ষষ্ঠ মাস হইতে প্রসবের পর চার মাস পর্যন্ত দ্বিগুণ রেশন পাইবেন।

(৮) শিশুর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য নগদ টাকা পাইবেন।

(৯) সন্তানের এক বছর বয়স পর্যন্ত মা নগদ সাহায্য পাইবেন।

(১০) তাহার ২ মাস বয়স হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত তাহাকে ভাল ব্যবস্থা ওয়ালা সরকারী শিশুসদনে ভর্তি করিয়া দিবার অধিকার থাকিবে।

ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি

(Growth of Embryo and foetus)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্ব এই উভয়ের মিলনেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শুক্রকীট এবং ডিম্ব উভয়ই অতি ক্ষুদ্র জীবকোষ মাত্র। উভয়ের সংস্পর্শে কি করিয়া ধারণাতীত জটিল ও সূক্ষ্ম এবং বিভিন্ন-কার্যক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হইয়া আবার উহাদের সমবায়বদ্ধ সমষ্টিগত পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ উদ্ভূত হয় তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি ?

জীবদেহের সূক্ষ্মতম অংশ কোষ

জীবদেহের ক্ষুদ্রতম অংশকে কোষ (Cell) বলা হয়। কোটি কোটি কোষের সমবায়ে দেহের তন্তুসমূহ (Tissue) গঠিত হয়। আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে কোষ একটুকু প্রোটোপ্লাজম্। আবার এই প্রোটোপ্লাজম্এর অভ্যন্তরে থাকে বিশেষরূপে গঠিত প্রাণবিন্দু (Nucleus)।

কোষের আকার, প্রকৃতি ইত্যাদি

কোষের আকার বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কতকগুলি বর্তুলাকার, আবার কতকগুলি ডিম্বাকৃতি; মাংস-পেশীর কোষসমূহ দীর্ঘাকৃতি, স্নায়ু-কোষসমূহ বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত; আবার রক্তের অন্তর্গত সাদা রক্তকণিকাসমূহের আকার কোনও একটি বিশেষ ধরনের নহে। ইহাদের আকৃতি যেরূপই হউক না কেন, ইহাদের গঠন মূলত একই।

এক কোষ-বিশিষ্ট জীব এমিবার জীবন-যাপন-প্রণালী

এক-কোষ-বিশিষ্ট জীবের কথা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ৩নং চিত্রে এক-কোষ-বিশিষ্ট এমিবার জন্মপদ্ধতিও দেখানো হইয়াছে। এমিবার জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু বলিবার আছে।

উক্ত চিত্র হইতে এমিবার প্রতিকৃতি সম্বন্ধে ধারণা হইবে। উহারা সাধারণত কূপ, নালা, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে থাকে এবং কাদার উপরে বা পাথরের গা বাহিয়া গড়াইয়া চলে। কয়েক রকম এমিবা মানুষের মুখ গহ্বরে ও অন্ত্রের মধ্যেও থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমাশয় সৃষ্টিকারী এমিবার কথা মনে করুন।

কাল রং বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এমিবা খালি চোখে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুবৎ দেখা যায়। বড় আকারের এমিবার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ ইঞ্চির ১০০ ভাগের এক ভাগ। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য না করিলে উহার জীবন-যাত্রার পদ্ধতি কিছুই বুঝা যায় না।
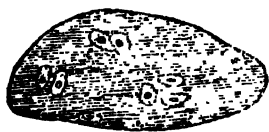
২৮ নং চিত্র
জীবকোষের বিভিন্নরূপ
[ডাইবল অবলম্বনে]

এমিবা এক-কোষ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব। ইহার জীবন আছে ; ইহা চলাফেরা, খাদ্যাহরণ, ভোজন, এবং বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি জীবোচিত সকল প্রকার কার্যই করিয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে একই কোষ স্বাধীনভাবে জীবন-পথে চলে। খাইবার জন্য মুখ, শ্বাস লইবার জন্য নাক, মলত্যাগ করিবার জন্য মলদ্বার ইত্যাদি ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিতে ইহার কিছুই নাই।

ইহার পা নাই। ইহা শরীরের অংশ আগাইয়া "ট্যাঙ্কের" মত গড়াইয়া চলে বলা যাইতে পারে। খাদ্যের দিকে ইহা আকৃষ্ট হয় ; প্রতিকূল অবস্থা হইতে ইহা বিরক্তিভরে সরিয়া আসে বা উহাকে এড়াইয়া চলে।

ইহার খাইবার কৌশল আরও কৌতুহলপ্রদ। ইহা লম্বিত বাহুর মত দুইটি "ডাল ফেলিয়া" খাদ্য দ্রব্য, যথা, পচা বৃক্ষাবশেষ ধরে এবং আস্তে আস্তে শরীরের অভ্যন্তরে লইয়া যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা পরিপাক হইয়া গেলে উহার ভুক্তাবশেষ শরীরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে এই যে, এক-কোষ-বিশিষ্ট এমিবা সমস্ত শরীর দিয়াই জীবোচিত সকল কার্য করে ; উহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই।

এক কোষের আকারগত ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন উহার ক্ষমতা কম।

বহু কোষ মিলিত হইয়া বড় বড় জীবদেহ গঠিত করে।

কোষসমূহের শ্রম-বিভাগ

দালানকে মোটামুটি যেমন বহু সংখ্যক ইঁটের সমষ্টি বলা যায়, জীবদেহকেও তেমনই বহু সংখ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সমষ্টি বলা যায়। অসংখ্য বালু বা ধূলিকণা যেমন ইঁটকে গড়িয়া তুলিয়াছে, অসংখ্য কোষের সমষ্টিও তেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই তুলনামূলক দৃষ্টান্ত একেবারে সর্বাংশে ঠিক নয়। ইঁট নির্জীব ও একছাঁচে ঢালা ; এই হেতু দালানের বিভিন্ন জায়গার ইঁটের মধ্যে বিশেষ তফাত নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কিন্তু বিভিন্নরকমের কাজ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ কোষের সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে ; এই কার্যসমূহ পরস্পরে যোগসূত্র রক্ষা করিয়াই সম্পন্ন হয় ; তাই সারা জীবটি জীবনযাত্রার পথে চলিবার উপযুক্ত হয়। এই শ্রম-বিভাগই (Division of labour) উচ্চতর জীবের অগ্রগতি ও পরিণতির সহায়ক হইয়াছে।

কিন্তু এই শ্রমবিভাগের ফলেই আবার কোষসমূহের শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই জন্যই চোখে কেবল আলোই ধরা পড়ে ; কানে কেবল শব্দই শোনা যায়। তবে কোনও কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একাধিক কাজ করিয়া থাকে। যেমন জিহ্বা শুধু যে কথা বলিতে সাহায্য করে তাহাই নহে স্বাদগ্রহণও উহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রাণবিন্দুর প্রয়োজনীয়তা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। অনেকের মতে প্রাণবিন্দু কোষের পরিপোষণের সাহায্য করে, আবার অনেকের মতে প্রাণবিন্দু আছে বলিয়াই কোষের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে। কোষের দ্বিধা এবং বহুধা বিভক্তির বিষয় আমরা প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কোষের প্রাণবিন্দু কোষের বিভক্তি ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করে।

অধিকাংশ কোষই অতি ক্ষুদ্র এবং আণুবীক্ষণিক। কোনও কোনও গাছপালার কোষ অপেক্ষাকৃত বড় এবং ঐগুলি খালি চোখে দেখা যায়। টাট্‌কা ডিম্বের কুসুম একটি মাত্র কোষ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু এক-কোষ-বিশিষ্ট জীব ধরাপৃষ্ঠে আছে। কোষ মাত্রই অনাগত নূতন জীবনকণার আধার—নূতন জীবন সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জীবন পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের সকল মালমশলাই কোষের মধ্যে মজুদ থাকে।

মনে রাখিতে হইবে যে, কোষ একটিমাত্র অখণ্ড পদার্থ—ইহাকে কৃত্রিমভাবে ভাগ করিলে বিভক্ত অংশগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রাকৃতিক রীতিতে যখন কোষ জ্যামিতিক নিয়মে দ্বিধা, চতুর্ধা এবং বহুধা বিভক্ত হইয়া প্রজনন-কার্যে সাহায্য করে তখন দ্বিধা-বিভক্ত কোষগুলি মূল কোষের সর্ববিধ গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়; ইহাদিগকে কন্যাস্থানীয় কোষ (Daughter cells) বলা যায়।

মানবদেহ এবং নানাজাতীয় কোষ

মানবদেহের কেবলমাত্র রক্তেই কোটি কোটি কোষ বিদ্যমান। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথা, মাংসপেশী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ইত্যাদির মধ্যে অসংখ্য কোষ রহিয়াছে। মোটামুটি বলা যায় যে, মানবদেহে পঞ্চাশাধিক নানাজাতীয় কোষ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিরাজ করিতেছে; সংখ্যায় সবসুদ্ধ প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কোষ বর্তমান।

তাহা হইলে মোটামুটি আমরা দেখিতেছি:

(১) জীবদেহের প্রাথমিক অংশ কোষ (Cell)। এক-কোষ-বিশিষ্ট স্বতঃসম্পূর্ণ জীবও রহিয়াছে, যথা, এমিবা। প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌জাতীয় সকল দেহেরই ক্ষুদ্রতম অংশ কোষ। শরীরের একটি কোষকে বৈজ্ঞানিকেরা বিচ্ছিন্ন করিয়া উপযুক্ত দ্রবণে (সলিউশনে) রাখিয়া বহুকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন।

(২) কতকগুলি কোষ লইয়া তন্তু (Tissue) গঠিত হয়। যথা, হাতের মাংসখণ্ডে বহু তন্তু আছে।

(৩) কতকগুলি তন্তু লইয়া পেশী গঠিত হয়। যথা, হাতের মাংসপেশী।

(৪) কতকগুলি তন্তু ও পেশী লইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। যথা, হৃদ্‌যন্ত্র, হাত, পা ইত্যাদি।

(৫) কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া আবার সম্পূর্ণ জীবদেহ গঠিত হয়। কুকুর, বিড়াল, মানুষ সকলেই কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কোষগুলির সমবায়প্রণালী কত আশ্চর্যজনক। ঠিক উপযুক্ত আকারে পরিণত হইলেই প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর বাড়ে না; হাতের কোষগুলি বাড়িতে বাড়িতে তাহার আকারকে ও দেহের অনুপাতকে ছাড়াইয়া যায় না। অর্থাৎ, জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপরগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঠিক পরিমাণ মতই বাড়ে।

ডিম্ব এবং শুক্রকীটও বিশিষ্ট জাতীয় কোষ

জীবদেহের অসংখ্য কোষের মধ্যে কতকগুলি কোষের কার্য নূতন জীব-সৃষ্টি। তাহারা দেহের রাসায়নিক পরিপুষ্টির কোনও সহায়তা করে না। তাহারা অন্যান্য কোষসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় কিন্তু কাজের বেলায় তাহারা শুধু জাতির (raceএর) তাঁবেদার। তাহারা ভবিষ্যৎ বংশধরের সূচনা করে। নারীর ডিম্ব ও পুরুষের শুক্রকীট এই জাতীয় কোষ।

মাতৃগর্ভে একটিমাত্র কোষ (প্রাণবন্ত ডিম্ব) কি করিয়া বহু কোষে পরিণত হয় এবং আপনা-আপনিই অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠন করিয়া যায় তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

ভিন্ন শ্রেণীর জীবের দ্বারা গর্ভাধান

সাধারণত এক শ্রেণীর জীবের সহিত অন্য শ্রেণীর জীবের যৌনমিলনে গর্ভসঞ্চার হয় না। কুকুর ও বিড়াল, গরু ও ছাগল, মানুষ ও ইতর জীব মিলিত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিতে পারে না। ইহাদের ডিম্ব ও শুক্রকীট বিভিন্নধর্মী; পরস্পর পরস্পরে মিলিত হয় না।

নিকটবর্তী শ্রেণীসমূহে কখনও কখনও যৌনমিলন হইয়া থাকে। একই শ্রেণীর বিভিন্ন গোত্রের ত কথাই নাই। নানারকম পায়রা, মুরগী, নানাদেশীয় বা নানা রংএর ঘোড়া, এমন কি ঘোড়া ও গাধা, ষাঁড় ও ঘোটকী, ঘোড়া ও গরু, হাঁস ও মুরগী ইত্যাদির যৌনমিলন কখনও কখনও হইতে দেখা যায়। মানুষও পশু দিয়া যৌনলালসা চরিতার্থ করে। প্রায়ই স্বাভাবিক ও স্বশ্রেণীর যৌন-সাহচর্যের অভাবেই এইরূপ হয়।

বলা বাহুল্য, ঘোড়া ও গরু, ষাঁড় ও ঘোটকী, হাঁস ও মুরগী অথবা মানুষ ও ইতর জন্তুর মিলনে সন্তানোৎপাদন হয় না। **স্ত্রীলোক ইতরজীবের দ্বারা গর্ভবতী** হইয়াছে এই রকম ভুল ধারণা অনেক জায়গায় রহিয়া গিয়াছে।

ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির বিষয়ে প্রাচীন কালের ধারণা

আশ্চর্য এবং কৌতুহলপ্রদ বিষয় এই যে, সর্বাংশে সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও, প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতেরা গর্ভে ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন।

বৈদ্যক মতে, "ঋতু হওয়ার পর যোনিক্ষেত্র পদ্মের ন্যায় বিকশিত হয়; ঐ সময়েই শোণিতবিশিষ্ট গর্ভাশয় বীর্য ধারণ করিয়া থাকে; অন্য সময়ে যোনিক্ষেত্র মুকুলিত থাকে। কিন্তু ঋতু-সময়েও উহা বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাতে আবৃত থাকিলে যদি বিকশিত না হয় তাহা হইলে গর্ভও হয় না। ঋতুকাল উপস্থিত হইলে যদি অবিকৃত বীর্য নিষিক্ত হয়, তবেই উহা বায়ু গতিতে চালিত হইয়া স্ত্রীশোণিতের সহিত মিলিত হয়। ঐ সময়েই নিষিক্ত বীর্যে করণ-সংবৃত জীব আসিয়া সম্পৃক্ত হয়। একদিন পরে উহাতে কলল জন্মে। পাঁচ রাত্রিতে সেই কলল বুদ্বুদাকৃতি ধারণ করে। ঐ বীর্য শোণিতময় বুদ্বুদে, সাত রাত্রিতে মাংশপেশী ও দুই সপ্তাহ পরে রক্তমাংসে ব্যাপৃত হইয়া দৃঢ়, পঞ্চবিংশতি রাত্রিতে পেশী বীজ অঙ্কুরিত এবং এক মাসের সময় পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার এক ভাগে কণ্ঠ, গ্রীবা ও মস্তক, দ্বিতীয় ভাগে পৃষ্ঠ, বক্ষ ও উদর, তৃতীয় ভাগে পাদদ্বয়, চতুর্থ ভাগে হস্তদ্বয়, পঞ্চমভাগে পার্শ্ব ও কটি। পরে দুই মাস হইলে ক্রমে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে থাকে। তিন মাসে সর্বাঙ্গের সন্ধিস্থান সকল উৎপন্ন হয়।"...ইত্যাদি ইত্যাদি; এই সমস্ত তথ্য এখন ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে। আধুনিক মত পরে আলোচনা করিতেছি।

কিছুদিন পূর্বে এমন কি বৈজ্ঞানিকেরাও মনে করিতেন যে, ডিম্ব অথবা পুরুষাঙ্কুর পূর্ণাবয়ব অথচ অতি ক্ষুদ্র মানুষ। ইহাকে Preformation মতবাদ বলা হইত। বড় ঘড়ি এবং ছোট ঘড়িতে যেমন একই রকম কলকব্জা রহিয়াছে, (তবে ছোটটিতে ক্ষুদ্রাকারে) তেমনই যেন পূর্ণাঙ্গ মানুষটিকে চাপিয়া পিষিয়া অতি ক্ষুদ্র ডিম্ব বা পুরুষাঙ্কুরে পরিণত করা হইয়াছে। এই মতে, তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র মানুষেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিণতবয়স্ক মানুষের আকার ধারণ করে। এই মতবাদও এখন অচল হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য নবজাত শিশু ও যুবকের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান; ঐ শিশুরই ক্ষুদ্র ও দুর্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যুবকের বড় ও শক্তিশালী অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত হয়। কিন্তু **প্রাণবন্ত ডিম্বের আকারের সহিত পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ শিশুর আকারের প্রত্যক্ষ কোন সামঞ্জস্য নাই।** ঐ একটি কোষই বহুকোষে বিভক্ত হইয়া আপনা আপনি সুসংবদ্ধ হইয়া পূর্ণাবয়ব শিশু গড়িয়া তোলে।

আধুনিক তথ্যসমূহ

পূর্বোক্ত মোটামুটি ধারণার স্থলে পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আরও সঠিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। আমরা এখন ঐ সকল উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে গর্ভাধানের পর্যায় কি করিয়া আরম্ভ হয় তাহা বলা হইয়াছে।

কোষ-বিভক্তি প্রক্রিয়া

শুক্রকীট ও ডিম্ব একত্রে মিলিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ডিম্বটি বহিরাবণের মধ্যেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ দুইভাগ চারিভাগে, চারিভাগ

(২৯ নং চিত্র)
বহিরাবরণের ভিতর
ডিম্বের বিভাজন।

ষোল ভাগে এবং এইভাবে (গুণখড়ি বিভাগক্রমে) ডিম্বটি অসংখ্য ভাগে পরিণত হয়। এইভাবে উপরের চিত্রে প্রদর্শিত মতে বিভক্ত হইতে হইতে ডিম্বটি ডিম্ববাহী নলের মধ্য দিয়া প্রায় এক সপ্তাহকালের মধ্যে জরায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ে। ততদিনে ইহা শত শত কোষের সমষ্টিগত একটি ক্ষুদ্র পিণ্ডের মত হইয়া পড়ে। শুধু ইহা বহুধা বিভক্তই হয় না; ইহার কোষগুলি আপনা আপনিই বিন্যস্ত হইয়া (পরবর্তী চিত্রে প্রদর্শিত মতে) একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে।

জরায়ুর মধ্যে আসিয়া ইহা জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হইয়া যায় এবং ইহার কোষগুলি বিভিন্ন কোষবিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ভ্রূণটি মানবদেহে পরিণত হয়।

ভ্রূণের বাসা বাঁধা, বৃদ্ধি এবং গর্ভফুল সৃষ্টি

ডিম্ববাহী নল হইতে জরায়ুর মধ্যে আসিয়া প্রাণবন্ত (fertilised) ডিম্ব বা আদি ভ্রূণ (zygote) তাহার ভিতরের গাত্রে (অণ্ডটি ডিম্বাশয় হইতে নির্গত হইবার পূর্বে যে স্থানে ছিল সেখানে) সৃষ্ট পীত বস্তু কর্প্যাস লুটিয়ম (Corpus

luteum) হইতে নিঃসৃত হরমোন—প্রজেসটেরণের (progesterone) —প্রভাবে বর্ধিত আস্তরের মধ্যে গর্ত করিয়া অবস্থান (Nidation) এবং বর্ধিত হইতে থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ৩২ হইতে ৩৪ নং চিত্রে জরায়ুগহ্বরে গর্ত করিয়া ভ্রূণের অবস্থান এবং ক্রমশ উহার বর্ধনের প্রতিকৃতি দেখানো হইয়াছে।
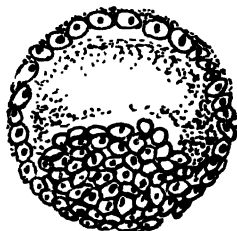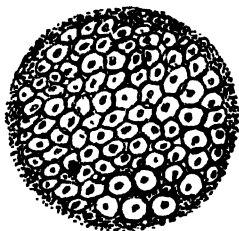
(৩০ নং চিত্র)
কোষসমূহ আপনা আপনি বিন্যস্ত হইতেছে।

ক্রমশ ইহা কোষ সমষ্টির পিণ্ডের (বলের) আকার ধারণ করে। এই পিণ্ডের ভিতরের দিকের কতকগুলি কোষ হইতে ভ্রূণের শরীর নির্মিত হয়। উপরের দিকের কোষগুলি ভিতরের কোষগুলিকে রক্ষা করে, এবং উপরের কোষগুলি হইতে অঙ্গুলির মত বস্তু নিচয় বাহির হইয়া মাতার রক্তবাহগুলি (blood vessel) হইতে পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়া শেষোক্ত কোষ গুলিকে সরবরাহ করে এবং এই নিম্নের কোষগুলি হইতে ভ্রূণে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদান টানিয়া লয়। বৃক্ষের মূলগুলি যেরূপ মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার পুষ্টি সাধন করে। তৃতীয় মাসে এই অঙ্গুলি সদৃশ বস্তু অধিক পরিমাণে একত্রীভূত হয় এই ভাবে গর্ভফুল (placenta) সৃষ্ট হয়। ভ্রূণ এবং ফুলকে সংযোগকারী অংশটি ভ্রূণের নাভির সহিত যুক্ত থাকে এবং ক্রমশ দীর্ঘ হয়। সন্তান প্রসবের প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে ফুল জরায়ু মধ্য হইতে খসিয়া পড়ে। তখন জরায়ুর ভিতরের রক্ত বাহগুলির মুখ উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে
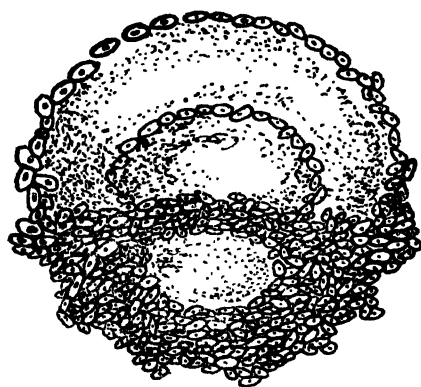
(৩১ নং চিত্র)
কোষসমূহ ক্রমশ আপনা আপনি বিন্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

বলিয়া সেই সময়ে বাহির হইতে রোগ বীজাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা অধিক। সেই জন্যই এই সময়ে সর্বাপেক্ষা বেশী সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।
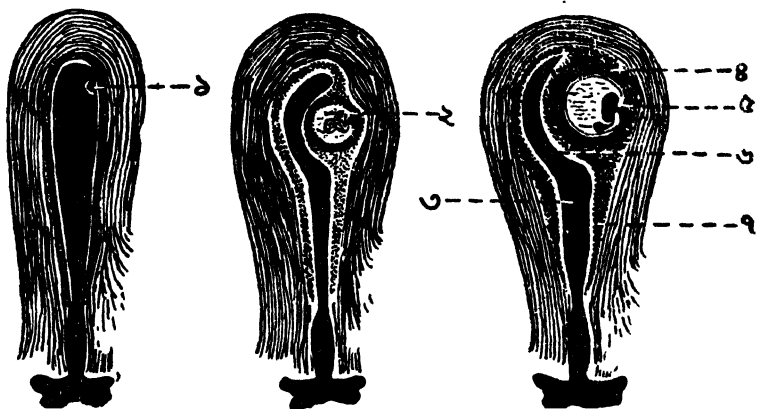
(৩২—৩৪ নং চিত্র)

১। পানমুচি, ২। জরায়ুগহ্বর, ৩। কোরিয়নিক ভিলাই, ৪। ডেসিডুয়া বেসালিস, ৫। ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস, ৬। ডেসিডুয়া ভেরা।

বিভিন্ন জীবের গর্ভকাল

বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন কাল গর্ভধারণ করিয়া থাকে। সাধারণত মানব শিশু ২৮০ দিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। অবশ্য এই সময়ের ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভধারণ কাল দেওয়া হইল :——

জীবের নাম	গর্ভকাল (দিন)	জীবের নাম	গর্ভকাল (দিন)
ইঁদুর	২২	ছাগল	১৫১
খরগোস	৩০	বানর	১৬৪
গিনিপিগ	৬২	**মানুষ**	**২৮০**
বিড়াল	৬৩	গরু	২৮৩
কুকুর	৬৩	ঘোড়া	৩৪৬
সিংহ	১১০	উট	৩৯৫
ভেড়া	১৫০	হস্তী	৬০০

সাধারণত প্রাণীর দেহের আকার এবং বুদ্ধিবৃত্তির উপরই গর্ভকাল নির্ভর করে। মানুষ, বানর, হস্তী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান জীবের স্নায়বিক গঠন অন্যান্য প্রাণীর গঠন অপেক্ষা জটিলতাপূর্ণ।

মানব ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি

গর্ভাধানের **দ্বিতীয় সপ্তাহেই** ভ্রূণের আকৃতি সিকি ইঞ্চি লম্বা হয়। **তৃতীয় সপ্তাহের** শেষভাগে ভ্রূণের চক্ষু, মস্তিষ্ক ও কর্ণের আকৃতি গঠিত হইতে আরম্ভ করে ; এই সময়ে ভ্রূণের আবরক ঝিল্লীরও সৃষ্টি হয়। চতুর্থ সপ্তাহের শেষভাগে ভ্রূণের মুখ ও গুহ্যদ্বার গঠিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যায়।

৩৫ নং চিত্র ভ্রূণাবস্থায় নানাপ্রকার জীবজন্তুর সাদৃশ্য।

প্রথম মাসেই ভ্রূণের চক্ষু, কর্ণ ও মুখের প্রাথমিক আকৃতি উপলব্ধি করা যায়। ভ্রূণের মেরুদণ্ডই প্রথম গঠিত হয়। গর্ভাধানের পর ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ দিবসে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট ভ্রূণের অস্তিত্ব বুঝা যায়। আর কয়েকদিনের মধ্যে হৃৎপিণ্ড গঠিত হইতে থাকে।

এতদিন-পর্যন্ত খুব দ্রুত গতিতে ভ্রূণের বৃদ্ধি হয় নাই। এখন হইতে উহার বৃদ্ধি আরও দ্রুততরভাবে হইতে থাকে।

নানারকম জীবজন্তু ভ্রূণাবস্থায় কত সদৃশ বোধ হয় তাহা উপরের চিত্রে দেখানো হইয়াছে। **প্রথমাবস্থায় সাদৃশ্য** বেশী থাকে ; তাহার পর ক্রমে উহারা নিজস্ব আকার ধারণ করে।

দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের আকৃতি মুরগীর ডিমের আকৃতির সমান হয়। নাসিকা স্বাভাবিক গঠন প্রাপ্ত হয় এবং অধর ও কণ্ঠাস্থি গঠিত হইতে আরম্ভ করে। লেজ বাহির হয় কিন্তু উহা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লুপ্ত হয়। ভ্রূণের চোখ,

কান, নাক, মুখ এই সময় গঠিত হইতে থাকে এবং আঙুল ও আঙুলের অগ্রভাগও দেখা দেয়। যদিও এই সময় ভ্রূণের লিঙ্গের বাহ্য আকৃতি অনেকটা গড়িয়া ওঠে তথাপি উহা নিরূপণ করা যায় না। ভ্রূণের দৈর্ঘ্য তখন এক হইতে দেড় ইঞ্চি মাত্র।

তৃতীয় মাসের শেষভাগে ভ্রূণ পৌনে তিন হইতে সওয়া তিন ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ওজনে প্রায় দেড় ছটাক হয়। **এই মাসে গর্ভফুল গঠিত হয়।**
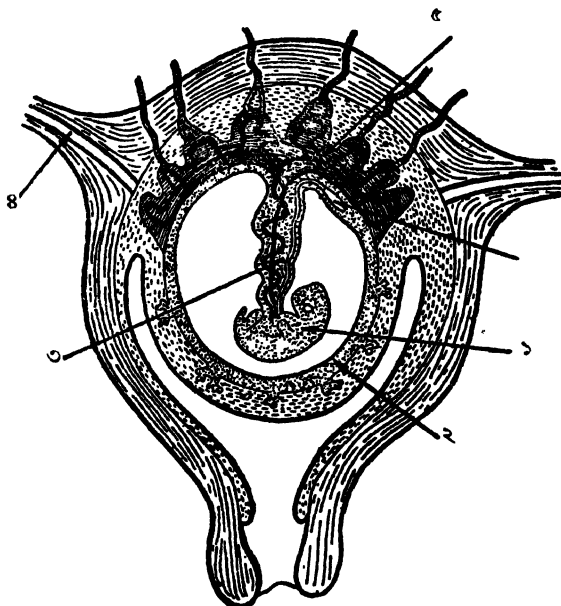
(৩৬ নং চিত্র) [জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের অবস্থান] (ওয়েলস্ অবলম্বনে)

১। ভ্রূণ, ২। ডিম্ব-কুসুমের থলি, ৩। নাভিরজ্জু, ৪। ডিম্ববাহী নল, ৫। গর্ভ-ফুল।

নখাদি অস্থিও এই মাসেই গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময় ভ্রূণের লিঙ্গ ভেদ দৃষ্ট হয় না তবে ভিতরের যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া লিঙ্গ নিরূপণ করা যায়। ভ্রূণ জরায়ুর গাত্রে লাগিয়া থাকে না; ফুলের সহিত নাভিরজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে। নীচের ছবি হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

মাতৃগর্ভে জীবন্ত শিশু আলো বাতাসের সংস্পর্শে না আসিয়াও কি ভাবে বাঁচিয়া থাকে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। প্রকৃতির কি সুন্দর ব্যবস্থা।

জরায়ু-গাত্রে প্রাণবন্ত ডিম্ব প্রোথিত হইবামাত্র ডিম্বের চারি দিকে দুইটি পর্দার স্তর সৃষ্টি হয়। বহির্ভাগের পর্দার স্তর ডিম্বটিকে জরায়ু-গাত্রে সংলগ্ন

করিয়া রাখে, যেন উহা স্থানচ্যুত না হইয়া যায়। অভ্যন্তর ভাগের পর্দার স্তর (কোরিয়ন Chorion) জলীয় পদার্থে (এ্যাম্‌নিওটিক ফ্লুইড Amniotic fluld) পরিপূর্ণ হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণ একটি সাবমেরিণের মত উহার মধ্যে ভাসিতে থাকে—জলীয় পদার্থ ভ্রূণটিকে এই ভাবে রক্ষা করে যেন গর্ভিণীর চলাফেরা বা নড়াচড়ার সময় বা অন্য কোনও কারণে ঝাঁকানি লাগিয়া উহার কোনও অনিষ্ট না হয়।

এই দুইটি পর্দার স্তর ছাড়া ভ্রূণটিকে খাদ্য, জল এবং বায়ু সরবরাহ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য **ফুল** (Placenta) জন্মে। কতকগুলি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া একটি থালার বা ছাতার আকারে পরিণত হয় এবং জরায়ুর ভিতরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই সব রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি গর্ভিণী এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বয়স্ক লোকের প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ুস্থিত অক্সিজেন ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া রক্ত শোধিত হয়। কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণের ফুস্‌ফুসের কোনও ক্রিয়া হয় না। ফুলের সাহায্যে গর্ভিণীর রক্ত-কণায় অবস্থিত অক্সিজেন ভ্রূণের রক্তে সঞ্চালিত হয়। ফুল মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ-সঞ্চারেও সাহায্য করে। ফুলের সহিত ভ্রূণ নাভিরজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে।

মাতা ও ভ্রূণের সম্পর্ক

মাতা এবং ভ্রূণের মধ্যে স্নায়বিক কোনও সম্পর্ক নাই। ভ্রূণ যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন ভ্রূণের পরিপুষ্টি, উহার আর্দ্রতা রক্ষা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চালাইবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য তাহার চারিদিকে ভ্রূণ-ঝিল্লী ঘিরিয়া থাকে।

কিন্তু যদিও মাতার গর্ভাশয় এবং ভ্রূণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং উভয়ের রক্তের মধ্যে গ্যাসজাতীয় ও অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থের বিনিময় ঘটিয়া থাকে তথাপি এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ভ্রূণের রক্তবাহী নলের মধ্য দিয়া মাতার রক্ত প্রবাহিত হয় না। অনেকের ধারণা মাতা ও ভ্রূণের মধ্যে এই ভাবে রক্তের আদান প্রদান হয় ফলে মাতার মানসিক ভাবগতি ভ্রূণের নানারূপ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। কিন্তু বাস্তবে এরূপ ব্যাপার ঘটে না।

কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন প্রাকৃতিক নিয়মে জরায়ু হইতে ফুল বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্গত হইয়া যায়।

চতুর্থ মাসের শেষে ভ্রূণ পাঁচ হইতে সাত ইঞ্চি লম্বা হয়। এই সময় ভ্রূণের মস্তকের আয়তনই সমস্ত শরীরের চারিভাগের একভাগ থাকে। এই মাসে ভ্রূণের মস্তকে এবং আরও দুই এক স্থানে লোম গজাইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে নাক, মুখ এবং লিঙ্গ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভ্রূণ এই মাস হইতেই অঙ্গচালনা আরম্ভ করে। উহা স্পষ্টত মানুষের আকার ধারণ করে; ওজন গড়পড়তা ২॥০ ছটাক (৫ আউন্স) হয়।

পঞ্চম মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি এবং ওজন ৪।৫ ছটাক (৮ হইতে ১০ আউন্স) হইয়া থাকে। এই সময় ভ্রূণের সমস্ত দেহ পিঙ্গলবর্ণ লোমে আবৃত হয় এবং ভ্রূণের গাত্রে পনিরের ন্যায় একপ্রকার সাদা পিচ্ছিল পদার্থ সৃষ্ট হয়। ইহা শেষ পর্যন্তই ভ্রূণের গায়ে বিদ্যমান

৩৭ নং চিত্র—ফুলের জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন দিক (প্রসব-বিজ্ঞান অবলম্বনে)

থাকে এবং প্রসব-কার্যের সহায়তা করে। গর্ভিণী এই সময় সন্তানের অঙ্গ-চালনা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম খুব সামান্য ভাবে নড়ে, মনে হয় যেন পেটের বায়ু। মনোযোগ দিলে বুঝা যায়।

ষষ্ঠ মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য বারো ইঞ্চি ও ওজন প্রায় এক সের হইয়া থাকে। এই সময়ে চক্ষের ভ্রূ ও পাতা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, মাথার চুল লম্বা হয়। সে নাভি অবধি উঠে (২৭ নং চিত্র)।

সপ্তম মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য চৌদ্দ হইতে সতেরো ইঞ্চি এবং ওজন ১।।০ হইতে ২।।০ সের (তিন হইতে পাঁচ পাউণ্ড) হইয়া থাকে। এই সময়ে ভ্রূণের মধ্যে মানবাকৃতির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্যক্‌রূপে গঠিত হয় এবং ভ্রূণের চক্ষু খোলে। অনেক বিশেষজ্ঞের মত এই যে, সাবধানতার সহিত প্রতিপালন করিলে সপ্তম মাসে প্রসূত সন্তানকেও বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে।
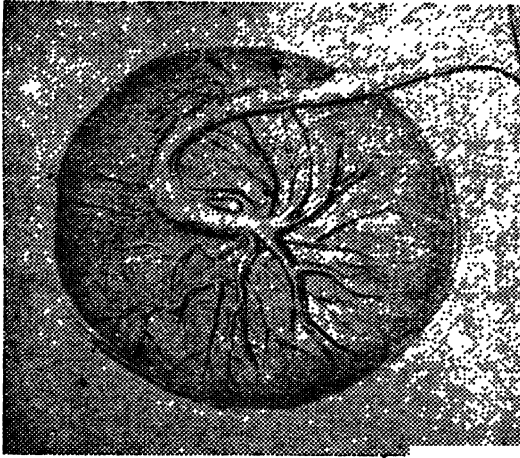
৩৮ নং চিত্র—ভ্রূণের দিকে ফুলের প্রতিকৃতি। নাভিরজ্জু ইহার সহিত সংলগ্ন থাকে।

অষ্টম মাসে ভ্রূণ দৈর্ঘ্যে প্রায় সতেরো ইঞ্চি ও ওজনে সওয়া দুই সের (সাড়ে চারি পাউণ্ড) হইয়া থাকে এবং গায়ের লোম লোপ পাইতে থাকে।

নবম মাসে ভ্রূণ প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় পৌনে তিন সের (সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড) ভারী হইয়া থাকে। এই সময় গর্ভিণীর পাঁজরের নিচের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছায় (২৭ নং চিত্র)।

দশম মাসে ভ্রূণের গঠন সম্পূর্ণ হয়। এই সময় উহার ওজন গড়ে সাড়ে তিন সের (সাত পাউণ্ড) ও দৈর্ঘ্যে কুড়ি ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ পূর্বে সন্তান বস্তিকোটরে নামিয়া আইসে, এই জন্য গর্ভিণী বেশ আরাম বোধ করে। সাধারণত **এই মাসের দশম দিনের কাছাকাছি প্রসব বেদনা** উপস্থিত হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

অনেকের ভুল ধারণা আছে, যে, গর্ভিণীর খোরাক কমাইয়া দিলেই সন্তান পরিপুষ্টির অভাবে আকারে ছোট হয় এবং প্রসবকার্য খুব সহজে সম্পন্ন হয়। এ কথা যে ঠিক নহে তাহা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদির প্রকোপের সময়কার হিসাব দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯১৭ সালে সেণ্ট টমাস এবং অন্যান্য হাঁসপাতালে প্রসূত বহু সহস্র শিশুর ওজন যুদ্ধের পূর্বেকার শিশুদের ওজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, যুদ্ধকালে গর্ভিণীদের অপেক্ষাকৃত অল্প খোরাক পাওয়া সত্ত্বেও এবং বহু গর্ভিণীর শরীর অপরিপুষ্ট থাকিলেও সন্তানের ওজনে বিশেষ তারতম্য হয় নাই। ভ্রূণ মাতার শরীর হইতে নিজের পরিপোষকের যোগ্য সারবস্তু লইয়াই লয়।

১৯ নং চিত্র
ভ্রূণের
ক্রমবৃদ্ধি

গর্ভে সন্তানের অবস্থান—গর্ভের গোড়ার দিকে ভ্রূণ ছোট থাকায় তাহার অবস্থান ক্রমাগতই বদলায়, এবং তখন বেশী জায়গা পাওয়ায় ভ্রূণ ডিগবাজীও খাইতে পারে। সম্ভবত এই সময়েই, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার গলায় নাড়ী জড়াইয়া বা ফাঁস লাগিয়া যায়। ভ্রূণ ক্রমশ যত বড় হয় তাহার নড়াচড়ার জায়গা ততই কমিয়া যায়। সেই জন্যই শেষ মাসে ভ্রূণ কদাচিৎ ডিগবাজী খায়। প্রসবের এক হইতে দেড় মাস পূর্বে ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইবার উপযুক্ত অবস্থানে আসে। অর্থাৎ তাহার মাথা নীচের দিকে, জরায়ুর গলার কাছাকাছি আসে। কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে অর্থাৎ মাথা উপরে ও পাছা নীচে করিয়া থাকে। এভাবে থাকিলে প্রসব করানো শক্ত হয় ও তাহাতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। এই জন্য প্রসবের **৫ সপ্তাহ পূর্বে পাশ করা** ডাক্তার, নার্স অথবা ধাত্রীকে **অবশ্যই** পেট দেখাইতে হয়। সন্তানের অবস্থানে যদি কোন গণ্ডগোল থাকে তবে দক্ষ ডাক্তার প্রভৃতি সহজেই সন্তানের অবস্থান ঘুরাইয়া ঠিক করিতে পারেন।

প্রসব (Labour)

পূর্বেকার নানা পদ্ধতি

গর্ভে সন্তান থাকিলে এবং না থাকিলে স্ত্রীলোকের আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়-সমূহের পারস্পরিক অবস্থিতির তুলনামূলক প্রতিকৃতি নীচের চিত্র দুইটিতে দেওয়া হইয়াছে।

৪০ নং চিত্র

গর্ভে সন্তান নাই
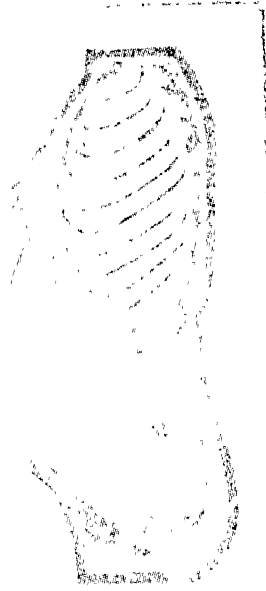
৪১ নং চিত্র

গর্ভে পূর্ণাঙ্গ সন্তান

চিত্র দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সন্তান জরায়ুর মধ্যেই একেবারে পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়। গাভণীর তলপেটের আকার দেখিলে বুঝা যায় যে, সন্তান আকারে একেবারে ক্ষুদ্র থাকে না। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে প্রসবপথের সঙ্কীর্ণতার কথা চিন্তা করিয়া উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক।

প্রসব সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হওয়ার পূর্বে এবং ঐ জ্ঞানের অভাবে অনুন্নত মানব সমাজে নানা রকম উদ্ভট উপায়ের প্রচলনের কথা শোনা যায়। অনেকটা হেঁচড়া-হেঁচড়ি, টানা-টানি না করিলে অত বড় সন্তান অত ক্ষুদ্র প্রসবপথ

৪২ নং চিত্র

৪৩ নং চিত্র

দিয়া বাহির হইয়া আসিবে না এই ধারণাই ঐ সকল উপায়ের কারণ। এই সকল ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া **আফ্রিকার** কোনও কোনও জায়গার
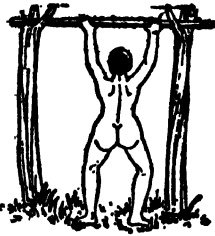
৪৪ নং চিত্র

৪৫ নং চিত্র

গর্ভিণীরা কাঠের উপর বসিয়া সম্মুখে দুইটি ডাল বা কাঠ সামান্তরালে রাখিয়া দুই হাত ও দুই পা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কুন্থন দিয়া থাকে (৪২ নং চিত্র)।

৪৬ নং চিত্র

৪৭ নং

আবার কোন কোন জায়গায় অপর একটি নারী গর্ভিণীর পিছনে পিছন দিয়া বসিয়া হাতে হাত জড়াইয়া টানাটানি করিতে থাকে (চিত্র নং ৪৩)। বঙ্গোর (Bongo) নিগ্রো গর্ভিণীরা একটি বাঁশ বা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া

পড়ে (চিত্র নং ৪৪)। **আনাম** দেশে গর্ভিণীর দুই বাহুর নীচ দিয়া রজ্জু বাঁধিয়া ডালের উপর দিয়া ঐ রজ্জু টানিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের উহার পেটের উপর জড়াইয়া ধরিয়া নীচের দিকে চাপিবার প্রথা আছে (চিত্র নং ৪৫)। **নীল নদের উপত্যকায়** গর্ভিণীকে দুইটি কাঠ বা বাঁশ ধরিয়া পা সামনে বাধাইয়া থাকিতে হয়, উহার পেটে কাপড়ের পেটি লাগাইয়া অপর একটি লোক ঐ পেটি ধরিয়া পিছন হইতে গর্ভিণীর কোমরে পা বাধাইয়া শুইয়া পড়িয়া টানিতে থাকে (চিত্র নং ৪৬)। **পারস্য** দেশে গর্ভিণীরা দুই সারি ইঁটের উপর দুই পা ও দুই হাত ছড়াইয়া উপুড় হইয়া কুন্থন দিতে থাকে (চিত্র নং ৪৭); কোথায়ও গর্ভিণী উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া অপর নারীর প্রচাপের সাহায্য লয় (চিত্র নং ৪৮)। **জার্মানীতে** মধ্যযুগে আবার প্রসব করাইবার উপযোগী চেয়ার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হইত।

৪৮ নং চিত্র

সকল প্রকার টানা-টানি হেঁচড়া-হেঁচড়ির ব্যবস্থাই অজ্ঞতা-প্রসূত অনিষ্টকর এমন কি, মারাত্মক। প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণেই প্রসব যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া ও প্রচাপ বৃদ্ধি পায় ফলে প্রসবপথ ঢিলা হইয়া প্রসব কার্য সম্পন্ন হয়। মানুষের কেবল প্রকৃতির সহায়তা করিয়া যাওয়াই উচিত।

আমরা এইবার প্রসব ক্রিয়ার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিতেছি।

প্রসব

জরায়ু সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেই সন্তান বাহির হইয়া আসে। দশম মাসেই সাধারণত জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। সন্তান পুষ্ট ও উপযুক্ত হইলে মস্তক মধ্যস্থ পিটুইটারি গ্রন্থির কতকগুলি হরমোন উত্তেজনার সৃষ্টি করে ও জরায়ুর মাংসপেশীসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রসব বেদনা আনে।

প্রসব-ক্রিয়াটিকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম স্তরে জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হয়। জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার ফলেই ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে সন্তান বাহির হইয়া আসিতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরে সন্তানের বহিরাগমন। এই স্তরে সন্তান জননীর গর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে; কিন্তু তাহার নাভিরজ্জু জননীর উদরাভ্যন্তরস্থ ফুলের সহিত সংযোজিত থাকে।

তৃতীয় স্তরে জরায়ুর ভিতর হইতে নাড়ীর মূল উৎপাটিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। নাড়ী-মূলকে সাধারণ কথায় 'ফুল' বলে। সম্পূর্ণ নাভিরজ্জু ও অন্যান্য ঝিল্লীসমেত ফুল, বাহির হইয়া আসে। 'ফুল পড়া' সমাপ্ত হইলেই প্রসূতি ও সন্তানের মধ্যে সম্পূর্ণ বিযুক্তি সাধিত হয়।

এই তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরে **ছয় হইতে চব্বিশ** ঘণ্টা, দ্বিতীয় স্তরে **১০ মিনিট হইতে দুই ঘণ্টা** এবং তৃতীয় স্তরে **১৫ মিনিট** হইতে **আধ ঘণ্টা** পর্যন্ত সময় লাগিতে পারে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রসব সম্বন্ধে কুসংস্কারাদি

প্রসব সম্বন্ধে কুসংস্কারের অবধি নাই। প্রসূতিকে অপবিত্র এবং তাহার সংস্পর্শ দূষণীয় মনে করা হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাহার জন্য বাড়ীর এককোণে বা উঠানে ভিন্ন ঘর তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়। প্রসবের পরে বহুবিধ সংস্কারাদি পালন করিয়া তবে প্রসূতিকে আবার বাড়ীর অন্য সকলের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে দেওয়া হয়। কোনও কোনও জাতির মধ্যে স্বামীকে প্রসূতির নিকটে যাইতে দেওয়া হয় না; উহাতে নাকি তাহার শক্তি হ্রাস হয়। ইওরোপেও বহু জায়গায় প্রসূতির সংস্পর্শকে অনিষ্টকর মনে করা হইয়া থাকে। রাশ্যা এবং প্রসূতিকে এমন কি কূপ বা নালার নিকট যাইতে দেওয়া হইত না; ইহাতে নাকি উহা শুকাইয়া যাইত।

খাওয়া পরার বিষয়েও অনেক অনাবশ্যক বিধি-নিষেধের আড়ম্বর আছে, যথা, বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ডিম খাওয়া বারণ।

ভূত, প্রেত, জিন, পরী ইত্যাদির হাত হইতে প্রসূতিকে রক্ষা করিবার অনেক বিধি-ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তাবিজ, কবচের ছড়াছড়ির অন্ত থাকে না। পূর্বে রাশ্যায় প্রসবের দিন গোপন রাখা হইত; কারণ যত বেশী লোকে এ কথা জানিবে প্রসূতি নাকি তত বেশী কষ্ট পাইবে।

এখানে Couvade নামে একটি কৌতূহলপ্রদ প্রথার উল্লেখ করা যায়।

এই প্রথায় স্বামী স্ত্রীর প্রসবকালে শয্যায় শুইয়া পড়ে এবং প্রসববেদনা অনুভব করিতেছে এইরূপ ভান করে। আত্মীয়-স্বজন উহাকে শুশ্রূষা করে এবং এমন কি বেচারী প্রসূতিকেও স্বামীর পরিচর্যা করিতে হয়। অনেকে মনে

করেন ভূত, পিশাচকে ঠকাইয়া প্রসূতির নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আজো (বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে) প্রসব সম্বন্ধে নানা-রকম ভয়, ভীতি এবং সঙ্কোচ রহিয়া গিয়াছে। ভূত, প্রেত সম্বন্ধেও আমাদের নারীরা ভীতিমুক্ত নয়। **নারীকে** এই সকল **অমূলক ভীতি** ও **কুসংস্কার** হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রসব প্রাকৃতিক ব্যাপার। ইহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। স্বাস্থ্যের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা ছাড়া অহেতুক সংস্কারাদির কোনই আবশ্যকতা নাই। **ভূত, প্রেত ইত্যাদি প্রসূতির কোন ক্ষতি করিতে পারে না** এবং **উহাদের** কোন **অস্তিত্বই** নাই। ইহারা শুধু আমাদের কল্পনাতেই আছে।

প্রসবের সময় নির্ধারণ

পূর্বাহ্ণে প্রসবের সম্ভাব্য দিন জানার সুবিধা—বাড়ীতে প্রসব হইবার ব্যবস্থা করিলে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, ধাত্রী, আঁতুড়ের ঝি প্রভৃতি ঠিক করিতে পারা যায়। যদি কোনও হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে দেওয়া স্থির হয় তবে সেখানকার ডাক্তার প্রভৃতির সহিত কথা বলিয়া এবং কামরা বা বিছানা রিজার্ভ করার ব্যবস্থা থাকিলে, তাহা করিয়া রাখা যায়। হাসপাতাল ও বাড়ী এই দুইটির সুবিধা ও অসুবিধা একটু পরেই 'হাসপাতালে অথবা বাড়ীতে' অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

কোন্ তারিখে কখন প্রসব হইবে, তাহা সঠিক নির্ধারণ করা খুব কঠিন হইলেও এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি অনুমান করা যাইতে পারে। সাধারণত এই অনুমান ঠিকও হইয়া থাকে।

ভ্রূণ সাধারণত শেষ ঋতু আরম্ভের পর প্রায় ২৮০ দিন, অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিন, গর্ভে থাকে। যে ঋতুস্রাবের পরে গর্ভ হয়, **সেই ঋতুস্রাবের প্রথম দিন হইতে** ২৮০ দিন হিসাব করিয়া যেদিন পাওয়া যাইবে, সাধারণত সেইদিনই প্রসব হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ডাঃ স্মিথের গণনা-প্রণালীই সাধারণত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সেজন্য আমরা নিম্নে ডাঃ স্মিথের গণনা-প্রণালী উদ্ধৃত করিলাম। অন্যান্য গণনা-প্রণালী অপেক্ষাকৃত জটিল।

১লা জানুঃ শেষ	ঋতুস্রাব	আরম্ভ	হইলে		৮ই	অক্টোবর	প্রসব	হইবে
১লা ফেব্রুয়ারী	„	„	„	„	৮ই	নভেম্বর	„	„
১লা মার্চ	„	„	„	„	৬ই	ডিসেম্বর	„	„
১লা এপ্রিল	„	„	„	„	৬ই	জানুয়ারী	„	„
১লা মে	„	„	„	„	৫ই	ফেব্রুয়ারী	„	„
১লা জুন	„	„	„	„	৮ই	মার্চ	„	„
১লা জুলাই	„	„	„	„	৭ই	এপ্রিল	„	„
১লা আগষ্ট	„	„	„	„	৮ই	মে	„	„
১লা সেপ্টেম্বর	„	„	„	„	৯ই	জুন	„	„
১লা অক্টোবর	„	„	„	„	৮ই	জুলাই	„	„
১লা নভেম্বর	„	„	„	„	৮ই	আগষ্ট	„	„
১লা ডিসেম্বর	„	„	„	„	৭ই	সেপ্টেম্বর	„	„

(১) শেষ ঋতুস্রাবের প্রথম দিন হইতে ২৮০ দিন পরে যে দিন পাওয়া যাইবে সেই দিনের আগের ৭ দিন ও পরের ৭ দিন ধরিয়া যে ১৫ দিন তাহার মধ্যেই সাধারণত প্রসব হইয়া থাকে।

উদাহরণ—শেষ ঋতুস্রাবের প্রথম দিন যদি ১১ই আগষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ তারিখ হইতে ২৮০ দিন পরে (আগষ্ট মাসের ৩১—২০=২১ দিন+পরবর্তী মাসগুলির ৩০+৩১+৩০+৩১+২৮+৩১+৩০+মে মাসের ১৭ দিন=২৮০ দিন) ১৮ই মে, তাহা হইলে ১৮ই মে'র কাছাকাছি সময়ে সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। ইহার পূর্বের ও পরের এক সপ্তাহের মধ্যে, অর্থাৎ ১১ই মে হইতে ২৫শে মে'র মধ্যেই প্রসব হইবে।

(২) পূর্বের নকশায় শেষ ঋতু আরম্ভের তারিখ কোনও মাসের ১লা হইলে কোন্ তারিখ প্রসবের সম্ভাব্য দিন তাহাই দেওয়া হইয়াছে। ঋতুস্রাব আরম্ভের দিন মাসের অন্য কোনও তারিখে হইলে ১লা হইতে সেই তারিখ যে কয়দিন পরে সেই কয়দিন দ্বিতীয় কলমে যে তারিখ দেওয়া আছে তাহার সহিত যোগ করিলেই প্রসবের দিন পাওয়া যাইবে। **উদাহরণ**—(ক) ধরা যাক কোন গর্ভিণীর শেষ ঋতুস্রাব ৮ই জুন আরম্ভ হইয়াছিল, ১লা জুনের ৭দিন পরে ৮ই জুন অতএব দ্বিতীয় কলমের ৮ই মার্চের সহিত ৭দিন যোগ করিলে ১৫ই মার্চ হয়। উহাই প্রসবের সম্ভাব্য দিন। (খ) ২৫শে সেপ্টেম্বর ঋতু আরম্ভের দিন হইলে ৯ই জুন+২৪=৩৩শে জুন অর্থাৎ ৩রা জুলাই প্রসবের সম্ভাব্য দিন।

(৩) ইংরাজী মাসের দিনগুলি নির্দিষ্ট থাকায় এরূপ গণনায় সুবিধা আছে, বাংলা মাসে সেরূপ সুবিধা নাই। অথচ আমাদের দেশে অধিকাংশ রমণীই, এমন কি অনেক শিক্ষিত ঘরেও, মাসিকের দিন বাংলা মাস অনুযায়ীই ঠিক রাখেন। সেরূপ স্থলে (ইংরাজি মাসের তারিখ মনে, অথবা লিখিয়া, রাখিলেও) ঋতু আরম্ভের তারিখ যে মাসে তাহার ৯মাস পরের, অথবা তাহার তিন মাস পূর্বের মাসের ঐ তারিখের সহিত ৭দিন যোগ করিলেই প্রসবের সম্ভাব্য দিন পাওয়া যাইবে। অথবা, শেষ ঋতু আরম্ভের তারিখের সহিত ৭দিন যোগ করিয়া যে তারিখ পাওয়া যাইবে, পরবর্তী নবম মাসের সেই তারিখের কিছু পূর্বে অথবা পরে প্রসব হইবার কথা। **উদাহরণ**—বৈশাখের ১১ই শেষ ঋতু আরম্ভের দিন। বৈশাখের পরের নবম অথবা পূর্বের তৃতীয় মাস হইল মাঘ; ১১ই মাঘের সহিত ৭ যোগ করিলে পাওয়া গেল ১৮ই মাঘ। অতএব ১১ই বৈশাখ শেষ ঋতুস্রাব আরম্ভের দিন হইলে পরবর্তী ১৮ই মাঘ প্রসবের সম্ভাব্য দিন।

(২) অথবা, অন্যভাবে—১১ই বৈশাখে (অথবা ২৭এ এপ্রিলে) সাতদিন যোগ করিলে পাওয়া যায় ১৮ই বৈশাখ (বা ৪ঠা মে)। ইহার পর নয় মাস গুণিলে পাওয়া যায় ১৮ই মাঘ (বা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) ইহারই কাছাকাছি সময়ে প্রসব হইবে। গর্ভিণী যদি সঠিক তারিখ না বলিতে পারে তাহা হইলেও কোন্ মাসের কোন্ সময়ে (মাসের প্রথমে, মাঝামাঝি অথবা শেষ কিংবা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে) শেষ ঋতুস্রাব হইয়াছে সেটুকু জানিতে পারিলেও উপরোক্তভাবে হিসাব করিয়া প্রসবের কাছাকাছি সময়ের একটি ধারণা করা যায়।

শেষের দিকে গর্ভিণীর মনে হইতে থাকে গর্ভের দিনগুলি যেন ফুরাইতেছে না। এই সময়ে গর্ভিণীকে কর্মনিরত রাখিবার জন্য আরামদায়ক কাজ বা স্ফূর্তিজনক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হয়। গর্ভিণী যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে; ইহার উপরে আবার **প্রসব সম্বন্ধে ভয় বা দুশ্চিন্তার অবকাশ তাহাকে দিতে নাই।** তবে আসন্ন প্রসব সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হইবে, যেন যথাসময়ের পূর্বেও প্রসব আগাইয়া আসিলে গর্ভিণী একেবারে অপ্রস্তুত না থাকে। **আসন্ন প্রসবের লক্ষণগুলি** জানা থাকিলে গর্ভিণী ও আত্মীয়স্বজন এ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই সজাগ থাকিতে পারিবে।

আসন্ন প্রসবের লক্ষণসমূহ

(১) প্রসবের প্রায় চারি সপ্তাহ পূর্ব হইতে জরায়ু ক্রমশ নামিতে এবং সামনের দিকে ঝাঁকিয়া পড়িতে থাকে। তলপেটেরও দৃশ্যত ঐরূপ অবস্থা হয় (নীচের চিত্র)। জরায়ুর নীচে নামার কারণ গর্ভস্থ সন্তানের মাথা নীচের দিকে আসিয়া পড়া।

(২) উপরোক্ত কারণে গর্ভিণী শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ায় আরাম ও হাল্কা বোধ করে ; কিন্তু হাঁটিতে বা চলাফেরা করিতে কষ্ট বোধ হয়।

(৩) পেটের মধ্যে সন্তানের নড়াচড়া অত্যধিক বোধ হয়। মনে হয় যেন সন্তান পা দিয়া জরায়ুর পেশীসমূহে ধাক্কা মারিতেছে।

৪৯ নং চিত্র
প্রসবের প্রারম্ভে জরায়ুর নীচে নামা

কাহারও কাহারও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, যে দিন নারী গর্ভধারণ করিবে, সেইদিন হইতে ২৮০ দিন গণনা করিতে হইবে। বাস্তবিক কোন্ দিনের সহবাসে গর্ভাধান হইল, তাহা নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব ; কাজেই এই ধারণা লইয়া বসিয়া থাকিলে গণনা করা অসম্ভব হইবে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। যেদিনই গর্ভাধান হউক না কেন, পূর্ববর্তী ঋতুর প্রথম দিন হইতে প্রায় ২৮০ দিনই ভ্রূণ গর্ভে থাকিবে অবশ্য যদি কোন রোগ-জনিত বিশেষ কারণ না ঘটে।

কাহারও যদি প্রসবের সময় হইয়াও প্রসব-বেদনা আরম্ভ না হয় এবং হিসাবে ভুল না থাকে তবে শেষ ঋতুস্রাবের প্রথম দিন হইতে ৩০০ দিনের বেশী অপেক্ষা করা উচিত নহে। সুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শমত বা কোনও প্রসবাগারে গর্ভিণীকে পাঠাইয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রসব বেদনা সৃষ্টি করিয়া প্রসবের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই সকল সঙ্কোচনকে প্রাথমিক প্রসব বেদনা বলে।

(৪) জরায়ু এইভাবে নীচে অবতরণ করে বলিয়া মূত্রাশয় এবং অন্ত্রসমূহে চাপ পড়ে, ফলে গর্ভিণী খুব নিম্নমুখী চাপ বোধ করে। এই হেতু গর্ভিণীর ঘন
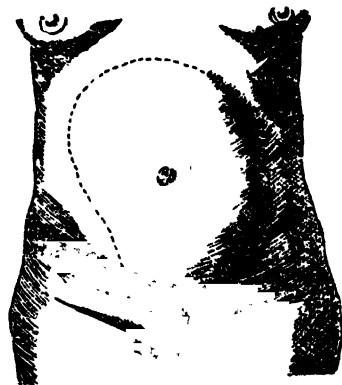
ঘন প্রস্রাব পায়। অনেক ক্ষেত্রেই **কোষ্ঠকাঠিন্য** হয় আবার কোনও কোনও স্থলে ঘন ঘন বাহ্যের বেগও আসিতে দেখা যায়।

(৫) বাহ্য জননেন্দ্রিয়েও প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থার অপ্রশস্ত যোনিনালীকে সন্তান নির্গমনের উপযোগী করিবার জন্য বড় হইতে হয়। যোনিনালীর শিরা-উপশিরাসমূহ রক্তের চাপের দরুন কাল কাল রেখার মত দেখায়। যোনিনালী হইতে অধিকতর শ্লৈষ্মিক স্রাব হয়; ইহাতে কিছু কিছু রক্তের অংশও থাকে। এই স্রাবে যোনিনালী ভিজিয়া যায় এবং সন্তান নির্গমের পথকে সুগম করিয়া দেয়।
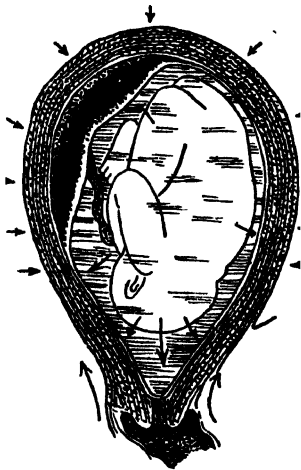
৫০ নং চিত্র
সন্তানের নিম্নমুখী ও জরায়ুর
উধ্বর্মুখী চাপ

(৬) পেটের মধ্যে সন্তানের নড়াচড়ার দরুন গর্ভিণীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। সামান্য নিদ্রাকর ঔষধ প্রয়োগে ঘুমের ব্যবস্থা করা যায়। ক্ষুধামান্দ্য হইয়া থাকে; তখন সামান্য আহার করাই ভাল। শরীরের রং বিবর্ণ হইয়া যায়; ইহাতে ভয়ের কারণ নাই।

সন্তানের নিম্নমুখী মাথার এবং জলীয় পদার্থের ব্যাগের অবিরল চাপে জরায়ুর নীচের অংশ এবং জরায়ুর মুখ উন্মুক্ত হইতে থাকে। সন্তান বাহিরের দিকে চাপিতে থাকে এবং জরায়ু উপরের দিকে উঠিতে চায়। এই দুই উল্টা শক্তির ক্রিয়ার জন্যই প্রসব-কার্য সম্ভবপর হয় (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতিই উপরোক্ত উপায়ে প্রসব-কার্যের সহায়তা করে। জরায়ু আপনা হইতেই দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এই অবস্থাতেই অনেক সময়ে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামপূর্ণ নিদ্রা যাওয়ার পরে, **প্রথম প্রসববেদনা** আরম্ভ হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসববেদনা রাত্রিকালে আরম্ভ হয়। *

---

* কখনও কখনও কৃত্রিম প্রসব বেদনা অনুভূত হয়। আসল ও নকল প্রসব-বেদনার প্রভেদ: আসল বেদনা (ক) নিয়মিত সময় পর পর আসিতে থাকে এবং (খ) ক্রমশ বেদনার তীব্রতা বাড়াতে থাকে। নকল বেদনার সবই অনিয়মিত হয়। (গ) এনিমা (মলদ্বারে ডুশ বা পিচকারী) দিলে প্রকৃত বেদনা তীব্রতর হয়, কিন্তু নকল বেদনা কমিয়া যায়।

এইবার গর্ভিণী সাধারণত বেশী যন্ত্রণা অনুভব করে এবং একটু একটু ভয় পায়। দ্বিতীয় বার বেদনা দেখা দিলেই মনে করা যাইতে পারে, **এইবার প্রসবের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই সময়ে হাসপাতালে পাঠানো বা ধাত্রী ডাকা উচিত।** প্রথমত কিছুক্ষণ পর পর বেদনা অনুভূত হয় এবং ক্রমেই ঘন ঘন নিয়মিত সময় পর পর ক্রমবর্ধমান বেদনা হইতে থাকে।

প্রসব-কার্যে যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, তাহাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—প্রথমত প্রসূতির গৃহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত তাহার দেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা। আমরা প্রসূতির ঘর সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব।

হাসপাতালে অথবা বাড়ীতে

যাহাদের সঙ্গতি ও সুবিধা আছে তাহাদের পক্ষে গর্ভিণীকে হাসপাতালে বা মাতৃ-সদনে পাঠানো উচিত। এ বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ এবং গর্ভিণীর নিজের মতামত গ্রহণযোগ্য। **হাসপাতালে** সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সহজ এবং যে কোন সময়ে হঠাৎ দরকার হইলে শিক্ষিতা ধাত্রী ও উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যায়। আলাদা ঘর না নিলে খরচও খুব কম পড়ে। অনেক হাসপাতালে সাধারণ বিভাগেও (জেনারেল ওয়ার্ড) একজন স্ত্রীলোককে কাছে থাকিতে দেয়।

নিজের বাড়ীতে সুবিধার মধ্যে শুধু প্রবোধ দিবার মত আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকে এবং গর্ভিণীও নিজের বাড়ীতে বেশী স্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু **গুরুতর অসুবিধা** এই যে অধিকাংশ বাড়ীর কর্তা-গিন্নীরাই আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না এবং তাহা বিশ্বাসও করেন না। ফলে আশে-পাশের বাড়ীর গিন্নী, হিতৈষী আত্মীয় এবং বন্ধুগণ নিজ নিজ 'অভিজ্ঞতা' সম্বন্ধে গর্ব করিয়া সালঙ্কারে যে উপদেশ দেন গৃহকর্তা অথবা কর্ত্রী তাহাই বিশ্বাস করেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করেন। আধুনিক প্রসব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন খবর না রাখার ফলে তাঁহারা জানিতে পারেন না যে ঐ সকল আত্মীয়, বন্ধুদের পরামর্শ কত ভ্রান্ত এবং কুসংস্কারে পূর্ণ। পাশ করা অভিজ্ঞ ধাত্রী, নার্স অথবা ডাক্তার যে সেকেলে দাই অথবা সবজান্তা গিন্নীদের অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞান রাখেন এবং কোন

জটিল উপসর্গ দেখা দিলে তাহার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করিতে পারেন এ ধারণা তাহাদের একেবারেই নাই। হিতৈষীদের পরামর্শ মত সেকেলে দাই নিযুক্ত করিবার পূর্বে তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে ঐ সকল দাইয়ের শিক্ষা ভ্রান্ত মত, পথ ও পদ্ধতির উপরই ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহারা শত সহস্র ক্ষেত্রে ঐ ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই আছেন যাঁহারা এই ভুল করেন না এবং অন্যকেও করিতে দেন না। কারণ তাঁহাদের ঠিক মত ও পথ জানিবার আন্তরিক আগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা, নূতন প্রণালীর কথা ভাবিবার, পরীক্ষা ও আবিষ্কার করিবার মত সৃজনী প্রতিভা, সাহস ও প্রগতিশীলতা আছে। কিন্তু, এই সব গুণ অত্যন্ত বিরল, আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে আরও বিরল।

বাড়ীতে আর একটি অসুবিধা এই যে প্রসবের সময়ে বা পরে হঠাৎ ডাক্তারের দরকার হইলে না-ও পাওয়া যাইতে পারে। লেখকের নিজের বাড়ীর প্রসূতিদের প্রায়ই হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গর্ভিণীর কোন জটিল উপসর্গ দেখা না দিলে বাড়ীতেও প্রসবের বন্দোবস্ত করা যায়। আঁতুড় ঘর পরিষ্কার ও যথোচিত সজ্জিত হওয়া উচিত।

আঁতুড় ঘর

যে ঘরে প্রসূতি সন্তান প্রসব করে, তাহাকে আমাদের দেশে আঁতুড় ঘর বলা হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের লোক সাধারণত বাড়ীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপরিষ্কার ক্ষুদ্র ও পরিত্যক্ত গৃহকেই আঁতুড় ঘর করে।

অনেকে উঠানে গরুর ঘরের মত গোচালা উঠাইয়াই কর্তব্য শেষ করে।

এ সম্বন্ধে অশিক্ষা হেতু আমাদের দেশবাসীর মধ্যে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। বহু কুসংস্কারের মধ্যে আমাদের কাছে যাহা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও আশু প্রতিকারোপযোগী বলিয়া মনে হয়, তাহা এই যে, আমাদের দেশে আঁতুড় ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আগুন জ্বালানো হয় প্রসূতিকে সেঁকিবার জন্য; এবং দরজা জানালা বন্ধ করা হয় জাতককে ভূত-প্রেতাদির হাত অথবা বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য। বদ্ধগৃহে অগ্নি-কুণ্ড অতি বিষাক্ত হাওয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেজন্য বহু প্রসূতি ও শিশু মারা যায়। যথাসম্ভব প্রচার ও শিক্ষাদ্বারা এই কুসংস্কারকে দেশবাসীর মন হইতে দুর করিয়া আঁতুড় ঘরের পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা ও সেখানে আলো হাওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিতে হইবে।' **অন্যথা বর্তমান প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর শোচনীয় হার হ্রাস করা সম্ভব হইবে না।)**

প্রসব-গৃহ বা আঁতুড় ঘর প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। উহাতে আলো-বাতাস চলাচলের জন্য দরজা জানালা থাকা চাই। ঘর হইতে অতিরিক্ত আসবাব-পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বাহির করিয়া ফেলা উচিত। ঘরের মধ্যে এমন স্থানে প্রসূতির শয্যা স্থাপন করিতে হইবে, যেখানে যথেষ্ট আলো পড়িতে পারে। প্রসূতির দক্ষিণ পার্শ্ব যাহাতে জানালার দিকে থাকে, তদনুসারে শয্যা স্থাপন করিতে হইবে। বিছানাটি ঈষৎ শক্ত হওয়া ভাল। স্প্রীঙের খাট ব্যবহার করা উচিত নহে। একটি তক্তাপোষ, একপ্রস্থ বিছানা, তোষক, বালিশ, মশারী, চাদর এবং শীতকাল হইলে লেপ বা কম্বল, * ঔষধাদি এবং প্রসূতি ও জাতকের ব্যবহারোপযোগী আসবাব ও বাসনপত্র রাখিবার জন্য একটি ছোট চৌকি বা টেবিল থাকিলেই হইল। পাকা ঘর হইলে পূর্বাহ্ণে ঘরটি চুনকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে এবং কাঁচা ঘর হইলে উহা নিকাইয়া, বেড়া, ঝাঁপ ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে হইবে। যাহাতে রৌদ্র ও বাতাস ঘরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার জন্য দরজা জানালা খুলিয়া রাখা দরকার। শীত ও বর্ষাকালে শুধু ততটুকুই বন্ধ করা উচিত যাহাতে কাহারও গায়ে সোজা ঠাণ্ডা হাওয়া বা বৃষ্টির ছাট না লাগে।

এতদ্ব্যতীত শিশুর শরীর ধোয়াইবার ও ধাত্রীর হাত ধুইবার জন্য ঠাণ্ডা ও গরম জলপূর্ণ বড় গামলা, তোয়ালে, সাবান, কাঁচি, বোরিক তুলা ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র ঘরের এক কোণে এমনভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে যেন দরকার-মত বিনা তালাসে অনতিবিলম্বে পাওয়া যায়।

নির্বিঘ্নে প্রসব-কার্য সম্পাদনে খুঁটিনাটি যত জিনেসের দরকার হয় শিক্ষিতা ধাত্রী তাহার তালিকা দিতে পারেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়গুলি প্রসব-সরঞ্জাম সেট্ ধারে দিয়া থাকেন; আবার সুসজ্জিত মাতৃ-সদন

---

* অশুচি হইয়া গিয়াছে এই ভ্রান্ত ধারণায় আঁতুড় ঘরের বিছানা বাসন প্রভৃতি ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত জিনিস কাচিয়া বা কাচাইয়া ও মাজিয়া বা মাজাইয়া এবং প্রসূতির কোনও সংক্রামক রোগ হইয়া থাকিলে দুষ্ট জীবাণু শোধন (disinfect) করিয়া বা করাইয়া গৃহস্থ অপর কাজে ব্যবহার করিতে পারে। অশুচি বা অপবিত্র হওয়ার কথা কুসংস্কার মাত্র।

বা শিশু-মঙ্গল সমিতি দরিদ্র প্রসূতিদিগকে এইরূপ সাজ-সরঞ্জাম ধার দিয়া সাহায্য করেন। **আমাদের দেশে এই সবের বড় অভাব। সরকারী কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের এই আবশ্যকীয় বিষয়ে আরও সজাগ হইতে হইবে।** ধাত্রীরাও যাহাতে আপন আপন ব্যবহারোপযোগী আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে বাধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে ময়লা কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয় বলিয়াই রোগ সংক্রমণের ও অনিষ্টের বেশী ভয় থাকে।

প্রসবকালীন কর্তব্য

উপরে আমরা আঁতুড় ঘরের অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। এখন আমরা অন্যান্য ব্যবস্থার আলোচনা করিব।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষণীয় বিষয়। এদেশের ধাত্রীরা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাহারা লোকাচার ও স্বীয় অভিজ্ঞতা-হইতেই সামান্য কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে।

আমার পক্ষে এই বিরাট বিষয়ের শুধু আভাস দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, তবুও এখানে মোটামুটি যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা হইতেও গর্ভিণী, প্রসূতি, ধাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের অনেকে অবহিত হইতে পারিবেন, আশা করা যায়।

প্রসবকালীন কর্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা প্রসূতি, আত্মীয় স্বজন, ডাক্তার এবং ধাত্রীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। *

ডাঃ গ্রীণ-আর্মিটেজ এবং ডাঃ দত্ত তাঁহাদের A Text Book of Midwifery in the Tropicsএ এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এদেশে **বহুক্ষেত্রে প্রসূতির রোগবীজাণু সংক্রমণজনিত পীড়ার জন্য দায়ী ধাত্রী এবং শুশ্রূষা-কারিণীদের অসতর্কতা। সূতিকা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগবীজাণু ইহারাই বহন করিয়া অনিষ্টের সূচনা করে।**

---

* অনেক জায়গায় সাধারণ ধারণা এই যে, আঁতুড় ঘর 'অশুচি'—সেখানে গেলে স্নান করিতে হয়। এরূপ ধারণা কুসংস্কারমূলক।

নূতন মতের নূতন শিক্ষা এই যে, যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেহে ও ধৌত বস্ত্র পরিয়া ভিতরে যান। অন্যথায়, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে বাহির হইতে বিষাক্ত রোগবীজাণু লইয়া গিয়া প্রসূতি ও শিশুকে সংক্রমিত করিতে পারেন।

বড় রকমের অস্ত্রোপচার করিতে গিয়া ডাক্তারেরা সংক্রমণের যত প্রকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, প্রসবকালেও সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শোধিত মুখোশ, আবরণী এবং দস্তানা (পার্শ্বের চিত্র) পরিয়া লওয়া ধাত্রীর এবং সাহায্যকারিণীর কর্তব্য। পাশ্চাত্ত্য দেশে যদি ঐগুলি ব্যবহার না করা হয় এবং প্রসূতির প্রসবের সময়ে কোনরূপ রোগ সংক্রমণ অথবা septic হয় তবে প্রসূতির পক্ষ হইতে মামলা করিলে প্রসবের সময়ে যাহাদের অসতর্কতার দরুন ঐরূপ ঘটিয়াছে তাহাদের শাস্তি পর্যন্ত হইয়া যায়। অন্ততপক্ষে **নখ কাটিয়া, ঘষিয়া, চুড়ি, বালা, আংটি প্রভৃতি খুলিয়া কার্বলিক এসিড সাবান দিয়া হাতের কনুই অবধি ধুইয়া ও লাইসল লোশনে ডুবাইয়া** লওয়া দরকার।

(৫১নং চিত্র)
প্রসবকালে ধাত্রীর ব্যবহার্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পরিচ্ছদ

প্রসবের প্রক্রিয়া

প্রসব-প্রক্রিয়ার কতকগুলি বিষয়ে সকলেরই জ্ঞান থাকা উচিত।

(১) **সন্তানের শরীরের অবস্থান**—প্রসবের প্রাক্কালে সন্তান গর্ভে 'হাত মুখ গুঁজিয়া' থাকে বলা যায় অর্থাৎ সন্তান যেন ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে। ইহাতে সন্তান সব চেয়ে কম জায়গায় থাকিতে পারে। সন্তানের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া এবং জরায়ুর মধ্যস্থ জায়গার আকার উক্তরূপ অবস্থানের সহায়ক। উহা সাধারণত লম্বালম্বিভাবেই থাকে (৩৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(২) **সন্তানের মস্তকের অবস্থান**—সন্তানের মস্তক সাধারণত নীচের দিকেই থাকে। অন্য অবস্থায় থাকিলে প্রসব-প্রক্রিয়ায় বেশী কষ্ট হয়।

মস্তক নীচের দিকে থাকিবার কারণ—(ক) মাধ্যাকর্ষণ; (খ) জরায়ুমধ্যস্থ স্থানের আকার। পূর্বে সন্তানের সাধারণ অবস্থান দেখানো হইয়াছে। নীচের চিত্রে নানাভাবে সন্তান থাকিবার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

(৫২—৫৫ নং চিত্র)

সন্তানের নানাভাবে অবস্থান

প্রসূতির বস্তিলোম মুণ্ডন করিয়া ফেলিয়া ঐ স্থান কার্বলিক সাবান দিয়া ধুইয়া, উহাকে স্নান করাইয়া পরিষ্কার, গরম এবং ঢিলা কাপড় পরাইতে হইবে।

প্রথম পর্ব

প্রসব বেদনার প্রথম পর্বেই প্রসূতিকে নরম জোলাপ দিতে হইবে। প্রথম গর্ভিণীকে আগে সাবান জলের এনিমা (মলদ্বারে ডুশ) দিয়া পরে ক্যাষ্টর অয়েল বা লিকরিস পাউডার ব্যবহারই প্রশস্ত। পরবর্তী প্রসব সময়ে সাবান জলে ডুশ দেওয়াই যথেষ্ট। এইভাবে পেট পরিষ্কার করাইয়া না দিলে প্রসবের সময় মল বাহির হইতে পারে।

ঘন-ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া মাত্রই প্রসূতির প্রস্রাব করা উচিত। পচন-নাশক ঔষধ (যথা লাইসল) মিশ্রিত অল্প গরম জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ জননেন্দ্রিয় ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, প্রসব-ক্রিয়ার প্রথম স্তর জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়া। এই সময় জরায়ু-গ্রীবায় সন্তানের মস্তক নামিয়া আসে। জরায়ু-মুখ উন্মুক্তির সহায়তার জন্য **প্রসববেদনার প্রথম দিকে প্রসূতির পক্ষে পদচারণা করা উচিত।** বেদনা আরম্ভ হওয়া মাত্র প্রসূতির শুইয়া পড়া উচিত নহে। প্রসূতি যতই হাঁটিতে থাকিবেন, ততই জরায়ু সজোরে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। তবে কষ্ট বোধ করিলে মাঝে মাঝে কেদারায় বসিয়া লইতে পারেন। জরায়ু

যতই সঙ্কুচিত হইবে, সন্তানের দেহ ততই বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ঐরূপে জরায়ু-গ্রীবা উন্মুক্ত হইয়া সন্তানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

পাশের চিত্রে ক্রমশ জরায়ু-গ্রীবা উন্মুক্ত হওয়ার দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। প্রসূতি শুইয়া থাকিলে এই সকল কাজে বিঘ্ন হইতে থাকিবে। ফলে প্রসব-ক্রিয়ায় বিলম্ব হইবে। পায়চারি করিতে থাকিলে সন্তানের ভার নীচের দিকে পড়ে এবং মাধ্যাকর্ষণ-বলে সন্তান নিম্নদিকে আসিতে থাকে। কিন্তু শুইয়া থাকিলে সন্তান মাধ্যাকর্ষণের কোনই সহায়তা পায় না। এই সময় প্রস্রাব করিয়া ফেলা ভাল; মূত্রাশয় হাল্কা না থাকিলে যন্ত্র (Catheter) প্রয়োগেও প্রস্রাব করাইয়া লওয়া উচিত। প্রসব-কার্যে বেদনা আসার সময় প্রসূতির পক্ষে এক-আধটু কুন্থন দিতে হয়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুন্থন দেওয়া যত সহজ, শুইয়া কুন্থন দেওয়া তত সহজ ও ফলপ্রদ নহে।
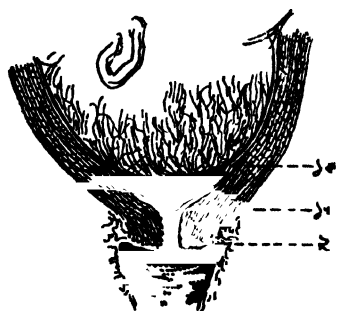
(৫৬—৫৯ নং চিত্র) ৫৬ নং চিত্রে ১ হইতে ২ প্রসব পথ। ৫৭ নং চিত্রে দেখুন উক্ত পথের প্রায় অর্দ্ধেক (১ক—১খ) খুলিয়া গিয়াছে। ৫৮ নং চিত্রে পথের সবটুকু খুলিয়া যাইলেও মুখ (২) বন্ধ আছে। ৫৯ নং চিত্রে প্রসব পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া পান মুচি ভাঙ্গিতেছে।

প্রসূতি সকলের প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিতে হয়। এই স্তরে শেষের দিকে সন্তানের **সম্মুখস্থ জলীয় পদার্থের ব্যাগটি ফাটিয়া** ('পানমুচি' ভাঙিয়া') **গিয়া** সন্তান বাহির হইবার পথ সুগম করিয়া দেয়। প্রসব-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায় এবার আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহির হইতে সন্তানের মস্তক দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ধাত্রীর হস্ত-সাহায্যের কোনও প্রয়োজনও নাই। এই সময় প্রসূতি জানুদ্বয় খাড়া করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে (Lithotomy position, নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রসূতি সজোরে কুন্থন
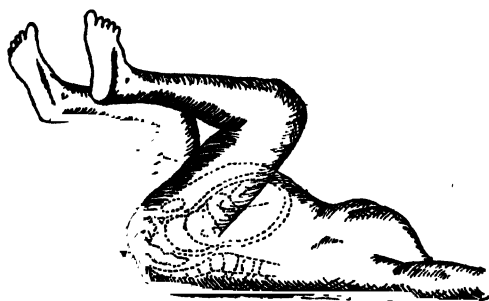
(৬০ নং চিত্র)
লিথোটোমী পজিশান

দিলেও তাহাতে ঝিল্লি ছিন্ন হইবে না। সুতরাং প্রয়োজন-মত বেদনা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কুন্থন দিয়া প্রসূতি জরায়ু-সঙ্কোচনের সাহায্য করিতে পারেন। ব্যথা না আসিলে যেন কদাপি কুন্থন না দেওয়া হয়। এই কুন্থন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রসূতির পায়ের দিকে কোনও খুঁটির সহিত একটি কাপড় বাঁধিয়া দিলে প্রসূতি সেই কাপড় ধরিয়া সজোরে টানিলেই কুন্থন-কার্য সজোরে সম্পাদিত হইবে।

এইভাবে জাতকের মস্তক প্রসব-পথে দৃষ্টিগোচর হইলেই ধাত্রী তাহার পরিষ্কৃত (অর্থাৎ **নখ কাটিয়া ও পরিষ্কার করিয়া চুড়ি, আংটি প্রভৃতি খুলিয়া লাইসল লোশন দ্বারা ধৌত**) হস্ত প্রয়োগ করিবে। এই কার্যে ধাত্রীকে দুইটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমত তাহাকে জাতকের যথাসম্ভব অল্প সময়ে বহিরাগমনের সাহায্য করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত প্রসূতির প্রসবদ্বার এবং পেরিনিয়াম যেন ছিন্ন না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে

হইবে। সন্তানের মস্তক বাহির হইলে আর কুন্থন দেওয়া উচিত নয়; কারণ তাহাতে যোনি-মুখ ছিন্ন হইতে পারে।

পেরিনিয়াম যত বিস্তৃতিলাভ করিবে, ইহা ছিঁড়িবার সম্ভাবনা ততই কম হইবে। শিশুর মস্তক যোনিদ্বারে দৃষ্ট হইবামাত্র ধাত্রী তাহার পরিষ্কৃত ও শোধিত (Sterilised) দক্ষিণ হস্ত প্রসূতির পেরিনিয়ামের উপর এমনভাবে স্থাপন করিবে যেন তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এক ভগোষ্ঠের দিকে থাকে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলি অপর ভগোষ্ঠের দিকে থাকে এবং অঙ্গুলিগুলির শীর্ষভাগ মলদ্বারের অভিমুখে থাকে। পেরিনিয়ামের উপর শোধিত পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা বা গজ (Gauze) দিয়া লওয়া উচিত। সাহায্যকারিণীর বাম হস্ত প্রসূতির তলপেটের উপর থাকিবে।

বেদনা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী বাম হস্তদ্বারা উপর হইতে চাপ দিবে এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা পেরিনিয়ামের উপরে উপযুক্ত পরিমাণে চাপ দিবে। ইহাতে

(৬১ নং চিত্র)
বেদনার সময়ে যাহাতে শিশুর মস্তক হঠাৎ বাহির হইয়া না আসিতে পারে তাহার জন্য মস্তকটি ভিতরের দিকে কতকটা ঠেলিয়া রাখিতে হয়। (প্রসব-বিজ্ঞান অবলম্বনে)

প্রসূতির পিউবিক অস্থিসন্ধির দিকে শিশুর মস্তকের যে অংশ আছে তাহা বাহির হইতে সাহায্য হইবে কিন্তু পেরিনিয়ামের দিকের অংশ (স্বাভাবিক ক্ষেত্রে কপাল হইতে চিবুক পর্যন্ত) হঠাৎ বাহিরে আসিতে পারে না।

বেদনার সময়ে এইরূপ বাহির হইতে পেরিনিয়ামের উপর চাপ দিলেও মস্তক ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে না, অথচ প্রতি বেদনার সঙ্গে সঙ্গে পেরিনিয়াম বিস্তৃতি লাভ করিবে। মস্তকের কিয়দংশ বাহিরে আসিবার পর প্রসূতিকে কুন্থন দিতে নিষেধ করিতে হইবে এবং তাহাকে হাঁ করিয়া নিশ্বাস

লইতে বলিতে হইবে। অনেক প্রসূতি এই সময়ে অত্যধিক বেদনায় কাঁদিয়া ওঠে, তাহাতেও উপকার হয়। এই সময়ে ধাত্রী বেদনার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তদ্বারা বেশী করিয়া চাপ দিবে এবং বাম হস্তের চাপ আর দিবে না, কারণ **এই সময়ে পেরিনিয়াম ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা** সর্বাপেক্ষা বেশী। যদি পেরিনিয়াম খুব শক্ত থাকেও কিছুতেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে না দেখা যায় (সাধারণত অধিক বয়সের প্রথম গর্ভিণীদিগের এরূপ হইয়া থাকে) তাহা হইলে জলে মিশানো টিংচার আইওডিন বা পারমাঙ্গানেট্ অফ পটাশের দ্রবণে ডুবানো, অথবা গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া, যে পাত্রে ফুটানো সেই পাত্রেই ঢাকা দিয়া রাখা শোধিত (Sterile) কাঁচি দ্বারা পেরিনিয়ামের মধ্যরেখার কোন একদিকে, সাধারণত বাম দিকে অল্প কাটিয়া দেওয়া উচিত। (৬২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) তবে এইরূপ কাটিতে হইলে ডাক্তার অথবা অভিজ্ঞা নার্সের সাহায্য লওয়া নিরাপদ। ইহাতে শিশুর মস্তক পেরিনিয়ামের অধিক ক্ষতি না করিয়া বাহির হইতে পারিবে এবং ছিন্ন পেরিনিয়াম অপেক্ষা এইভাবে কাটা পেরিনিয়াম সেলাই করাও যেমন সুবিধা, জোড়াও লাগে তেমনি সহজে। মস্তক বাহির হইয়া পড়িলে আর বাহির হইতে যতই চাপ পড়ুক মস্তক ভিতরে ঢুকিয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইবার আর একটি কি দুইটি বেদনাতেই মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসিবে এবং মস্তক ধীরে ধীরে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিবে। এখন পেরিনিয়ামে মস্তকের চাপ পড়িবার সম্ভাবনা কম এবং এইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে ভগৌষ্ঠ আস্তে আস্তে সরাইয়া, প্রয়োজন হইলে বাম হস্তদ্বারা শিশুর কপাল ধরিয়া উপরের দিকে আকর্ষণ করিয়া

(৬২ নং চিত্র)
পেরিনিয়াম কাটা

(৬৩ নং চিত্র)
কপাল, মুখ ও চিবুক বাহির করিতে সাহায্য

কপাল, মুখ ও চিবুক বাহির হইতে সাহায্য করা উচিত (৬৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

শিশুর চক্ষু ও মুখ-গহ্বর পরিষ্কার করিয়া বাহির করা

মস্তক সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসিবার পর জরায়ুর সঙ্কোচন কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত থাকে। এই সময়ে তাড়াতাড়ি বোরিক লোশনে ভিজানো তুলা দ্বারা শিশুর মুদ্রিত চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দিবেন (পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্বে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটু গজ বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা লইয়া শিশুর মুখগহ্বর পরিষ্কার করিয়া দিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকেরা এরূপ করিতে নিষেধ করেন, কারণ ইহার ফলে আঘাত লাগিতে পারে এবং তাহার ফলে থ্র্যাস ইন্‌ফেক্‌শন্‌ অথবা সেপসিস্‌ (Thrush infection or Sepsis) হইতে পারে তাহার পর দেখিতে হইবে **শিশুর গলায় নাভিরজ্জু জড়াইয়া আছে কিনা।** যদি থাকে তবে আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার উপর দিয়া অথবা কাঁধ গলাইয়া উহা সরাইয়া দিতে হইবে (পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)। যদি সরানো না যায় তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আর্টারি করসেপ (Artery forceps) এর সাহায্যে নাভিরজ্জুর দুইস্থলে আটকাইয়া অথবা দুইস্থানে বাঁধিয়া মাঝে কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিতে হইবে।*

(৬৪ নং চিত্র)
শিশুর চক্ষু মোছানো

(৬৫ নং চিত্র)
নাভিরজ্জু কাঁধ গলাইয়া সরানো

* ইহার পর শিশুর পরিচয় কিছু পরে 'শিশুকে কাঁদানো' এবং নাড়ী কাটা পর্যায় এবং পরবর্তী 'প্রসূতি ও সন্তান পরিচর্যা' অধ্যায়ের 'আঁতুড় ঘরে সন্তান' অনুচ্ছেদে পাইবেন।

স্কন্ধ বাহির হইবার সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য নচেৎ পেরিনিয়াম ছিন্ন হইতে পারে। প্রসূতির পিউবিক অস্থিসন্ধির দিকে স্কন্ধ প্রথমে বাহির হইলে, প্রয়োজন হইলে শিশুর মস্তক ধরিয়া ঈষৎ নীচের দিকে টানিলেই উহা সহজে বাহির হইবে। এইবার শিশুর মস্তক উঁচু করিয়া ধরিতে হয় (নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইহাতে শিশুর অপর স্কন্ধ বাহির হইতে সুবিধা হয়, প্রয়োজন হইলে ধাত্রী একটি অঙ্গুলি শিশুর বগলে আটকাইয়া সামান্য বাহিরের দিকে ও উপরের দিকে টানিলেই হইবে। উভয় স্কন্ধ বাহির হওয়ার পর শরীরের বাকী অংশ বাহির হইতে কোন অসুবিধা নাই বা কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই, শুধু শিশুকে দুই হস্তদ্বারা ধরিয়া থাকিতে হয়—সামান্য টান দিবারও কোনও দরকার হয় না।

(৬৬ নং চিত্র)
কাঁধ বাহির করিতে সাহায্য

এই সমস্ত সময়েই প্রসূতিকে উৎসাহসূচক কথা বলিয়া প্রফুল্ল অথবা অন্তত অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রসব-বেদনা থাকিয়া থাকিয়া ঝড়ের বেগে আসিবে এবং পরক্ষণেই চলিয়া যাইবে। দুই বেদনার চাপের মধ্যে প্রসূতিকে বিশ্রাম, সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে হইবে। আঁতুড় ঘরে বেশী লোকজন থাকিতে দিবেন না; এবং ভীতিসূচক কোনও কথাবার্তা বলিবেন না।

সন্তান বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস লয় এবং কাঁদিয়া ওঠে। কখনও কখনও কিছুক্ষণ পরে কাঁদিয়া ওঠে; ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। মাতা এতক্ষণে স্বস্তি বোধ করে। তাহার সাধের সন্তান এখন তাহারই নিকটে। তখনও সন্তান নাভিরজ্জুর মারফতে মায়ের সহিত যুক্ত থাকে। সন্তানের বহিরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে রস ও রক্ত-স্রাব হয়।

শিশুকে কাঁদানো

সন্তান বাহির হইয়া না কাঁদিলে তাহার দুই পা ধরিয়া (বা কোমর ধরিয়া) মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া ধরিতে হয়। ইতিমধ্যে না কাঁদিলে হস্তদ্বারা পিঠে বা পদতলে আঘাত করিয়া (চড় মারিয়া—ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই) কাঁদাইবার চেষ্টা করিতে হইবে (নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য)। তাহাতেও না কাঁদিলে মাতা হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য উপায়ে তাহাকে কাঁদাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইবার চেষ্টা সম্ভবক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য। (পরবর্তী 'প্রসব ও সন্তান পরিচয়' অধ্যায়ের সন্তান না কাঁদিলে···পর্যায়ে দেখুন)।

নাড়ী-কাটা

সন্তান কাঁদিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ সন্তানকে বিচ্ছিন্ন না করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া নাভিরজ্জুর স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। যখন আর স্পন্দন অনুভব করা যাইবে না বা খুব কমিয়া গিয়াছে মনে হইবে তখন * গরম জলে ফুটানো ও সেই পাত্রেই ঢাকিয়া রাখা সূতা দ্বারা নাভিরজ্জুতে—কাছাকাছি দুইটি বন্ধনী —একটি বন্ধনী মাতার দিকে অপরটি শিশুর নাভি হইতে আড়াই হইতে চারি ইঞ্চি দূরে—দিয়া তাহার মাঝে পূর্বোক্তরূপে শোধিত (Sterilised) কাঁচিদ্বারা নাভিরজ্জু কাটিয়া দিতে হইবে। কাটাস্থানে তৎক্ষণাৎ টিংচার আইওডিন লাগাইয়া শিশুকে, অপর কোন সাহায্যকারিণী উপস্থিত থাকিলে, তাহার নিকট পরিচর্যার জন্য দিতে হইবে। নচেৎ মাতার কিছুদূরে শিশুকে মস্তক বাদে সর্বাঙ্গ গরম কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়া দিয়া মাতার তৃতীয় পর্বের

(৬৭ নং চিত্র)
শিশুকে চাপড় দিয়া কাঁদানো

* একদল চিকিৎসকের অভিমত এই যে, উক্ত সময়েই নাড়ী কাটা উচিত। অপর দলের মত এই যে, সন্তান কাঁদিয়া উঠিবার পরই কাটা উচিত। কলিকাতার মেডিকেল কলেজের সহিত যুক্ত নারীদের জন্য, ইডেন হাসপাতালে, ইদানীং শিশু কাঁদিয়া উঠিবার পরই নাড়ী কাটা হয়। তবে বিপদের আশঙ্কা থাকিলে যে তখনই নাভিরজ্জু কাটা উচিত, এই বিষয়ে উভয় দলই এক মত।

প্রসবকার্যে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে পরিষ্কৃত করিবার কাজই আগে করিতে হইবে। ইহার পরের কর্তব্য সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায় 'প্রসূতি ও সন্তান পরিচর্যা' বা 'আঁতুড় ঘরে সন্তান' অনুচ্ছেদ দেখুন।

তৃতীয় পর্ব

এবার তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। নাভিরজ্জু এখন যোনিনালি দিয়া বাহির হইয়াই রহিল। উহাকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নহে!

এই পর্বে সাহায্যকারিণী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার বামহস্ত জরায়ুর উপর রাখিবে এবং জরায়ুর উপরিভাগ শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। সন্তান বাহির হইবার পর এখন জরায়ু অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় ইহার সঙ্কোচন আরম্ভ হইবে। সঙ্কোচনের সময় জরায়ু গোলার মত শক্ত বোধ হইবে। যদি বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জরায়ু এরূপ শক্ত বোধ না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ফুল বিচ্ছিন্ন হইতেছে না। যদি বেশী রক্তস্রাব দেখা দেয় তাহা হইলে জরায়ু হইতে তাড়াতাড়ি যাহাতে ফুল বিচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনতিবিলম্বে তাহাই লওয়া ভাল।

(৬৮ নং চিত্র)

নাভিরজ্জু বাহির হইয়া থাকা

ফুল বিচ্ছিন্ন হইয়া জরায়ুর ভিতর তাহার নীচের অংশে পতিত হয়—তাহার জন্য ফুল বিচ্ছিন্ন হইবার পর তলপেট (কামাস্থির একটু উপরে) একটু উঁচু দেখায়, জরায়ু ঈষৎ উপরে উঠিয়া যায় এবং যোনিমুখ হইতে নাভিরজ্জু যেটুকু

বাহির হইয়াছিল তদপেক্ষা বড় দেখায়। এই সব লক্ষণ দ্বারা ফুল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বুঝিতে না পারিলে জরায়ুর উপরে যে হস্ত আছে তাহা দ্বারা সামান্য চাপ দিলে যোনিমুখ হইতে নাভিরজ্জু আরও খানিকটা বাহির হইয়া আসিবে; কিন্তু চাপ সরাইয়া লইলে, যদি ফুল বিচ্ছিন্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে নাভিরজ্জু আর ভিতরে ঢুকিবে না। যে উপায়েই হউক, ফুল জরায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই সাহায্যকারিনী প্রসূতিকে অল্প কুন্থন দিতে বলিবে অথবা নিজেই জরায়ুর উপরে সামান্য চাপ দিয়া ফুল বাহির করিবে। কোন অবস্থাতেই **নাভিরজ্জু ধরিয়া টানাটানি অথবা ফুল বিচ্ছিন্ন হইবার আগে জরায়ুর উপরে বেশী চাপ দিবে না,** ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া প্রসূতির জীবন সংশয় হইতে পারে। ১৫ হইতে ৬০ মিনিট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গর্ভফুল, নাভিরজ্জুর ভিতরকার বাকী অংশ এবং অপ্রয়োজনীয় ঝিল্লিসমূহ বাহির হইয়া আসে। এই সকল পদার্থকে জলে ভাসাইয়া মিলাইয়া দেখিতে হয় সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে কিনা। না আসিয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে হয়। কিছু ভিতরে থাকিয়া গেলে মারাত্মক রোগ (সূতিকা) জ্বর হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রক্তস্রাবও হইয়া থাকে। এই রক্তস্রাব স্বাভাবিক; ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। তবে রক্ত বন্ধ না হইলে ডাক্তারের সাহায্য লইতে হয়

(৬৯ নং চিত্র)
ফুলের জরায়ুগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া (প্রসব-বিজ্ঞান অবলম্বনে)

(৭০ নং চিত্র)
ফুল সম্পূর্ণ বাহির হইল কিনা দেখা

প্রসূতি পরিচর্যা

প্রসবের পরে

সন্তান প্রসব হইবার পর শুশ্রূষাকারীগণের কর্তব্য দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়—একদিকে প্রসূতিকে, অপরদিকে জাতককে শুশ্রূষা করিতে হয়। আমি প্রথমে প্রসূতি-মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রসূতি-মৃত্যু

গর্ভিণী ও প্রসূতি-মৃত্যুর মর্মন্তুদ বিবরণ এবং এ সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা 'গর্ভাবস্থায় বিধিনিষেধ' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, **ভারতবর্ষে প্রসূতি-মৃত্যুর হার সম্ভবত চীনদেশের সমপর্যায়ে এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ।**

প্রসূতি-মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ

(১) প্রসবের পরে সংক্রমণ।

(২) গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার ব্যাধি ; যথা, এক্লামশিয়া ইত্যাদি।

(৩) প্রসব প্রক্রিয়ার নানাবিধ জটিল বিঘ্ন।

প্রথম দুইটি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে শীঘ্রই আলোচনা করা হইতেছে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব ব্যতিরেকে অন্য সকল লক্ষণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা গর্ভাবস্থায় অবলম্বন করিলে সুফল হয়। রক্তস্রাব বন্ধ করিবারও নানা প্রকার বিধি-ব্যবস্থা আছে। পাশ করা ধাত্রী এবং ডাক্তার প্রসবকার্য পর্যবেক্ষণ করিলে গুরুতর উপসর্গের হাত হইতেও প্রসূতিকে রক্ষা করা যায়।

ইওরোপে গড়ে প্রসূতি-মৃত্যুর হার হাজার করা মোটে ৪ জন, বিভাগ-পূর্ব ভারতবর্ষে ছিল প্রায় ৪০। ইওরোপে প্রসবের পূর্বে, প্রসবকালে এবং

প্রসবের পরে বিঘ্নজনক উপসর্গ দেখা যায় শতকরা ১০, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ২০ ক্ষেত্রে।

অসাবধানতা, উদাসীনতা, চিকিৎসার অভাব, অজ্ঞতা, শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদিই **প্রসূতি-মৃত্যুর** উচ্চ হারের কারণ।

প্রসূতি পরিচর্যা

(১) প্রসবের পরে যোনিমুখ ও সমগ্র যোনিপ্রদেশে লাইসল-মিশ্রিত জলে ধোয়াইয়া, মোছাইয়া, ব্রিলিয়্যাণ্ট গ্রীন (Brilliant green) অথবা ডেটল-ক্রীম (Dettol cream) লাগাইয়া, কিংবা, ডেটল দ্বারা ডুশ করিয়া ডাক্তারি ঔষধের দোকানের পরিশোধিত তুলা ও কাপড় বা গজ (Gauge) দ্বারা মোটা করিয়া কপনী প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা যোনি ঢাকিয়া দিতে হইবে (নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য) এবং প্রসূতিকে পরিষ্কার কাপড় পরাইতে হইবে।

এবার সে মুক্ত ; সন্তানও বিযুক্ত ও মুক্ত।

(২) তৎপর ভাঁজ-করা শক্ত প্রায় এক বিঘৎ চওড়া কাপড় দিয়া তাহার পেট বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাতে প্রসূতি আরাম পায়। এইভাবে পেট না বাঁধিয়া দিলে পেট যথোচিত ভাবে সঙ্কুচিত হয় না ফলে পেট অতিরিক্ত রকম ঢিলা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। পেট ঢিলা হইলে (ক) শুধু যে দেখিতেই বিশ্রী হয় তাহা নহে ; (খ) অজীর্ণ রোগেরও সৃষ্টি হইতে পারে, এবং (গ) পেট ঝুলিয়া পড়িলে পরবর্তী প্রসবে প্রসূতিকে কষ্ট পাইতে হয়।
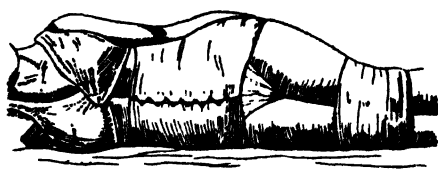
(৭১ নং চিত্র)
প্রসবের পর যোনিপ্রদেশের আবরণ

(৩) প্রসবের অল্পক্ষণ পরেই প্রসূতি অবসাদ-জনিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই নিদ্রা বড়ই উপকারী। যাহাতে এই নিদ্রা গভীর হয়, তাহার জন্য ঘর অন্ধকার ও কথাবার্তা বন্ধ রাখিতে হইবে। আঁতুড় ঘরে ভাল নিদ্রা না হইলে প্রসূতির সূতিকা জ্বর বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইতে পারে।

ইহার পরেও আঁতুড় ঘরে প্রসূতির যথেষ্ট পরিমাণে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাওয়া উচিত। ইহাতে শরীর ও মন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। নিদ্রাহীনতা থাকিলে

মনে করিতে হইবে কোথাও কোন গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে। এই গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। দরকার হইলে ভেরোনল্ (Veronal), ব্রোমাইডিয়া (Bromidia) বা ভেরামন্ (Veramon) ব্যবহার করিয়া প্রসূতির নিদ্রা আনয়ন করিতে হইবে।

(৪) প্রসবের পর প্রসূতি **খুব দুর্বল বোধ করিলে** তাহাকে অল্প-গরম অথচ ঘন চা পান করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৫) প্রসবের পর প্রসূতি ৬ ঘণ্টার মধ্যে এবং ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রস্রাব করিবে। সে শয্যায় শুইয়াই যাহাতে প্রস্রাব করিতে পারে এমন ব্যবস্থা (অয়েল ক্লথ অভাবে সংবাদপত্রের উপর নারীদের বিশেষ মূত্রপাত্র, তাহার অভাবে, বেডপ্যান) করিতে হইবে। প্রস্রাব না হইলে গরম সেঁক, পুলটিস, এমন কি প্রস্রাব-যন্ত্র (Catheter) ব্যবহার করিয়া প্রস্রাব করানো উচিত।

(৬) প্রথম প্রসবের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল বা ততোধিক সময় মাতার স্তন নিষ্ক্রিয় থাকে। ইহার পরে স্তন দুইটি বড় হইতে থাকে এবং টান ও চাপ পড়ায় উহাতে বেদনা অনুভূত হয়। সন্তানকে প্রত্যেক বার দুধ দিবার পূর্বে এবং পরেও স্তনের বোঁটা পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া নরম এবং পরিষ্কার কাপড় বা ন্যাকড়া দ্বারা মুছিয়া লওয়া উচিত।

(৭) প্রসূতির কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে কি না দেখিতে হইবে। প্রসবের দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যা বা তৃতীয় দিনের সকাল পর্যন্তও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে চায়ের চামচের ২।৩ চামচ ক্যাষ্টর অয়েল এবং আরও গুরুতর হইলে সাবান-গোলা অল্প গরম জলের এনিমা (Enema) দেওয়া উচিত।

(৮) **সংক্রমণের-আশঙ্কা**। প্রসবের পূর্বে দুষ্ট বীজাণু দ্বারা সংক্রমণের আশঙ্কা যতটা থাকে, প্রসবের পরে উহা অপেক্ষাও বেশী থাকে। কারণ, জরায়ু হইতে সন্তান বাহির হইয়া যাইবার পরে উহার মধ্যে ও মুখে বড় রকমের ঘায়ের মত থাকে। ডাঃ ভেল্ডি এবং সকল ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতই তাই সকলকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, যেন কোনও রকম দুষ্ট বীজাণু প্রসূতির জননেন্দ্রিয়-পথে প্রবেশ করিতে না পারে। একটি সামান্য ধূলিকণাতেও মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

প্রসূতি নিজে, ধাত্রী, ডাক্তার বা অন্য কেহ **প্রসূতির জননেন্দ্রিয়সমূহ ছুঁইবার পূর্বে উত্তমরূপে হাত ধুইয়া লইবেন** এবং স্পঞ্জ, তুলা, বস্ত্রখণ্ড বা তোয়ালে সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হইলে কখনও ব্যবহার করিবেন না।

এই সকল বিষয়ে ঘোর অজ্ঞতা ও অসাবধানতা হেতু পূর্বে লক্ষ লক্ষ মাতা প্রসবের পরে রোগ বীজাণু সংক্রমণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। আমাদের দেশে এখনও এ বিষয়ে উদাসীনতা ও অসাবধানতার অবধি নাই; ইহাই এদেশে প্রস্থতি-মৃত্যুর সর্বপ্রধান কারণ।

বীজাণু দুষণের ফলে প্রসূতি মৃত্যু আবিষ্কার

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে হাঙ্গেরীর একজন গবেষক (Ignaz Philip Semmelweis) সর্বপ্রথমে বিশ্লেষণ করিয়া প্রস্থতি মৃত্যুর এই কারণ আবিষ্কার করেন। এই গবেষকের অক্লান্ত চেষ্টা ও তখনকার চিকিৎসক-মণ্ডলীর অদ্ভুত তাচ্ছিল্যের ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই মর্মস্পর্শী।

১৮৪৬ সনে তিনি একটি মাতৃসদনে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হইয়া ঢুকেন। তখন প্রস্থতি-মৃতুর হার খুব বেশী ছিল। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর শব-ব্যবচ্ছেদের সময় লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার শরীরের অবস্থা মৃত প্রস্থতিদের মতই হইয়াছিল। দুষ্ট জীবাণু সংক্রমণের ফলে বন্ধুটির রক্ত বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রস্থতি-মৃত্যুরও ইহাই প্রধান কারণ। **তখন হইতে প্রসব-কার্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া প্রসূতি-মৃত্যুর হার অনেক হ্রাস করা হইয়াছে।**

(৯) প্রসবের পর সাধারণত তিন সপ্তাহকাল পর্যন্ত প্রস্থতির জরায়ু হইতে স্রাব হইয়া থাকে। ইহাকে লোকিয়া (Lochia) বলে। এই রক্ত প্রথম প্রথম তাজা রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং ক্রমে উহার বর্ণ ফ্যাকাশে হইতে থাকে; দ্বিতীয় সপ্তাহে রক্তস্রাবের পরিবর্তে সাদা স্রাব হইতে থাকে। সাধারণত এই স্রাবে কোনও গন্ধ থাকে না। স্রাবে কোনও গন্ধ থাকিলে তাহাকে রোগ-লক্ষণ বুঝিতে হইবে। এই স্রাবের জন্য প্রস্থতির কপ্‌নী ব্যবহার করা উচিত। এই কপ্‌নী প্রথম প্রথম, দিনে ৪।৫ বার ও শেষের দিকে ২।৩ বার বদলাইতে হয়। এই নিঃসরণ যাহাতে ভাল হয় এজন্য খাটের মাথার দিকে, খান তিনেক ইঁট উপর উপর রাখিয়া প্রায় এক ফুট উঁচু করিতে হয়।

(১০) সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার ও 'ফুল' পড়িবার পরে কোনও কোনও প্রস্থতির তলপেটে ও কোমরে, জরায়ুর ভিতরকার ছিন্ন ঝিল্লীসমূহও রক্ত বাহির করিয়া দিবার জন্য জরায়ুর সঙ্কোচন হওয়াতে ঠিক প্রসব-বেদনার ন্যায় একরূপ বেদনা হয়, ইহাকে 'হ্যাঁদাল ব্যথা' বলা হইয়া থাকে। জরায়ুর অনিয়মিত

সঙ্কোচনের জন্যই এই বেদনা হইয়া থাকে। এই বেদনা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৩।৪ দিন স্থায়ী হয়। তলপেটে গরম সেঁক দিলে এবং পেট শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলে এই বেদনা হয় না এবং হইলেও অতি শীঘ্র উপশম হয়।

(১১) প্রসবের পর প্রসূতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবেন। প্রথম পাঁচদিন একেবারে শয্যাত্যাগ করিবেন না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, তলপেটে ব্যথা এবং সূতিকা জ্বর হইতে পারে।

ডাঃ জনষ্টোন তাঁহার Text-book of Midwifery পুস্তকে উপদেশ দিয়াছেন যে, পাঁচদিন পরে প্রসূতিকে শয্যায় বসিতে দেওয়া যায়; দশ-দিন পর্যন্ত শয্যাত্যাগ করিতে নাই, তবে চৌদ্দদিন এইভাবে বিশ্রাম করিতে পারিলে আরও ভাল; চৌদ্দদিন পরে কেদারায় বসিতে দেওয়া যায়, অবশ্য আস্তে আস্তে সহাইয়া; তৃতীয় সপ্তাহের পরে গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে দেওয়া যায়, এবং একটু-আধটু হাঁটিতে চেষ্টা করিতে দেওয়া যায়।

প্রসবের পরে ৬ হইতে ৮ সপ্তাহের মধ্যে জননেন্দ্রিয়সমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। জরায়ু আবার প্রায় পূর্বেকার মতই ছোট হইয়া যায়।

এই সময়ে মাতার শরীরে নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয় বলিয়া নানা-প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চলিতে হয়। অসাবধানতার ফলে ব্যাধি-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

(১২) প্রসূতির খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। প্রথম প্রথম দুধ-সাগু-বার্লি এবং কিছুদিন পর্যন্ত লঘুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন। প্রসূতির খুব পিপাসা হয়; সুতরাং তাহাকে খুব জল খাইতে দিবেন। কাঁচা নাড়ী ফুলিয়া যাইবার ভয়ে অনেকে প্রসূতিকে জল দিতে কৃপণতা করে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। প্রচুর জলপানে প্রসূতির উপকার বৈ অপকার হয় না। প্রসবের সময় প্রভূত স্রাবে প্রসূতির দেহের প্রচুর রস-রক্ত ক্ষয় হইয়া থাকে। জলপানের দ্বারা এই ক্ষয়ের কতকটা পূরণ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রসবের পর প্রসূতির দেহে নানারূপ বিষ প্রবেশ করিতে পারে, প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে প্রস্রাবের সঙ্গে এই সমস্ত বিষ বাহির হইয়া যায়। প্রচুর জলপান জ্বরেরও প্রতিষেধক।

ছয় সপ্তাহ পরে মাতা আবার দৈনন্দিন কর্ম, স্বামী-সহবাস ইত্যাদি করিতে পারে। অবশ্য কোনও ব্যাধিলক্ষণ থাকিলে, তাহাকে চিকিৎসাধীনই থাকিবে হইবে।

ব্যায়াম

প্রসবোত্তর ব্যায়াম

যে নারীদের পেশীসমূহ সবল নয়, গর্ভকালে উদর বড় হওয়াতে তাহাদের সেখানকার পেশীগুলি সরিয়া যায় এবং প্রসবের পর তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার পর, উপযুক্তভাবে নিয়মিত অঙ্গচালনা না করিলে, তাহারা দুর্বল থাকিয়া যায়। প্রসবের পর যখন কিছুকাল, পূর্বের মত, কাজকর্ম করা না হয়, অথচ পূর্ণ আহার করা হয়, তখন মোটা হওয়ার প্রবণতার সম্ভাবনা থাকে। উদরের ভিতরের যন্ত্র ও পেশীগুলিতে চর্বি সঞ্চিত হওয়ায় পেট উঁচু হইয়া পড়ে এবং দেহলতার সৌষ্ঠব ও সুষমা নষ্ট হয়। তাহা ব্যতীত, প্রসবের সময়ে বস্তিপ্রদেশের পেশীগুলিতে খুব টান পড়ে এবং কষ্টকর ও কঠিন প্রসবের সময়ে ছিঁড়িয়া পর্যন্ত যায়। ইহার ফলে জরায়ুর নীচের দিকে নামিবার সম্ভাবনা হয়। এইরূপে ক্রমশ তাহা কতকটা যোনির মধ্যে নামিয়া আসে। এই রোগকে আয়ুর্বেদে কন্দ, কথ্য ভাষায় প্যাঁদ এবং ডাক্তারীতে prolapse of uterus বলে। উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে এই সমস্ত উপসর্গাদির অনেকটা নিবারণ করা যায়।

যদি স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে প্রসবক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং প্রসবের পরে কোন বাধা-বিপত্তি না ঘটে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলি প্রসবের পর **চতুর্থ দিন** হইতেই সুরু করা যায়।

প্রথম ব্যায়াম—অর্ধশায়িত অবস্থায় (কাঁধের নীচে তিনটি বালিশ রাখিয়া দেহের উর্ধ্বভাগ নিম্নভাগ অপেক্ষা উঁচু করিয়া) হাত দুইটি দেহের দুই পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া নাক দিয়া প্রশ্বাস টানিয়া দমবন্ধ করিবেন তাহার পর হাত দুইটি দেহের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িবেন। চারবার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যায়াম—অর্ধশায়িত অবস্থা। উদর-গাত্রের মাংসপেশী যথাসম্ভব আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত করিয়া (পেট ভিতর দিকে টানিয়া লইয়া) পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনুন। চারবার করিতে হইবে।

পঞ্চম দিন—পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এই ব্যায়ামটিও করুন :—

প্রথম ব্যায়াম—অর্ধশায়িত অবস্থা। হাঁটু সোজা রাখিয়া একদিকের নিতম্বের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করুন ও পরে স্বাভাবিক অবস্থায় আনুন। ইহার পর অন্য দিকের নিতম্বও ঐরূপ করুন। পাঁচবার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যায়াম—কাঁধের নীচে একটি এবং হাঁটুর নীচে একটি বালিশ রাখিয়া চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায় একদিকের হাঁটু বাহিরের দিকে ছড়ান ও পরে স্বাভাবিক অবস্থায় আনুন। ইহার পর অন্যদিকের হাঁটুও ঐরূপ করুন। চারবার করিতে হইবে।
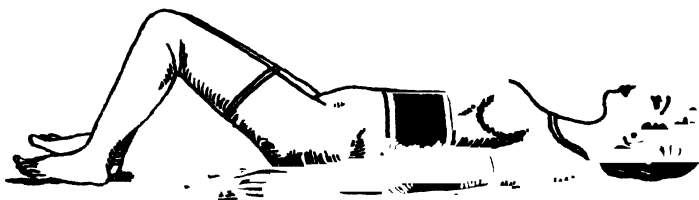
(৭২ নং চিত্র)
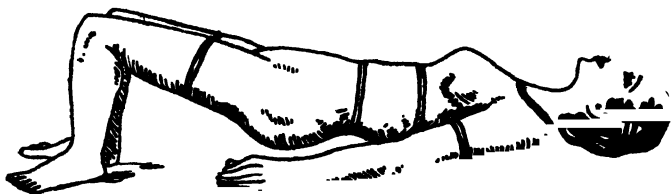
(৭৩ নং চিত্র)

ষষ্ঠ দিন—পূর্ববর্ণিত ব্যায়ামগুলির সহিত এটিও করুন :—

বিছানার উপর দেহ টান টান করিয়া শুইয়া হাত দুইটি দেহের দুই দিকে প্রসারিত করুন এবং হাঁটু দুইটি ভাঙ্গিয়া উপরের দিকে তুলুন (৭২ নং চিত্র)। ইহার পর দেহের নিম্নাংশ (নিতম্ব, তলপেট, উদর ও পৃষ্ঠদেশ) উপর দিকে এমন ভাবে তুলুন যাহাতে সারা দেহের ভার দুইটি পা, কাঁধ এবং মাথার উপর থাকে (৭৩ নং চিত্র)। এইবার বস্তিপ্রদেশ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে ঘুরাইয়া আনুন। চারবার করিতে হইবে।

সপ্তম দিন—পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এই ব্যায়ামটিও করুন :—

বিছানার উপর দেহ টানে টান করিয়া শুইয়া পড়ুন (৭৪ নং চিত্র)। একটি পায়ের হাঁটু ভাঙ্গুন (৭৫ নং চিত্র —২) এবং ঐ হাঁটু ভাঙ্গা অবস্থাতেই

(৭৪ নং চিত্র)
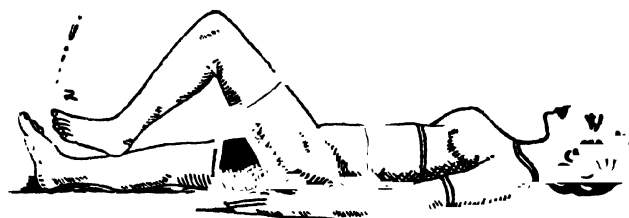
(৭৫ নং চিত্র)
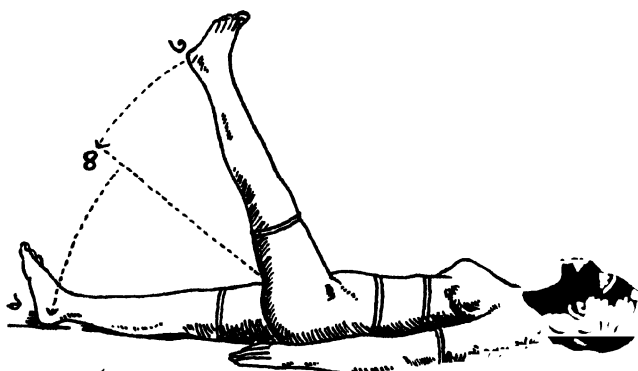
(৭৬ নং চিত্র)

উপরের দিকে তুলুন (৭৫ নং চিত্র—৩), ইহার পর পা ঐখানে সোজা করুন এবং সোজা অবস্থাতেই পা'টিকে একটু নামাইয়া আনুন (৭৬ নং চিত্র—৩ হইতে ৪)। ইহার পর যে ভাবে হাঁটু ভাঙ্গিয়া পা'টিকে উপরে তুলিয়াছিলেন (৭৫ নং চিত্র—২ হইতে ৩) সেই ভাবেই হাঁটু ভাঙ্গিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনুন। প্রথমে একটি পা এবং পরে অপর পা ঐভাবে তুলিয়া নামাইয়া আনুন। চারবার করিতে হইবে।

অষ্টম দিন—পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এই ব্যায়াম দুইটিও করুন ঃ—

(১) বিছানার ধারে বসিয়া পা দুইটি ঝুলাইয়া দিন। প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বাম পা ঘোরান। চারবার করিতে হইবে।
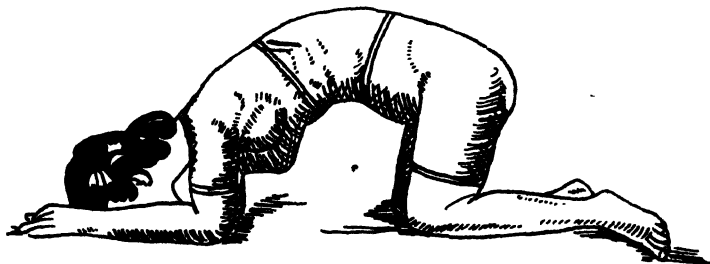
(৭৭ নং চিত্র)
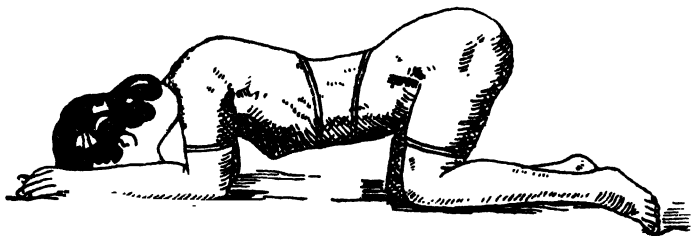
(৭৮ নং চিত্র)

(২) মাথা, কনুই, হাঁটু বিছানার উপর রাখিয়া দেহকে ধনুকের মত বাঁকান (৭৭নং চিত্র)। তাহার পর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া নীচে নামান (৭৮নং চিত্র)। চারবার করিতে হইবে।

নবম দিন—পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এটিও করুন ঃ—

হাত মাথার দিকে তুলিয়া মুঠা করিয়া টান টান ভাবে শুইয়া পড়ুন।

৭৯ নং চিত্র)

(৮০ নং চিত্র)

ইহার পর মাথা, কাঁধ ও পায়ের উপর ভর দিয়া নিতম্ব উপর দিকে তুলুন এবং নামাইয়া আমুন। চারবার করিতে হইবে।

দশম দিন—পূর্ববর্ণিত সবকটি ব্যায়াম করুন এবং বিছানা হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে ১০।১২ হাত (ঘরের মধ্যেই) হাঁটিয়া বেড়ান।

কয়েক মাস পরে, নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার ব্যায়াম প্রত্যহ নিয়মিতভাবে করুন। (অপর যে কোনও সময়েও) **তলপেট কমাইবার জন্য :—**

(ক) চিৎ হইয়া শুইয়া, হস্তদ্বয় মাথার উপর তুলিয়া কিছু ধরুন। হাটু মোটে না মুড়িয়া, পদদ্বয় মেঝে হইতে প্রায় একফুট তুলুন। এবার ধীরে ধীরে পা নামান, কিন্তু গোড়ালি যেন মেঝে স্পর্শ না করে। এই ভাবে পর পর দশবার পা উঠা নামা করুন।

(খ) চিৎ হইয়া শুইয়া, পা দুইটি কোনও আলমারি প্রভৃতি আসবাবের নীচে আটকাইয়া (অথবা কেহ ধরিয়া) রাখিয়া শরীরের অর্ধাংশ ধীরে ধীরে তুলিয়া উঠিয়া বসুন। এবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়ুন। পাঁচবার করুন।

(গ) সোজা হইয়া দাঁড়ান, স্কন্ধদ্বয় পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া, পেট ভিতর দিকে আকুঞ্চিত করিয়া (টানিয়া) দুই উরুর পার্শ্বের উপর হস্ত দুইটি রাখুন। এইবার, কুড়িবার পর পর পেটের পেশীগুলি ঐভাবে আকুঞ্চিত ও শিথিল করুন। দিনের মধ্যে যখনই সুবিধা হয় তখনই এই ব্যায়াম করুন। এই ব্যায়ামে পেট ভিতর দিকে টানিয়া রাখা অভ্যাসে দাঁড়াইবে। তখন কুৎসিতভাবে পেট উঁচু হইয়া থাকা আপনিই ঠিক হইয়া আসিবে।

(অপর যে কোনও সময়েও) **নিতম্বের মেদাধিক্য কমাইবার জন্য :—**

(ক) চিৎ হইয়া শয়ন করুন। হাত দুইটি শরীরের পার্শ্ব হইতে একটু দূরে শয্যার (বা মেঝের) উপর থাকিবে। বামপদ তুলিয়া, দক্ষিণ দিকে ঘুরাইয়া, দক্ষিণ পদের উপর দিয়া লইয়া গিয়া তাহার গোড়ালি দ্বারা মেঝে স্পর্শ করুন। এবার তাহাকে পূর্ববৎ সোজা রাখুন ও ঐভাবে দক্ষিণ পদের গোড়ালি দিয়া বাম দিকের মেঝে স্পর্শ করুন। দশবার করিবেন।

(খ) সোজা হইয়া দাঁড়ান। গোড়ালি দুইটি স্পর্শ করিয়া, দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিছু তফাতে (প্রায় অর্ধ সমকোণে, অর্থাৎ ৪৫° ডিগ্রিতে) রাখুন ও দুই উরুর পার্শ্বে হস্ত দুইটি রাখুন। গোড়ালি দুইটি একত্র রাখিয়াই পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়ান। এইবার ধীরে ধীরে জানু দুইটি মুড়িয়া অর্ধেক বসিবার ভঙ্গীতে, নীচু হউন আবার সোজাভাবে দাঁড়ান। দশবার করিবেন।

আঁতুড় ঘরে সন্তান

নাড়ীকাটা

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সন্তান প্রসবের পরেও নাভিরজ্জুর মারফতে গর্ভফুলের সহিত কিছুক্ষণের জন্য যুক্ত থাকে। বাহির হইবার অব্যবহিত পরে নাভিরজ্জুর রক্তবাহী নলসমূহের মধ্যে একটি স্পন্দন ও শিহরণ (Pulsation) থাকে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তখনও গর্ভফুল ও সন্তানের মধ্যে রক্তের আদান প্রদান চলিতেছে। অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, **নাভিরজ্জুর স্পন্দন না থামিলে এবং সন্তান কাঁদিয়া না উঠিলে** নাভিরজ্জু কাটা উচিত নহে। কারণ, তখন সন্তানের বেশী রক্তের প্রয়োজন এবং ঐ অবস্থায় রক্তের আদান প্রদান রোধ করা উচিত নয়।

দেহ পরিষ্কার করা—নাড়ী কাটিয়া সন্তানকে মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পরবর্তী কর্তব্য তাহার অঙ্গের ক্লেদ পরিষ্কার করা। ইহার জন্য বন্ধ ঘরে শিশুর সর্বাঙ্গে অলিভ অয়েল (Olive oil) অথবা অপর কোনও অঝাঁঝাল পরিষ্কার তৈল (সরিষার নহে, কারণ ইহা ঝাঁঝাল) ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া, মাখাইতে হইবে, ইহাতে ক্লেদ উঠিয়া যাইবে। তাহার পর সাবান মাখাইয়া সহমত গরমজল-পূর্ণ গামলায় শিশুর দেহ ডুবাইয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইতে হইবে। অঙ্গের ক্লেদ উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিলে বা তৈল না ফুটাইয়া মাখাইলে শিশুর সর্বাঙ্গে নানা আকারের বিচর্চিকা বাহির হইতে পারে—ঐগুলিকে চলিত কথায় "মাসীপিসী" বাহির হওয়া বলে—এগুলি বড়ই কষ্টদায়ক এবং ইহার ফলে সর্বাঙ্গে 'ঘা'ও হইতে পারে।

চক্ষুর যত্ন—প্রসবের সময় শিশুর মস্তক বাহির হইলেই তাহার চক্ষু মুছাইবার কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। শিশুকে স্নান (Baby bath) করানো হইয়া গেলে তাহাকে মুছাইয়া দুই চক্ষে ১ ফোঁটা করিয়া, ১০০ ভাগ জলে ১ ভাগ সিলভার নাইট্রেট মিশ্রিত দ্রবণ (1% Silver Nitrate Solution) দিয়া আবার নর্ম্যাল স্যালাইন লোশান (Normal Saline lotion) দ্বারা ধুইয়া দিতে হইবে। কিংবা দুই চক্ষুতে কোনও কষ্টকবিহীন জীবাণু-ধ্বংসকারী

ঔষধ, বোরিক লোশনে ধৌত করা কাঁচের ফোঁটা ফেলা কাঠি (dropper) দিয়া দিবেন। ইহার জন্য ক্রুক্স কলোস্যাল সিলভার (Crooks collosal silver) বেশ নিরাপদ ও ভাল।

ইহার পর শিশুর নাভির চারিদিক অ্যালকোহল (Absolute alcohol বা Rectified spirit) দ্বারা মুছিয়া নাভিরজ্জুর কাটাস্থানে পুনরায় Tinc. Iodin দিয়া Dusting powder বা বোরিক পাউডার (Acid boric) দ্বারা নাভিরজ্জু ঢাকিয়া তাহার উপর তুলা দিয়া বাঁধিতে হইবে।

জামা পরানো—এইবার শিশুকে ঋতু অনুযায়ী জামা পরাইয়া শয্যায় লইয়া গেলেই হইল। 'গরম জামা পরাইতে হইবে' একথা শীতপ্রধান দেশের পক্ষে ঠিক বটে, কিন্তু আমাদের দেশে শীতকাল ঠাণ্ডার দিন ব্যতীত গরম কাপড় পরানো ঠিক নহে। তবে অকালে জন্মানো অপরিণত শিশুকে ঋতু নির্বিশেষে গরম কাপড় পরাইতে হয়। অনেক সময় উত্তাপ প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইয়া পড়ে।
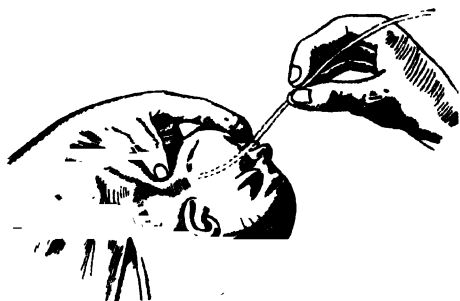
(৮১ নং চিত্র)
শিশুর শ্বাসনলী পরিষ্কার

সন্তান না কাঁদিলে কি করা কর্তব্য—এই বিষয়ে পূর্ববর্তী 'প্রসব' অধ্যায়ের 'শিশুকে কাঁদানো' পর্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে। জন্মিয়া শিশু শ্বাস গ্রহণ না করিলে প্রধান কর্তব্য তাহার শ্বাসপথ পরিষ্কার করা, হার্টের কাজ যাহাতে বন্ধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং শরীরের উত্তাপ বজায় রাখা। প্রথম অবস্থায় শিশু নীলবর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় শ্বাস লওয়া সহজসাধ্য পরে অবস্থা যখন আরও গুরুতর হয় তখন শিশুর সর্বাঙ্গ সাদা হইয়া আসে, হার্টের কাজও কমিয়া যায়—এই অবস্থায় প্রতিকার কষ্টসাধ্য।

সন্তান প্রসূত হইবার পরেই তাহার মস্তক নিম্নাভিমুখী করিয়া ধরিয়া পৃষ্ঠে বা পায়ের তলায় চপেটাঘাত করার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেও না কাঁদিলে মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গরমজল-পূর্ণ গামলার মধ্যে শিশুর দেহ ডুবাইয়া তাহার বুকে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হয়। তাহাতেও না

কাঁদিলে মিউকাস্ ইভ্যাকুয়েটার (Mucus evacuator) নামক যন্ত্রের বা রাবার ক্যাথেটারের (Rubber Catheter) সাহায্যে শিশুর শ্বাসনালী পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিতে হয় (৮১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার বেশী দরকার হয় না। যদিই ইহাতেও না হয় তাহা হইলে শিশুর নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদির উপর একটি কাপড় চাপা দিয়া নাকের ছিদ্রের উপর আঙ্গুল দিয়া সন্তানের মুখের উপর মুখ দিয়া জোরে ফুঁ দিতে হয়। এই ফুঁ দেওয়ার সময় শিশুর পেটের উপর একটি হাত রাখিতে হয় যাহাতে হাওয়ায় পেট ফুলিয়া না

(৮২ নং চিত্র)

শিশুর মুখে ফুঁ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো

ওঠে। উপরের চিত্রে নাকের ছিদ্রে আঙ্গুল চাপা না দিয়া ফুঁ দেওয়ার দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। ইহাতে নাক দিয়া হাওয়া বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। তাহাতেও না কাঁদিলে শিশুকে গামলা হইতে বাহির করিয়া গরম কাপড়ে মুড়িয়া মাথা নীচু করিয়া শোয়াইয়া মুখে দুই চার ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি বা রাম (Brandy বা Rum) দিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ নাভিরজ্জুতে কোবেলাইন (Cobeline) নামক ইনজেক্সান দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—চিকিৎসকের সাহায্য অবিলম্বে দরকার। অনেক স্থলে এই অবস্থায় কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস (Artificial Respiration) বহাইবার চেষ্টা করা হয়—অনেক চিকিৎসকও ইহা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদদের মত এই যে, **শিশুকে কখনই কৃত্রিমভাবে নিশ্বাস বহাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে। অনেক ক্ষেত্রে শুধু এই কারণেই অনেক শিশু মারা যায়।**

গর্ভপাত—প্রসবে বিঘ্ন

গর্ভপাত (Abortion)

প্রথম তিন মাসের মধ্যে ভ্রূণ স্খলিত হইয়া গেলে উহাকে **গর্ভস্রাব** (Sponteneous abortion); উহার পরের তিন মাসের মধ্যে ঐরূপ হইলে তাহাকে **গর্ভপাত** (Miscarriage); এবং শেষ তিন মাসের মধ্যে, পূর্ণ সময়ের পূর্বে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এরূপ সন্তান-প্রসবকে **অকাল-প্রসব** (Premature delivery) বলা হয়। বাংলায় গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

প্রায় প্রতি ৪ বা ৫ জন গর্ভিণীর মধ্যে একজনের গর্ভপাত হয়। প্রথম গর্ভাধানে গর্ভপাতের আশঙ্কা বেশী থাকে। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখনও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়সমূহের সন্তানধারণ-ক্ষমতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। অনেকের আকস্মিক কারণে গর্ভপাত হয়; অন্য সময় হয়ত আবার তাহার স্বাভাবিক রীতিতে সন্তান-প্রসব হইয়া থাকে। কাহারও আবার ৪।৫টি সন্তান-প্রসবের মধ্যে হয়ত ২।৩ বার গর্ভপাত হইয়া যায়। কাহারও আবার গর্ভপাত অভ্যাসের মধ্যে গিয়া দাঁড়ায়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ কোনও কারণে **মরিয়া গেলে** জরায়ু উহাকে অনাবশ্যক পদার্থ হিসাবে বাহির করিয়া দেয়। ভ্রূণের মৃত্যুর ঠিক পরেও তাহা বাহির নাও হইতে পারে।

কখন হয়—সাধারণত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে গর্ভ না হইলে যে যে সময়ে মাসিক হইতে পারিত গর্ভস্রাব সেই সময়ে হইয়া থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণ পিতা বা মাতা হইতে সংক্রামিত ব্যাধির দরুনই মরিয়া যায়। মৃতবৎসা দোষেরও প্রধান কারণ মাতার **উপদংশ**। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্বামীর দ্বারাই সংক্রামিত হন।

গর্ভপাতের কারণ বহুবিধ যথা:—গর্ভিণীর প্রবল জ্বর, **উপদংশ**, **মূত্রাশয়ের পীড়া**, গর্ভাবস্থায় ব্যাধি, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের রসক্ষরণের

গোলযোগ, **জরায়ুগাত্রের প্রদাহ, জরায়ুর স্থানচ্যুতি**, জরায়ু স্ফীতি, প্রসব পথের গুল্ম, গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম, অধিক ভারী বস্তু উত্তোলন, কড়া জোলাপ, তলপেটের উপর চাপ দেওয়া বা আঘাত লাগা, উচ্চ স্থান হইতে পতন, অধিক দৌড়াদৌড়ি বা লম্ফ-ঝম্প, পদব্রজে অধিকদুর ভ্রমণ, ক্রমাগত অথবা প্রায়ই রাত্রি জাগরণ, উদরে কিল, চড়, ঘুষি, লাথি প্রভৃতি মারা, প্রায়ই ক্লান্তি বোধ লাগা সত্ত্বেও কাজ করিয়া যাওয়া, স্বামী ও স্ত্রীর রক্তের একটি গুরুতর পার্থক্য (অর্থাৎ একজনের R. H. Positive ও অপরের R. H. negative হওয়া), পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে কাজ করা প্রভৃতি। জরায়ুগ্রীবা যদি গভীরভাবে ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে প্রত্যেক বার গর্ভ হইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ ভ্রূণের ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়ার চাপ জরায়ু মুখের ভিতর দিকের পেশীগুলি সহ্য করিতে পারে না। **গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে** (বিশেষত গর্ভ না হইলে যে যে সময় ঋতু হইত সেই সময়ে) সাধারণ আসনে, উদরে চাপ দিয়া, সজোরে এবং অত্যধিক সম্ভোগেও গর্ভপাতের সূচনা করে। * কামের অথবা অন্য কোনও প্রকারের অত্যধিক **উত্তেজনা, ভীতি, শোক** ইত্যাদি **মানসিক কারণেও** গর্ভপাত হইতে পারে।

প্রতিকার—গর্ভ না হইলে যে যে সময় ঋতু হইতে পারিত তখন অসোয়াস্তি বোধ হইলে অধিকক্ষণ চুপচাপ শয়ন করিয়া থাকাই ভাল। (ক্লান্তি বোধ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্রাম না করিলে নিজের এবং গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়)। কোষ্ঠবদ্ধ হইতে দিবেন না। ইহার জন্য পূর্ব লিখিত ব্যবস্থা অনুসারে চলিবেন। সুপথ্য ও ব্যায়াম সত্ত্বেও কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে, এনিমা লওয়া উচিত। তাহার সুবিধা না থাকিলে, খুব মৃদু জোলাপ যথা লিকুইড প্যারাফিন (Liquid Paraffin) অথবা ফিলিপস্ মিল্ক অফ ম্যাগ্‌নেশিয়া ব্যবহার করিবেন। পাশ করা ডাক্তার, নার্স বা দাইকে জরায়ু ঠিক স্থানে আছে কি না তাহা দেখিতে বলিবেন।

গর্ভস্রাবের বিশেষ প্রবণতা থাকিলে সারা গর্ভকাল স্বামী সহবাস অবশ্যই বন্ধ রাখিতে হইবে।

গর্ভপাতের পর ৩।৪ বৎসর গর্ভ না হওয়াই ভাল। তাহাতে পেটের যন্ত্র-গুলি বিশ্রাম এবং শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে গর্ভনিবারণের

---

* 'গর্ভাবস্থায় সহবাস' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দেখুন।

কোনও পন্থা, প্রত্যেক সঙ্গমের পূর্বে যথাযথভাবে এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে।

পূর্বে গর্ভপাত বা তাহার উপক্রম হইয়া থাকিলে

বিধি—দ্বিতীয় মাসের মধ্যভাগ হইতে চতুর্থ মাসের শেষ অবধি বিছানায় শুইয়া খুব বিশ্রাম করিতে হইবে। সকালের জল-খাবার বিছানাতেই শুইয়া বা বসিয়া খাইবেন। দুপুরে অন্তত দুই ঘণ্টা শুইয়া থাকিবেন। গর্ভের প্রারম্ভেই ডাক্তারকে গতবারের সমস্ত কথা জানাইয়া তাঁহার উপদেশ মত চলিবেন।

নিষেধ—গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাই অথবা স্বামী পুত্রের কষ্ট হইবে ভাবিয়া অধিক পরিশ্রম করিলে চলিবে না। নিজে না করার জন্য যে কাজ হইবে না তাহার জন্য মনের অস্থিরতা দমন করিতে হইবে এবং অপরদের কিছু কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতেই হইবে। মোটরে অধিক দূর যাইবেন না। স্বামী ও নিজে স্বতন্ত্র ঘরে শয়ন করিবেন। শরীর ও মনের সর্বপ্রকার উত্তেজনার কারণ-সমূহ এড়াইয়া চলিতে হইবে। ক্লান্তিকর পরিশ্রম বা ব্যায়াম করিবেন না। জোলাপ লইবেন না। আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি যাঁহার বাড়ীতে সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হাম, বসন্ত বা পান বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হইয়াছে তিনি এইরূপ রোগিণীর অথবা কোনও প্রসূতির আঁতুড় ঘরে যাইবেন না।

যদি ডাক্তার না পাওয়া যায় এবং রক্তস্রাব বাড়িতে থাকে

প্রসূতিকে চিৎভাবে শোয়াইয়া প্রস্রাব করান। নিজের দুই হাতের নখ কাটিয়া ঘষিয়া সাবান জল দ্বারা হস্ত উত্তমরূপে ধৌত করুন। নিজের নাক ও মুখের উপর ধোয়া রুমাল বা ন্যাকড়া বাঁধুন নতুবা আপনার নিশ্বাসের সহিত দুষ্ট জীবাণু বাহির হইয়া রোগিণীর যৌনাঙ্গের খোলা ঘায়ে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্ত বিষাক্ত করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে। তাহার পর রোগিণীর যোনিপ্রদেশ সাবান ও অল্প গরম জল দ্বারা ধৌত করুন। আবার নিজের দুই হাত সাবান জল দিয়া ধুইয়া লাইসল লোশনে ডোবান, অথবা তাহাতে টিংচার আইওডিন মাখান। বোরিক গজ অথবা ধোয়া কাপড় ৩।৪ অঙ্গুলি চওড়া লম্বালম্বি ছিঁড়িয়া অর্ধ ঘণ্টা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া নিন। ইহার পর বাম হস্তের

তর্জনী ও মধ্যমা প্রসব পথের মধ্যে (যতদূর যায়) দিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দিয়া উক্ত বোরিক গজ, বা সিদ্ধ স্যাকড়ার ফালি **ভাল করিয়া ঠাসিয়া** দিবেন। যদি এই দুইটি না পাওয়া যায় তবেই বোরিক তুলা ঠাসা উচিত কারণ তাহার হাঙ্গামা বেশী।

বোরিক তুলা ব্যবহার করিতে হইলে ঐ তুলার ১০।১২টি টুকরা করিয়া প্রত্যেকটির সহিত ৪।৬ আঙ্গুল লম্বা এক একটি সুতা বাঁধিয়া, ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া ব্যবহারের সময় নিংড়াইয়া লইবেন। ইহার পর তুলার টুকরাগুলি ভিতরে দিবার সময় সেগুলি গুণিয়া লিখিয়া রাখিবেন, এবং দেখিবেন যেন তাহাতে বাঁধা সুতার ডগাগুলি বাহিরে থাকে, যাহাতে ঐগুলি ধরিয়া টানিয়া তুলার দলাগুলি সহজে বাহির করা যায়। বাহির করিবার সময় গুণিয়া দেখিয়া লইতে হইবে যে সবগুলিই বাহির হইল কিনা, কারণ তুলা ভিতরে থাকিয়া গেলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে।

২৪ ঘণ্টা পরে ঐ গজ, তুলা বা স্যাকড়া বাহির করিতে হইবে। যদি তাহার পূর্বেই সেগুলি রক্তে ভিজিয়া যায়, তাহা হইলে তখনি সেগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি আবার **শক্ত (আঁট) ভাবে** নূতন বস্তুচয় (পূর্বোক্ত ভাবে সিদ্ধ করিয়া) ঠাসিয়া দিবেন এবং ডাক্তার ডাকিবেন, অথবা সম্ভব হইলে হাসপাতালে অবশ্য পাঠাইবেন। স্রাবের সহিত যে সমস্ত দ্রব্য বাহির হইয়াছে সেগুলিও রোগিণীর সহিতই হাসপাতালে পাঠানো উচিত। প্রসূতিকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করানোই ভাল, কারণ বহু দিন যাবৎ রাত দিন তাহার সেবা যত্ন দরকার।

গর্ভপাতের পূর্ব লক্ষণ—জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব এবং বারবার ঋতুর সময়ের মত তলপেট, কোমর, পিঠ ও হাতে-পায়ে বেদনা। ইহা ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ উপসর্গও দেখা দিতে পারে।

জরায়ুর ভিতর দিকের আস্তর হইতে ভ্রূণ যত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে রক্তস্রাব ততই অধিক হয়। যদি অধিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ভ্রূণের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহাকে বাহির করিয়া দিবার জন্য জরায়ুর সঙ্কোচন আরম্ভ হয়। তাহার ফলে, বাধক বেদনার খিল ধরার মত, পরন্তু তাহা অপেক্ষাও তীব্রতর, অবিরাম বেদনা বারবার আসে ও যায়।

গর্ভাবস্থায়, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পূর্বে মুখ-গহ্বরের যে তাপ থাকে তাহার হঠাৎ হ্রাস গর্ভপাতের সূচনা করে।

শুশ্রূষা—গর্ভপাতের পূর্ব লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করিলেই শয্যাগ্রহণ করা উচিত। এ সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন। খাদ্য লঘু হওয়া উচিত এবং গরম দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ।

রক্তস্রাব দেখিলে ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না যে ২।১ মাস কোনও কারণে ঋতু বন্ধ ছিল, এখন অমুক ঔষধ খাওয়ায় অথবা অমুক উপায় অবলম্বনের ফলে, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। বরং ইহা ধরিয়া লইয়া কাজ করা নিরাপদ যে গর্ভ হইয়াছিল এবং তাহা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। (যদিও কখনও কখনও খুব কম নারীর গর্ভে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসেও ঋতু রক্ত দেখা দেয়, এবং কোনও কোনও গুরুতর রোগে * গর্ভাবস্থায় স্ত্রী অঙ্গ দিয়া রক্তপাত হইয়া থাকে)।

চায়ের চামচের এক চামচ (৬০ ফোঁটা বা এক ড্রাম) চুনের জল আধ ছটাক ভাল জলের সহিত মিশাইয়া, ৪ ঘণ্টা অন্তর, দিনে ৪ বার পান করিতে দিবেন। রক্ত বন্ধ করার জন্য ডাক্তারী ঔষধ আর্গট (ergot) দেওয়া আবশ্যক।

খাটের পায়ের দিকে ইঁট প্রভৃতি রাখিয়া উঁচু করিবেন। মেঝেতে শুইয়া থাকিলে প্রসূতির কোমরের নীচে বালিশ দিয়া কোমর উঁচু করিয়া রাখিতে হইবে।

রোগিণীকে গরম কাপড় ঢাকা দিবেন এবং তাহার পাশে ও পায়ের কাছে গরম জলের ব্যাগ বা বোতল রাখিবেন। তাহাকে আশা, ভরসা ও সান্ত্বনা দিতে হইবে। জোলাপ দিবেন না। যদি বুঝা যায় যে গর্ভপাত হইবেই তাহা হইলে এনিমা দিবেন। কার্বলিক সাবান দ্বারা অতি উত্তমরূপে হাত ধুইয়া (সম্ভব হইলে তাহার পর লাইসল লোশনে হাত ডুবাইয়া তবে রক্ত-স্রাবের স্থানে হাত দিবেন। তখন নিজের নাক ও মুখের উপর কাপড় বাঁধিয়া দিবেন নতুবা নিশ্বাসের সহিত বিপজ্জনক জীবাণু (germs) বাহির হইয়া রোগিণীর জননেন্দ্রিয়ের খোলা ঘায়ে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্ত বিষাক্ত করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে। অবিলম্বে **চিকিৎসকের সাহায্য** গ্রহণ করা উচিত। ভ্রূণ ও উহার সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ সম্পূর্ণ বাহির হইয়া না গেলে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

---

* যথা Chorionepithelioma, Hydatidmole, Ecoptic pregnancy, Placenta praevia প্রভৃতি।

যাহা কিছু বাহির হয় সে সমস্ত সযত্নে রাখিয়া দিতে হইবে যাহাতে ডাক্তার আসিয়া সেগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে ভ্রূণ, ফুলের সমস্তটি এবং সমস্ত আনুষঙ্গিক ঝিল্লী (membranes) বাহির হইয়া গিয়াছে কি না। কিছু ভিতরে থাকিয়া গেলে হঠাৎ বেশী রক্তস্রাব হইতে পারে ও বিষাক্ত (septic) সুতিকা জ্বরে (Puerheral fever) মৃত্যু হইতে পারে। ভিতরে কিছু থাকিয়া গেলে ডাক্তার সমস্ত বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। হাসপাতালে রোগিণীকে এবং যাহা কিছু বাহির হইয়াছে সে সমস্তই লইয়া যাওয়া উচিত।

ডিসকাইসিস্‌ (Dyskysis)—উপদংশের (গরমির, সিফিলিসের) জীবাণু নারীর শরীর থাকিলে, অথবা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে, গর্ভের প্রথম দিকেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সকলে মনে করে যে কোনও কারণে ২।১ মাসে ঋতুবন্ধ ছিল, তাহা অমুক ঔষধ সেবনে অথবা তাবিজ, মাদুলি বা শিকড় ধারণের ফলে, কিংবা আপনিই পরিষ্কার হইয়া গেল। গর্ভস্রাব বলিয়া বুঝা যায় না। ডাক্তাররা এই অবস্থাকে ডিস্‌কাইসিস (Dyskysis) বলেন। ওয়াশারম্যান রিএ্যাকসান (Wassermann Reaction) সংক্ষেপে W. R. অথবা কান (Kahn) নামক প্রণালীতে রক্ত পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে সিফিলিস আছে তাহা হইলে তাহার অধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করাইলে তাহা আরোগ্য হইবে ও তাহার পর আর গর্ভপাত হইবে না।

হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী, হেকিমী বা টোটকা চিকিৎসায় ঐ সকল রোগ কখনও নির্মূল হয় না।

যদি দেখা যায় যে, সিফিলিস নাই, পরন্তু কোনও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির গোলযোগ আছে, তবে তৃতীয় মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ লুটিয়্যল (Luteal) হরমোনের ৫ মিলিগ্রামের (5 m. g.) একটি বটিকা এবং তিন মিলিগ্রাম ভিটামিন ই (E) সেবন করিতে হইবে।

গর্ভাবস্থায় যে সকল বিষয়ে সাবধান হইবার উপদেশ 'গর্ভাবস্থায় বিধিনিষেধ' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে তাহা পালন করিলে গর্ভপাতের হাত হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

রক্ত বন্ধ হইবার পরও ২৪ ঘণ্টা শুইয়া থাকিতে হইবে। গর্ভিণীর গায়ে গরম কাপড় ঢাকা দিয়া তাহার দুই পার্শ্বে এবং পায়ের তলায় গরম জল বন্ধ করিয়া রাখিবার রবারের ব্যাগ অথবা আঁটভাবে বন্ধ করা গরম

জলের বোতল রাখিবেন। তাহাকে আশা, ভরসা ও সান্ত্বনা দিতে হইবে। জোলাপ দিবেন না। যদি বোঝা যায় যে গর্ভপাত হইবেই তাহা হইলে এনিমা দিবেন। প্রায় ১০ দিন শুইয়া থাকিতে হইবে।

পথ্য—প্রারম্ভে শুধু জল। বারবার জলপান করাইতে হইবে, পরে শুধু পাকা ও শুষ্ক ফল ও ফলের রস। রোগিণীকে খাইতে দিবার সময়েই ফল তাহার কাছে আনিবেন, অপর সময়ে অন্যত্র রাখিবেন। ২।১ দিন পরে, যতদূর সম্ভব, রাঁধা খাবার না দিয়া, কাঁচা স্যালাড প্রভৃতি দিবেন। গরম খাদ্য বা পানীয় দিবেন না।

ভবিষ্যতে নিবারণ—উপরের লেখা কারণগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টির জন্য গর্ভপাত হইতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া সেগুলি দূর করা এবং 'প্রতিষেধ' ও 'পূর্বে গর্ভপাত বা তাহার উপক্রম হইয়া থাকিলে' শীর্ষক বিষয়গুলির উপদেশাবলী পালন করা আবশ্যক।

সিফিলিস অথবা অন্তঃস্রাবী কোনও গ্রন্থির রসক্ষরণের গোলযোগ থাকিলে যথা কর্তব্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 'ডিস্‌কাইসিস্' শীর্ষক পর্যায়ে বলা হইয়াছে।

প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া—এই বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

ঘাম ঝরানো—গর্ভিণীকে লেপ বা কম্বল চাপা দিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে অথবা ডাক্তার ডাকিতে হইবে।

কৃত্রিম গর্ভপাত—গর্ভিণীর গুরুতর পীড়া ইত্যাদির দরুন উহার পক্ষে প্রসব-প্রক্রিয়া মারাত্মক হইতে পারে বলিয়া ডাক্তারেরা অনেক সময়ে কৃত্রিম গর্ভপাতের (Induced abortion) পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত অবৈধ প্রণয়ের ফলে অবিবাহিতা বালিকা বা বিধবার গর্ভ হইলেও গোপনে কৃত্রিম গর্ভপাতের (ভ্রূণ হত্যার) ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার গর্ভপাতের সংখ্যা পাশ্চাত্ত্য দেশে অধিক; ছেলেমেয়েদের এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগে অবৈধ গর্ভের সূচনা হইয়া থাকে। জার্মাণীতে পূর্বে প্রতি বৎসর ১,০০০,০০০ এবং আমেরিকায় ৮০০,০০০ হইতে ২,০০০,০০০ পর্যন্ত অবৈধ গর্ভপাত করা হইত বলিয়া অনেকে বলেন। আমাদের দেশেও গর্ভপাতের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে।

লোকলজ্জাভয়ে গোপনে হাতুড়ে কবিরাজ, অনুপযুক্ত ডাক্তার বা অজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্যে যে সকল গর্ভপাত করানো হয় তাহার পরিণাম প্রায়ই বিষময় হইয়া থাকে। গর্ভিণীর শারীরিক অনিষ্ট, চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ

এমন কি রোগবীজাণু সংক্রমণের দরুন মৃত্যুও অনেক সময়ে অনিবার্য হইয়া পড়ে।

গোপনে হাতুড়ে কবিরাজ, অজ্ঞ ধাত্রী বা গর্ভিণী নিজে অপরের পরামর্শে গর্ভপাত করাইবার জন্য যে যে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

জরায়ুর মধ্যে গাছের ডাল বা শিকড়, বোনার ছুঁচ, পেন্সিল, কাঁচি, চুলের কাঁটা প্রভৃতি প্রবেশ করানো ; যোনি বা জরায়ুর মধ্যে কোনও গরম বা উত্তেজক (irritant) তরল দ্রব্য যথা সাবান জল, আইওডিন, গ্লিসারিন, ভিনিগার, কাপড় ধোয়া সোডার জল ইত্যাদি প্রবেশ করানো ; জরায়ু-মুখে ডুশের নলের মুখ ঢুকাইয়া জোরে ডুশ করা, ইত্যাদি।

এই সকল প্রক্রিয়া বিশেষ মারাত্মক। ইহার ফলে জননেন্দ্রিয়সমূহের অনিষ্ট এবং জরায়ুতে অথবা অপর স্থানে রোগ বীজাণু সংক্রামিত হইয়া **মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে**। ঔষধের মধ্যে কুইনাইন, আরগট, কড়া জোলাপ, কোনও ধাতুর লবণ, সরিষা, পেনি বা পেরেক ভিজানো জল, লোহার গুঁড়ার সহিত বিয়ার, জিন বা অন্যান্য মদ্যপান ইত্যাদি গর্ভপাত করে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে।

আঘাতাদির দ্বারা : যথা, সিঁড়িতে ওঠা-নামা, পেটে চাপ দেওয়া, ভারি জিনিস তোলা, বাইসিকেল চড়িয়া উপর দিকে ওঠা প্রভৃতি খুব কম ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয়, ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ডাক্তারেরা এখনও এমন ঔষধ পান নাই যাহা দিয়া গর্ভিণীর যথেষ্ট অনিষ্ট না করিয়া গর্ভপাত করানো যায়।

তথাপি খবরের কাগজ খুলিলেই অসংখ্য বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। 'সেবনমাত্র ঋতু পরিষ্কার হইবে', 'ঋতু অনিয়মিত হইলে পরিষ্কার হয়', 'গর্ভকালে সেবন নিষিদ্ধ কারণ ইহা গর্ভপাত করে' ইত্যাদি ঔষধ গর্ভপাত করে মনে করিয়া অনেক গর্ভিণী ব্যবহার করিয়া থাকে। বলা-বাহুল্য, এই সকল ঔষধে কোনই ফল হয় না ; বরং ইহারা শরীরের প্রভূত অনিষ্ট করে।

কাহারও নানা কারণে সাময়িকভাবে ঋতু বন্ধ হইলে বা কাহারও এমনিই গর্ভপাত হইয়া যাইত—এই অবস্থায় কোনও ঔষধ সেবনের পরে ঋতু পুনরায় দেখা দিলে বা গর্ভপাত হইয়া গেলে, ঐ ঔষধের কৃতিত্ব অযথা প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র।

স্বাভাবিক প্রসবে যত প্রসূতি-মৃত্যু হয় কৃত্রিম গর্ভপাত করাইতে গিয়া তাহার বহুগুণ বেশী গর্ভিণী-মৃত্যু হয়—ইহা স্মরণ রাখিবেন।

উপযুক্ত ডাক্তার যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গর্ভপাত করাইলে বিশেষ কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

ডাক্তারেরা ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া গর্ভিণীর জরায়ুমুখ যন্ত্রপ্রয়োগে খুলিয়া জরায়ুর ভিতর হইতে ভ্রূণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। এই প্রক্রিয়াকে Dilatation and curettage, অথবা সংক্ষেপে D. C. বলে। জার্মাণীতে অপর একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ নলের (Syringe) সাহায্যে বিশেষ এক রকমের নির্দোষ আঠাল পদার্থ (antiseptic paste) জরায়ুতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। জরায়ুর মধ্য হইতে এই পদার্থটিকে বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ২৪।২৮ ঘণ্টার মধ্যে জরায়ু মধ্যস্থ ভ্রূণসমেত উহা বাহির হইয়া আসে। কদাচিৎ সমস্তটা বাহির হইয়া না আসিলে যন্ত্রযোগে জরায়ুর ভিতরটা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

এই প্রক্রিয়ায় ছয়মাসের ভ্রূণ এমন কি, পূর্ণগর্ভার ভ্রূণ জরায়ুতেই মরিয়া গিয়া থাকিলেও বাহির হইয়া আসে। তবে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ইহা করাইতে হয়।

রুশিয়ায় অবৈধ, গোপনীয় এবং বিপজ্জনক গর্ভপাতের হাত হইতে গর্ভিণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারী হাসপাতালে সরকারী তত্ত্বাবধানে আইন বলে গর্ভপাত করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় গর্ভিণীদের মৃত্যুসংখ্যা একেবারে নগণ্য হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগকে এই সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হইবে **উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাতের ব্যবস্থাকে আইনসঙ্গত এবং সর্বসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রণালীসমূহে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে**। এ সম্বন্ধে আমি আমার ইংরাজী পুস্তক, Crime and Criminal Justiceএ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

উপযুক্ত ডাক্তার ক্ষেত্রবিশেষে গর্ভপাত করাইবার জন্য যে পর্যন্ত আইনের অনুমতি না পান, ততদিন পর্যন্ত হাতুড়ে কবিরাজ ও ধাত্রীদের গোপন ব্যবসা চলিতে থাকিবে এবং সমাজের ভীষণ ক্ষতি হইতে থাকিবে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় 'সুজাতা সরকার' এর মৃত্যু সম্পর্কে মকদ্দমা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইদানীং সমাজে সকাল সকাল বিবাহ হইতে না পারায় মেয়েদের পদস্খলনের সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বহুল প্রচলিত না থাকায় অসংখ্য বিধবাকে সারাজীবন পুরুষ সংসর্গ এড়াইয়া চলিতে হয়। রক্তমাংসের শরীরে স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সা অব্যাহত থাকার দরুন উহাদের পদস্খলন হওয়া স্বাভাবিক; আবার পুরুষের বলপ্রয়োগে বা প্রলোভন দেখাইয়া উহাদের ভ্রষ্টা করার দৃষ্টান্তও কম নহে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া না জানায় বা ব্যবহার করিবার সুযোগ বা প্রবৃত্তির অভাবে অবিবাহিত মেয়েদের বা বিধবাদের গর্ভসঞ্চার হইয়া পড়িলে উহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। গর্ভপাত না করাইতে পারিলে তাহাদের পদস্খলনের কথা সকলেই জানিতে পারিবে এই ভয়ে তাহারা ব্যস্ত হইয়া যাহা-তাহা ব্যবহার করে এবং ভীষণ অনিষ্টের সম্ভাবনাও বরণ করে। উহাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনেরও লজ্জার সীমা থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে, গর্ভিণী ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের জ্ঞাতার্থে আমি বলিতে বাধ্য :

(১) তাঁহারা যেন হোমিওপ্যাথ, হেকীম, কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তার বা ধাত্রী দ্বারা গর্ভপাত করাইতে চেষ্টা না করেন। ইহাতে গুরুতর অনিষ্ট এমন কি জীবন নাশ পর্যন্ত হইতে পারে।

(২) বহু বিজ্ঞাপিত 'ঋতু প্রবর্তনকারী' ঔষধসমূহ বিষবৎ বর্জনীয়।

(৩) বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হইবার আশঙ্কা থাকিলে উপযুক্ত ডাক্তার দিয়া পূর্ববর্ণিতভাবে গর্ভপাত করাইয়া লইতে পারেন। জরায়ুমুখ খুলিয়া ভিতরটা পরিষ্কার করা অথবা জরায়ুমুখ দিয়া আঠালো পদার্থবিশেষ ইন্‌জেকসনের কথা একটু পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৪) ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে গর্ভকাল পূর্ণ হইতে দিয়া সন্তান জন্মদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

গোপন-প্রসবের ব্যবস্থা

অবৈধ সংসর্গের ফলে এইরূপ সন্তান জন্মিলে প্রসূতি, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের লজ্জার সীমা থাকে না বলিয়া **কলিকাতা, দিল্লী, বেনারস ও নবদ্বীপে গোপন-প্রসবের কতকগুলি ব্যবস্থা আছে।**

নদীয়ায় অবস্থানকালে লেখককে তদন্ত প্রসঙ্গে নবদ্বীপের এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে।

নদীয়া জেলায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানে বহু ঠাকুর বাড়ী আছে। বহু দুর হইতে তীর্থযাত্রী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা এখানে পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসেন। সেই জন্য যাত্রীদের উপযোগী বহু হোটেল ও ভাড়াঘর আছে।

গর্ভিণীরা এখানে আসিয়া ভাড়াঘরে থাকিতে পারেন। সঙ্গে বয়স্থা কোনও আত্মীয়া এবং সম্ভব হইলে কাজকর্ম করিবার জন্য পুরুষ চাকর লইয়া আসা ভাল। বাসাঘরে থাকিয়া মাতৃ-মন্দির বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে খবর দিলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা ও পরামর্শের জন্য ডাক্তার বা ধাত্রী পাঠাইয়া থাকেন। পূর্ণগর্ভা হইলে বাসাঘর হইতে প্রসবাগারে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ প্রসব করাইয়া দেওয়া হয়। ইচ্ছা করিলে মাতা সন্তান লইয়া যাইতে পারেন অথবা কোনও আশ্রমে বা খ্রীষ্টানদের মিশনে লালিতপালিত হইবার জন্য রাখিয়া যাইতে পারেন। সাধারণত অবৈধ সংসর্গের সন্তান রাখিয়া আসা হয়। নিম্নলিখিত কার্য-বিবরণী উল্লেখযোগ্য।

মাতৃমন্দির

সাল	গর্ভিণী ভর্তি	সধবা	বিধবা	কুমারী
১৯৪৫	১৬৪	৭৬	৬৫	২৩
১৯৪৬ (১৮ই মে পর্যন্ত)	৫২	১৪	২৭	১১

শিশুজন্ম	মা লইয়া গিয়াছে	দত্তক হিসাবে লওয়া হইয়াছে	খ্রীষ্টান মিশন	মৃত্যু	আশ্রম
১৪৮	৭৩	১০	৩৮	২৭	×
৪৩	১২	২	১৩	১৩	৩

মাতৃমঙ্গল কুটির

সাল	গর্ভিণী ভর্তি	বৈধ	অবৈধ	প্রসব না হইয়া বিদায়	প্রসব না হইয়া মৃত্যু
১৯৪৫	১৩৫	২৯	১০৬	৩	৪
১৯৪৬ (৬ই মে পর্যন্ত)	৬৬	১০	৫৬	১	৩

মৃত প্রসব পুত্র—কন্যা	জীবিত সন্তান প্রসব পুত্র—কন্যা	প্রসবের পর মৃত্যু পুত্র—কন্যা	সন্তানসহ বিদায়
৫ ১০	৫৯—৫৪	১৩—১১	৮৭ *
৫ ৬ (৬ই মে পর্যন্ত)	২৭—১৭	৫—৩	৩৬ (২টি যমজ)

* বাকি সন্তান বোধ হয় আশ্রম, মিশন ইত্যাদিতে দেওয়া হইয়াছিল।

শিশু ও নারীরক্ষা আশ্রম

হেড অফিস কলিকাতা। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে নবদ্বীপে শাখা অফিস খোলা হয়।

১৯৪৫ সালের বাকী কয়েকদিনে ৬টি সন্তান প্রসব করানো হইয়াছে। সকলই অবৈধ; ইহাদের মধ্যে ৩টি সন্তান প্রসবের সময় এবং ২টি প্রসবের পরে মারা যায় এবং ১টি মাত্র জীবিত থাকে।

১৯৪৬ সালে মে মাস পর্যন্ত ৩টি সন্তান জন্মে—সকলেই জারজ। ১টি জীবিত এবং ২টি মৃত।

ইহা ছাড়াও নবদ্বীপে বোধ হয় আরও প্রসবাগার আছে।

এখানে গাভণীদের নিজেদের ব্যয় বহন করিতে হয়। প্রসূতিদের নাম-ধাম ইত্যাদি যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়।

এই সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য পায় না। পাওয়া উচিত। সাধারণের সাহায্যে ও চলিত আয় হইতেই ইহারা চলে।

সমাজ ইহাদের আবশ্যকতা ও উপকার স্বীকার করিতে বাধ্য।

বোধ হয় সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধানের অধীন না থাকায় এই সকল প্রসবাগার সময় সময় অতিরিক্ত টাকা আদায় করিয়া থাকে।

একটি বাসাঘরে থাকা কয়েকটি মেয়েকে তদন্তক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার সুযোগ লেখকের হইয়াছিল। **সকলেই বিধবা।** অবৈধ গর্ভসঞ্চার হওয়ায় পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজন এখানে পাঠাইয়াছিলেন। সকলের কাহিনীই মর্মন্তুদ।

...বালা—মেয়েটির বয়স ২৪। দেখিতে সুশ্রী। লেখাপড়া জানে। বিশিষ্ট ভদ্র ঘরের। বাড়ী উত্তর বঙ্গে। পিতা ডাক্তারী করেন। ৩৷৪ বৎসর হইল বিধবা হইয়াছে। ২ বৎসর স্বামী সঙ্গলাভ করিয়াছিল এবং কোন সন্তানাদি ছিল না।

পিতার অনুমতিক্রমে ও শ্বশুর-শাশুড়ীর উপরোধে বিধবা হইয়াও স্বামীর বাড়ীতেই থাকিত। একজন যুবক ঐ বাড়ীতেই থাকিয়া পোষ্ট অফিসে চাকুরী করিত। একই ঘরের এদিক ওদিক থাকাকালীন যুবকটি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে। পিতা টের পাইয়া মেয়েকে বাড়ী লইয়া আসেন। মেয়েটি ৩৷৪ মাস পর টের পায় যে সে গর্ভবতী। মাতা ও কাকা পরামর্শ

করিয়া বয়স্কা এক পিসিমাকে সঙ্গে দিয়া গোপন প্রসবের জন্য মেয়েটিকে নবদ্বীপে পাঠান। উহার বয়স্থা কুমারী ভগ্নী আছে তাই সকলেই উদ্বিগ্ন যাহাতে এই দুঃসংবাদ সমাজে প্রকাশ না পায়। মেয়েটি সুশ্রী, শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী, নিজের অবস্থায় নিজেই অনুতপ্তা। এখন ভালমতে প্রসব হইয়া গেলেই সে রক্ষা পায়।

...বালা দাসী—পূর্ববঙ্গে বাড়ী। পিতা মৃত। জাতিতে নমঃশূদ্র। বয়স ২৭। ২বৎসর হইল বিধবা হইয়াছে। কোনও সন্তানাদি ছিল না। মাতার অবস্থা সচ্ছল না থাকায় তাহাকে গ্রামের এ-বাড়ী ও-বাড়ীতে কাজ করিয়া খাইতে হইত। তাহার অবস্থার সুযোগ লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক সংসর্গ করে। প্রলোভনে পড়িয়া এবং নিজের যৌবন-ধর্মের প্রভাবে সে নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। গর্ভসঞ্চার হইয়াছে জানিতে পারিয়া সকলে তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছে।

অন্যান্য কাহিনীও প্রায় এইরূপ। বাংলা ও আসামের বহু জায়গা হইতে এমন কি, বাংলার বাহির হইতেও মেয়েরা বিপদে পড়িয়া এইভাবে নবদ্বীপে আসিয়া উদ্ধার পায়।

অভাবে গর্ভপাত করাইবার চেষ্টা না করিয়া এখানে পাঠানো অনেক ভাল।

বেনারস, **কাশী ও দিল্লীতে** এই রকম আশ্রম ও প্রসবাগার আছে। কাশী অনাথালয়, ষ্টেশন রোড, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট এইরূপ একটি।

এখানে থাকা ও খাওয়ার জন্য মাসিক ২০৲ হিসাবে দুই মাসের জন্য ৪০৲ এবং প্রসবের খরচ বাবদ ১৫৲ অগ্রিম দিতে হয়। সেখানে শিশু রাখিয়া আসিলে তাহার জন্য মাসিক ৫৲ অগ্রিম দিতে হয়। তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক মহিলা বলেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের খাদ্য নিকৃষ্ট ও বাঙালীদের উপযোগী নয়, এবং নৈতিক আবহাওয়াও ভাল নয়।

দিল্লীর ১১-১৩ নং রাজপুর রোডের 'সেবা সদন' আর একটি। এখানে আহার ও বাসের জন্য মাসে ৫০৲ এবং প্রসবের জন্য ৫০৲ দিতে হয়।

উপরোক্ত দুই স্থানের খরচের হারগুলি সম্ভবতঃ ১৯৪৮ এ জানা গিয়াছিল।

কলিকাতায় ২৬এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, জনৈকা মহিলা কর্তৃক একটি প্রসবাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে গর্ভাবস্থায় নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং পরিত্যক্ত শিশুরক্ষার সুব্যবস্থা করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

সরকারেরও এইরূপ গোপন-প্রসবের বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাতে বহু জীবন নষ্ট না হইয়া পরিত্রাণ পাইবে ও বহু পিতামাতা দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার হাত হইতে আংশিক নিষ্কৃতি পাইবেন।

শিশু মৃত্যু

গর্ভস্থ সন্তান জন্মিবার পূর্বেই নষ্ট হইয়া যাওয়া ছাড়া বহু শিশু স্বাভাবিক-ভাবে জন্মগ্রহণ করিবার পরেও অসাবধানতার জন্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়। শিশু-মৃত্যুর হারও ভারতবর্ষে প্রায় সর্বোচ্চ।

সমগ্র জীবজগতে সদ্যোজাত মানব-সন্তানই বোধ হয় সব চেয়ে নিরুপায়। তাহার বাঁচিবার আশা একমাত্র পিতামাতার যত্নের উপরই নির্ভর করে। পাশ্চাত্ত্য দেশে শিশুদের জন্য কত কষ্ট, ব্যয় এবং যত্ন করা হয় তাহার বিবরণ আমি পরবর্তী অধ্যায়ে দিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে উহাদের ভীষণ মৃত্যু-হারের কথাও উল্লেখ করিব।

প্রসবে বিঘ্ন

আমি এ পর্যন্ত মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে প্রসবের বিষয়েই উল্লেখ করিয়াছি। সুখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসব-কার্য স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়। প্রকৃতিই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বাজায় রাখিয়া প্রসব কার্যে সহায়তা করে।

তবে এ কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক প্রসবের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই এত জটিল যে, কখন, কোন্ স্তরে এবং কিভাবে সমস্যাবহুল উপসর্গ বা গোলযোগ দেখা দিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

প্রসব-বিজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব। এই বিজ্ঞানে পারদর্শী চিকিৎসকের সংখ্যাও এদেশে খুব বেশী নয়। পাঠক-পাঠিকারা যাহাতে প্রসবের স্থূল বিঘ্নসমূহের অন্তত মোটামুটি একটি ধারণা করিতে পারেন সেই জন্য আমি এখানে সামান্য আলোচনা করিব মাত্র।

স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় প্রসবকার্য অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিদের মধ্যে একটি সহজ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মাত্র। আবার পশুদের মধ্যে প্রসব কার্যে যেন বিঘ্নই হয় না, এরূপ ধারণা হইতে পারে। মুক্তস্থানবাসী অনুন্নত জাতিদের মধ্যে

প্রসবকার্য অনেক ক্ষেত্রে সহজ হইলেও তাহাদের মধ্যে অসংখ্য প্রস্থতি ও শিশু-মৃত্যু বা প্রসবকালে শিশু-মৃত্যু প্রকৃতির লীলা বলিয়াই মানিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

প্রসবযন্ত্রসমূহের এবং প্রসবের প্রকৃত প্রক্রিয়া না জানিয়া অশিক্ষিত বা অসভ্য জাতির লোকেরা গর্ভ হইতে সন্তান বাহির কবিবার নানা ফিকির-ফন্দী বাহির করিয়া লইত এবং এখনও লয়। নানা প্রকার টানা-টানি হেঁচড়া-হেঁচড়ির কথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ের প্রথম দিকেই বলিয়াছি।

এই সকল মারাত্মক প্রক্রিয়ার বিষময় কলঙ্কস্বরূপ বহু প্রস্থতি ও শিশুমৃত্যু যে হইত বা হয় তাহা অবধারিত সত্য।

প্রাচীনকালের মানব সমাজেও যে প্রসব-কার্যে অপরের সহায়তার দরকার হইত তাহার বিবরণ পুরাকালের শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়।

প্রসব-কার্যে বিঘ্নের প্রথম কারণ প্রসব পথের সঙ্কীর্ণতা। বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেরী ষ্টোপ্‌স্‌ বলেন যে, গর্ভস্থ শিশু সুস্থ, সবল ও পূর্ণকায় হইলেও দেখা যায় তাহার মস্তকের আকার প্রসব-পথের তুলনায় বড় হইয়া থাকে। এই জন্যই ভূমিষ্ঠ হইবার প্রক্রিয়ায় জাতকের মস্তক মুচড়াইয়া ঐ পথে বাহির হইবার উপযুক্ত হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, ২৫% সন্তান গর্ভে পরিপুষ্ট হইয়াও ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কেবলমাত্র এই কারণেই নষ্ট হইয়া যায়। বোধ হয় পেটে অস্ত্রোপচার করিয়া এই সমস্ত সন্তান বাহির করিতে পারিলে, উহাদের মধ্যে অনেকে বাঁচিয়া থাকিত।

তিনি বলেন, অনেকে আশঙ্কা করেন যে, মানব জাতির মস্তিষ্কের ক্রমবৃদ্ধি হেতু মানব সন্তানের মস্তকের আকারও বাড়িয়া যাইতেছে; ফলে মাতার প্রসব পথের সঙ্কীর্ণতা হয়ত নিরাপদ প্রসবের ঘোর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে থাকিবে।

আমরা আশা করিতে পারি যে, প্রকৃতি বংশ-রক্ষা করিবার জন্য জাতকের মস্তকের সহিত মাতার শারীরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে থাকিবে এবং মানুষও বুদ্ধি বলে আরও নানাবিধ উপায় ও কৌশল আয়ত্ত করিবে।

এই যুগেও প্রসব পথ সঙ্কীর্ণ হইলে ডাক্তারেরা তলপেট কাটিয়া সন্তান বাহির করিয়া আনিতে পারেন। ইহাতে অস্ত্রোপচারের পর প্রায় তিন সপ্তাহ বিছানায় থাকাকালীন মাতার কষ্ট হইলেও এই প্রক্রিয়া খুব বিপজ্জনক নহে। ইহাকে Caeserean Section বলে।

স্বাভাবিকভাবে প্রসব হইয়া যাইবে মনে হইলে যেরূপ স্বাভাবিকভাবেই হইতে দেওয়া উচিত, তেমনি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িলে, মাতার ও শিশুর নিরাপত্তার জন্য উহা করিয়া লইতেও ইতস্তত করা উচিত নয়।

প্রসব-পথের সঙ্কীর্ণতা ব্যতিরেকেও **মাতার ও সন্তানের নানাবিধ ব্যাধি বা বৈকল্যের দরুনও প্রসবে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে,** যথা মাতার শারীরিক দৌর্বল্য, জননেন্দ্রিয়সমূহের অপরিণত অবস্থা, প্রসব-পথের স্ফীতি, গর্ভস্থ সন্তানের অস্বাভাবিক অবস্থিতি, মাতার অত্যধিক ঝুলিয়া-পড়া পেট, গর্ভফুলের দোষ, একলাম্‌শিয়া রোগ, মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের পীড়া ইত্যাদি।

এই সমস্তই গর্ভ বা প্রসব অবস্থার দোষ বা ব্যাধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া যথাসময়ে ইহার প্রতিকার করা উচিত।

আমি প্রসবের প্রাক্কালে সন্তানের অবস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছি; সাধারণত শতকরা ৯৫ ক্ষেত্রেই সন্তানের মাথা নিম্নমুখী থাকে। তবে অন্যান্য অবস্থায় থাকিবার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে। এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকা উচিত এবং সন্তানের অবস্থিতি দুর্ভাগ্যবশত অস্বাভাবিক হইলেও ইহাতে বিশেষ ভয় পাইবার কারণ নাই। উপযুক্ত ডাক্তার এবং শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা ধাত্রী সহজেই এই বিঘ্নের প্রতিকার করিতে পারেন।

প্রসবের অন্যান্য গুরুতর বিঘ্নের মধ্যে **জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান** (Extra-uterine pregnancy) অন্যতম। ইহাতে প্রথমাবস্থা হইতেই গুরুতর অবস্থা দাঁড়ায়। ইহার ফলে অনেক মাতা ও শিশু মারা যায়। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইবার বহু পূর্বেই চিকিৎসকেরা ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। যে সব কারণে গর্ভের সময় মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখানো অত্যাবশ্যক ইহা তাহার অন্যতম। এইরূপ অস্বাভাবিক গর্ভাধান সাধারণত ফ্যালোপিয়ান নলেই বেশী হয়। তবে এইরূপ গর্ভ কদাচিৎ হয় মাত্র।

প্রসবের অন্যান্য সামান্য বিঘ্নের মধ্যে প্রসব বেদনার মৃদুতার কথা উল্লেখ করা যায়। ইহাতে প্রসব-প্রক্রিয়ার বিলম্ব হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় কারণেই ইহা হইতে পারে। ডাঃ ভেন্ডি বলেন, এক ক্ষেত্রে জনৈকা প্রসূতি তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হওয়ায় প্রসবে দেড় দিন বিলম্ব হইয়াছিল। আবার অত্যধিক বেদনাও অনেক সময়ে প্রসব-কার্য আগাইয়া আনে। ইহাতে জাতক ও জননী উভয়েরই অনিষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসকেরা এই উভয়বিধ অবস্থারই প্রতিকার করিতে পারেন। শেষোক্ত অবস্থায় বেদনা লাঘবের ঔষধ ব্যবহার্য। এরূপ ঔষধের কথা একটু পরেই বলা হইতেছে।

যমজ সন্তান হইলে প্রসব-প্রক্রিয়া জটিল হয়। গর্ভাবস্থায় ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়া যমজ সন্তানের অবস্থিতির সম্বন্ধে পূর্বেই জানিয়া লইলে প্রসবের সময়ে ধাত্রীর সুবিধা হয়। অধুনা এক্স-রে দ্বারা ফটো লইয়া পেটে যমজ সন্তান রহিয়াছে কি না তাহা গর্ভের ৪ মাসের মধ্যেই নির্ধারণ করা যায়।

প্রতিকার

আমি এই সমস্ত বিঘ্নের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিকারের কথাও মোটমুটি বলিয়াছি। এখানে ইহাই বক্তব্য যে, প্রসব-ক্রিয়ার জটিলতার কথা উপলব্ধি করিয়া প্রসূতিদের ও ভাবী মাতাদের হতাশ বা ভীত হইবার কারণ নাই। মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃতিই জাতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

আবার আরও সুখের বিষয় এই যে, মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে শুধু প্রসব-প্রক্রিয়া সম্বন্ধেই সম্যক অবহিত হইতেছে তাহা নহে নূতন নূতন উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করিতেও চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না।

গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অস্ত্রোপচার বা Forceps প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারেরা প্রসব-কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। এইরূপ যন্ত্রের সাহায্য নিলে অনেকক্ষেত্রেই জননী ও জাতকের জীবন রক্ষা হয়।

মোট কথা গর্ভাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অনেক উপসর্গের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে অনেক পীড়া বা ব্যাধি সারিয়া যায়; এবং পাশ করা দাই, নার্স বা ডাক্তারের দ্বারা অবলম্বিত নানা উপায় ও কৌশল অবলম্বনে প্রসবকালীন প্রায় সকল প্রকার বিঘ্নেরই প্রতিকার সম্ভবপর হয়।

ধাত্রীবিদ্যা

সুখের বিষয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষের অনুসন্ধানের ফলে ধাত্রীবিদ্যা এতদুর অগ্রসর হইয়াছে যে বৈজ্ঞানিক সেল্‌হিম (Selheim) গর্বের সহিত বলিতে পারিয়াছেন, ধাত্রীবিদ্যার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য এখন প্রায় সফল হইয়াছে।

গর্ভস্থ সন্তানের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির সহায়তা, পূর্ণ অবস্থায় উহাকে জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ করানো এবং ভূমিষ্ঠ সন্তানকে উপযুক্তভাবে বাঁচাইয়া রাখা যায়।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষায় আমাদের দেশের মেয়েদিগকে ব্রতী হইতে হইবে; সরকারকে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে; এবং সর্বোপরি জনসাধারণকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাতুড়ে কবিরাজ, ও অর্ধশিক্ষিত ডাক্তার প্রভৃতির স্থলে আমাদিগকে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

সুখের বিষয়, বাংলার জনস্বাস্থ্য-বিভাগের চেষ্টায় এই প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ধাত্রী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে পল্লী অঞ্চলে যত বেশী শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব শহরে তত নয়। অসংখ্য প্রসূতি-ও শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী হাতুড়ে ধাত্রী এবং অনভিজ্ঞ ডাক্তার।

প্রসবের বেদনা লাঘবের প্রক্রিয়া

সন্তান প্রসবের যে বেদনা ও কষ্ট, ইহাকে একরূপ স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বাইবেলে উল্লেখ আছে স্বর্গের উদ্যানে আদি মানব আদমকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করিবার জন্য আদি মানবী হাওয়াকে (বা ঈভকে) ভগবান (জাহুয়া বা জিহোবা) এই বলিয়া অভিশাপ দেন—"কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়া তুমি সন্তান-প্রসব করিবে। অনেক খৃষ্টান রমণী এই জন্য প্রসব-বেদনা লাঘবের পক্ষপাতী নন। ইহা অনাবশ্যক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহারা একথা ভাবেন না যে যদি প্রসবের সময় সমস্ত নারীর (আদি মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঔষধ ব্যবহার করিলেও ঐ বেদনা লাঘব হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যে সমস্ত নারীগণ ঐরূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা ত বলিয়াছেন যে, উহার ফলে তাঁহারা সামান্যই বেদনা অনুভব করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি এইরূপই অন্ধ (অর্থাৎ চিন্তা ও যুক্তিহীন) হয়।

ডাঃ ভেল্ডি এ বিষয়ে অনেক বাজে বক্তৃতা করিয়া মন্তব্য করেন যে, প্রসূতি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডাক্তারের বেদনা-লাঘবের প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত। বলা বাহুল্য যে বিশেষ কষ্ট হইলে ঔষধ প্রয়োগে বেদনা লাঘব করা হইবে ডাক্তার এইরূপ আশ্বাস দিলে গর্ভিণী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের পর হইতে প্রসবকালে প্রসূতিকে অচেতন করিয়া তাহার যাতনা কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে ক্লোরোফর্ম-মিশ্রিত অনেক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের ব্যবহারও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধের সাধারণ দোষ এই যে, উহারা প্রসূতির যন্ত্রণা-বোধ-শক্তি রহিত করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা পৈশিক সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতা (সুতরাং প্রসব বেদনা বা বেগ) হ্রাস, এমন কি রহিত করিয়া ফেলে। ইহাতে প্রসব-কার্যে অযথা বিলম্ব ঘটে।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে প্রসূতির যাতনা-লাঘবের একটি নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। উহার নাম দেওয়া হয় (twilight sleep)। এই প্রক্রিয়া অনুসারে প্রসব-বেদনার শেষ দিকে **মর্ফিয়া** ও **হাইওসাইন মিশ্রিত** একটি **ইন্‌জেক্‌শন** দেওয়া হয়। ইহাতে প্রসূতির পৈশিক সবলতা নষ্ট না করিয়াও তাহাকে নিদ্রাভিভূত করা যায়। সুতরাং অনেক কম কষ্টে প্রসব-কার্য সমাধা হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ারও একটি দোষ আছে। মর্ফিয়ার ক্রিয়ায় জাতকের দম বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রসবের পরে জাতকের নিশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়।

সম্প্রতি দেখা গিয়াছে **'বার্বিচুরেট'** জাতীয় ইন্‌জেক্‌শানের ও সেবনীয় ঔষধগুলি ঘুম পাড়াইবার জন্য ভাল। কিন্তু ইহার **বেদনা-নাশক-ক্ষমতা** অতি কম। ইহাতে বিলম্বে প্রসব হইলেও **প্রসূতি বা জাতকের কোনও অনিষ্ট হয় না।**

ইহাদের সুবিধা এই যে, (১) সহজে দেওয়া যায়, (২) বমি কদাচিৎ হয় এবং (৩) অর্ধ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রসূতি নিদ্রাতুর হয়। পক্ষান্তরে, অসুবিধা এই যে, (১) প্রসব বেদনার শেষের দিকে দিলে ইহাদের ক্রিয়া অনিশ্চিত (erratic), (২) প্রসবের পরও অনেকক্ষণ ঘুমের ভাব থাকে, (৩) মাত্রা বেশী হইয়া গেলে মাতা ও শিশুর শ্বাস কষ্ট (depression of respiration) হয় এবং (৪) প্রসূতি নিদ্রালু হইলেও কখনও কখনও তাহার বেদনা বোধ খুব সামান্যই কমে।

ডাঃ ভেল্ডি এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঔষধাবলী ব্যতিরেকেও ডাক্তার সম্মোহন এবং ইচ্ছাশক্তি বলে বেদনা অনেকটা লাঘব করিতে পারেন। ইহাতে মনের উপর ক্রিয়া হয়। আমি নিজে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ইহার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত

হইয়াছি। হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌এর সাহায্যে জটিল অস্ত্রোপচার পর্যন্ত হইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ।

সম্প্রতি ফরাসী ডাক্তার ফ্রেডারিক বেনই (Frederic Benoit) প্রসব বেদনা লাঘবের এক অভিনব পন্থার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পূর্ববর্তী ফরাসী অধ্যাপক ডারসনভাল (Darsonval) গত শতাব্দীতেই অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, **ইলেক্‌ট্রিক প্রবাহ বেদনা লাঘবের চমৎকার ঔষধ**। ডাঃ বেনই সেই সূত্র ধরিয়া পরীক্ষাকার্য চালাইয়া দেখেন যে, প্রসবে বেদনার মুখ্য কারণ জরায়ুর সঙ্কোচন। তিনি তাই জরায়ুপেশী-গুলিতে ইলেক্‌ট্রিক প্রবাহ (Low-frequency alternating current) চালাইয়া বেদনা লাঘবের চেষ্টা করেন। ইহাতে জরায়ুর সঙ্কোচনকার্য সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং বেদনাও অনেকটা কম অনুভূত হয়।

নানা হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, এই প্রক্রিয়ায় গর্ভিণীর বেদনাভোগের কাল বহু ঘণ্টা হইতে কমিয়া মাত্র দেড় ঘণ্টায় দাঁড়ায়। ৭০০ প্রসব নির্বিঘ্নে ও সহজে সম্পন্ন হইবার পর ডাঃ বেনই তাঁহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালীন ফ্রান্সে প্রবাসী মার্কিন ডাক্তারেরা এই প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার সুফল সম্বন্ধে সুখ্যাতি করেন।

ভবিষ্যতে ইহার বহুল প্রয়োগ হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

ইদানীং ১০০ মিলিগ্রাম পেথিডাইনের (Pethidine) সহিত $\frac{১}{১২৮}$ গ্রাম হাইওসিন (Hyoscine, ইহার অপর নাম Scopalamine) মিশ্রিত করা এ্যাম্‌পিউল (ampule) বাজারে পাওয়া যায়। কলিকাতার মেডিকেল কলেজের (নারীদের জন্য) ইডেন হাসপাতালে উহা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। হাইওসিন সহযোগে নেম্বুট্যাল ও (Nembutal) বেশ ভাল। ৮৬০ জন প্রসূতিকে ইহাদের মিশ্রণের ইন্‌জেক্‌শান দিয়া মাত্র ৮৬ জনের (১০%) তৎকালীন সম্পূর্ণ বিস্মৃতি (amnesia) হয়। কেবলমাত্র ১২০ জনের (অর্থাৎ প্রায় ১৪%) কোনও কোনও মন্দ ফল দেখা যায় ৫৪২ জন (৬৩%) শিশু জন্মের পরেই শ্বাস গ্রহণ করে।

প্রসবের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূতিকে ভয়ে অভিভূত করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাকিলে প্রসূতি অনাবশ্যক ভীতি এবং সেই হেতু বেদনা ও যন্ত্রণাপ্রবণতা হইতে অনেকটা রক্ষা পাইতে পারে। এই পুস্তকের উদ্দেশ্যও এ সম্বন্ধে প্রসূতিকে সম্যক অবহিত করা।

যমজ সন্তান

ইতর জীবের মধ্যে

যমজ সন্তানের কথা তুলিলেই মনে হওয়া উচিত যে, কুকুর, বিড়াল ছাগল, খরগোস ইত্যাদির একই সময় ৪।৫টি বা আরও অধিক সংখ্যক সন্তান হইয়া থাকে। স্ত্রীর একটি মাত্র ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীটের সংস্পর্শে প্রাণবন্ত হইলে একটি সন্তান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি একাধিক ডিম্ব এই সময়ে অঙ্কুরিত হয় এবং শুক্রকীটের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। একটি ডিম্ব বহুধা বিভক্ত হইলেও একাধিক সন্তান হইতে পারে। একজাতীয় প্রাণী একই সময়ে চারিটি সন্তান প্রসব করে, কারণ ইহাদের অঙ্কুরিত ডিম্ব প্রথমাবস্থায়ই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

মানব জাতির মধ্যেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অনেকের যমজ সন্তান হইয়া থাকে।

যমজ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবজন্তু ও গৃহপালিত পশুর একসঙ্গে একাধিক শাবক অহরহ জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াও পূর্বেকার মানুষ মানবজাতির মধ্যে যমজ সন্তান হওয়া অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা, ভয়, বিরক্তি অথবা আশা ও আনন্দের চোখে দেখিয়াছে। বোধ হয় যমজ সন্তান মানুষের মধ্যে কম হয় দেখিয়া এবং উহার প্রকৃত কারণ না বুঝিতে পারিয়া তাহারা উহাকে অস্বাভাবিক মনে করিত।

এখনও আমেরিকা, ইওরোপ, আফ্রিকা, উত্তর-পূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলের আদিম অসভ্য জাতিদের মধ্যে যমজ সন্তান হওয়াটা দারুণ অশুভ ও বিপদের পূর্ববার্তা বলিয়া মনে করা হয়। ভারতের কোনও কোনও অনার্য জাতিদের মধ্যে

এবং নিকটবর্তী দেশগুলিতে বিভিন্ন লিঙ্গের দুইটি সন্তান একত্রে জন্মানো গুরুতর ব্যাপার মনে করা হয়। কারণ মাতৃজঠরে তাহারা অতি নিকটে ছিল। উহা পাপজনক। কোথাও মনে করা হয় যে কোনও জন্তু যমজরূপে জন্মিয়াছে। কোথাও বিশ্বাস করা হয় যে, তাহারা আবহাওয়া অনুকূল এবং অধিক ফসল উৎপন্ন করিতে সাহায্য করিতে পারে। কোনও দেশে মনে করা হয় যে, যেহেতু পুরুষ একবারে একটিমাত্র সন্তানের জন্ম দান করিতে পারে সুতরাং দুইটির মধ্যে একটি সন্তান অবশ্যই জারজ। এই জন্য পিতা তাহাকে হত্যা করেন। সম্ভবত আরও পুরাতন এবং অধিক প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, তাহারা ঐশী শক্তিবলে জন্মিয়াছে। অনেক জাতির লোকেরা (যথা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে কতক) মনে করে যে মাতা জোড়া ফল খাওয়ার ফলে যমজ সন্তান জন্মিয়াছে। অনেক দেশে যমজ ভ্রূণকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করা হয়। ঋগ্বেদের অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদের অশ্বযুগল (পরে ইঁহাদের আবার রথী বলা হইয়াছে) আকাশ ও বিদ্যুতের সহিত যুক্ত, তাহারা পৃথিবী ও মনুষ্যকে উর্বরতা প্রদান করে এবং পথিক ও নাবিককে সাহায্য করে। কোথাও যমজদের একজনকে অথবা দুই জনকেই মারিয়া ফেলা হয় এবং নানা যাগযজ্ঞ করিয়া অশুভ ব্যাপারটির প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, কোথায়ও মাতাকে ব্যাভিচারী বা কুলক্ষণা মনে করিয়া উহার নির্যাতন, নির্বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও আবার যমজ সন্তানকে ভগবদ্দত্ত মহাসৌভাগ্য মনে করা হয়।

বেচারী মায়ের যে ইহাতে কোনই হাত নাই, ইহাও যে একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার এ ধারণা না থাকাতেই নানা দেশে মানুষের এই রকম ভুল হইয়াছে এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে এখনও হয়।

প্রকৃত কারণ

যদি একাধিক পক্ক ডিম্ব একই সময়ে এক এক একটি শুক্রকীটের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে যমজ সন্তানগুলি **একই অথবা বিভিন্ন লিঙ্গের** হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ অপর ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে সচরাচর যতটা দেখা যায় তদপেক্ষা অধিক হয় না। তাহাদের প্রত্যেকটি **ফুল** (Placenta. **প্ল্যাসেন্টা**) **আলাদা আলাদা** হয়। ইহাদের অসম বা বিসদৃশ যমজ (Ordinary twins) বলে। কিন্তু

যদি শুক্রকীটের সহিত মিলিত হইবার পর একটি প্রাণবন্ত (fertilised) ডিম্বই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, **দুইটি কোষে বিভক্ত** হইবার পর সেই দুইটি কোঁষ পরস্পর যুক্ত থাকিয়া বা **আলাদা ও স্বাধীনভাবে** (বিভিন্ন কোষে বিভক্ত হইয়া) বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে যে যমজ সন্তানদ্বয় জন্মাইবে তাহারা **একই লিঙ্গের** হইবে এবং তাহাদের **শরীর ও মনে খুব মিল** দেখা যায়। সেইজন্য এই শেষোক্ত প্রকার সম যমজের (Indentical twins) **একটি মাত্র ফুল** হয়।

এক গর্ভে দুইএর অধিক সন্তান জন্মিবার কারণাবলী

এককালে দুইএর অধিক সন্তান নিম্নলিখিতভাবে জন্মিতে পারে :—

(১) ত্রয়জ (Triplets) তিন প্রকারে জন্মাইতে পারে :—

(ক) সম-ত্রয়জ, অর্থাৎ একটি মাত্র প্রাণবন্ত (উর্বরীকৃত fertilised) ডিম্ব তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক লিঙ্গের তিনটি স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হয়।

(খ) একটি প্রাণবন্ত ডিম্ব দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক জোড়া সম-যমজ এবং অপর একটি ডিম্ব স্বতন্ত্রভাবে অপর একটি পুংবীজ দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া, তৃতীয় একটি জীবের জন্মদান করে।

(গ) তিনটি ডিম্ব একত্রে বা প্রায় সমকালে, পরিণত, স্ফুটিত ও নিঃসৃত হইয়া তিনটি বিভিন্ন পুং বীজ দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া তিনটি অসম-যমজ সৃষ্ট হয়।

(২) চতুষ্টয়জ (Quadruplets) পাঁচ প্রকারে জন্মিতে পারে :—

(ক) একটি প্রাণবন্ত ডিম্ব দ্বিধা বিভক্ত হয়, পরে এই দুইটির প্রত্যেকটি আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একই লিঙ্গের চারিটি সম-যমজের জন্ম হয়।

(খ) এককালীন নিঃসৃত দুইটি ডিম্ব এক একটি শুক্রকীটের সহিত মিলিত হইবার পর প্রত্যেকটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুই জোড়া সম-যমজ সৃষ্ট হয়। এই-ভাবে চারিটি সন্তানের জন্ম অতি বিরল।

(গ) নিঃসৃত দুইটি ডিম্বের মধ্যে একটি উপরের (১ ক) প্রণালীতে তিনটি সম-ত্রয়জ উৎপন্ন করে এবং অপরটি হইতে চতুর্থ অসম-যমজ উৎপন্ন হয়।

(ঘ) একত্রে বা প্রায় সমকালে নিঃসৃত তিনটি ডিম্বের মধ্যে একটি প্রাণবন্ত হইবার পর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক জোড়া সম-যমজ উৎপন্ন হয় এবং অপর দুইটি ডিম্ব দুইটি বিভিন্ন শুক্রকীট সহযোগে দুইটি অসম-যমজ জন্মে।

(ঙ) একত্রে বা সমকালে চারিটি ডিম্ব নির্গত হইয়া প্রত্যেকটি এক একটি পুংবীজ দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া চারিটি অসম-যমজ হয়।

(৩) পঞ্চজ (Quintuplets) (৪) ষড়জ (Sixtuplates) (৫) সপ্তজ (Sentuplates) প্রভৃতিও এইরূপ নানাভাবে উৎপন্ন হইতে পারে।

২।৩টি যমজ সন্তান একসঙ্গে জন্মিয়া জীবিত থাকিতে অনেকেই দেখিয়াছেন কিন্তু ৪।৫টি কিংবা ততোধিক সন্তানও একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। তবে ইহারা প্রায়ই মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় অথবা জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই মারা যায়। কানাডায় এক রমণীর এক সঙ্গে ৫টি সন্তান জন্মিয়া বাঁচিয়া আছে বলিয়া প্রকাশ।

দুই প্রকারের যমজ

পূর্বেই বলিলাম, যমজ সন্তান সাধারণত দুই প্রকারের—(ক) **অসম বা বিসদৃশ**—ইহারা একই অথবা বিভিন্ন লিঙ্গবিশিষ্ট।

সম বা সদৃশ—ইহারা একই লিঙ্গবিশিষ্ট। ইহাদের শরীরে ও মনে খুব সাদৃশ্য থাকে।

অসম যমজ সন্তানের একটি হয়ত পুরুষ এবং অপরটি স্ত্রী কিংবা উভয়েই পুরুষ অথবা স্ত্রীজাতীয়াও হইতে পারে। দুইটি বা ততোধিক বিভিন্ন ডিম্ব একই সময়ে বিভিন্ন শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিলেই এইরূপ যমজ সন্তান হইয়া থাকে। একটি ডিম্ব অন্যটির সঙ্গে সম্বন্ধহীনভাবে বর্ধিত হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার সহবাসে দুইটি ডিম্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাণবন্ত হইয়া যমজ সন্তানে পরিণত হইতে পারে ডাক্তারী বইয়ে এইরূপ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনী তাঁহার স্বামীর সহিত সহবাস করার কিছুক্ষণ পর তাঁহার নিগ্রো ভৃত্য কর্তৃক ধর্ষিতা হন। যথাসময়ে দুইটি যমজ সন্তান হয়—ইহাদের একটি সাদা ও একটি কাল।

ভ্রূণ অতি প্রাথমিক অবস্থায় দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে এবং প্রত্যেক অংশই পৃথকভাবে এক একটি নূতন ভ্রূণে পরিণত হইলেই সম-যমজ সন্তান জন্মাইয়া থাকে।

সম—যমজ সন্তানের চেহারায় সাদৃশ্য খুব বেশী। একই ডিম্ব হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয় এবং উভয়েই মূল ভ্রূণের (ডিম্বের) প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সাধারণত অসম-যমজ সন্তানদের মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য সাধারণ ভ্রাতা বা ভগিনীর সাদৃশ্য

অপেক্ষা বেশী থাকে না কিন্তু সম-যমজ সন্তানদের মধ্যে গঠন ও চেহারার সাদৃশ্য দেখা যায়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সাধারণ অসম-যমজ সন্তান ভিন্ন ভিন্ন ভ্রূণ-ঝিল্লীর মধ্যে বিভিন্ন ফুল হইতে বর্ধিত হয় কিন্তু সম-যমজ সন্তান একই ভ্রূণ-ঝিল্লীর মধ্যে বর্ধিত হইয়া থাকে, আবার ইহাদের ফুলও মাত্র একটি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সম-যমজ সন্তানের একটি অপরটির একেবারে হুবহু প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। আয়নার সামনে দাঁড়াইলে দেখা যায় আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ডান হাত আমাদের প্রকৃত বাম হাত, ডান হাত ইত্যাদি। সম-যমজ সন্তানের একটির যদি ডান হাত বাম হাত অপেক্ষা সামান্য ছোট হয় তাহা হইলে অপরটির বাম হাত উহার ডান হাত অপেক্ষা সামান্য ছোট হইবে। কিংবা যদি একটির ডান চোখে কোন দোষ কিংবা কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তবে অন্যটির বাম চোখে অনুরূপ দোষ অথবা বৈশিষ্ট্য থাকিবে।

(৮৬ নং চিত্র)

অসম-যমজ সন্তান। ইহাদের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভ্রূণ-ঝিল্লী এবং ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ফুল থাকে।
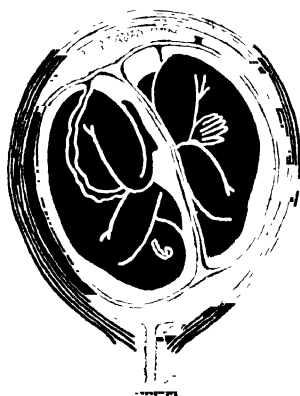
(৮৭ নং চিত্র)

সম-যমজ সন্তান। ইহাদের একটি ভ্রূণ-ঝিল্লী থাকে এবং ইহারা একটি ফুলের সঙ্গেই যুক্ত থাকে।

সম-যমজ সন্তানের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। **সহজাত গুণাবলী এবং পারিপার্শ্বিকতা এই দুইয়ের প্রভাবেই মানুষের চরিত্র গড়িয়া ওঠে।** কেহ কেহ বলেন যে, একই মূল ভ্রূণ (ডিম্ব) হইতে উৎপন্ন সম-যমজ সন্তান সাধারণত একই প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থান করিলেও স্বভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট

হয় না। সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কণ বা অন্য যে কোন বিষয়ে তাহারা উভয়েই একই রুচিবিশিষ্ট হয়। ইহাদের মানসিক এবং শিল্পকার্যে দক্ষতা এমন কি হস্তাক্ষরও নাকি একই রূপ। ইহারা বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও নাকি একই সময়ে একই বস্তু বা ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে। ইহাদের ভাব-প্রবণতা, কোনও বিষয়ে রুচি-অরুচি, এবং কোনও কোনও খাদ্য নির্বাচনে দারুণ খামখেয়ালী ভাবও অনুরূপ। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ পরিবারের এক সম-যমজ ভগ্নীদ্বয়ের স্বভাব, প্রকৃতি ও মানসিক ক্ষমতায় অনেক পার্থক্য আছে। এক জনের এক গালে তিল আছে, কিন্তু অপরের তাহা নাই। ইহাদের মাতা নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইহাদের একটি মাত্র ফুল ছিল।

পক্ষান্তরে আবার কতক লেখক বলেন যে, দৈহিক সাদৃশ্য যথেষ্ট থাকিলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় লালিত পালিত হইলেও সম-যমজের মানসিক বিকাশ বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ম্যাক এণ্ড্রুজ (Mac Andrews) তাঁহার Encyclopaedia of sex and love techniqueএ বলেন যে তাঁহার মাতা ও মাসীমা সম-যমজ। তাঁহাদের আকৃতি এক হইলেও প্রকৃতি বিভিন্ন। তিনি আরও সম-যমজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃতিগত হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। লোকেরা নাকি আগ্রহাতিশয্যে মানসিক সাদৃশ্যের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়া থাকেন মাত্র।

ক্যানাডার ডিওনে যমজ পাঁচটি

১৯৩৪ সালে কানাডার ডিওনে (Dionne) পরিবারে এক সঙ্গে সম-পঞ্চজ সন্তান (কন্যা) হয়। ডাঃ ড্যাফো (Dr. Dafoe) ইহাদের জন্ম পর্যবেক্ষণ করেন এবং ইহাদের লালন-পালনে সম্যক দৃষ্টি রাখেন। ১৯৪১ সালে ইহাদের বয়স ৭ বৎসর হয়। তখন ইহাদের কথা একজন পর্যবেক্ষক এইরূপ বলেন: এই পাঁচটি কন্যা যেমন দর্শকমণ্ডলীর কৌতুকপ্রদ লক্ষ্যবস্তু তেমনই জীব বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার পাত্রী।

এই পাঁচটি কন্যার নাম এ্যানেট্, সিসিল্, মেরী, এমিলি ও ইভোন। তাহারা সম-যমজ বলিয়া আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা সুসদৃশ। আকৃতি-গত পার্থক্যের মধ্যে মাত্র একটি বাম হাতে শক্তি রাখে এবং অপর একজনের দক্ষিণ চক্ষু দুর্বল। ইহা ছাড়া পাঁচটি কন্যাই সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে বেশী তীক্ষ্ণ।

ইহারা একটু* দেরীতে কথা বলিতে শিখে কিন্তু এখন তাহারা খুব মুখর। সারাদিন কথাবার্তা, গল্প, আলোচনায় কাটায়।

৭ বৎসর বয়সে ইহারা লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে। মনোভাবে অনেকটা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন:

"এই সমস্ত দেখিয়া মনে হওয়া উচিত যে, কন্যা পাঁচটি ব্যক্তিত্বে ও মনোবৃত্তিতে একই সমান। কিন্তু লক্ষ্য করিবার সবচেয়ে গুরু বিষয় এই যে তাহারা সম-যমজ এবং একই পারিপার্শ্বিকতায় প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও এ সব দিকে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। অনেক ব্যাপারে ইহাদের রুচি ও প্রকৃতি **এত বিভিন্ন যে ইহারা পাঁচটি বিভিন্ন পরিবারের সন্তান বলিয়া মনে হয়।** এই বিভিন্ন বিকাশই আমাদের কাম্য। ভবিষ্যতে ইহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি লইয়া বিভিন্ন ধারায় জীবন যাপন করিতে পারিবে।

বিশ্ববিখ্যাত শ্যামদেশীয় অভিন্ন-যমজ দুইটি

শ্যামদেশে ১৮১১ সালে দুইটি অভিন্ন-যমজ—চ্যাং (Chang) এবং অ্যাং (Eng) জন্মগ্রহণ করে। ইহারা পাশাপাশি **যুক্ত অবস্থায়** ছিল। বুকের হাড়ের প্রান্তে একটি ছোট সম্প্রসারণশীল মাংস-বন্ধনী উভয়কে এমনভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছিল যে তাহা কাটিয়া বিভিন্ন করিতে গেলে প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল।

ইহারা একই সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটিত, মুখোমুখি শুইত এবং দৌড়িতে, খেলিতে বা সাঁতার দিতে পারিত।

ইহাদের ছোটবেলায় হাম ও বসন্ত একই সময় হয় ও একই সময় সারে।

১৮ বৎসর বয়সে ইহাদিগকে আমেরিকায় এবং তৎপর ইওরোপে প্রদর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়।

মিস সোফিয়া (Sophia) নাম্নী একজন যুবতী লণ্ডনে উভয়ের প্রেমে পড়ে কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না। কারণ ডাক্তারেরা দুই জনকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করেন। *

ইহারা একই সময়ে শুইত ও একই সময়ে জাগিত, একই সময়ে ক্ষুধা বোধ করিত এবং একই পরিমাণে আহার করিত। এক সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে

---

* বিলাতী (খৃষ্টান) আইনে কাহারও এক স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় অপর কাহাকেও বিবাহ করা (দ্বিবিবাহ—'বিগ্যামি Bigamy) অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহার জন্য শাস্তি হয়

কথা বলিতে পারিত না কারণ উভয়েই একই বিষয়ে একই মনোভাব পোষণ করিত। আবার অনেক বিষয়ে ইহারা বিভিন্ন মতও প্রকাশ করিত। ১৮৪৭ সালে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভোট দেয়।

আমেরিকার দুইটি মেয়ে (পরস্পর ভগ্নী) ইহাদের প্রেমে পড়ে ও বিবাহ করে। কিন্তু বিশেষ মিলন না হওয়ায়, স্ত্রীদের তিন মাইল দূরে বাড়ী করিয়া দিয়া এই যুক্ত যমজ যুগল প্রত্যেক বাড়িতে তিন দিন করিয়া বাস করিত। ৩০ বৎসর উহাদের বিবাহিত জীবন অব্যাহত থাকে। চ্যাংয়ের সাত মেয়ে ও তিন ছেলে এবং অ্যাং এর সাত ছেলে ও পাঁচ মেয়ে হয়। এই সকল সন্তান স্বাভাবিকই হইয়াছিল; কেবল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে মূক-বধির ছিল।

১৮৭৪ সালে ২৩শে জানুয়ারী তারিখে তাহারা শয্যাগ্রহণ করে কিন্তু চ্যাং ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। মধ্যরাত্রির পর উভয়ে উঠিয়া আগুন পোহায়। অ্যাং-এর ঘুম পায় এবং সে শুইতে চায় কিন্তু চ্যাং বলে যে, শুইতে গেলে তাহার বুকে বেদনা লাগে। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর উভয়েই শুইয়া পড়ে এবং অ্যাং খুব গভীর নিদ্রামগ্ন হয়। অ্যাং জাগিয়া তাহার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার কাকার অবস্থা কি? ছেলেটি বলে, চ্যাং মরিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। অ্যাং তখন কাঁদিতে থাকে এবং স্ত্রীকে বলে যে, তাহারও সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে। ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিয়া তাহার ভয়ানক স্নায়বিক বিকার হয়। যদিও তাহার শরীর সুস্থ ছিল, তবুও দুই ঘণ্টার মধ্যেই সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চ্যাং-এর মস্তিষ্কের রোগে মৃত্যু হয় কিন্তু অ্যাং বোধ হয় ভয়েই প্রাণত্যাগ করে।

সারা পৃথিবীময় ঘুরিয়া প্রদর্শনী দেখাইয়া ইহারা বহু টাকা উপার্জন করিয়াছিল।

ষড়জ

পাঁচটির বেশী সন্তান হওয়ার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন:

আমি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের স্যার কেদারনাথ মেটারনিটি হাসপাতালের হাউস সার্জেন থাকা-কালীন একদিন আমার নাইট ডিউটিতে সংবাদ পাইলাম, পেটে যন্ত্রণা ও রক্তস্রাব লইয়া একটি রোগিণী আসিয়াছে।

তাহার উদর দেখিয়া তাহাকে পূর্ণগর্ভা বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু তাহার কথিত শেষ ঋতুস্রাবের তারিখ হইতে হিসাব করিয়া দেখা গেল তাহার গর্ভ মাত্র ছয় মাসের। পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, রোগিণীর প্রসব পথে জরায়ু-মুখ হইতে একটি ক্ষুদ্র পা বাহির হইয়া আছে এবং জরায়ু-মুখও যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুক্ত ও রক্তস্রাব হইতে থাকায় আর কালবিলম্ব না করিয়া ঐ শিশুটিকে প্রসব করানো হইল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গর্ভফুল—যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া জরায়ু মধ্যেই ছিল—বাহির হইয়া আসিল। পুনরায় বেদনার সঙ্গে আর একটি ক্ষুদ্র শিশু ফুল সমেত বাহির হইল। তাহার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই পর পর আরও চারিটি শিশু অক্ষত ও স্বতন্ত্র ভ্রূণ-ঝিল্লী সমেত প্রসূত হইল (প্রথম দুইটির ভ্রূণ-ঝিল্লী কাটিয়া গিয়াছিল)। সর্বসমেত ছয়টি—প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ, ক্ষুদ্রাকার (৫।৬ ইঞ্চি লম্বা) ও একটি ব্যতীত সবগুলি মৃত অবস্থাতেই প্রসূত হইয়াছিল। ঐ একটি প্রসবের পর অল্প কিছুক্ষণ হস্তপদাদি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়াছিল।

অন্যান্য তথ্য

মানুষের সম এবং অসম সন্তানের পার্থক্য নির্ণয় করাও শক্ত। আমরা সাধারণত মনে করি দুইটি একই লিঙ্গ-বিশিষ্ট সন্তানের মধ্যে যদি খুব সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেই উহারা সম-যমজ সন্তান এবং যাহাদের মধ্যে উক্তরূপ সাদৃশ্য থাকে না তাহারাই অসম। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনেক সময় নির্ভুল নাও হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, যমজ-সন্তান-ধারণ-প্রবণতা বংশানুক্রমিক এবং একবার যমজ সন্তান ধারণ করিলে আর একবার যমজ সন্তান ধারণ করিবার সম্ভাবনা থাকে। এ সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় নাই। ইহুদীদের মধ্যে নাকি যমজ সন্তান বেশী হয়।

সাধারণত ৮০ জনের মধ্যে একজন যমজ সন্তান ধারণ করিয়া থাকে। আয়ার্ল্যাণ্ড এই হার—$\frac{১}{৬০}$; কিন্তু ইংলণ্ডে $\frac{১}{৯০}$; তিনটি সন্তান এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিবার অনুপাত $\frac{১}{৬০০০}$; ততোধিক যমজ সন্তান অতি বিরল। হেলিন (Hellin) একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে যমজ দুইটি সন্তানের হার $\frac{১}{৮০}$; তিনটির $\frac{১}{৬৪০০}$ এবং চারিটির $\frac{১}{৫১২০০০}$ ইহা মোটামুটিভাবে সত্য।

শিশু পরিচর্যা

(প্রথম দুই বৎসর)

সন্তানের যত্ন

জীবজগতের এক দিকে লক্ষ্য করিলে সন্তানের প্রতি পিতামাতার নির্বিকার উদাসীনতা দেখা যায়। ভেকের বংশধরেরা ডিম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেরাই জীবনপথে চলিতে থাকে; উহাদের পিতামাতা পূর্বেই সরিয়া পড়ে। সাপের বেলায়ও এই কথাই খাটে। অধিকাংশ মাছও ডিম পাড়িয়া ও উহাকে প্রাণবন্ত করিয়া সরিয়া পড়ে। অবশ্য দুই এক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। জীবের বেলায় সন্তান পালন বিষয়ে এইরূপ উদাসীনতা বিশেষ করিয়া দেখা যায় তাহার কারণ ইহাদের অসংখ্য শাবক জন্মে এবং এই সকল জীবের প্রথম হইতেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার সামর্থ্য থাকে। বহু জীব প্রথম অবস্থায় নষ্ট হইয়া গেলেও গোটা জাতিটা লোপ পায় না।

কিন্তু যেখানে বংশধরের সংখ্যা কম বা জন্মগ্রহণের পরে সন্তান নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয় সেখানে প্রকৃতিই আবার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। কারণ তাহা না করিলে জাতি-রক্ষা-কার্য ব্যাহত হইত।

জীবজগতে **যৌন-প্রবৃত্তি ক্ষুৎ-পিপাসার মতই শক্তিশালী**। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে বংশরক্ষার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অন্যরূপ হইলেও, অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ এবং জীবজন্তু যৌন-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়াই বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে,—একথা আমরা আলোচনা করিয়াছি।

উচ্চতর জীবের মধ্যে কাম-প্রবৃত্তিই স্ত্রী-পুরুষের একত্র সমাবেশ ও পারস্পরিক প্রীতির সূচনা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী ভালবাসা ও পরিবার-বদ্ধতার কারণ হয়।

তাই প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি ও ধ্বংসলীলা দেখিয়াই যাঁহারা হতাশ হন, তাঁহারা জীবজগতে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং জীবন-পণ সহযোগিতার মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মুগ্ধ হইবেন।

স্নেহমমতা মাখা এক সর্বজয়ী সংস্কারের বশে পিতামাতা ভাবী বংশধরদিগের যত্ন ও লালনপালন করিয়া থাকে। পিতামাতার মহানুভবতা সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা এবং উহার হিতসাধনে আত্মবলিদানের কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

একজাতীয় ভ্রমর এই ব্যাপারে আত্মত্যাগের এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। দারুণ কষ্ট স্বীকার করিয়া উহারা ডিমের চারি পাশে এত খাদ্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যায়, যাহাতে বাচ্চা ভ্রমর জন্মিবার পরে আর উহাকে খাদ্যাহরণের জন্য কষ্ট করিতে না হয়; অথচ বেচারী ভ্রমরী সন্তানের জন্মের পূর্বেই মরিয়া যায়।

বানরেরা বাচ্চাকে লইয়াই গাছে গাছে বেড়ায়; মাতা অবসন্ন হইয়া পড়িলে পিতা এই কাজের ভার লয়।

পাখীদের বাসা তৈয়ার করিবার কৌশল ও তোড়জোড় দেখিলেই মনে হয়, শুধু নিজেদেরই আরামের ব্যবস্থা করা হইতেছে না, ভাবী শাবকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যেন তাহারা অধিকতর আগ্রহশীল। মানব-শিশু এত অসহায় অবস্থায় পতিত হয় যে, পিতামাতা বা মাতৃ-পিতৃস্থানীয় লোকদের আদর যত্ন ব্যতীত উহাদের বাঁচিবার উপায় থাকে না। পিতামাতার, বিশেষ করিয়া মাতার অফুরন্ত আদর-যত্নেই উহারা ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়া থাকে।

পিতামাতা সন্তানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। রূপ, গুণ, যশ এবং ঐশ্বর্যে সন্তান পিতামাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হউক এই কামনাই তাহাদের সন্তানপ্রীতির অকৃত্রিমতার জলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অফুরন্ত আদর, যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা সত্ত্বেও জীবন-প্রভাতে মানব শিশু ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া থাকে। পিতামাতার অজ্ঞতা নিবন্ধন উহার স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না।

শিশু-মৃত্যু

এই কথাগুলি লিখিবার সময়েই (১৯৪২) দেখি দেশপ্রিয় "অমৃত বাজার পত্রিকা" সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন, আমাদের দেশে প্রসূতি-মৃত্যুর ন্যায় **শিশু-মৃত্যুর হারও অতিশয় ভয়াবহ।** সম্প্রতি গণনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাংলা দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৬০০,০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাহার

মধ্যে ৩০০,০০০ জন এক বৎসর পার হইতে না হইতেই মারা যায়। ইহাদের অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ১৫০,০০০ এক মাসের মধ্যেই মারা যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি নামক দেশ ছাড়া পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ভারতবর্ষেই প্রতি বৎসর শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি বৎসর অখণ্ড ভারতবর্ষে মোটামুটি ৯৪।৯৫ লক্ষ শিশু জন্মাইত এবং তাহাদের মধ্যে গড়পড়তা ১৫।১৬ লক্ষ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

জন্মের এক বৎসরের মধ্যে হাজার-করা শিশু-মৃত্যুর হার বিভিন্ন দেশে এইরূপ ছিল ঃ

ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স	...	...	(১৯৪০)— ৫৫
ফ্রান্স	...	...	(১৯৪১)— ৯১
জার্মানী	...	...	(১৯৪০)— ৬৩
ইটালী	...	...	(১৯৪০)—১০৪
স্পেন	...	...	(১৯৩৮)—১১৯
ক্যানাডা	...	...	(১৯৪০)— ৫৬
আমেরিকা	...	...	(১৯৪০)— ৪৬
জাপান	...	...	(১৯৩৮)—১৪৪
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	(১৯৪০)— ৩৮
সিলোন (লঙ্কা)	...	...	(১৯৪০)—১৪৯
ভারতবর্ষ	...	...	**(১৯৪০)—১৬০**

১৯৩৮ সনে বাঙলাদেশে শতকরা ২১·৩ শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই ক্রমশ মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে।

কলিকাতা সহর জনসংখ্যা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং প্রাচ্যের অন্যতম বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর। ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এই কলিকাতার বুকে শিশু-মৃত্যুর হার হাজার করা ২৩৯ জন, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৪। কোন সভ্য দেশে আজ শিশু-মৃত্যুর হার এত অধিক নহে। প্রসবের সময় প্রসূতি-মৃত্যুর হারও কলিকাতায় বেশী; মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সহরগুলি এসব বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অগ্রণী।

কলিকাতায় ১৯৩৮ ১৯৩৯ সালের বিভিন্ন বয়সের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

	মৃত্যু-সংখ্যা
১ম সপ্তাহ পর্যন্ত	১৭৯১
১ম সপ্তাহ হইতে ১ম মাস	১০৩৩
১ম সপ্তাহ হইতে ২য় মাস	৪০৬
২য় মাস হইতে ৩য় মাস	৫৩৫
৩য় মাস হইতে ৬ষ্ঠ মাস	৫৮৮
৬ষ্ঠ মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যে	১২৫৬
জন্মের এক বৎসরের মধ্যে মোট মৃত্যু	৫৬০৯

১৯৩৮-১৯৩৯ সালে কলিকাতায় বিভিন্ন রোগে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

	মৃত্যু-সংখ্যা	মোট মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা
বায়ুনলীভুজ প্রদাহ এবং ফুসফুসপ্রদাহ ...	১৯৫৩	৩৩%
জন্মগত দৌর্বল্য	১২৩৪	২০%
ধনুষ্টঙ্কার	১৫০	২½%
অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জন্ম	৫১৪	৯%
উদরাময় ও অন্তঃপ্রদাহ	৫২০	৯%
শৈশবকালীন যকৃত	১০৭	২%
অন্যান্য কারণ	১১৯৮	২০%
মোট	৫,৬৭৬	

কলিকাতা বাঙলার গৌরবস্থল—এখানেই যদি শিশু-মৃত্যুর হার এত অধিক হয়, তবে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যে কত শোচনীয় হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়। **দারিদ্র্য, অজ্ঞতা** এবং **অবহেলাই** এই **মৃত্যুর আধিক্যের কারণ।**

নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্ম-মৃত্যুর এবং শিশু-মৃত্যুর তুলনামূলক সংখ্যা দেওয়া হইল :—

	হাজার করা লোক জন্মায়	হাজার করা লোক মরে	জন্মের প্রথম বৎসরে হাজার করা শিশু মৃত্যু
ভারত	৩৪·১	২৩·৭	১৯০·৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৮·৩	২১·৮	৩৮·৬
পাঞ্জাব	৪৩·৮	২০·৮	১৭১·১
দিল্লী	৪৭·৭	২২·৮	১৫০·৩
যুক্ত প্রদেশ	৩৩·৬	২৩·২	২০৪·১
বিহার	৩৭·৮	২১·৫	১২০·৬
উড়িষ্যা	৩২·৯	২৮·৫	১৫২·৮
বঙ্গদেশ	**২৮·৯**	**২৬·৩**	**১৮৪·৩**
মধ্যপ্রদেশ	৩৯·৫	২৫·২	২৩৭·৫
বোম্বাই	৩৮·৭	২৭·১	২২৮
সিন্ধুপ্রদেশ	১৮·১	১৩·২	১৫০·৪
মাদ্রাজ	৩৫·৭	২০·৮	১৭০·৮
কুর্গ	২৩·১	২৬·৬	৪৮·৪
আসাম	২৭·৯	২২·১	১২১·৭
আজমীর মারওয়াড	৩৪·৭	২৫	১৯২·২

মফঃস্বলের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। বাংলার তিনটি জেলায় প্রত্যেক পাঁচটি নবজাত শিশুর মধ্যে ১ জন এবং অপর সাতটি জেলায় প্রত্যেক চারটির মধ্যে একটি শিশু মারা যায়।

পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিশুর উপযুক্ত পরিচর্যা হইলে উক্ত সন্তানদিগকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত।

সরকারের এ বিষয়ে আরও দৃষ্টি দিতে হইবে। শিশু-পরিচর্যা-সমস্যা একটি চিরন্তন সমস্যা; বাংলার **ঘরে ঘরে,** পল্লীতে **আজ** এই সমস্যা মাথা উঁচু করিয়াছে।

প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের গুরুভার বহন করিবার পূর্বেই শিশু-পরিচর্যা বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যদি এ বিষয়ে তাহাদের সামান্য উপকারেও আসে, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

শিশুর অধিকার

পিতামাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর শিশুর কতকগুলি সনাতন অধিকার রহিয়াছে। ডঃ মেরী ষ্টোপ্‌স্ এ সম্বন্ধে খুব হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথমত শিশুলাভের আকাঙ্ক্ষা পিতামাতার প্রাণে জাগিবে; অর্থাৎ তাহার আকাঙ্ক্ষা করিলে সে আসিবে, অন্যথায় নহে।

দুঃখের বিষয়, এখনও কোটি কোটি সন্তান পিতামাতার প্রবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে অভাব-জর্জর অক্ষম পরিবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার ভাবনার কারণ হয়। ইহাতে সন্তানের কোন দোষ নাই; **দোষ পিতামাতার।**

জন্ম-প্রকরণ ও **জন্ম-নিয়ন্ত্রণের** সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে পিতামাতা ইচ্ছামত এবং উপযুক্ত মুহূর্তে সন্তান লাভ করিতে পারিবে।

তাহা হইলেই সন্তানের **দ্বিতীয় অধিকার** পূর্ণ হইবে, অর্থাৎ জন্মের **পূর্বে** ও **পরে** সন্তান পিতামাতা ও সমাজের সমান কামনার বস্তু ও ভালবাসার পাত্র হইবে।

অবশ্য সকল অবস্থাতেই সন্তান পিতামাতার স্নেহ মমতা পায়; তবে একান্ত বাঞ্ছিত শিশুই উহা অধিক পাইয়া থাকে।

শিশুর **তৃতীয় অধিকার** এই যে, সে সুস্থ **শরীর** ও **মন** লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে; রোগাক্রান্ত পিতামাতার অভিশপ্ত জীবনের অংশ গ্রহণ করিবে না।

অনেক প্রকার রোগ ও মানসিক বিকৃতি আছে যাহা পিতামাতা হইতে বংশানুক্রমিকভাবে সন্তানে বর্তে। এই প্রকার রোগাক্রান্ত পিতামাতার সন্তানের জন্মদান করা অনুচিত,—**মহাপাপ**।

শিশুর **চতুর্থ অধিকার** এই যে, সে শরীর ও মনের পূর্ণ পরিপুষ্টির সহায়ক **সুখাদ্য ও কল্যাণকর পরিবেষ্টন** পাইবে। দারিদ্র্য প্রপীড়িত সংসার শিশুর স্বাভাবিক পরিণতির প্রতিকূল।

শিশু-পরিচর্যার সম্পূর্ণ ভার সরকার গ্রহণ করায় রুশিয়ায় এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে। অন্যান্য সভ্যদেশেও শিশু পরিচর্যা ব্যাপারে রাষ্ট্রই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকে।

দারিদ্র্যই মানব সমাজের কঠিন সমস্যা। ইহার দুরীকরণ আজিও সম্ভবপর হয় নাই ; তবে আংশিক সমাধান সম্ভব হইয়াছে মাত্র। আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও অজ্ঞতাই আমাদের **জাতীয় অধঃপতনের মূল**। অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যই আমাদের জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তোলে। শিশুদের সুস্থ, সবল ও জ্ঞানবান্ করিয়া তুলিতে হইলে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, সুচিকিৎসা ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের সে সঙ্গতি কোথায় ? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে একটি শিশুকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিতে কত খরচ পড়ে, সম্প্রতি তাহার একটি সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে। শিশুর জন্মমুহূর্ত হইতে এক বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের বাবদ কত খরচ পড়িয়াছে তাহার একটি হিসাব উহার পিতামাতা রাখিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, একবৎসরে শিশুটির জন্য খরচ হইয়াছে ৯১০৲ টাকা ঃ প্রসবের সময় হাসপাতালে দশ দিন ১৮০৲ ; ডাক্তার ১৬২৲ ; দুধ ১৯৩॥০ ; প্র্যাম্ (সন্তানদের লইয়া যাইবার গাড়ী ; pram অথবা perambulator) ১৪৭৲ ; স্নানের সাবান ও ধোপা খরচ ৫৪৸০ ; এবং ১৫০০৲ টাকার জীবন বীমার উপর প্রিমিয়াম ২৮॥৵০। শিশুর জন্য এক বৎসরে ২৪০টি কমলা লেবু ; ৬০টি কলা ; টিনে ভরা অন্যান্য ফল ও সব্জী ২৫৩ টিন ; পুতুল ; কড্লিভার অয়েল, এমন কি হাসপাতাল হইতে বাড়ী ফিরিবার ট্যাক্সি ভাড়া পর্যন্ত কিছুই এই হিসাব হইতে বাদ পড়ে নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত শিশুর পিতার আয় মাসিক ৪০০৲ টাকা। আমাদের দেশে এ হিসাব নিতান্ত আজগুবি বলিয়া মনে হয় না কি ?

পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে শিশুপরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষাদান করিলে আপাতত এই সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। শুধু অর্থ ও সামর্থ্য থাকিলেই হইবে না **উপযুক্ত** ও **পরিমিত** জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন।

আমি এখানে সর্বশ্রেণীর লোকের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত শিশু পরিচর্যার বিষয় আলোচনা করিব।

আঁতুড় ঘরে সন্তান

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই তাহাকে পরিষ্কার করিয়া গরম কাপড় পরানো এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন হইলে তাহার প্রতিকার ইত্যাদির আভাষ আমি পূর্বেই দিয়েছি।

গরম রাখা—সম্ভব হইলে, মাতার উচিত শিশুকে নিজ শরীরের সঙ্গে জড়িত করিয়া রাখা। ইহাতে মাতার শরীরের উত্তাপে সে আরাম বোধ করিবে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর দৈহিক তাপ গর্ভে থাকাকালীন তাপ অপেক্ষা অনেক হ্রাস পায়। শৈত্য বোধ করে বলিয়াই শিশু কাঁদিয়া উঠে।

খাওয়ানো—প্রসবের পর দুই তিন ঘণ্টা শিশুর আহারের প্রয়োজন নাই শিশু জাগ্রত থাকিলে তাহাকে দুই ঘণ্টা পর পর চায়ের চামচের এক চামচ গরম জল একটু মধু বা চিনি মিশাইয়া খাওয়াইতে হইবে।

তৃতীয় দিনে মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। তৎপূর্বে শিশুকে গো-দুগ্ধ বা অন্য কোনও খাদ্য খাওয়াইবার চেষ্টা করা অনুচিত। তৎপরিবর্তে প্রথম দুই দিন মাতৃস্তনে যে হরিদ্রাভ জলীয় পদার্থ বাহির হয়, উহা শিশুর পক্ষে বড়ই উপকারী। ঐ পদার্থ পান করিলে শিশুর পেট পরিষ্কার হয়।

প্রসবের ছয় ঘণ্টা পরে জননীর স্তন দুইটি উত্তমরূপে অল্প গরম জলে ধুইয়া প্রত্যেক স্তন পাঁচ মিনিট করিয়া শিশুকে পান করিতে দিবেন। প্রত্যেক স্তন প্রথম দিন ৬ ঘণ্টা অন্তর, দ্বিতীয় দিন হইতে ৩ মাস পর্যন্ত ৪ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে পান করাইবেন। রাত্রি ১০টা হইতে সকাল পর্যন্ত সারা রাত্রে একবার দুধ খাওয়াইবেন, সুস্থ শিশুকে না খাওয়াইলেও চলে। দ্বিতীয় মাস হইতে ঐ সময়ে না খাওয়াইবারই অভ্যাস করা উচিত।

ক্রন্দন—শিশু যদি সুস্থ থাকে এবং তাহাকে ঠিক নিয়মিতভাবে খাওয়ানো হয় তবে সে কোনরূপ বিশেষ অসুবিধা বোধ না করিলে কখনই কাঁদিবে না। শিশু কাঁদিলে প্রথমে কাঁদিবার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য—হয়ত সে প্রস্রাব বা বাহ্য করিয়াছে; কিংবা পিঁপড়া বা ছারপোকা কামড়াইতেছে; অথবা গরম বোধ করিতেছে; কিংবা অনেকক্ষণ একভাবে শুইয়া থাকার দরুন অস্বস্তি বোধ করিতেছে, একটু কোলে করা দরকার; হয়ত বা গলা শুকাইয়া উঠিয়াছে একটু জলপান করাইতে হইবে। কত সময় শোনা যায় "অমুক ছেলেটি বড় কাঁদুনে হয়েছে, খাইয়ে দাইয়ে শান্তি নেই, সব সময় কেবল কাঁদবে" আবার দুই

একটি ক্ষেত্রে ইহাও শোনা যায় "আহা অমুকের মেয়েটি কি শান্ত সব সময় শুয়ে শুয়ে খেলা করছে, সময় মতো খাইয়ে গেলেই হল, কাঁদতে মোটে জানেই না যেন।" মন্তব্যগুলি শুনিলে মনে হয় শিশু যেন কাঁদুনে বা শান্ত হইয়াই জন্মাইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাতার 'মানুষ' করিবার দোষে বা গুণেই এইরূপ হয়।

জন্মমুহূর্ত হইতেই শিশুর শিক্ষা সুরু হয়, শিশুকে আঁতুড় হইতে যে ভাবে অভ্যাস করানো যাইবে, সে সেইভাবেই অভ্যস্ত হইবে। সুস্থ শিশুর (বিশেষ করিয়া বাঙালী মায়েদের ক্ষেত্রে) কাঁদুনে হইবার কারণ প্রধানত দুইটি।

প্রথমত, আঁতুড়ে শিশুকে সর্বদা কোলে করিয়া রাখা। কোলের কোমলতা ও উষ্ণতায় শিশু আরাম বোধ করে, কাজেই একবার কোল অভ্যাস হইয়া গেলে আর কিছুতেই বিছানায় শুইতে চায় না, শোয়ালেই কাঁদে (এমন কি কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অথচ শোয়াইলেই ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিয়া ওঠে)। মাতা যে কয়দিন আঁতুড়ে থাকেন সে কয়দিন দিনের অধিকাংশ সময় শিশুকে কোলে করিয়া রাখিতে কোন অসুবিধা নাই কিন্তু কিছুদিন পরে যখন সাংসারিক কাজে মাতাকে ব্যস্ত থাকিতে হয় তখন শিশুকে বেশী কোলে করিবার অবসর না হওয়ায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়—শিশুও শুইয়া থাকিতে চায় না, 'কাঁদুনে' আখ্যা পায়। অথচ **আঁতুড় হইতে শোয়াইয়া রাখা অভ্যাস** করিলে শিশু জাগরিত অবস্থাতেও শুইয়া শুইয়া খেলা করিবে।

দ্বিতীয়ত, খাওয়ানো। শিশুকে ঠিক সময়মতো খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সময় ঠিক রাখার অভ্যাস করা দরকার। যখন তখন শিশুকে খাওয়াইলে বা কাঁদিলেই স্তন্যপান করাইলে শিশু কোনও সময়েই পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, তাহার পাকস্থলী বিশ্রাম পায় না, ফলে হজমের ব্যাঘাত ঘটে, এবং অভ্যাসের ফলে সর্বদাই স্তন্যপান করিতে চায় (অনেক সময় ইহার জন্য শিশুর মুখে রবারের চুষি দিয়া রাখা হয়, এটাও প্রকাণ্ড কু-অভ্যাস) এবং কাঁদুনে হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহু ক্ষেত্রে নবপ্রসূতিকে নিয়মিত ঘড়ি ধরিয়া সন্তানকে খাওয়াইবার গুরুত্ব, তাহার উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য কতখানি নির্ভর করে এবং অনিয়মিত খাওয়াইলে তাহার অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইয়া কি ভাবে খাওয়াইতে হইবে উপদেশ দিয়া আসিলেও কিছুদিন পরে গিয়া দেখা যায় উপদেশ অনুযায়ী কিছুই হয় নাই। প্রশ্ন করিলে অবশ্য

নানারূপ অজুহাত শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—"যে সময় ওর খাওয়ানোর সময় হয় তখন ও ঘুমোয়, কাজেই ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়ানো হয় না" ; "বড্ড কাঁদছিল, মাই না দিয়ে চুপ করানো গেল না" ; রাত্রে মাঝে মাঝে মাই না খাওয়ালে মোটে ঘুমোয় না, খালি ট্যাঁ ট্যা করে"—এই অজুহাতগুলির কোনটিই যুক্তিসঙ্গত নহে। যদিই বা দুই একটি ক্ষেত্রে কোন আধুনিক মাতা চিকিৎসকের উপদেশ মতো চলিতে চেষ্টা করেন, তখনই বাড়ীর ঠাকুমা, দিদিমা বা গৃহিণী-জাতীয়া কেহ মন্তব্য করেন, "ডাক্তাররা ওরকম বলেই থাকে, আমরা এত ছেলেমেয়ে মানুষ করেছি কই এ-সব ত কখন শুনিনি, ও-সব মেমসাহেবিয়ানা আমাদের ঘরে চলে না, ছেলে কাঁদছে, গলা শুকিয়েছে তবু মাই দেবে না এ আবার কোন্ দেশী কথা বাপু।" ইত্যাদি। এরূপ কথা শুনিলে উহাতে বিব্রত না হইয়া নিয়ম পালন করিয়া যাইতে হইবে। তবে বাস্তবিক ক্ষুধা পাওয়ার জন্যও শিশু কাঁদিতে পারে। সুতরাং একটু পূর্বেই যেরূপ বলিয়াছি, কেন কাঁদিতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, যথা শয্যা আর্দ্র থাকা, কীটের দংশন প্রভৃতি। যদি মনে হয় যে অত্যধিক ক্রন্দনের একমাত্র কারণ ক্ষুধাবোধ তাহা হইলে যথাসময়ের পূর্বে খাওয়ানো যাইতে পারে।

শিশুর প্রাথমিক, প্রধান ও প্রকৃত খাদ্য মাতৃস্তন্য। যে সমস্ত শিশু জন্ম হইতে প্রায় নয় মাস ইহা খাইতে পায়, তাহাদের স্বাস্থ্য আজীবন ভাল থাকে। জননী মাত্রেরই রীতিমত স্তন্যদান করা উচিত। ইহাতে জননীরও বিশেষ উপকার হয়। স্তন্যদানের ফলে নারীর জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। আঁতুড়ে স্তন্যদান-কালে জননীর পেটে যে ক্ষণস্থায়ী তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, উহা জরায়ু-সঙ্কোচ-জনিত ব্যথা ; উহাকে রোগ মনে করিয়া ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই।

মাতৃস্তনে দুগ্ধ না থাকিলে তবেই গো-দুগ্ধ ছাগ-দুগ্ধ বা পেটেণ্ট ফুড্ শিশুদের দেওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত খাদ্যই অস্বাভাবিক। অনেক নারী স্তনের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া শিশুকে স্তন্যদান না করিয়া গো-দুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। গো-দুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধ খুব পুষ্টিকর খাদ্য বটে, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, হাজার ভাল হইলেও মাতৃদুগ্ধের তুলনায় ঐ সমস্তই নিকৃষ্ট। পারতপক্ষে মাতৃস্তন্য বাদ দিয়া অপর দুগ্ধ বা কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো উচিত নহে।

অতিরিক্ত মাত্রায় স্তন্যপান করাইলে শিশুর পেটের অসুখ হয়, দাস্ত ও বমি হয়। ক্রমে শিশু রোগা হইয়া পড়ে এবং তাহার ওজন হ্রাস

পাইতে থাকে। অতি অল্পমাত্রায় স্তন্যপান করাইলেও শিশুর অপকার হয় ; খিট্‌খিটে মেজাজ, কান্নাকাটি, ওজন হ্রাস, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অত্যল্প পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, শিশুকে খাওয়াইবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় সে ক্রন্দন করিলে, ফুটানো হইয়াছে এরূপ একটু জল সামান্য গরম করিয়া পান করানো ভাল। ইহা ছাড়াও শিশুকে দিনের মধ্যে কয়েকবার ঐরূপ জলপান করানো উচিত। জলপান না করাইলে প্রায়ই উহাদের মুখে ঘা হইয়া থাকে।

শিশুর বদহজম হইলে মৌরী বা যোয়ান গরম জলে ফুটাইয়া সেই জল চিনি দিয়া খাওয়ানো ভাল। সপ্তাহে অন্তত একদিন তাহাকে কাঁচা কাল-মেঘের পাতার রস করিয়া মধু দিয়া খাওয়ানো ভাল। যদি উহা না পাওয়া যায়, তবে নির্ভরযোগ্য ভাল কারখানার তৈয়ারী কালমেঘের নির্যাস খাওয়ানো যাইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুর স্বাস্থ্য অনেকখানি মাতার স্বাস্থ্য ও খাদ্য নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। মাতার খাদ্য সহজপাচ্য পুষ্টিকর হওয়া চাই। সাধারণ ডাল-ভাত (অড়হর, মটর,—ছোলার ডাল নয়), টাটকা মাছ, তরকারি, সুসিদ্ধ মাংস (অল্প পরিমাণে) এবং যথেষ্ট পরিমাণে দুধই প্রসূতির প্রধান খাদ্য। প্রসূতির কোষ্ঠ যাহাতে রীতিমত পরিষ্কার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; প্রচুর পরিমাণে জলপান করা ভাল। প্রসবের পর প্রথম দুইদিন প্রসূতি অতি সহজে হজম হয় এরূপ তরল খাদ্য গ্রহণ করিবেন। তাহার পর মাছ বা অন্যান্য সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করা ভাল।

স্তন্যদায়ী মাতাকে সর্ববিধ **উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার** হাত হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। কোনও কারণে তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইলে তাহার স্তন শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাতে পীড়ার উৎপত্তি হয়। সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইবার সময় প্রসূতির নিকট বাজে লোকের যাওয়া ঠিক নয়।

অনেক মাতার সন্তানকে স্তন্য দান করিবার সময়ও ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। ঋতুস্রাব দেখা দিলেই সন্তানকে স্তন পান করিতে বিরত হওয়া ঠিক নয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত হইলে সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হয়। ঋতুস্রাব হইতে থাকিলে প্রথম ২।১ দিন প্রসূতির স্তন্যের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে ;

ইহাতে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না। বরং অসময়ে দুধ ছাড়াইয়া নিলেই সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

জন্ম মুহূর্ত হইতে শিশুকে কি ভাবে খাওয়াইতে হইবে তাহার সময় ব্যবস্থা নীচে দেওয়া হইল ঃ—

তালিকা নং ১—স্তন্যপান

প্রথম দিন শিশু জাগ্রত থাকিলে তাহাকে ২ ঘণ্টা পর পর সামান্য মধু বা চিনি মিশাইয়া চায়ের চামচের এক চামচ অল্প গরম জল খাওয়াইতে হইবে। ছয় ঘণ্টা পর ও তারপর ৬ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে কয়েক মিনিটের জন্য স্তন্যদান করিতে হইবে। ইহাতে শিশু স্তন্যপান করিতে শিখিবে এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারে সাহায্য হইবে।

দ্বিতীয় দিন প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর শিশুকে কয়েক মিনিটের জন্য স্তন্যদান করিতে হইবে।

তৃতীয় দিনে স্তনে সাধারণত দুগ্ধের সঞ্চার হয়। যদি না হয় এবং শিশু যদি ক্ষুধায় ক্রন্দন না করে বা অস্থিরতা না দেখায় তাহা হইলে শিশুকে স্তন্যদান করিবার পর মধু বা চিনি মিশ্রিত ফুটানো অল্প গরম জল পান করানো যাইতে পারে। এই সময় প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে। যদি স্তনে প্রচুর দুগ্ধ না থাকে এবং শিশু ক্ষুধায় ক্রন্দন করিতে থাকে তবে তাহাকে স্তন্যদানের পর অল্প পরিমাণ গরুর দুধে সমপরিমাণ ফুটানো অল্প-গরম জল মিশ্রিত করিয়া একটু মধু বা চিনি সহ দেওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ দিন হইতে প্রথম মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত সাধারণত স্তনে প্রচুর দুগ্ধ সঞ্চার হয়। প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে ৬, ১০, ২, ৬ এবং ১০ ঘটিকার সময় এবং শীতকালে ৭, ১১, ৩, ৭ ও ১১ ঘটিকার সময় স্তন দান করিতে হইবে, অবশ্য যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর ওজন ছয় পাউণ্ড (তিন সের) বা ততোধিক হয়। যদি শিশুর ওজন ইহা হইতে কম হয় তবে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্যদান করিতে হইবে। বেলা চারি ঘটিকার সময় চায়ের চামচের এক চামচ কমলা লেবুর রস এবং বেলা ১১টা ও সন্ধ্যা ৭টার সময় চায়ের চামচের অর্ধ চামচ কড্‌লিভার অয়েল খাওয়ানো ভাল। দুধ খাওয়াইবার সময় কখনও ফলের রস খাইতে দেওয়া

উচিত নয়; **অন্তত এক ঘণ্টা পরে দিতে হইবে।** ফলের রস অল্প গরম জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়; কমলা লেবু সামান্য টক্ হইলে চিনি মিশাইয়া দিতে হয়।

রাত্রিতে খাওয়ানো

প্রথম মাসে রাত্রি দশটা বা এগারোটা হইতে সকাল ছয়টা বা সাতটা পর্যন্ত সারা রাত্রে মাত্র একবার দুধ খাওয়ানো যাইতে পারে। শিশু পুষ্ট ও সবল হইলে না খাওয়ালেও চলে। **দ্বিতীয় মাস হইতে না খাওয়াইবার অভ্যাসই করা দরকার।**

দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ মাস — প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর স্তন্যদান। প্রত্যহ চারি ঘটিকার সময় একবার কমলা লেবুর রস অর্ধ আউন্স; ক্রমশ পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। বেলা ১১টা এবং সন্ধ্যা ৭টার সময় স্তন্যদানের পর চায়ের চামচের অর্ধ চামচ কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইতে হইবে; এই পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া তিন চামচ করিতে হইবে।

পঞ্চম হইতে অষ্টম মাস — বেলা ৭টার সময় স্তন্যদান। ১১টার সময় অপেক্ষাকৃত ঘন গো-দুগ্ধ। ৩টার সময় স্তন্যদান। সন্ধ্যা ৭টার সময় গোদুগ্ধ। রাত্রি ১০টা কিংবা ১১টার সময় স্তন্যদান। কড্‌লিভার অয়েল এবং কমলা লেবুর রস দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ মাসের মত সময়ে পান করাইতে হইবে।

নবম মাস হইতে শিশুকে স্তন্য দুগ্ধ ছাড়াইতে হইবে।

শিশুকে দুধ ছাড়ানো—প্রথম আট নয় মাস শিশুকে মাতৃস্তন্য দান করিয়া তাহার পর গরুর দুধের পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া অন্তত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাহাকে মাতৃস্তন্য পানে বিরত রাখিতে হইবে। কারণ, ৮।৯ মাসের পর মাতৃস্তন্যের আর বিশেষ কোনও আবশ্যকতা থাকে না।

মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে তখন গাভীর দুগ্ধ এবং অন্যান্য সহজপাচ্য খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে।

কখন মাতৃস্তন্য বন্ধ রাখিতে হয়

মাতার বা সন্তানের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দরুন সন্তানের স্তন্যপান একেবারে বা অল্প সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে হয়। মাতার যক্ষ্মা, রক্তহীনতা,

পুরাতন ম্যালেরিয়া, হৃদরোগ, মৃগী, উন্মাদ রোগ প্রভৃতি থাকিলে সন্তানকে স্তন্যদান উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক।

মাতার সেপ্‌টিক জ্বর, স্তনের বোঁটা ফাটা, স্তন পাকা; অথবা সন্তানের পেটের অসুখ, হাম, বসন্ত প্রভৃতিতে ঐ সমস্ত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিতে হয়।

মাতৃস্তন্যের বদলে

মাতৃস্তন্যের অভাবে অথবা মাতার উপরোক্ত কোনও পীড়ার সময় উপমাতা দুধ দিতে পারে। তবে, তাহার স্বাস্থ্য ভাল হওয়া আবশ্যক এবং তাহার নিজের সন্তানের বয়স শিশুর বয়সের প্রায় সমান হওয়া ভাল। সম্ভব হইলে তাহার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করাইয়া লওয়া উচিত।

গো বা ছাগ দুগ্ধ

এরূপ ধাত্রী না পাওয়া গেলে গো-দুগ্ধ পান করানো উচিত। কিন্তু গো-দুগ্ধে জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া এবং সামান্য মধু বা চিনি মিশাইয়া দুগ্ধকে সুমিষ্ট খাদ্যে পরিণত করিতে হইবে। শিশুর বয়স-ভেদে জল ও মধু বা চিনির পরিমাণও বিভিন্ন করিতে হইবে।

ছাগ ও গাভীর দুগ্ধ পান করাইতে হইলে এই সব কথা মনে রাখিতে হইবে ঃ—

(১) 'এক বলকা' দুধ সহজে হজম হয়। বেশী ফুটানো দুধ গুরুপাক।

(২) যে বাছুরের বা ছাগ-শিশুর বয়স শিশুর বয়সের প্রায় সমান, তাহার মাতার দুগ্ধই শিশুর উপযোগী।

(৩) মাখন তোলা দুগ্ধ বা কেবলমাত্র জল মিশ্রিত দুগ্ধ শিশুকে খাওয়ানো ঠিক নয়। ইহাতে শিশুর পুষ্টি সাধন হয় না।

(৪) রুগ্‌না গাভী বা ছাগীর দুগ্ধ শিশুকে পান করানো উচিত নয়।

(৫) শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ও চিনির পরিমাণ কম করিতে হইবে।

(৬) গাভীর দুগ্ধ মাতৃস্তন্য অপেক্ষা অধিক অম্লভাবাপন্ন; এই অম্লত্ব দূর করিবার জন্য উহার (গাভীর দুগ্ধের) সহিত চুনের জল মিশাইতে হয়। চুনের জল মিশাইলে গাভীর দুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীতে গিয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত দধিতে পরিণত হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ দধি শিশুর পক্ষে অপকারী।

মাতৃস্তনের বদলে বাহিরের দুগ্ধ পান করাইবার নিয়ম
(প্রথম হইতে অষ্টম মাস পর্যন্ত)

প্রথম মাস—শিশুর ওজন জন্মমুহূর্তে ছয় পাউণ্ড (বা তিন সের) * হইলে তাহাকে অর্ধেক পরিমাণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। ওজন অস্বাভাবিকরূপে কম হইলে সমপরিমাণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। প্রত্যেকবার আহারের পরিমাণ আধ পোয়ার বেশী হইবে না। দিনে দুইবার চায়ের চামচের অর্ধ চামচ কড্‌লিভার অয়েল এবং একবার এক চামচ ফলের (কমলালেবু, টোম্যাটো ইত্যাদি) রস পান করাইতে হইবে।

দ্বিতীয় মাস—প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর প্রায় আড়াই ছটাক (৫ আউন্স) পরিমাণ অর্ধেক জলমিশ্রিত দুধ। দিনে দুইবার এক চামচ করিয়া কড্‌লিভার অয়েল এবং দিনে একবার দেড় চামচ ফলের রস খাওয়ানো দরকার।

তৃতীয় মাস—প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর প্রায় তিন ছটাক (৬ আউন্স) পরিমাণ অর্ধেক জল-মিশ্রিত দুধ। দিনে দুইবার ২৷৩ চামচ করিয়া কড্‌লিভার অয়েল এবং দিনে একবার অর্ধ আউন্স ফলের রস।

চতুর্থ মাস—প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর প্রায় সাড়ে তিন ছটাক (৭ আউন্স) পরিমাণ অর্ধেক জল মিশ্রিত দুধ। কড্‌লিভার অয়েল এবং ফলের রসও অধিক পরিমাণে দিতে হইবে।

পঞ্চম হইতে অষ্টম মাস—(১) খাঁটি গরুর দুধ প্রত্যেকবার আড়াই ছটাক পরিমাণে সকালে ৭ ও ১১টার সময় এবং বৈকাল ৩ ও ৭টায় পান করাইতে হইবে। (২) দেড় ছটাক গরুর দুধের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কোন শক্ত খাদ্য যথা, ভাত বা অন্য কিছু দিনে দুইবার ১১ টা এবং ৭টায় দেওয়া যাইতে পারে। (৩) দিনে দুইবার কড্‌লিভার অয়েল। (৪) ফলের রস দিনে একবার বেলা চারি ঘটিকার সময়। প্রত্যহ যে গরুর দুধ দেওয়া হইবে তাহার মোট পরিমাণ পৌনে চার পোয়ার বেশী যেন না হয়।

* ১ পাউণ্ড=অর্ধ সের। ১ আউন্স=২৷৷০ তোলা।

নবম হইতে দ্বাদশ মাস

৭ ঘটিকায়—গরুর দুধ ২ হইতে ৩ ছটাক।

১১ ঘটিকায়—আধপোয়া গরুর দুধ, সাগো (সাগু বা সাবু), বার্লি ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া এক পোয়া পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। চা চামচের ১ হইতে ২ চামচ কড্‌লিভার অয়েল খাওয়ানো দরকার; নরম ভাত অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়—গরম দুধ ২।৩ ছটাক এবং কমলা বা অন্য কোন ফলের রস পৌনে দুই তোলা।

৭ ঘটিকায়—আধ পোয়া দুধ, সমপরিমাণ এরারুট, সাগো ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া; চা চামচের ১ হইতে ১½ চামচ কড্‌লিভার অয়েল।

১০ ঘটিকায়—২।৩ ছটাক গরম দুধ।

ছয় সাত মাস বয়সে মাতার স্তন শিশুর পক্ষে যথেষ্ট না হইলে, শিশুকে একটু একটু মণ্ড খাওয়ানো যাইতে পারে। ক্রমে পাকস্থলীতে এই ভিন্ন জাতীয় খাদ্য সহ্য হইয়া গেলে, দুই একবার বাদামী রংএর ময়দার মণ্ড এবং একটি অর্ধসিদ্ধ ডিম দেওয়া যাইতে পারে। একটি কাঁচা ডিম ভাঙিয়া, গরম ভাতের মণ্ডে দিয়া, নাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভাতের মণ্ড দুই ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিতে হইবে। শিশু বড় হইতে থাকিলে তাহার খাদ্যে একটু ঝলসান বা সিদ্ধ করা আলু দেওয়া যাইতে পারে। পালং শাক এবং বিলাতী বেগুন সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া খাওয়ানো ভাল। কমলা লেবুর রস, ভাল পাকা কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল খাওয়ানো যাইতে পারে।

খাদ্যের পরিমাণ

	১—২ বৎসর	২—৩	৩—৫
দুধ	১৫ ছটাক	১৫ ছঃ	১৫ ছঃ
ডিম	১টি	১টি	১টি
অথবা মাংস, মাছ বা যকৃৎ	আধ ছঃ	পূর্ববৎ	পূর্ববৎ
সবুজ পত্রবহুল শাকসব্জী	½ হইতে ১ ছঃ	১½ ছঃ	১½ ছঃ
গোলআলু বা শিকড়স্থানীয় তরকারী	১ ছঃ কিছু কম	ঐ	১ হইতে ১½
কড্‌লিভার অয়েল	চা চামচের ৩চামচ	ঐ	ঐ
কাঁচা শাকসব্জী বা ফলের রস	½ ছঃ	½—১ ছঃ	ঐ
রুটী, সাগো বা বার্লি	৪ তোঃ কিছু কম	১½	½ পোয়া
মাখন	½ তোঃ কিঃ বেশী	পূঃ মত	৪ তোঃ প্রায়

আট মাস হইতে শিশুকে কিছু কিছু শক্ত খাদ্য চিবাইয়া খাইতে শেখানো উচিত। ইহাতে দাঁত উঠিবার সহায়তা হয় এবং মুখমণ্ডলের পেশীসমূহ শক্ত ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে। মিষ্টি বেশী বেশী খাইতে দিলে পেটের অসুখ, দাঁতের পোকা, ক্রিমি ইত্যাদি হইয়া থাকে। নানারকম ভিটামিন এবং বাঙালীর খাদ্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

পেটেণ্ট ফুড্—স্থানান্তরে গমানাগমন কালে বাড়ী হইতে দুধ লইয়া যাওয়াও যেমন ভাল নহে, তেমনই রাস্তা হইতে দুধ কিনিয়া খাওয়ানও উচিৎ নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে 'পেটেণ্ট ফুড' * সঙ্গে রাখাই যুক্তি সঙ্গত। এইরূপ সাময়িক প্রয়োজনে অগত্যা পেটেণ্ট ফুড্ ব্যবহার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যখন খাঁটী টাট্‌কা দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে, তখন কিছুতেই পেটেণ্ট ফুড্ খাওয়ানো উচিত নহে। বিজ্ঞাপনে যতই চাকচিক্য ও আড়ম্বর-পূর্ণ কথা থাকুক না কেন, বাজারচল্‌তি **কোনও পেটেণ্ট ফুডেই শিশুর দেহ-গঠনের জন্য আবশ্যক সমস্ত উপাদান নাই**। কেবলমাত্র মাতৃস্তন্যে এবং তাহার পরেই গো-দুগ্ধে ও ছাগ-দুগ্ধে ঐ সমস্ত উপাদান থাকে। ক্রমাগত বেশী দিন বাজারের 'মল্টেড্ মিল্ক' ও 'ফুড্' খাওয়াইলে শিশুর 'রিকেট্‌স্' নামক ব্যাধি হইতে পারে। এই রোগে শিশুর অস্থি অতিশয় কোমল, মাথা ও পেট বড় এবং হাত পা সরু সরু হইয়া থাকে। সুতরাং, পারতপক্ষে কদাচ বাজার চলতি ফুড্ শিশুকে খাওয়াইবেন না।

দুধের বোতল—নৌকার মত দুধ খাওয়াইবার বোতল ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে রবারের বোঁটা (nipple) থাকে। বোতল ব্যবহার করিবার **পূর্বে ও পরে খুব গরম জল দিয়া** ধুইয়া ফেলিতে হয়। বোঁটা-গুলিও সাবধানতার সহিত ধুইতে হয়। ময়লা জমিয়া রবার অনেক সময়ে বিষের মত কাজ করে। তাই বোতল উত্তমরূপে ধুইয়া, পরিষ্কার পাত্রে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়; ব্যবহারের পূর্বে উহা জল হইতে উঠাইয়া গরম জলে ধুইয়া লইতে হয় † পাত্র, চামচ, ঝিনুক, পলিতা ইত্যাদিও খুব পরিষ্কার

---

* গ্ল্যাক্সো, ভিটামিল্ক, কাউ এণ্ড গেট্, এ্যালেন্‌বেরীর ফুড, হরলিক্স ইত্যাদি ভাল জিনিস। খাওয়াইবার প্রণালী সঙ্গের ব্যবস্থাপত্রে থাকে।

† বোতল ভাল কারখানার তৈয়ারী হওয়া চাই, (এ্যালেন্‌বেরীর বা গ্ল্যাক্সো ফিডার ভাল)। বোতল প্রতিবার খাওয়াইবার পূর্বে ও পরে গরম জলে ত ধুইতেই হইবে, তাহা ছাড়া প্রত্যহ অন্তত একবার আধঘণ্টা ধরিয়া জলে ফুটাইতে হয় (দেশী বোতল ফুটাইতে গেলে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা

পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় ; উহাতে ধূলা, বালু, কীট, মাছি ইত্যাদি পড়িয়া রোগ জন্মাইতে পারে।

চুষিকাঠি—অনেকে সখ করিয়া শিশুকে চুষিকাঠি ব্যবহার করিতে দেয়। সন্তানের কান্না নিবারণের উপায়রূপে চুষিকাঠি আজকাল ঘরে ঘরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত চুষিকাঠি ব্যবহার করিলে শিশুর তালুর গঠন বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহার গলার ভিতর 'য়্যাডিনয়েড্' (Adenoid) নামক একপ্রকার ব্যাধি দেহ-বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটায়। সুতরাং শিশুকে চুষিকাঠি ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চুষিকাঠির পরিচ্ছন্নতার ব্যাঘাত হইয়াই থাকে এবং সেই জন্য সকল সময়েই বিপদ থাকিয়া যায়।

স্নানাদি

শিশুর স্নানাদির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তবে নাভি না শুকানো পর্যন্ত সমস্ত গা এমনভাবে মুছাইতে হইবে যাহাতে পটি না ভিজিয়া যায়। নাভি না ভিজিলে প্রায়ই ৫।৭ দিনে পড়িয়া যায়। শিশু প্রথমেই ঠাণ্ডা জল সহ্য করিতে পারে না বলিয়া প্রথম প্রথম তাহাকে কুসুম-গরম জলে স্নান করাইয়া স্নানে অভ্যস্ত করা উচিত। ঠাণ্ডা জলে শিশুকে স্নান করাইতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যহ একই সময়ে নিয়মিতভাবে শিশুকে স্নান করানো উচিত।

নিদ্রা

শিশুর নিদ্রা সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম মাসে শিশুর দৈনিক ২০ ঘণ্টা হইতে ২২ ঘণ্টা কাল নিদ্রার দরকার। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া থাকে। ১ বৎসর বয়সে শিশু প্রায় ১৪-১৬

আছে) রবারের বোঁটাগুলি (Teats & Valves) শুধু ধুইলে চলিবে না—প্রতিবার খাওয়াইবার আগে ও পরে ফুটাইতে হইবে। একটি সুবিধাজনক উপায় হইতেছে ৪।৫টি বোঁটা (Allenbury's teats & valves) একসঙ্গে সকালবেলা ফুটাইয়া রাখা এবং প্রতিবার খাওয়াইবার সময় এক এক জোড়া (সামনের একটি ও পিছনের একটি ব্যবহার করা, বিকালে আবার একবার কয়েকটি ফুটাইলে রাত্রের ও ভোরের ব্যবস্থা হইবে। বোতল ব্যবহার সুবিধাজনক বটে কিন্তু উপরোক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ পালন করিতে না পারিলে ঝিনুক বা চামচ ও বাটি ব্যবহার করাই ভাল। পলিতা ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নহে।

ঘণ্টা ঘুমায় ; (যুবকের পক্ষে দৈনিক ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট)। শিশু যতদিন কচি থাকে, ততদিন তাহাকে মায়ের সহিত এক বিছানায় রাখা উচিত নহে। নিদ্রার ঘোরে অনেক প্রসূতি সন্তানের উপর হাত-পা অথবা তাহার নাক-মুখের উপর স্তন চাপাইয়া শিশু হত্যা করিয়াছে। যদি পৃথক বিছানা করা সম্ভব না হয়, তবে একই বিছানায় প্রসূতি ও সন্তানের মধ্যে একটি বালিশ স্থাপন করা খুবই দরকার।

নিদ্রার পরিমাণ

বয়স	নিদ্রার পরিমাণ	বয়স	নিদ্রার পরিমাণ
১ মাস	২১ ঘণ্টা	৪ বৎসর	১৩ ঘণ্টা
৬ ,,	১৮ ,,	৬ ,,	১২ ,,
১ বৎসর	১৫ ,,	৯ ,,	১১ ,,

শৈশবে নিদ্রার পরিমাণ যথেষ্ট না হইলে শিশুদের স্নায়বিক বিকার ঘটিবার আশঙ্কা থাকে ; এবং উহাদের স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি ঘটে না। নিদ্রার সময় এবং স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে ধরাবাঁধা নিয়ম পালন করা উচিত।

শিশুর নাভি

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দিন দিন শিশুর নাভি শুকাইতে থাকে এবং সাধারণত ৫ দিন হইতে ৭ দিনের মধ্যেই নাভি খসিয়া পড়ে। ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কোনও কোনও স্থলে ২০।২১ দিনেও পড়িতে পারে। যদি নাভি শুক্‌না এবং নাভিমূল ফুলিয়া না থাকে, তবে নাভি দেরীতে পড়িলেও তাহাতে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু নাভি যদি না শুকাইয়া নাভিমূলে ফুলা বা ঘা থাকে, তবে অসুখ হইয়াছে জানিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে। প্রত্যহ বোরিক তুলায় বোরিক পাউডার লাগাইয়া নাভির উপর রাখিয়া সর্বদা নাভি বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। নাভিতে জল না লাগানো ভাল ; স্নান করাইবার সময়ে নাভির পটি বাঁচাইয়া শরীর মুছাইতে হয়।

শিশুর পক্ষে রৌদ্র-তাপ

রৌদ্র-তাপ শিশুর পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং সে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মঠ হয়। কাজেই আঁতুড় ঘরে থাকিতেই শিশুকে প্রত্যহ প্রাতে কিছুক্ষণ রৌদ্র-তাপে রাখিতে হইবে। রৌদ্রে রাখিবার সময় শিশুর মাথায় কিছু একটা দিয়া আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে কারণ,

মাথায় রৌদ্র লাগানো ভাল নহে। শিশুকে রৌদ্রে রাখিবার আগে তাহার সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করা খুব ভাল অভ্যাস। যে সমস্ত শিশুকে এই ভাবে প্রতিপালন করা হয়, তাহাদের বড় একটা সর্দি-কাশি হইতে দেখা যায় না। এককালীন ১০ মিনিটের বেশী রৌদ্রে রাখা উচিত নয়।

শিশুর ওজনবৃদ্ধি ও ক্রমপরিণতি

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং ওজন অনেকটা মাতৃগর্ভে সে যেরূপ পোষণোপযোগী খাদ্য লাভ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে। জন্মের পরে তিন দিন শিশুর ওজন কিছুটা হ্রাস পায়, কিন্তু ১২।১৪ দিনের মধ্যে পুনরায় ওজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। সাধারণত জন্মের সময় শিশুর ওজন ৭ পাউণ্ড হয় এবং এক বৎসর পরে উহার ওজন তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। নিম্নে ওজন বৃদ্ধির একটি মোটামুটি তালিকা দেওয়া হইল :—

	কত বাড়ে
জন্মকাল হইতে তৃতীয় মাস পর্যন্ত	৫ $\frac{১}{৪}$ পাউণ্ড
৩—৬ মাস পর্যন্ত	৩ $\frac{১}{২}$ ”
৬— ৯ ”	২ $\frac{১}{২}$ ”
৯—১২ ”	৩ ”

নিম্নে শিশুর ওজনের তারতম্যের তালিকা দেওয়া হইল।

ছেলেদের বৃদ্ধি

	পাঃ	আঃ		পাঃ	আঃ
জন্ম মুহূর্তে	৭	০	২৪ সপ্তাহে	১৫	৮
২ সপ্তাহে	৭	৮	২৮ ”	১৬	১২
৪ ”	৮	০	৩২ ”	১৮	০
৬ ”	৮	১২	৩৬ ”	১৯	০
৮ ”	৯	৮	৪০ ”	২০	০
১০ ”	১০	০	৪৪ ”	২১	০
১২ ”	১১	০	৪৮ ”	২১	৮
১৬ ”	১২	৮	৫২ ”	২২	০
২০ ”	১৪	০			

সাধারণত মেয়েদের ওজন ছেলেদের ওজন হইতে ৪ আউন্স কম হইয়া থাকে।

জন্মের ১২।১৪ দিনের মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়া আসে এবং তখন হইতে চতুর্থ মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৪ হইতে ৮ আউন্স ওজন বৃদ্ধি পাওয়া বাঞ্ছনীয়। পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ মাসের মধ্যে সন্তানের ওজন, জন্ম সময়ের ওজনের দ্বিগুণ হইয়া থাকে। অবশ্য যে সকল শিশু স্বভাবতই অত্যধিক ভারী কিংবা একেবারে হাল্‌কা তাহাদের পক্ষে এই হিসাব খাটে না।

শিশুর কেবল ওজন বৃদ্ধি তাহার স্বাস্থ্য এবং শক্তির পরিচায়ক নহে। শিশুর দৃঢ় মাংসপেশী, কর্মতৎপরতা, নিদ্রা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বও কম নয়। যে শিশুর ওজন একটি সুনির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় তাহার স্বাস্থ্য, অনিয়মিতভাবে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পাওয়া অন্য কোন শিশুর স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। এক বৎসর বয়সের পরে শিশুর ওজন-বৃদ্ধি ব্যাপারটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শরীর ও মনের ক্রমপরিণতি

শিশুর জীবনে নিম্নলিখিত দৈহিক পরিণতি এবং মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জন্ম মুহূর্তেই শিশুর স্বাদ গ্রহণ শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে দেখা যায়।

প্রথম সপ্তাহের শেষে শিশু আলোর দিকে ফিরিয়া তাকাইতে আরম্ভ করে।

একমাস পরে পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

দেড় মাসের সময় শিশুর মস্তকের পশ্চাতের হাড়গুলির সংযোগস্থলে যে পর্দা থাকে তাহা অস্থিতে পরিণত হইয়া যায়।

৬।৭ সপ্তাহের সময় শিশুর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে; তখন মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাহাকে জোর করিয়া হাসাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এরূপ করা অন্যায়।

দুই মাসের সময় সে মাতাকে সম্যক্ চিনিতে পারে। সে ধীরগামী কোনও বস্তুর অনুসরণ করিতে এবং উহা ধরিতে প্রয়াস পায়, তাহার মনোযোগ আরও গভীর হইতে থাকে।

চারি মাসের সময় শিশু মাথা উঁচু করিতে পারে, ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ হয় এবং অপরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করিতে পারে।

পাঁচ মাসের সময় সে চীৎকার করিতে শিখে এবং উচ্চহাস্য করিতে আরম্ভ করে।

ছয় মাসের সময় শিশুর আত্ম-চেতনা জন্মে; সে তখন নিজের হাত এবং পায়ের অঙ্গুলি এবং খেলনা নিয়া খেলা করিতে ভালবাসে; এই সময় দাঁতও দেখা দিতে পারে। তাহার পারিপার্শ্বিক পরিচিত জিনিসগুলির নাম করিলে কিসের কথা বলা হইতেছে বুঝিতে পারে।

আট মাসের সময় শিশু সোজা হইয়া বসিতে পারে।

নয় মাসের সময় সে হামাগুড়ি দিতে থাকে।

এক বৎসর বয়সের সময় অসংলগ্নভাবে শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে এবং নিজে নিজেই দাঁড়াইতে পারে।

পনেরো মাসের সময় শিশু অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে একাকীই হাঁটিতে আরম্ভ করে। দুই চারিটি কথা বলিতে পারে।

দুই বৎরের সময় সাধারণত ছোট ছোট বাক্য তৈয়ারী করিতে পারে। রাত্রে প্রস্রাব বন্ধ করিতে পারে, অর্থাৎ শিশুকে প্রস্রাব করাইয়া শোয়াইলে রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব নাও করিতে পারে।

শিশুর এই ক্রম-পরিণতির ধারা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিলে মাতা কিংবা অন্য যে কেহ শিশুর অভ্যাস, চরিত্র গঠন এবং শিক্ষার গতি নির্ধারণ করিতে পারে।

দাঁত ওঠা

ভিন্ন ভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সে দাঁত ওঠে; **৬ হইতে ৯ মাসের** মধ্যেই সাধারণত দাঁত উঠিয়া থাকে। প্রতি বৎসর ৬ হইতে ৮টি দাঁত এবং ২ বৎসরে ২০টি দাঁত ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

নয় মাসের সময় দাঁত না উঠিলে ডাক্তার দেখানো উচিত, কারণ উপযুক্ত বয়সে দাঁত না ওঠা রিকেট্সের লক্ষণ। রিকেট্স্ হইলে শরীরের হাড় শক্ত হয় না। এজন্য শিশু সোজা হইয়া থাকিতে পারে না এবং তাহার কোমরের হাড় ও বুকের গঠন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মেয়ে সন্তানের এই রোগ

হইলে ভবিষ্যতে তাহারা প্রসব কালে নানারূপ বিপদে পড়িতে পারে। ইহারা সাধারণত ক্ষীণজীবী এবং রোগা হয়। সুতরাং যথাসময়ে এই রোগের সুচিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুস্থ, কোষ্ঠকাঠিন্যমুক্ত এবং যথারীতি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণকারী শিশুর দাঁত উঠিবার সময় বেদনা বা অন্য কোনও উপসর্গ দেখা দেয় না। অনেক সময় দাঁত উঠিতে দেরি হয়। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে দাঁত শিশুর দেহের রক্ত হইতেই উদ্ভূত হয়, সুতরাং তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। শৈশব এবং বাল্যকালে কিছু কিছু শক্ত খাদ্য খাওয়া চাই যেন মুখ ও চোয়ালের ব্যায়াম হয়। নয় মাস পরে শিশুদিগকে অপেক্ষাকৃত শক্ত খাদ্য দিতে হইবে; দ্বিতীয় বৎসরে উহাদিগকে অধিকতর শক্ত এবং শুক্‌না খাদ্য দেওয়া দরকার। দাঁত ওঠার পর ভাতের ফেন, ডালের ঝোল, গলা ভাত বা সাগু, বার্লি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। কারণ, তখন উহাদের শরীরের পুষ্টির জন্য দুগ্ধ ভিন্ন এই জাতীয় খাদ্যও দরকার।

কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা

সন্তানের **মলত্যাগের নিয়মানুবর্তিতার** দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। উহা নিয়মিত করিবার এক **সহজ উপায়** এই যে, প্রত্যহ একই সময়ে দুই বেলা মলত্যাগের ভঙ্গিতে শিশুকে বসাইয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে অভ্যাস সৃষ্টি করা যাইবে। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে পানের বোঁটা দিয়া পায়খানা করানোর নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। প্রথমেই কোনও ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পানের বোঁটা দিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করা মন্দ নয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ

শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ মোটামুটি চলনসই হওয়া দরকার। মনের উপর পোষাক-পরিচ্ছদের ক্রিয়া হইয়া থাকে, একথা সকলেই অবগত আছেন। সেজন্য শিশুদের পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বদা পরিষ্কৃত রাখার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বিলাসিতাপূর্ণ চাকচিক্যময় পোষাকও শিশুকে পরানো উচিত নহে। ইহাতে শিশুর মধ্যে গর্ব ও আড়ম্বরের স্পৃহা হইতে পারে। শিশুর পোষাক সাদাসিধা ধরনের হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ব্যায়াম ও খেলাধুলা

এতক্ষণ আমরা শিশুর খাদ্য, যত্ন এবং লালন-পালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সুঠাম, সুন্দর শিশু সকল মাতাপিতারই কামনার বস্তু। কিন্তু কেবল খাদ্য বিচার করিলেই উহার শরীর সুগঠিত এবং নীরোগ হয় না। শিশুকাল হইতে দেহ যদি সুঠাম ও মজবুত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনেও রোগের আশঙ্কা বড় একটা থাকে না।

ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু হাত-পা নাড়াচাড়া করে, লাথি ছোঁড়ে, অঙ্গ সঞ্চালন করিবার প্রয়াস পায়। এই সব তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ক্রিয়া। কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সুশৃঙ্খল সঞ্চালনকেই **শিশুর ব্যায়াম** বলা যায়।

সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠুভাবে গঠিত থাকে না; থাকে কেবল সুগঠিত ফুস্‌ফুস্‌, হজম শক্তি এবং কাঁদিবার মত স্বরনালীর ব্যবস্থা। উহাদের হাড়গুলি থাকে অত্যন্ত নরম, মাথার খুলি নরম ও তুলতুলে। যথাবিধি অঙ্গসঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দৃঢ় ও সুডৌল হইতে থাকে।

পেটের অসুখের কারণ ও প্রতিকার

আমাদের দেশের শিশুদের পেট সাধারণত অতিমাত্রায় বড় হয়, কারণ কোন্ বয়সে শিশুর কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা মায়েদের জানা নাই;—অতিরিক্ত ভোজন করাইবার ফলে উহাদের পেটের মাংসপেশীগুলি ঠিকমত গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই জন্য বড় হইলে উহাদের নানাপ্রকার পেটের অসুখ হইয়া থাকে। শিশুর পাকস্থলীর ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক। উহাদিগকে **উপুড় করিয়া শোয়াইয়া ব্যায়াম করাইতে** হইবে। পাশ্চাত্ত্যের কোনও কোনও শিশুপালন কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রাতে শিশুদের পিঠ ও পেটের পেশীগুলিকে মজবুত করিয়া তুলিবার জন্য যথাবিধি ব্যায়াম করানো হয়।

বুক ও ঘাড়—শিশুর বক্ষদেশ যাহাতে ঠিকমত বাড়ে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিশুর **শ্বাস-প্রশ্বাস** যাহাতে নিয়মিত ও নির্দোষভাবে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। শিশুকে ছোটবেলা হইতে হাত-পা ছড়াইয়া শুইতে শিখাইতে হইবে। বাম হাতের উপর শিশুর বুক ও

পাঁজরার ভার রাখিয়া উহার পা-দুটি ডান হাত দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলে উহাকে খুব সাবধানে রাখা হইবে। এইভাবে তুলিয়া ধরিলে শিশু নিজেই বুক ও ঘাড়ে জোর দিয়া মাথা তুলিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহা হইলে শিশুর বুক ও ঘাড় উভয়ই শক্ত হইবে।

শিরদাঁড়া—শিশুর মেরুদণ্ড ঠিকভাবে গড়িয়া তোলা না হইলে ভবিষ্যতে সে কুব্জ বা খর্বকায় হইতে পারে। এই জন্য **মেরুদণ্ডের ব্যায়ামও** একান্ত দরকার। প্রত্যেক জননী তাঁহার শিশুকে এই ব্যায়াম করাইতে পারেন।

পায়ের পাতায় আঙ্গুল দিয়া সুড়সুড়ি দিলে শিশুদের পায়ের মাংপেশীগুলি সঞ্চালিত হয় এবং ভবিষ্যতে আর উহাদের পায়ে কড়া বা গাঁট ফোলার যন্ত্রণা হয় না।

নাড়াচাড়া করা—দিনান্তে একবার মায়ের কোলে রাখিয়া শিশুর মাথা নীচের দিকে করিলে প্রত্যহই শিশুর দেহের ভিতরের অঙ্গগুলিতে নাড়াচাড়া লাগে ও রক্ত চলাচলের কাজও ভাল হয়। ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। শিশুরা ব্যায়াম করিয়া আনন্দ পায় এবং যে কোনও অবস্থায় নাড়াচাড়া করিলেও তাহারা ভয় পায় না। কাজেই উহাদিগকে ব্যায়াম করাইতে কোনও বেগ পাইতে হয় না।

শিশুর রোগ এবং তাহার প্রতিষেধ ও প্রতিকার

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, **শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখা** প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্য-কর্তব্য। উহাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য নিয়মিত আহার, পরিমিত ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে কথাও আমারা বলিয়াছি। সাধারণভাবে ঐ সমস্ত সতর্কতা ছাড়াও শিশু-দিগকে কতকগুলি পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশের শিশু-সন্তানগণকে প্রায়ই নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাধি প্রায়ই সংক্রামক হইয়া থাকে বলিয়া বাড়ীতে একজনের হইলেও আর সকলকে আক্রমণ করে। পূর্বাহ্ণে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সমস্ত ব্যাধির আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে।

হাম—সর্দি-কাশি ও জ্বর সহ চোখ হইতে জল পড়িয়া তৃতীয় বা চতুর্থ দিবস হইতে সর্বাঙ্গে লালবর্ণ ঘামাচির মত বাহির হয়। এই রোগে ৭।৮ দিনের মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে হামও মিলাইয়া যায়। কিন্তু

সর্দি-কাশি থাকিয়া যায়। সেই সময়ে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে সর্দি-কাশি বাড়িয়া ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া পর্যন্ত হইতে পারে। বাড়ীতে কোন এক ছেলের হাম হইলে অন্য সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে উহা সংক্রামিত হয়। সুতরাং বাড়ীতে কিংবা প্রতিবেশীর কোনও ছেলেমেয়ের হাম হইলে **রোগীর সহিত অন্য ছেলেমেয়েকে মিশিতে দিবেন না**। কারণ হামের বীজাণু রোগীর নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া নাসিকার ভিতর দিয়া অপরের শরীরে প্রবেশ করে। হাম-রোগীর কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র গরম-জলে না ফুটাইয়া অন্য শিশুকে সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দিবেন না। এই রোগ শিশুদিগকেই প্রধানত আক্রমণ করে। পাঁচ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক শিশুগণই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

হুপিং কাসি—এই রোগেও সাধারণত শিশুরাই আক্রান্ত হয়। শিশুদের কাসি হইলেই তাহা প্রায়ই হুপিং কাসে পরিণত হয়। এই কাসিতে রোগী একদমে অনেকক্ষণ কাসিয়া শেষে মোরগের বাঙের মত হুপ্ শব্দ করিয়া থাকে বলিয়া ইহাকে হুপিং কফ বলা হয়। হুপিং কফও **সংক্রামক** সুতরাং এক শিশুর হুপিং কফ হইলে অন্য শিশুকে যথাসম্ভব দূরে রাখিবেন। হুপিং কফের রোগীকে রাত্রিতে বিছানায় শোওয়াইবার সময় শূকরের চর্বি গরম করিয়া তাহার পায়ের তলায় মালিশ করিবেন, পুরাতন 'রম' নামক মদ শিশুর পিঠে মালিশ করিলেও হুপিং কফে উপকার হয়। প্রথম অবস্থা হইতে ভ্যাক্সিন্ (váccine) ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসা করিলে রোগীর কষ্ট এবং রোগভোগের কাল আরও কমানো যায়।

ক্রিমি—শিশুগণের আর এক ব্যাধি ক্রিমি। ক্রিমি বহু প্রকারের দেখা যায়। তাহার মধ্যে সূত্র ক্রিমি ও কেঁচো ক্রিমি প্রধান। সূত্র ক্রিমি সাদা সূতার ন্যায় সরু ও ক্ষুদ্র; ইহারা গুহ্যদ্বারে কিলবিল করিয়া অত্যন্ত চুলকানি সৃষ্টি করে। বড় ক্রিমি বা কেঁচো ক্রিমি আরও উর্ধ্বে ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পাকস্থলীতে বাস করে। পেটে ক্রিমি থাকিলে অজীর্ণ, মুখে দুর্গন্ধ, গুহ্যদ্বারে ও নাসিকাগ্রভাগে চুলকানি, শুষ্ক-কাসি, নিদ্রায় চমকাইয়া ওঠা, নিদ্রায় দাঁত কিড়মিড় করা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্যের সহিত অথবা ধুলা-বালু-ময়লার সহিত ক্রিমির ডিম পেটে যাওয়া প্রভৃতি কারণে ক্রিমি হইয়া থাকে। প্রত্যুষে লবণ-জল পান করিলে কিংবা লবণ-জল ঈষৎ গরম করিয়া ডুশ দিলে ক্ষুদ্র-ক্রিমিতে উপকার হইতে পারে। বাহ্য পরীক্ষা করাইয়া চিকিৎসা করাইতে হয়।

ডিপ্‌থিরিয়া—সাধারণত ৩ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক শিশুদের ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হইতে দেখা যায়। গলার ভিতরে পর্দা পড়িয়া শ্বাসনালী বা অন্ননালীর কার্যের অসুবিধা হইলেই তাহাকে ডিপ্‌থিরিয়া বলে। রোগীর হাঁচি, কাশি, ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসে এই রোগ সংক্রামিত হয়। এই রোগে জ্বর, কাশি, গলায় ব্যথা, গলার হাড় ফুলা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ খুব মারাত্মক। রোগের প্রারম্ভে সিরাম্ ইন্‌জেক্‌সান না করিলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া অনেক শিশুই মারা যায়। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত সতর্কতার ব্যবস্থা আছে; এই রোগেও সেই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব প্রয়োজনীয়। এই রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সানও আছে।

ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস)—কাটা নাভির ক্ষতে কোন ময়লার সহিত এই জীবাণু লাগিলে এই রোগ হয়। *

বড়দেরও ক্ষতে ধুলা, মাটি প্রভৃতি ময়লা লাগিলে এই রোগ হয়। এই রোগ হইলে ২/৪ দিনের মধ্যে রোগী মারা যায়। ইহার প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সন আছে। প্রধানত গোয়াল ঘর ও আস্তাবলের জমিতে এই রোগের জীবাণু বিস্তার করে। শিশুর জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে দেখা যায়। ইহাতে শিশুর চোয়াল আট্‌কাইয়া যায়, পিঠের দাঁড়া শক্ত হয় ও বাঁকিয়া যায়; পা শক্ত হয় ও খেঁচিতে থাকে। অজ্ঞ লোকে বলে 'পেঁচোয়' (এক প্রকার ভূত) পাইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে ওঝা ডাকিয়া ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থা হয়। ভূত নয়, ইহা একটি শক্ত ব্যাধি। ডাক্তার ডাকা উচিত।

বসন্ত—প্রথমে জ্বর হয়। ঐ জ্বরে মাথায় ও পেটে যন্ত্রণা হয়। ৩।৪ দিন জ্বর হইবার পর শরীরে আঙুরের দানার মত ফুস্‌কুড়ি বাহির হয়। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক ও অতিশয় মারাত্মক। এই রোগের বিষ রোগীর নিঃশ্বাসে, কাপড় চোপড়ে, বিছানা-পত্রে এবং গায়ের চর্মে লুক্কায়িত থাকে। এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক টীকা। প্রত্যেক শিশুকে **ছয়মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যেই টীকা** দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি কোন স্থানে বসন্ত

* কাটা নাভির ক্ষতে, সাধারণত অশিক্ষিতা ধাইয়ের বাঁশের চাঁচাড়ি বা অপরিষ্কৃত অস্ত্র দ্বারা নাভি কাটিবার জন্য অথবা কোনও ময়লার সহিত, ধনুষ্টঙ্কারের বীজাণু লাগিয়া এই রোগ হয়। এই রোগ একবার হইলে রোগীকে বাঁচানো খুবই কঠিন, কিন্তু ইহার প্রতিষেধ সহজ—নাভি কাটিবার জন্য ধাইয়ের পরিশোধিত হস্তে (sterilised hand) ফুটানো কাঁচি ব্যবহার করা এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় (aseptically) নাভি বাঁধার কথা (dressing of the cord) পূর্বেই বলিয়াছি।

রোগ দেখা দেয়, তবে সে স্থানের সমস্ত সদ্যোজাত শিশুকেই টীকা দেওয়া উচিত। **টীকার প্রতিষেধ ক্ষমতা** তিন বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। সুতরাং অন্তত তিন বৎসর অন্তর অন্তর টীকা লওয়া উচিত।

জলবসন্ত—ইহা তত মারাত্মক নহে, তবে যথেষ্ট কষ্ট দিতে পারে। ইহা খুব ছোঁয়াচে। আসল বসন্ত এবং জল বসন্তে তফাত অনেক; তবে সাধারণ লোক চিনিতে ভুল করিতে পারে।

জলবসন্ত সামান্য একদিনের জ্বরে অথবা একেবারে বিনা জ্বরেই বাহির হয়। জলবসন্তের দানা ফোস্কার মত। রোগীকে আলাদা ঘরে রাখা উচিত, এবং ২১ দিন পর্যন্ত বাহিরে যাইতে দিতে নাই।

কলেরা—এক প্রকার সূক্ষ্ম কীট খাদ্য ও পানীয়ের সহিত উদরে প্রবেশ করিলে কলেরা রোগ হয়। ইহা অতিশয় সংক্রামক ও মারাত্মক। অন্যান্য সংক্রামক রোগে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে সমস্ত সতর্কতা এখানে অত্যাবশ্যক ত বটেই, তাহা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ফুটানো এবং ঢাকা জল পান করিবেন। সংক্রামক আকারে কলেরা দেখা দিলে কলেরা-টীকা লওয়া উচিত।

কোষ্ঠকাঠিন্য—অধিকাংশ শিশুই এই রোগে ভুগিয়া থাকে। স্তন্যদাত্রী মাতার যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে শিশুকেও এই ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে। কৃত্রিম খাদ্য খাইয়া যে শিশু বাঁচিয়া আছে তাহার খাদ্যে যদি চিনি, মাখন জাতীয় পদার্থ এবং ছানা সমানুপাতে না থাকে এবং শিশু যদি প্রচুর জলীয় পদার্থ পান না করে তাহা হইলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে পারে। এক বৎসর বয়স্ক শিশুকে **ফলমূল এবং শাকসব্জী খাইতে দেওয়া আবশ্যক**। নতুবা কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে পারে। খাদ্য ঠিকভাবে নির্বাচন এবং আহারের সময়ের মাঝে মাঝে শিশুকে অল্প গরম সিদ্ধ জল পান করানো উচিত। টাটকা ফলের রস, কমলালেবু ইত্যাদি খাওয়ানো যাইতে পারে। ৫।৭ দিনেও কোষ্ঠকাঠিন্য না সারিলে, প্রতিদিন দুইবেলা দৈনিক ১০।১৫ ফোঁটা কড্‌লিভার অয়েল, অলিভ্‌ অয়েল, কিংবা ১০ ফোঁটা গব্য ঘৃত ও দুগ্ধ শর্করা খাওয়ানো চলে। দিনে দুইবার—ভোরে এবং বিকালে শিশুর **তলপেট অন্তত দশ মিনিট-কাল মাজা** (massage) দরকার। তলপেটের ডানদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তাকারে ক্রমে উপরের দিকে এবং আবার নিম্ন বাম দিকে মাজিতে হইবে। পদদ্বয়ের ব্যায়াম করানো দরকার, ইহাতে তলপেটের

মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় হয়। ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ এই অবস্থায় দেওয়া বিধেয় নয়।

পেটের অসুখ—সাধারণত অতিভোজন এবং অখাদ্য-কুখাদ্যই পেটের অসুখের কারণ। স্তন্যপায়ী শিশুর দিনে ২/৩ বার দাস্ত হইতে থাকিলে তাহাকে আরও অল্প সময়ের জন্য স্তন্যপান করানো দরকার। ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা রোগ বীজাণু পাকস্থলীতে সক্রিয় হইয়া উঠিলেও পেটের অসুখ হইতে পারে। দিনে ৫/৬ বার দাস্ত হইলে চায়ের চামচের এক চামচ ক্যাষ্টর অয়েল দুই চামচ গরম (সিদ্ধ) জলের সহিত পান করানো যাইতে পারে। শিশুকে যতক্ষণ সম্ভব কিছু না খাওয়াইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। পেটে সর্বদা গরম কাপড় বা ফ্ল্যানেল বাঁধিয়া রাখিবেন যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

চোখ ওঠা—অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত গরমে চক্ষের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া চোখ লালবর্ণ হইলে তাহাকে চোখ ওঠা বলা হয়। এই রোগে চক্ষুতে বেদনা হয়; ইহা খুব সংক্রামক। প্রসূতির গণোরিয়া থাকিলে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, উহার কপোল দেশে এবং ললাটে উক্ত স্রাব লাগে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর চক্ষু খুলিবামাত্র ঐ স্রাব শিশুর চক্ষুর ভিতরে লাগিয়া যায়। প্রসূতির গণোরিয়ার স্রাবই শিশুর জন্মান্ধতার প্রধানতম কারণ; মাতৃগর্ভ হইতে কোন শিশুই জন্মান্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। সময়ে সাবধান হইলে অর্থাৎ প্রসূতির পূর্বাহ্ণে চিকিৎসা করিলে, এই অন্ধতা নিবারণ করা যায়। আঁতুড় ঘরেই অধিকাংশ শিশু অন্ধ হইয়া যায়, চোখ উঠিলে যথাসময়ে তাহার সুচিকিৎসা না হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা চোখে ধোঁয়া লাগিয়া শিশুর চোখ ফুলিয়া যাইতে পারে এবং চোখ হইতে জল ঝরিতে থাকে। তখনই ডাক্তার দেখানো উচিত; দেরি হইয়া গেলে আরোগ্যের সম্ভাবনা কম থাকে।

'প্রসবের প্রক্রিয়া' অনুচ্ছেদে (৩২৮ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে, যখন তাহার মাথা প্রসব পথে সবে মাত্র বাহির হয়, তখন জলে ফুটানো বোরিক তুলা বা জলে ফুটানো পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা প্রত্যেক চোখই ভাল করিয়া মুছাইয়া দেওয়া ভাল; তাহা হইলে কোনরূপ স্রাব চোখর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। 'আঁতুড় ঘরে সন্তান' অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে, শিশুর স্নানের পরই তাহার প্রত্যেক চোখে এক ফোঁটা 'সিল্‌ভার নাইট্রেট' লোসন (1% Silver Nitrate Lotion) দেওয়া উচিত, নতুবা চোখ সংক্রামক

-রোগ বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ নর্ম্যাল স্যালাইন্ সলিউসন্ (Normal Saline Solution) দ্বারা চক্ষু ধুইয়া দিতে হইবে।

শিশুর আরও বহু প্রকার অসুখ-বিসুখ হইয়া থাকে। ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রসূতি-পরিচর্য্যা' এবং ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রণীত 'সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র' পুস্তক দুইটিতে শিশু-রোগের প্রতিষেধ ও প্রতিকার বিষয়ে বহু মূলবান তথ্য আছে।

অন্যান্য তথ্য

শিশুমঙ্গল আন্দোলন—শিশু মঙ্গল আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন টমাস ফষ্টার (Thomas Foster)। ইনি ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুস্তকে (Book of Children) এই বলিয়া উপদেশ দেন যে, মাতা নিজেই নিজের শিশুর পরিচর্যা করিবে তদবধি এই আন্দোলন জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে।

পূর্বে গর্ভাবস্থায় নারীদের রোগ ও অসাচ্ছন্দ্য এবং শিশুদের জীবন-প্রভাতে বিপদ-আপদ প্রকৃতির ব্যবস্থা বলিয়া সহ্য করিয়া যাওয়া হইত। এখন ক্রমেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, উপযুক্ত যত্ন লইলে ও প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিলে এই সকল ব্যাধির কবল হইতে মাতা ও শিশুকে অতি সহজেই রক্ষা করা যায়।

আমাদের দেশেও এ বিষয়ে গণজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে, এ কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। আমার এই পুস্তক যদি এই আন্দোলনের কিছুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে, তবে আমার শ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

ত্বকচ্ছেদ—ইহুদি ও মুসলমানেরা শিশুদের ত্বকচ্ছেদ করাইয়া থাকেন। ত্বকচ্ছেদের অন্যান্য উপকারের মধ্যে সর্বপ্রধান ইহাই যে, ত্বকচ্ছেদ করাইলে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে, রতিজ রোগ কম হয় এবং সম্ভোগেরও ক্ষমতা বাড়ে। অধিকাংশ ডাক্তারই ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে একমত। ইহুদি ও মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও এই স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিরুদ্ধে গোঁড়ামি থাকা উচিত নহে। শৈশবে ত্বকচ্ছেদ সম্পাদন করা খুব সহজ। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধু ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া যৌবনেও ডাক্তারের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করাইয়া ত্বকচ্ছেদ করিয়া লইয়াছেন।

শিশুর শিক্ষা

কিসে কিসে চরিত্র গঠিত হয়

শিশুর শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি? শিশু কতকগুলি সংস্কার বা সহজাত বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার শিশু-জীবনের পারিপার্শ্বিকতাও তাহার জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রিত করে। বংশগতি (heredity) জনিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, মানসিক গতি এবং প্রকৃতি শিশুর জীবনে কতটুকু সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে তাহার পরিমাণ এবং বিস্তৃতি নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু একথা ঠিক যে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই দুইএর সমন্বয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া ওঠে।

ভাল অভ্যাস করানোর লাভ

মানুষের স্বভাবের অনেকটা কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি বই আর কি? শৈশবেই এই অভ্যাসের ভিত্তি গড়িয়া ওঠে; আবার এই অভ্যাসকে ভিত্তি করিয়াই শিশুর চরিত্র গড়িয়া ওঠে। যদি জন্ম-মুহূর্ত হইতে শিশুকে সু-অভ্যাসের অধীন করা যায়, তাহা হইলে পরবর্তী জীবনে **নিয়ম, সুশৃঙ্খলা, আজ্ঞানুবর্তিতা, সময়নিষ্ঠা, সংযম** প্রভৃতি মহৎ গুণ তাহার চরিত্রকে করিয়া তুলিবে আদর্শস্থানীয়।

শিক্ষা কখন আরম্ভ হয়?

জন্ম-মুহূর্ত হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। শিক্ষা অর্থে আমরা কেবল লেখাপড়া বুঝি না; **শিক্ষার অর্থ** জীবনপথে চলিবার মত সামর্থ্য অর্জন। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন-ধারা একরূপ নির্ধারিত হইয়া যায়। এই সময় শিশুকে অত্যন্ত সাবধানে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

শিশুর চরিত্র গঠনে মাতা-পিতার দায়িত্ব

শিশুর **চরিত্র গঠনে** মাতাপিতার দায়িত্ব অসীম। শিশু এই পৃথিবীতে জন্মায় একটি স্ফুটনোন্মুখ মন লইয়া ;—রহস্যময় তাহার জীবন। তাহার দেহ ও মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া, হাবভাব এবং অভিব্যক্তি সূক্ষ্মভাবে-পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া উহাদের অব্যক্ত মনের গতি, প্রত্যেকটি আচরণ ও গতিবিধি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শিশুরাও মানুষ ; এক পরিপূর্ণ মানবের বীজ উহাদের মধ্যে নিহিত থাকে। অতি যত্নে এই অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের মানুষটিকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিতে হয়। কোনও কোনও শিশু অতিরিক্ত লজ্জাশীল, ভীরু, একগুঁয়ে এবং খিট্‌খিটে হইয়া থাকে। শিশুদের মনের মধ্যেও বয়স্কদের মত নানা বিরুদ্ধ ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত চলে। এই পরস্পর বিরোধী প্রকৃতির সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলেই শিশুর চরিত্র সুগঠিত হইতে পারে। মনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব মিটাইতে পারিলে শিশুর লজ্জাশীলতা, বিরক্তিভাব ইত্যাদি সংশোধন করা যাইতে পারে।

শিশুর মনের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

আমরা মাতাপিতার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা জোর গলায় বলিলাম সত্য ; কিন্তু এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যে শিশুর মনস্তত্ত্ব ও তাহার উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা উচিত, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিষয়টি অতিশয় জটিল। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার অবকাশও এখানে নাই। আমার ইংরাজী পুস্তক Crime and Criminal Justiceএ Heredity and Environment শীর্ষক অনুচ্ছেদে এই তত্ত্বসমূহের মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি।

The Indian Journal of Social Work (Bombay, 1940 issues)-এ শিশুর আচরণের মূল কারণসমূহের গবেষণামূলক আলোচনা করিতে গিয়া K. R. Masani অনেক মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা ছাড়া বহু পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি হইতে এই বিষয়ে আলোচনার সারমর্ম আমি অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিতেছি।

পিতৃ-মাতৃগুণবীজ এবং দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার ফল

অধুনা শিশুর উপর জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব লইয়া বহু আলোচনা ও বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে। এখন ইহা প্রায় সর্ববাদীসম্মত ভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে যে, উভয়েরই প্রভাব শিশুর আচরণের উপর সুস্পষ্ট। কতকগুলি শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য লইয়া সকল শিশুই জন্মগ্রহণ করে। চোখ, কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া শিশু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান আহরণ করে। তবে ইহাদের কার্যক্ষমতা বিভিন্ন হইয়া থাকে।

উপলব্ধি করিবার যন্ত্র হিসাবে সকল শিশুরই মস্তিষ্ক রহিয়াছে। তবে মানসিক শক্তিরও কম বেশী হইতে দেখা যায়।

আমেরিকায় জন্মগত বুদ্ধিমত্তার তারতম্যের বিচার ও বিশ্লেষণ ভাল ভাবেই হইয়া থাকে। একই বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদের বুদ্ধিমত্তায় অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশী পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি মাতাপিতার হতাশ হইবার কারণ আছে ? বিশেষ নয়।

একটি দিক বিবেচনা করিলেই আমরা একথা বুঝিতে পারিব। সকল মানবশিশুই মাতৃভাষা শিখিয়া মনোভাবের আদান প্রদান করে। কিন্তু লোকালয় হইতে দূরে রাখিয়া মাতাপিতা যদি কেবল শিশুর দৈহিক প্রয়োজনই মিটাইয়া উহাকে প্রতিপালন করে তাহা হইলে সে ভাষা শিক্ষা ও পরে বিদ্যাভ্যাস করিতে না পারায় তাহার মন থাকিয়া যায় অবিকশিত এবং অপূর্ণাঙ্গ। শিক্ষার আলোক মনকে কত সমৃদ্ধ করে তাহা বলাই বাহুল্য। তাই তীক্ষ্ণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিশুকেও অজ্ঞানের তিমিরে রাখিয়া দিলে তাহার মনের বিকাশ ব্যাহত হয়। তবে এ কথা ঠিক যে, একই আবেষ্টনীতে লালিত পালিত হইলেও এবং একই রূপ শিক্ষার সুযোগ পাইলেও মেধাবী ছেলেমেয়েরা অন্য সকলকে ছাড়াইয়া যাইবে।

শারীরিক শক্তি ও দক্ষতা যেমন মানুষ কর্ষণ ও অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করে শুধু জন্মগত মূলধন লইয়া বসিয়া থাকে না, মনের বেলায়ও তেমনই শিক্ষা ও কর্ষণের দ্বারা জন্মগত শক্তিকে আরও অধিকতর করা যাইতে পারে।

আমরা এই পুস্তকের অন্যত্র মানব শরীরে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রভাবের পরিচয় দিয়াছি। এই গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ার গোলযোগে শিশুর মানসিক

বৈষম্য দেখা দিতে পারে। পিটুইটারী, থাইমাস, এ্যাড্রিন্যাল্, থাইরয়েড্ প্রভৃতি গ্রন্থির ক্রিয়ার বৈকল্যে শিশুর আচরণের গোলযোগ হইয়া থাকে এবং উহার সুষ্ঠু পরিণতির ব্যাঘাত হইতে পারে।

ইহাদের ক্রিয়াবৈষম্য লক্ষ্য করিয়া আজকাল গ্রন্থিরসতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকেরা (Endocrinologists) উহার প্রতিকার করিতে পারেন। এই দিকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক নব ও দূরপ্রসারী উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে।

শারীরিক অপকর্ষ অনেক সময়ে মানসিক অবনতির কারণ হয়; আবার উপযুক্ত মতে চালিত হইলে শিশু শারীরিক অপকর্ষকে ঢাকিবার জন্য ক্ষতিপূরণ করিবার ছলে মানসিক উন্নতি লাভ করে।

পারিপার্শ্বিক—শিশুর প্রথম পারিপার্শ্বিক জগৎ গড়িয়া ওঠে বাড়ীতে। পিতামাতা বা পিতৃমাতৃস্থানীয় লোকেরাই হয় তাহার প্রথম শিক্ষাগুরু। মাতার হাবভাব, আচার-ব্যবহার সহজাত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া শিশু অনুকরণ করিতে থাকে এবং তিলে তিলে, অন্যের অজ্ঞাতসারে, এই অনুকরণীয় আদর্শ—ভাল বা মন্দ—সন্তানের চরিত্রে দৃঢ়মূল হইতে থাকে।

শিশুর অনুকরণপ্রিয়তা

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। সে যাহাকে ভালবাসে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহারই কার্যকলাপের অনুকরণ করিয়া থাকে। শিশুর নিকট বক্তৃতা বা উপদেশের বিশেষ আদর নাই; সে চিনে বাস্তব, জীবন্ত আদর্শ। বুদ্ধিমতী মাতা সূক্ষ্মভাবে সন্তানের রুচি, আগ্রহ, বিতৃষ্ণা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং তাহার অন্তরের কথা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন। "উপদেশের চেয়ে উদাহরণ ভাল" এই সুপ্রাচীন প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা শিশুর জীবনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। আমরা যেভাবে কথাবার্তা বলি, যে ভাবে কাজকর্ম করি শিশু নিবিষ্টচিত্তে তাহা পর্যবেক্ষণ এবং অনুসরণ করে। আমরা অনেক সময় শিশুদের সম্মুখে এরূপ আপত্তিজনক ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করি যে, শিশুরা দুর্ভাগ্যবশত ঐরূপ ব্যবহারই শিক্ষা করিয়া থাকে।

সৎসঙ্গ

সন্তানকে সকল দিক হইতে সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে সৎসঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্ভব হইলে খেলাধূলা ব্যতীত

অন্য সকল সময় শিশুকে পিতামাতার সঙ্গে রাখা ভাল। এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শিশু-মনের সমস্ত কৌতূহলোদ্রিক্ত প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিয়া শিশু-মনকে চমৎকার রূপে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। অনেক পিতা সন্তান ও নিজের মধ্যে সম্মানসূচক (!) দূরত্ব রক্ষার জন্য সন্তানগণের সহিত ভাল করিয়া মিশে না। ইহা ভ্রমাত্মক এবং সন্তানের শিক্ষার পক্ষে অতিশয় মারাত্মক। মাতাপিতার এরূপভাবে চলা উচিত যাহাতে সন্তানগণ মাতা-পিতাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে, মাতাপিতার নিকট কিছু গোপন না করে। ফলত সন্তানগণের আস্থালাভ করা মাতাপিতার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

কবেটের মত

সন্তানদিগকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে ধরা বাঁধা নিয়ম করা সম্ভব নহে। ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে নিয়মকানুনের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। তবু উইলিয়ম কবেট এ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ পিতা ও সন্তান সম্বন্ধে খাটে বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"আমার ছেলেমেয়েরা সকলেই প্রশংসার সহিত পাশ-করা ছাত্র ও নাম-করা বিদ্বান্। কিন্তু আমি ইহাদিগকে শৈশবে একদিনের জন্যও তিরস্কার করি নাই ; বা কোনও কার্য করিবার আদেশ করি নাই। আমি আমার জীবনে একবারও আমার পুত্র-কন্যার কাহাকেও বই পড়িবার জন্য আদেশ করি নাই। আমি শুধু কথোপকথনে আমার ছেলেমেয়েদের জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা করিতাম। আমার প্রধান লক্ষ্য থাকিত তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে। খোলা মাঠের অফুরন্ত আনন্দ তাহাদের শরীর সুস্থ ও বাগানের সৌন্দর্য তাহাদের প্রাণ তাজা রাখিত। আমার লাইব্রেরীর টেবিলে ক্রীড়া-কৌতুক সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক শিশুপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া থাকিত। তৎসঙ্গে কাগজ, কলম, পেন্‌সিল, দোয়াত, রবার প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত থাকিত। বৃষ্টির দিনে ছেলেমেয়েরা খেলায় বাহির হইতে না পারিয়া লাইব্রেরীতে তাহাদের মাকে ঘিরিয়া বসিত। পুস্তকসমূহে পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদির রঙিন ছবি দেখিয়া উহারা আকৃষ্ট হইত। সকলে মাকে এবং আমি থাকিলে আমাকেও নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত। সে সব প্রশ্নের সবগুলিই শিশু-মনের জিজ্ঞাসা ; সমস্তই জ্ঞানের ক্ষুধার পরিচায়ক। আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেমেয়েকে মিথ্যা স্তোক না দিয়া এবং

'বড় হইলে বুঝিবে' বলিয়া ধমক না দিয়া, তাহাদের বোধগম্য করিয়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতাম। ছেলেমেয়েদের সকাল সকাল শোয়ানো যেমন দুরূহ, সকালে সকালে শয্যাত্যাগ করানোও তেমনি কঠিন, তাহা সকলেই জানেন। এ ব্যাপারেও আমি ছেলেমেয়েদের কোন দিন আদেশ করি নাই। আমি শুধু নিয়ম করিয়াছিলাম যে, যে সকলের আগে উঠিবে, সে হাজরিখানার টেবিলে আমার ডান দিকে বসিবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই লইয়া প্রতিযোগিতা হইত। এইভাবে উহারা বিনা শাসনে সকালে শয্যাগ্রহণ ও সকালে শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মোট কথা, শাসন অপেক্ষা ভালবাসার দ্বারা শিশু-মন গঠন করা সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয়, ইহা আমার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। পিতাকে সর্বদা এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে সন্তানগণ তাঁহাকে ভালবাসে এবং তাঁহার সংস্পর্শে থাকিতে চায়। সন্তানগণ যে পিতাকে ভয় পায়, যাঁহার অনুপস্থিতিকে সন্তানেরা বাঞ্ছনীয় মনে করে, "আজ বাবা বাসায় থাকিবেন না" বলিয়া যে পিতার সন্তানেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সে পিতার দ্বারা সন্তানের প্রকৃত সুশিক্ষা হওয়া সম্ভব নহে।"

বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও সাংবাদিক উইলিয়ম কবেট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি কথা কত মূল্যবান্, সামান্য চিন্তা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

শিষ্টাচার

শিশুগণকে ভদ্র ও শিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাদের সহিত ভদ্র ও শিষ্ট ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাদের সহিত 'তুই-তোকার' ব্যবহার করিলে তাহারা গুরুজনকে 'তুই-তোকার' করিয়া থাকে। সুতরাং শৈশব হইতেই পিতামাতার এদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত।

শিশুর প্রতি পিতামাতার মনোভাব এবং আচরণের উপর উহাদের অভ্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি নির্ভর করে। পিতামাতার মেজাজ যদি খিটখিটে, ক্রোধান্ধ, অতি মাত্রায় স্নেহশীল কিংবা অন্যায়ভাবে কঠোর হয়, এবং সন্তানের প্রতি ব্যবহারে যদি তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ মূর্তি ধারণ করেন তাহা হইলে শিশুদের মনের উপর ঐ সকল অবস্থা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

শিশুগণকে সত্যবাদী, সরল, দয়াবান্‌, ক্ষমাশীল, সাহসী, সংযমী ও বীর করিয়া গড়িয়া তুলিতে লইলে মাতাপিতার ঐ সমস্ত গুণে অভ্যস্ত হইতে হইবে; অন্তত ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী লোকের সংসর্গে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজেরা যাঁহা-ইচ্ছা-তাহা করিব অথচ ছেলেমেয়েরা আদর্শ-চরিত্র প্রতিভাশালী ভদ্রলোক হইবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

অনুকরণ-স্পৃহা শিশুদের মধ্যে অতি প্রবল। মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গীরা ইহাদের নিকট যে আদর্শ স্থাপন করে উহারা তাহাই অনুসরণ করে।

'শিশুরাও মানুষ' একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। মার্কিণ দেশীয় লেখিকা মিসেস এমিলি পোষ্ট Children are people (ছেলেমেয়েরাও মানুষ) শীর্ষক একটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মাতাপিতার পক্ষে নিম্নলিখিত তিনটি নিয়ম অবশ্য পালনীয় বলিয়া তিনি মনে করেন,—(১) **অপরিচিতের সামনে শিশুকে কখনও তিরস্কার করা উচিত নয়; (২) শিশুর কাছে কখনও কোনও প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করা উচিত নয়; (৩) শিশু কোনও প্রশ্ন করিলে মাতাপিতা যদি তাহার উত্তর না জানেন, তবে প্রশ্ন না এড়াইয়া সে কথা শিশুর কাছে অকপটে স্বীকার করা উচিত।**

শিশুকে বাস্তবিকই কি আমরা মানুষ বলিয়া মনে করি? শিশু হয়ত আপন মনে খেলায় মত্ত হইয়া আছে। বাস্তব সংসারের বাহিরে এক কল্পজগতে তাহার বাস—পুরাতন একখানা চেয়ার তাহার নিকট একখানা মটর গাড়ী, পুতুল নিয়া তাহার ঘরকন্না। তখন হঠাৎ যদি পিতামাতা তাহাকে খেলা বন্ধ করিয়া আহার করিবার জন্য গুরুগম্ভীর স্বরে আদেশ জারী করেন তবে তাহার মনের অবস্থা কি হইতে পারে? তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে জোর করিয়া খেলার আমোদ হইতে বঞ্চিত করার চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার আর নাই। ঐ অবস্থায় বরং তাহাকে ধীর ও শান্তভাবে বুঝাইয়া বলা যায়, "খেলা শেষ হইলেই আহার করিতে আসিবে, তোমার আহার তৈয়ারী আছে।" সামরিক কায়দায় শিশুকে আজ্ঞানুবর্তী কিংবা তাহার দুষ্ট স্বভাবের সংশোধন করিবার চেষ্টা করা চিন্তাশক্তিহীনতা, সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার অভাবের পরিচয়, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, অত্যাচারমূলক ও অন্যায়। স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসার মধুর স্পর্শে শিশু-চিত্ত জয় করিতে হইবে।

দুষ্টামি

শিশুরা দুষ্টামি করে, পিতামাতার কথার অবাধ্য হয়, মূল্যবান্ জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া আমোদ উপভোগ করে। এইরূপ বিরক্তিকর ব্যবহারের প্রতিকার কি?—কিল ঘুষি, চড়-চাপড়, শাসানি-বকুনি,—এক কথায় কুরুক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণের অভিনয়! কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হইয়া শিশুকে শাসন করার ফল কি দাঁড়ায় তাহা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি কি? বার বার শাস্তি ভোগ করিয়া শিশুর প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে—অবাধ্যতা, গোঁয়ার্তুমি এবং অশিষ্টাচার তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া ওঠে।

শিশুরা সাধারণত দুষ্টামি করিতে ভালবাসে। শিশু মনে নানারূপ অনুভূতির ঘাত প্রতিঘাত অবিরত চলিয়াছে। এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়াই শিশুর স্বভাব বা আচার গড়িয়া ওঠে। তাহার বাহ্য আচরণ বুঝিতে হইলে উহার প্রকৃত উৎসমূল আবিষ্কার করা দরকার। শিশুরা লক্ষ্যহীন—কোনও একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা উদ্দেশ্য তাহাদের নাই।

অমূলক শাস্তির ভয়

শিশুদিগকে কখনও শাস্তির ভয় দেখাইতে নাই। মা ছেলেকে বলিলেন, "আমি যাহা বলি কর, নতুবা লাঠি দিয়া পিটাইয়া তোমার হাড় গুঁড়া করিয়া ফেলিব।" ছেলে যদি মাতার আদেশ অমান্য করে তবে কি প্রকৃতপক্ষে তাহার হাড় গুঁড়া করা হইবে? ডক্টর ব্যালার্ড (Dr. Ballard) তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ছেলেকে কখনও শাস্তির ভয় দেখাইও না; যদি দেখাও, তবে যাহা করিবে বলিয়াছ তাহা তোমাকে অবশ্য করিতে হইবে। যদি বল, অমুক কাজ পুনরায় করিলে তোমাকে খুন করিয়া ফেলিব, আর ছেলে যদি বাস্তবিকই সেই কাজ করিয়া বসে, তবে তাহাকে কি অবশ্য খুন করিবে? শাস্তির ভয় মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আর থাকিবে না।"

শিশুরা মিথ্যা বলে কেন?

শিশুরা মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত হয় কেন? অনেক সময় দেখা যায় মাতা বা অন্য আত্মীয়-স্বজন প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দেয়। দৈনন্দিন জীবনের কত খুঁটিনাটি ঘটনায় আমরা শিশুর সম্মুখে মিথ্যার আদর্শ

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্থাপন করিয়া থাকি। শিশু হয়ত তিক্ত ঔষধ খাইতে চায় না, তিক্ত ঔষধের নামে সে ভয় পায়। আবার এই ঔষধ তাহাকে না খাওয়াইলেই চলিবে না, জোর করিয়া খাওয়ানও অসম্ভব কাজেই বলা হইল, "ঔষধ নয়, অতি মিষ্ট সরবৎ।" সরল-প্রাণ শিশু বিশ্বাস করিয়া সরবৎ পান করিতে গিয়া তিক্ত ঔষধই গলাধঃকরণ করিল। শিশুর সমস্ত মনপ্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল মিথ্যাবাদী মাতাপিতা বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। শিশুর মাতা বা পিতা নানাকাজের ভিড়ে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন না। শিশুকে বলা হইল, "যাও, গিয়া বল, যে তিনি বাড়ীতে নাই।" শিশু এইভাবে মাতাপিতার নিকট হইতে মিথ্যাকথন শিক্ষা করে।

স্বাবলম্বন শিক্ষা

অত্যধিক আদর ও অন্যায় শাসন উভয়ই মন্দ

শিশুদিগকে শৈশব হইতেই স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে একান্ত নিঃসহায় মনে করিয়া সর্বদা তাহাদের পিছু লাগিয়া থাকা উচিত নয়। আছাড় খাইলে কিংবা সামান্য ব্যথা পাইলে, খাওয়া দাওয়া কিংবা খেলাধূলায় নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করিলে, মিছামিছি অতিরিক্ত আদর-যত্ন করিলে শিশুরা স্বভাবত আপনাদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয়, পরাশ্রিত, অকর্মা এবং অপদার্থ মনে করে। পক্ষান্তরে শিশু যদি পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা উপযুক্ত পরিমাণে না পায়, মাতা যদি বিরক্তিভরে শিশুকে বলে, "তুমি বড্ড দুষ্টু, তোমাকে আমি ভালবাসি না," তবে স্বভাবতই শিশুর প্রাণে একটি নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ ভাব জাগিয়া ওঠে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া তাহার চরিত্রগঠনে প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুর ভয়প্রবণতা

ভয়প্রবণতা প্রাণী মাত্রেরই একটি সাধারণ বৃত্তি। স্বাভাবিক কার্যক্রমের ব্যতিক্রম হইলেই সাধারণত ভয়ের উদ্রেক হয়। শিশু জন্মের পরেই সজোরে দরজা বন্ধ করার মত বিকট শব্দ শুনিলে ভয় পায়। কুকুরের কর্কশ ঘেউ ঘেউ শব্দ উহার ভয়ের উদ্রেক করে। হঠাৎ শিশু পতনোন্মুখ হইলে, উহার জামা খুলিতে লাগিলে কিংবা হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইতে লাগিলে গতানুগতিকার ব্যতিক্রম হেতু উহার ভয় হয়।

মনে রাখিতে হইবে, শিশুর মনে কোনও কারণে ভয়ের উদ্রেক হইলে শীঘ্র শীঘ্র উহার উপশম হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা তাহার মনে ভীতির ছাপ বদ্ধমূল হইয়া যায়।

অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং অসাবধানতা হেতু মাতাপিতা এবং মাতৃপিতৃ-স্থানীয় লোকেরা শিশু মনের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার বিষময় পরিণাম দেখা দেয়। আমাদের অমূলক ভয়ের কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের জীবন-প্রভাতে সূচিত হইয়াছিল।

চেম্বারলেন্ বলেন, "শিশুকে কোন কুৎসিত কাহিনী শুনাইলে কিংবা ভয় দেখাইলে আজীবন সেগুলি শরীরের মাংসে বিদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত, তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিবে। ভূতপ্রেত, দৈত্যদানব, ডাইনী, কল্পিত নরখাদক, বীভৎস হিংস্র প্রাণীর গাঁজাখুরি গল্প কিংবা মাতা, নার্স বা চাকর চাকরাণীর মনগড়া অদ্ভুত এবং কল্পনাতীত দানবকুল শিশু মনে যে অস্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার করে তাহার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ। যুগ যুগ ধরিয়া এইভাবে অবোধ শিশুর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটানো হইতেছে। স্বভাবত ভয়কাতর অন্য কোনও ইতর প্রাণীও বোধ হয় মানব শিশুর মত পুরুষপুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে ভীতি প্রাপ্ত হইতেছে না।"

আত্মপ্রত্যয় কি ভাবে জন্মাইতে হয় তাহার উপায় বিশ্লেষণ করিতে গিয়াই তিনি এত কথা বলিয়াছেন। শৈশবে যাহারা সর্বদা ভীতির আবহাওয়ায় বাস করে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা কিরূপে আত্মপ্রত্যয়শীল ও সাহসী হইবে?

শিশুর ভয়ের কারণসমূহ খুব বেশী নয়। তবে শিশু যতই বড় ও উহার মনোবৃত্তি যতই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, পারিপার্শ্বিকের ঘাত প্রতিঘাতে ভয়ের কারণও ততই বাড়িতে থাকে। শিশু আগুন দেখিয়া ভয় পায় না, এমন কি সুন্দর সাপ দেখিলেও সে উহা লইয়া খেলা করিতে চাহিতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে আগুনে পুড়িয়া বা দংশিত হইয়া ভয় পাইবার পূর্বেই মাতাপিতা উহাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করেন। তখন হইতেই সে ভয় পাইতে শিখিল।

আবার পরোক্ষভাবেও ভয়ের সঞ্চার হয় এবং করানো যায়। মনে করুন, শিশু কুকুরের ছানা লইয়া খেলিতে ভালবাসে। কুকুরের ছানা শিশুর সামনে আনিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি কয়েকবার বিকট শব্দ করা হয়,

তাহা হইলে অনিষ্টকর না হইলেও শিশু উহাকে দেখিয়া ভয় পাইবে মনস্তাত্ত্বিকেরা এই প্রক্রিয়াকে "Conditioning" বলিয়া থাকেন।

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, মানুষের যাবতীয় আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষার মূলে রহিয়াছে এই প্রক্রিয়া। এই সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করিবার মত স্থান এখানে নাই।

শিশুরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। শিশুর কৌতূহলের সীমা নাই। সে গল্প বলিবার জন্য উৎপীড়ন করে; গল্প আরম্ভ করিলেই, "তার পর?" "তার পর?" প্রশ্নের পালা আরম্ভ হয়। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা ভাল। গল্প বলিবার ছলে উহাদিগকে অনেক কিছু শিক্ষাও দেওয়া যায়। তবে অবান্তর, ভয়াবহ বা শোকাবহ গল্প বলিতে নাই।

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, নরক, ভূত, প্রেত, জিন, ফেরেস্তা ইত্যাদির **অমূলক ভয় শিশুদিগকে দেখানো একেবারে অনুচিত**। শিশুদের বিশ্বাসপ্রবণ মন গল্পের বিষয়বস্তুকে বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লয়; শুধু তাহাই নহে, উহাকে কল্পনার সাহায্যে আরও ভয়াবহ করিয়া তোলে। এই জন্যই শিশুমনে অকারণে ভয়ের উদ্রেক করিতে নাই। অমূলক ভয়ের সঞ্চার করা তো ঘোর অন্যায়।

সিনেমা, থিয়েটার সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। ভয়াবহ, শোকাবহ, বা প্রেমলীলা-বহুল দৃশ্যাবলীর প্রভাব আরও বেশী অনিকষ্টর। শিশুদের জন্য **আমোদজনক ও শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র বা নাটকের প্রচলন** হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্ধকারে শিশুরা কোন দৃশ্য না দেখিলেও কল্পনার সাহায্যে ভয়ের কারণ সৃষ্টি করিয়া ভয়াতুর হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া ভয়প্রবণ শিশুরা ভয়ে বেশী ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ঘুমঘোরে বিকট স্বপ্ন দেখাও উহাদের একটি সাধারণ অভ্যাস। যাহাতে শিশুচিত্তে ভয়ের কারণসমূহের কোনও ছাপ না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কোনও কারণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াই পড়ে, তবে তাহার প্রতিকার বা উপশম করিতে হইবে।

মনে করুন, শিশু অকারণে কুকুর দেখিয়া ভয় পায়। এইরূপ ক্ষেত্রে কুকুরের ভয় হইতে শিশুচিত্তকে মুক্ত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে শিশু যখন আহার বা খেলাধূলায় মত্ত থাকে তখন অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে কুকুরটিকে উহার সন্নিকটে আনিতে হইবে। কয়েকদিন এইরূপ করিলেই

শিশু আর কুকুর দেখিয়া ভয় পাইবে না। এই প্রক্রিয়াকে মনস্তাত্ত্বিকেরা "De-conditioning" বলেন।

অমূলক ভয় অবাঞ্ছিত হইলেও, মনে রাখিতে হইবে যে, সঙ্গত কারণে ভয় থাকাও বাঞ্ছনীয়। ভয় প্রাণীকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করে। চিল উড়িতে থাকিলে মুরগীর ছানা দৌড়িয়া পালায়; সর্প দেখিয়া ভেক পালাইবার চেষ্টা করে। **সর্প, অনিষ্টকারী জীবজন্তু, রোগের কারণসমূহ, অবাঞ্ছনীয় বা অন্যায় আচরণ ইত্যাদির ভয় শিশুমনে সঞ্চার করা উচিত।**

সু-অভ্যাস গঠন ও বদভ্যাস দূরীকরণ

আমাদের জীবন কতকগুলি প্রবৃত্তি চালিত কার্যক্রম এবং অভ্যস্ত আচার অনুষ্ঠানেরই সমষ্টি। অভ্যাস কি করিয়া গড়িয়া ওঠে, এ বিষয়েও মাতা-পিতার জ্ঞান থাকা উচিত।

সাধারণত একই কাজ বার বার সমাধা করিলে ঐ কাজ অভ্যস্ত হইয়া যায়; ক্রমে ক্রমে ঐ অভ্যাস বদ্ধমূল হইতে থাকে। পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে আবার অভ্যাসের বিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্তন হইয়া থাকে।

অভ্যস্ত কার্যক্রমের একটি সাধারণ গুণ এই যে ক্রমে ক্রমে উহা অনয়াস-সাধ্য হইয়া পড়ে। শারীরিক ও মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন ক্রমেই কম অনুভূত হয়। আমাদের হাঁটিবার, খাইবার এবং পোষাক পরিবার প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

শিশুর ভাল অভ্যাস গঠনে মাতাপিতাকে সাহায্য করিতে হইবে।

প্রথমত, শারীরিক প্রয়োজনসমূহ মিটাইতে নিয়মানুবর্তিতা—অর্থাৎ আহার ব্যায়াম, নিদ্রা, মলমূত্রত্যাগ ইত্যাদি প্রক্রিয়া নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে সমাধা করিতে শিশুদিগকে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত খেলাধূলা বা কাজকর্ম যখন যেটাই করুক না কেন, উহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে; অর্থাৎ শিশুকে কোনও কাজে নিবিষ্টমনে আত্মনিয়োগ করা শিখাইতে হইবে; হিজিবিজি করিয়া বা গোঁজা-মিল দিয়া কোন কাজ করিবে না।

তৃতীয়ত ধূমপান, আঙ্গুল কামড়ানো, মাদক দ্রব্য খাওয়া ইত্যাদি অভ্যাস যাহাতে গড়িয়া না ওঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

'এটা খাব না, ওটা খাব না'—এরূপ বদভ্যাস বাড়িয়া উঠিতে দিতে নাই।

ভাল অভ্যাস অর্জন ও কদভ্যাস বর্জন—উভয়ই শিশুদের অবশ্য কর্তব্য। শিশুরা নিজেরা বুঝিয়া বা শুনিয়া ইহা করিতে পারে না বলিয়াই মাতাপিতাকে সাহায্য করিতে হইবে।

কদভ্যাস দূর করিবার নানাবিধ **উপায়** আছে, যথা :—

(ক) ভয় দেখানো বা শাস্তিপ্রয়োগ (Intimidation)—ইহা শিশুর পক্ষে একেবারে অনুপযোগী ; হিতে বিপরীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

(২) সহানুভূতির সহিত বুঝাইয়া উহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা (Persuasion)। ইহার উৎকৃষ্ট পথ। একেবারে না মানিলে নানাভাবে বারে বারে বুঝাইয়া অভ্যাস ছাড়াইতে হয়।

(৩) কদভ্যাসের পরিবর্তে মনোরঞ্জক কোন সুঅভ্যাস গড়িয়া তোলা (Substitution)। মনে করুন, কোন শিশু শুধু শুধু রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করে। এই অভ্যাসের গতি ফিরাইতে হইলে আঙ্গিনায় নানারূপ খেলাধূলার আয়োজন করা যাইতে পারে।

(৪) কদভ্যাসকে অলক্ষ্যে তিক্ত করিয়া তোলা। মনে করুন, শিশু আঙুল কামড়ায়। হাত ধুইবার ছলে আঙুলে ঈষৎ তিক্ত কোন মলম বা পাউডার লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মাতৃস্তন্য ছাড়াইতে হইলে স্তনের বোঁটায় তিক্ত কিছু লাগাইবার প্রথা আছে। তবে হঠাৎ কিছু করিতে নাই ; **ক্রমে কদভ্যাস দূর করা ভাল।**

খেলাধূলার প্রভাব

শারীরিক কর্ম-ক্ষমতা রক্ষা করিবার জন্য শিশুদের ব্যায়াম যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আমি পূর্বে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলাধূলার তাৎপর্য যে কত বেশী মাতাপিতাকে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

শিশু যখন বাড়িতে আরম্ভ করে তখনই তাহাকে লইয়া আসল সমস্যা দেখা দেয়। বাড়তির সময় শিশু শুধু পিতামাতার আদর আপ্যায়নেই তৃপ্ত থাকে না—আরও কিছু কামনা করে। একথা আমাদের দেশে অধিকাংশ পিতামাতাই ভুলিয়া যান যে, ঠিক করিয়া বিশেষত সমবয়সীর সহিত খেলিতে না পাইলে হাজার আদর সোহাগ সত্ত্বেও শিশু-মন ভরিয়া ওঠে না।

আমরা যেমন শিশুর পরিচর্যা ও আহারের দিকে নজর দিই তেমনই তাহার খেলার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আমাদের এক প্রধান কর্তব্য। কোন্ বয়সে কি খেলা শিশুর উপযোগী সে-সম্বন্ধে যদি বিশদ ধারণা না থাকে তবে শিশুর প্রতি পিতামাতার কর্তব্যে অবহেলা থাকিয়া যাইতে বাধ্য।

পাশ্চাত্ত্য দেশে এ-ব্যাপারে আয়োজন ত্রুটিহীন বলিলেই হয়। আমাদের দেশে শিশু-ক্রীড়ার বন্দোবস্ত কিন্তু এখনও প্রাথমিক অবস্থায়ই পড়িয়া রহিয়াছে।

ক্রীড়া শিশুর জীবনে কতটা দরকারী সে-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবে অবহিত হইতে হইবে। প্রকৃতি প্রধানত ক্রীড়া দ্বারাই শিশুকে শারীরিক উন্নতির পথে লইয়া চলে। পরিমিত খেলাধুলা না করিলে শিশুর অস্থি, মজ্জা শক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিবে না এবং তাহার শরীরের বাড়ও অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সূর্য এবং খোলা বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া খেলা করিলে সূর্য কিরণের অতি-বেগুণী (আলট্রা-ভায়োলেট-রে) রশ্মির প্রভাবে শরীর, অস্থি গঠন ও দৃঢ়কারী ভিটামিন ডি'র যোগান পাইবে, ক্ষুধার উদ্রেক এবং গভীর ঘুম হইবে ফলে তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যেও প্রচুর উন্নতি হইবে।

খেলা করিবার সময় শিশুদের মন সর্বদাই ক্রিয়াশীল ও সচেতন থাকে এবং খেলার ভিতর দিয়া তাহারা নিয়মানুবর্তিতা ও পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা এই দুই মূল্যবান্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার সুযোগ পায়।

অতএব শিশু খেলিবার সুযোগ কতটা পাইল সে দিকে পিতামাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এ ব্যাপারে পিতামাতার দায়িত্ব তিন প্রকারের। প্রথম, তাহাদের খেলার একটি জায়গা নির্বাচন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, খেলিবার সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, শিশুর খেলার সাথী বাছিয়া লইতে হইবে।

কয়েকমাস আগে পর্যন্তও যে সব কাজ শিশুর পক্ষে দুরূহ এবং অসম্ভব ছিল সেগুলি শিশুকে আয়ত্ত করিতে দেখিলে এমন কোনও পিতামাতা নাই যাঁহারা আনন্দ বোধ করেন না। বস্তুত এক হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে শরীর বৃদ্ধি এত দ্রুত হয় এবং তাহার হাত, পা কাজে লাগাইবার ক্ষমতা এত বাড়িয়া যায় যে অন্য কোনও অবস্থায় তাহা বোধ হয় সম্ভবপর হয় না।

বিভিন্ন বয়সে শিশুর ক্ষমতা

এক হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সন্তানের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক তিন চারমাস অন্তর খেলার সামগ্রীর প্রতি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া যায় এবং ছয়মাস বয়সে যে-সব খেলনা তাহার পক্ষে নয়নমুগ্ধকর ছিল এক বৎসর বয়সে সেসব খেলনার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। শিশুর বয়স যখন বছর দেড়ের কোটায় আসে তখন খালি খেলনা দেখাইয়া তাকে আর নিরস্ত করিবার উপায় থাকে না। বাহিরের জগৎ তখন তাহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং পশু-জগতের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। এই সময় বিশেষ করিয়া কুকুর, বিড়াল বা খরগোস দেখিলে শিশুরা খুব আমোদ বোধ করে এবং সেগুলিকে আদর করিবার প্রয়াস পায় এবং দূরে দেখিলে সস্নেহে কাছে ডাকিবার চেষ্টা করে।

শিশু যখন **দুই বছরে** পড়িয়াছে তখন **ছবি-ওয়ালা বই** পাইলে তাহার স্ফূর্তি প্রবল হইয়া ওঠে এবং খালি ছবির দিকে চাহিয়া থাকিতেই তাহার ভাল লাগে। জলের দিকেও শিশুর এখন দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এক বালতি হইতে আর এক বাল্‌তিতে জল ভর্তি করিবার মধ্যে সে প্রচুর আমোদের খোরাক খুঁজিয়া পায়। দেহে তখন তার সামর্থ্যও অনেকটা বাড়িয়াছে এবং সেই সামর্থ্যকে কাজে লাগাইবার নানা ফিকিরে শিশু ভূমি, বিছানা প্রভৃতিতে পতিত হয় এবং সুযোগ পাইলেই কোথাও গড়াইয়া পড়ে বা কোনও একটি জিনিষের উপর চাপিয়া বসে। অবশ্য এই সময় দেখিতে হইবে যেন শিশুর অত্যধিক পরিশ্রম না হয় এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে বিশ্রাম লইতে না দিয়া অন্য কিছু করিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

এক হইতে দুই বৎসরের মধ্যে শিশুর অনুকরণের প্রবৃত্তিও প্রবল হইয়া ওঠে। বাপ-মাকে বা বয়স্ক ব্যক্তিদের যাহা করিতে দেখে শিশুরা তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। কল্পনার পরিমাণ কোন শিশুর মধ্যে বেশী হইলে অনুকরণ করিবার মাত্রাও তাহার বাড়িয়া যায়। ইহা মোটেই দূষনীয় নয়। তবে নজর রাখিতে হইবে যে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি যেন কোন বক্র পথ বাছিয়া না লয় এবং ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির যে-বীজ উপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা যেন সঠিকভাবে বিকশিত হইতে পারে।

অধিকাংশ শিশুর মনেই একটি শিল্পী লুকাইয়া আছে। কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত শুনিলেই শিশুরা বেশ মনোযোগের সহিত যেদিক হইতে শব্দটি

আসিতেছে সেদিকে চাহিয়া থাকে। অন্য কোন বৃহত্তর আকর্ষণের সন্ধান যদি তাহারা না পায় তবে তাহাদের তন্ময়ভাব সহজে ভাঙে না।

সঙ্গীতের প্রতি শিশুর সহজাত আকর্ষণ বৃদ্ধি করিতে হইলে শিশুকে সব কয়টি খেলনা উপহার না দিয়া দু'একটি বাজনা দিলে সেগুলি নিয়া শিশু নিজের চেষ্টায়ই তাহার চারিদিকে সঙ্গীতের পরিবেশ তৈয়ারী করিয়া ফেলিবে।

তিন বৎসর বয়সে শিশু তিনচাকার সাইকেল ঠেলিতে এবং চার বৎসর বয়সে চড়িতে শিখিয়া যায়। এই বয়স হইতেই শিশুর মন সঙ্গীর জন্য উন্মুখ হইয়া ওঠে এবং কোন একটি দুরূহ কার্য সম্পাদন করিবার পুরস্কার স্বরূপ সে বয়স্কদের প্রশংসাও প্রত্যাশা করিতে শিখে।

শিশুর বয়স যখন পাঁচ ছাড়াইয়া যায় তখন বহির্জগতের দিকে তাহার নজর পড়ে এবং গৃহের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনীতে সে আর কিছুতেই সারাক্ষণ কাটাইতে চায় না। ছয় সাত বৎসর বয়সে, স্কুলে ভর্তি হইবার পর প্রত্যেক দিন সে স্কুলে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে—জ্ঞানার্জন অপেক্ষা সঙ্গীদের সাহচর্যের লোভে। এই সময়টি শিশুর পক্ষে ঈষৎ বিপজ্জনক। বুদ্ধি খরচ করিয়া ও সতর্কতার সহিত তাহার সঙ্গী নির্বাচন না করিলে তাহার ভুল পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

খেলাধুলার গুণ

শিশুর বয়স যখন আরও বাড়ে এবং ফুটবল খেলিবার দিকে তাহার ঝোঁক যায় তখন খেলার ভিতর দিয়া সে অনেক কিছু শিখিতে পারে। **পরাজয়** বরণ করিলেও স্মিত ভাব; শারীরিক কষ্ট পাইলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া যাওয়া; কষ্ট-সহিষ্ণুতা; পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার ভাব; সাহস এবং নৈপুণ্য; বিপদের সময় স্থির-মস্তিষ্কে তাহার সম্মুখীন হওয়া; নম্রতা ও স্বভাবের মাধুর্য আয়ত্ত করা ইত্যাদি বিবিধ গুণ খেলার ভিতর দিয়াই প্রথম প্রস্ফুটিত হয় এবং শিশুকে পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলে।

শিশুর পরিচর্যায় আমাদের এসব অতি প্রয়োজনীয় কথা ভুলিলে চলিবে না।

সার কথা

(১) ব্যায়াম একাকী বা নিজে নিজেই করা যায়; **খেলাধুলায়** সাধারণত ব্যায়াম ত হয়ই; আবার

(২) অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গলাভ হয়।

(৩) উহাদের সহিত কথোপকথনে মনোভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতালাভ ও ভাবের আদান-প্রদান হয়।

(৪) ইহাতে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে এবং পরমত-সহিষ্ণুতা বাড়ে।

(৫) ইহাতে মোটামুটি কতগুলি নিয়মকানুন থাকায়, শিশুদের নিয়ম মানিয়া চলিবার অভ্যাস হয়। এই নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) ভবিষ্যৎ জীবনে সামাজিকতা শিক্ষার সহায়ক হয়।

(৬) খেলাধূলা প্রতিযোগিতামূলক বলিয়া উহাতে অপরের অপেক্ষা উৎকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। ক্রমে অন্যান্য ব্যাপারেও বিজয়ী হইবার প্রবৃত্তি জন্মে।

(৭) পক্ষান্তরে, খেলাধূলায় পরাজিত হইয়াও সঙ্গী বা বন্ধুর উপর বিরক্তি, ক্রোধ বা হিংসার ভাবের উদ্রেক হয় না। সামাজিক জীবনেও এই খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব (Sportsmanly spirit) অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতিতে সমভাব ও অহিংসা-ভাব অতি অমূল্য সম্পদ্।

খেলাধূলা চরিত্র গঠনের এক উপযুক্ত উপায়। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া প্রাচীনপন্থীদের মতে, খেলাধূলা অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে।

সারা দেশে,— সহরে, পল্লীতে, ঘরে ঘরে, নানাবিধ খেলাধুলার প্রবর্তন করা উচিত। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সকলের উপযোগী খেলাধুলাই আছে।

অমোদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার সামাধান হইবে তখন যখন আমরা সকল ক্ষেত্রেই খেলোয়াড়ের মনোভাব লইয়া উহার সম্মুখীন হইব। 'দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'।

নার্সারী স্কুল

মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর উহার ভবিষ্যৎ জীবন-ধারণ এবং চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহজাত প্রবৃত্তিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই চরিত্র-গঠনে সাহায্য করা হয়—শারীরিক, মানসিক এবং অনুভূতি-মূলক অভ্যাস-সমূহকে সুপথে

চালিত করিলেই চরিত্র গড়িয়া ওঠে। সুতরাং **২ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুর শিক্ষার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক**। এই বয়সে সাধারণত শিশুরা বাড়ীতে মাতপিতা, ভ্রাতা-ভগিনীর সাহচর্যেই কাটায় এবং তাঁহারাই উহার অভ্যাস ও চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিয়া থাকেন। শিক্ষা অর্থে আমরা এখানে অক্ষর পরিচয় কিংবা বই পড়ার কথা বলিতেছি না। শিশুকে স্বাস্থ্যসম্মত আবহাওয়া ও ভাল আবেষ্টনীর মধ্যে রাখিয়া উহার শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করাই প্রকৃত শিক্ষা। অধিকাংশ পরিবারে শিশু-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত নাই; স্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টন, উপযুক্ত শিক্ষিতা মাতা—যিনি সন্তানের মনোজগতের খবর রাখেন এবং তাহাকে সুপথে চালিত করিতে পারেন, খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির অভাব অধিকাংশ পরিবারেই রহিয়াছে। আবার শিক্ষিত, সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে হয়ত শিশুদের জন্য সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হয় কিন্তু তাহাও ঠিক উহাদের চরিত্র-গঠনে সম্যক্ সাহায্য করে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আজকাল নার্সারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।

উদ্দেশ্য—ইংল্যাণ্ডের নার্সারী স্কুলসমূহ শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিশুকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে নাসারী স্কুল স্থাপিত হয় না, স্কুলে গিয়া যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিবার পূর্বে কয়েক বৎসর যাহাতে শিশুরা তাহাদের চরিত্র গঠনোপযোগী পরিবেষ্টনে বাস করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই নার্সারী স্কুল স্থাপিত হয়। শিশুর অসীম কৌতূহল এবং নানাবিষয় ও বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য নার্সারী স্কুলে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। শিশু-জীবনের এই স্তরে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেকখানি।

নার্সারী স্কুলে শিশুরা অজ্ঞাতসারে এবং অনায়াসে **শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাবলম্বন** প্রভৃতি শিক্ষা করে। সঙ্গীদের সঙ্গে একত্র আহার-বিহার এবং খেলাধূলা করিয়া উহারা **সামাজিকতা, শিষ্টাচার, বিনয় ধৈর্য, অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা, উদারতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, নেতার প্রতি আনুগত্য** এবং **নেতৃত্ব** ইত্যাদি শিক্ষা করে। শিশুর চরিত্র সুগঠিত ও সুন্দর করিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ এবং জীবন এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন শিশু দেখিয়া শুনিয়া এবং বাস্তব অবস্থার ভিতর দিয়া ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ হইতে পারে।

নার্সারী স্কুলের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :

(১) শিশুদের জন্য প্রচুর আলো, বাতাস, সূর্যকিরণ এবং উন্মুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করা।

(২) শিশুদের জীবন যাহাতে স্বাস্থ্য-সম্মত, সুখশান্তিময় এবং সুশৃঙ্খল হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) প্রত্যেক শিশুকে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অর্জন করিতে সাহায্য করা।

(৪) শিশুদের কল্পনা-শক্তি-বিকাশে সাহায্য করা, নানাবিধ বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ জন্মানো এবং বিবিধ কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া।

(৫) ক্ষুদ্রায়তন সমাজ-জীবনের আবহাওয়ায় শিশুকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবিধা দান। সমবয়স্ক এবং বিভিন্ন বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সহিত একত্র খেলাধূলা করিতে দেওয়া।

(৬) পারিবারিক জীবনের সঙ্গে প্রকৃত ঐক্য স্থাপন।*

নার্সারী স্কুল শিশুদের জন্য খুবই উপযোগী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শিশু ইহার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, শিশুকে মাতাপিতার আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া লইয়া অপরিচিত স্থানে এবং অনাত্মীয়ের কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনে রাখিলে উহারা অস্বস্তি অনুভব করে। প্রথম প্রথম করে বটে কিন্তু শীঘ্রই সে ভাব কাটিয়া যায়।

সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুরা মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে পাইলে অনুকূল আবহাওয়ায় তাহাদের আত্মবিকাশ সহজেই ঘটে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মাতাপিতারই শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও উহার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্গতি আছে।†

* The English Nursery School—A. F. N. Abdul Huq, M. A. Dip-in-Edin. (President, Secondary Education Board, Dacca)—বইখানি অতি উপাদেয় এবং শিশু-শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন পথ-প্রদর্শক। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, ঢাকা।

† শিশুর শিক্ষা ও শরীর পালন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমার প্রকাশিতব্য বই 'শিশুমঙ্গল'এ করা হইবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ কি ও কেন ?

সংজ্ঞা

আমি এতক্ষণ সন্তানলাভের কথা বলিয়াছি; এইবার যে মাতাপিতা কোনও কারণবশত সন্তান চাহেন না তাঁহাদের সুবিধার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

এ সম্বন্ধে আমার "জন্মনিয়ন্ত্রণ" ও "Controlled Parenthood" পুস্তক দুইখানিতে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে শুধু দম্পতিকে সাধারণ মত ও কতিপয় উপকারী পথের সন্ধান দিতেছি।

পুরুষ ও নারীর যৌনমিলনে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ মাতাপিতা ইচ্ছা করিলে সন্তান হইবে, আর ইচ্ছা না করিলে হইবে না, সন্তান-জন্মের উপর মাতাপিতার অতখানি অধিকার স্থাপন করার নাম জন্মনিয়ন্ত্রণ।

আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, ইংরাজী Birth Control অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটাই ঠিক নহে; কারণ, আমরা যাহা চাই তাহা Conception Control অর্থাৎ গর্ভনিয়ন্ত্রণ। তবে পূর্বোক্ত কথাটারই প্রচলন হইয়া গিয়াছে তাই উহা দ্বারা শেষোক্ত অর্থ ই বুঝিতে হইবে।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় যৌনমিলন হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনমিলনে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে না, বিশেষত পুরুষের। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান-জন্মকে যৌনমিলনের অপরিহার্য বিপদরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম বিধাতার বিধানরূপে মানিয়া লওয়া হয় মাত্র, অন্তরের সহিত চাওয়া হয় না।

মিলনের দুই উদ্দেশ্য

মিলনের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক উদ্দেশ্য রহিয়াছে। একটি সন্তান, অপরটি আনন্দ লাভ। যে উপায় দ্বারা এই দুইটি পৃথক উদ্দেশ্য পৃথকভাবে সাধন করা

যায় অর্থাৎ যে উপায়ে ইচ্ছা মত সন্তান এবং ইচ্ছা মত আনন্দ লাভ করা যায় তাহাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলে। স্বেচ্ছালব্ধ পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব যেমন পরম আনন্দ-দায়ক, অনাকাঙ্ক্ষিত পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব তেমনই পীড়াদায়ক। যৌনমিলন মানুষের দৈহিক শক্তি ও কামনা দ্বারা এবং পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সত্যকার আকাঙ্ক্ষা ও আর্থিক সঙ্গতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। মানুষের আনন্দ-বৃত্তিকে তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল করানো কোনও মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে নানাবিধ যুক্তি

যাঁহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, তাঁহাদের যুক্তি বহুবিধ।

(১) অনভিপ্রেত পিতৃত্ব সভ্যতার কলঙ্ক, পরিপূর্ণ আনন্দের বিঘ্ন। অনভিপ্রেত মাতৃত্ব নারীজাতির স্বাস্থ্য ধ্বংস করিতেছে। তাহা ছাড়া জাতকের উপরও ইহার ক্রিয়া নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, **আনন্দ লাভ ও সন্তান জন্মদান এই দুইটি ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সম্পাদন করিবার শক্তি মানুষের নিতান্ত ন্যায্য অধিকার।** জাতকের পক্ষ হইতেও একথা নিতান্ত ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যাইতে পারে যে, নারী-পুরুষের কাম-বাসনা চরিতার্থতার অনভিপ্রেত ফল স্বরূপ সে সংসারে আসিবে না; নারী-পুরুষ যদি তাহাকে কামনা করে তবেই সে আসিবে।

(২) **গর্ভিণী ও প্রসূতির মৃত্যু হ্রাস**—নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে সন্তান-ধারণ বিপজ্জনক। খুব স্বাস্থ্যবতী নারীর স্বাস্থ্যও প্রসবের সময় অল্পবিস্তর ভাঙিয়া পড়ে। আমাদের হতভাগ্য দেশের নারীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, আমেরিকা ও ইওরোপে প্রসূতির জন্য সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা হাজারে চারিজন। সুতরাং নারী-জীবনের নিরাপত্তার জন্যও সন্তান প্রসব যথাসম্ভব কম করা উচিত। জননীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিয়া সর্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্তে সন্তান ধারণের ক্ষমতা ও সুবিধা থাকিলে প্রসূতির মৃত্যুহার বর্তমান অপেক্ষা অনেক হ্রাস করা যাইতে পারে।

(৩) **প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা**—প্রসূতি মৃত্যুর চরম অবস্থার কথা বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক প্রসবই প্রসূতির স্বাস্থ্য অধিকতর

ধ্বংস করিয়া দেয়। নারী-দেহের সর্বাংশে গর্ভধারণের ফল সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবতী জননী প্রসবের পরে দীর্ঘ দিনের বিশ্রাম পাইলে দৈহিক ক্ষতির খানিকটা পূরণ হইতে পারে। কিন্তু এই বিশ্রামের কোনও নিশ্চয়তা নাই, কারণ, সাধারণত প্রসূতিকে দম ফেলিবার সুযোগ না দিয়া একটির পর একটি করিয়া বহু সন্তানের জন্ম দিতে হয়।

পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যবতী নারী যদি দুই গর্ভের মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়, তবে গর্ভধারণের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া সে পুনরায় গর্ভধারণের উপযোগী হইতে পারে। এই ভাবে একটি নারী সাত আটটি সন্তান ধারণ করিলেও তাহার শরীর ও স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সতেরো আঠারো বৎসরের যুবতীর সহিত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবকের বিবাহ হইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে অন্তত পঁচিশ বৎসরকাল সন্তান লাভ করিতে পারে। পাঁচ বৎসরের বিশ্রাম দিয়া সন্তান প্রসব করিলেও ঐ দম্পতি পাঁচটি সন্তানের মাতাপিতা হইতে পারে। এমন মাতাপিতা আমাদের দেশে খুব কমই আছে, যাহারা পাঁচের অধিক সন্তান কামনা করিয়া থাকে। অবসরান্ত পাঁচটি সন্তানের জন্মদান করিলে প্রসূতির স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না, অথচ **ঘন-ঘন প্রসব করিয়া** পাঁচটি সন্তানের জন্মদান করিলে প্রসূতির স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে।

(৪) কোনও কোনও রোগগ্রস্তদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—আবার স্বাস্থ্যের খাতিরে অনেক স্ত্রীলোকের ইচ্ছা থাকিলেও সন্তানধারণ করা উচিত নয়। হৃদ-যন্ত্র বা বৃক্ককের (কিড্নীর) গুরুতর পীড়া, যক্ষা বহুমূত্র, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির বৈকল্য, পাগলামির ছিট, জড়বুদ্ধি, বংশগত মূক ও বধিরত্ব, বংশগত পক্ষাঘাত, গলগণ্ড, মৃগী, হাঁপানি ইত্যাদি থাকিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্ভধারণ না করাই উচিত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বংশপরম্পরায় সন্তানে বর্তে। এই সকল ক্ষেত্রে সন্তানধারণে ভাবী বংশধরের উপর অন্যায় করা হয়।

(৫) সমান সমান বিবাহ করার সম্ভাব্যতা—যাহাদের অল্প আয় তাহারাও যথাসময়ে বিবাহ করিতে ভয় পাইবে না, সুতরাং সমাজে বর্তমান সময় অপেক্ষা ব্যভিচার, গণিকাবৃত্তি, মদ্যপান, রতিজ রোগ, গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা অনেক কম হইবে ও বিবাহিত জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রেম বৃদ্ধি পাইবে।

(৬) **দাম্পত্য প্রণয় গভীর হওয়া**—প্রথম যৌবনে বিবাহ হওয়াতে অবাঞ্ছিত গর্ভের আশঙ্কা দূর হওয়াতে ও আর্থিক সচ্ছলতা থাকাতে দম্পতির প্রণয় মধুর ও গভীর হইবে।

(৭) **শিশুমৃত্যু কম** হইবে। দেখা গিয়াছে যে, সন্তানদের জন্ম সময়ের দূরত্ব (Interval) ও শিশুমৃত্যুর হারের মধ্যে অনেকটা সম্বন্ধ আছে। সন্তানের বয়সের দূরত্ব অন্তত তিন বৎসর হওয়া উচিত।

(৮) **জাতীয় উন্নতি**—মাতাপিতা নিজ আয় অনুযায়ী সন্তানের জন্ম-নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে স্বল্প সংখ্যক সন্তানের খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য বেশী খরচ করিতে পারিবে। সুতরাং দেশে সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত লোকের আধিক্য হইবে।

(৯) **অবাধ সন্তান জন্মে দাম্পত্য প্রণয় ব্যাহত**—বেশী সন্তান-প্রসবের ফলে মাতাপিতার মনের উপর যে ক্রিয়া হয়, তাহা দৈহিক কষ্ট ও স্বাস্থ্যহানি অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। প্রত্যেক দম্পতিরই বিবাহিত জীবনের প্রথম ভাগ স্বপ্নময়, আনন্দপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রথম দুই-এক সন্তানের জন্ম তাহাদিগকে অধিক আনন্দই দিয়া থাকে। মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মাতার দৈহিক কষ্টকে ছাপাইয়া ওঠে। কিন্তু এই ভাব অধিক দিন থাকে না। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর নূতন গর্ভের উৎপীড়ন, প্রসবকালীন মারাত্মক বিপদের কল্পনা, নবাগত সন্তানের লালনপালনের দায়িত্ব ইত্যাদির দুশ্চিন্তা উভয়েরই সকল সুখের কল্পনাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। নৈরাশ্য ও উপায়-হীনতার অনুভূতি তাহাদের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট করিয়া দেয়। এই নৈরাশ্য ও উপায়হীনতা (প্রসূতির অজ্ঞাতে) ভ্রূণের উপর একটি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহার পরিণামে সন্তানের প্রতি মাতাপিতার স্নেহের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় থাকিতে পারে না। **শারীরিক ও মানসিক পীড়া, দুরবস্থা প্রভৃতি মানুষের স্নেহ-মমতা হ্রাস করে।** তদুপরি এরূপ ক্ষেত্রে এই অনভিপ্রেত সন্তানের জন্য স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা না হউক অন্তত ঔদাসীন্য ও বিরক্তির ভাব জন্মে। পরিণামে ইহাই দাম্পত্য কলহে রূপান্তরিত হয়।

(১০) **আর্থিক** কারণেও জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা আছে। পুরুষের তীব্র বাসনা তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহার সম্ভোগ চাইই। ধর্ম, নীতি, সুনাম,

স্বাস্থ্য, শান্তি ও সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে বিবাহিতা **স্ত্রীর সহিত মিলনের অবাধ সুবিধা** তাহার থাকা দরকার! কিন্তু সকল সময়েই যদি সন্তান বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে, তবে হয় প্রতি বৎসর সন্তানের জন্মের সম্ভাবনা মানিয়া লইতে হইবে, অন্যথায় আনন্দলাভ বন্ধ করিতে হইবে ; এ দুইয়ের কোনোটাই না পারিলে অন্য উপায়ে যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে হইবে।

(১১) **অবাধ জন্মে সন্তানের দুর্দশা**—ঘন ঘন সন্তানের জন্ম যদি মানিয়া লওয়া হয় তবে কি দুর্দশা হয়, আমাদের দেশে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্বামীর যে সঙ্গতি আছে, তাহাতে হয়ত কায়ক্লেশে দুই তিন জনের জীবনধারণ সম্ভবপর। এই অবস্থায় উপর্যুপরি কয়েক সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া পোষ্য-সংখ্যা বাড়িলে সন্তানেরা উপযুক্ত খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, পরিচর্যা ও চিকিৎসার অভাবে দুর্বল ও রুগ্ন হইবে।

(১২) **দম্পতির দৈহিক তৃপ্তি ও সমাজের সুনীতি**—পুরুষ কি বিহার বন্ধ করিয়া দিতে পারে? সংযম, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি বড় বড় নীতিকথা ও আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, সাধারণভাবে ঐ ব্যবস্থা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এবং অনিষ্টকর।

কাজেই স্বামীর ও সমাজের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, এমন উপায় আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে অনভিপ্রেত সন্তান জন্মের বিপদ এড়াইয়াও পুরুষ স্বীয় বিবাহিত স্ত্রীর দ্বারা নিজের বাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে। **এই উপায়ই জন্মনিয়ন্ত্রণ।** শুধু পুরুষেরই নারী সম্ভোগের দরকার হয় তাহা নহে, নারীরও কামাবেগ অনেক ক্ষেত্রে তাহার কাম জোয়ারের (ঋতুর ২।৪ দিন পূর্বে ও ৫।৭ দিন পরে) সময় পুরুষের মত সুতীব্র এবং উহারও পুরুষ সংসর্গে কামতৃপ্তি ন্যায্য অধিকার। তাই নারীর পক্ষেও নিশ্চিন্ত মনে কামতৃপ্তি হয় তখনই, যখন অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভাধানের আশঙ্কা থাকে না।

(১৩) ব্যক্তির দিক হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা যতটা আছে, **রাষ্ট্র ও সমাজের দিক হইতে** উহার আবশ্যকতা তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নহে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জন্ম-মৃত্যুর হারের উপর রাষ্ট্রের কল্যাণ-অকল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

(১৪) **মৃত্যুহারের আধিক্যে জাতির অর্থ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি**—স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বেশীসংখ্যক সন্তান জন্মগ্রহণ

করিলে বেশী-সংখ্যক লোক মারা গেলেও মোটের উপর জাতির তাহাতে বিশেষ কোনও লোকসান হয় না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। অধিক মৃত্যুর হার যে কেবল মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনের মনঃপীড়ার কারণ, তাহা নহে। মৃত্যুর হারের আধিক্যের অর্থই এই যে, দেশে রোগ-শোক, অশান্তি ও দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশী। এই সমস্ত শিশুর জন্মদানে ও প্রতিপালনে মাতাপিতার, বিশেষ করিয়া মাতার যে শক্তিক্ষয় এবং পিতার যে অর্থব্যয় হয়, উহা বস্তুতই জাতীয় লোকসান। তাহা ছাড়া ঐ সমস্ত মৃতলোক মৃত্যুর প্রাক্কালে আত্মীয়-স্বজনের বহু অর্থ ও শক্তি ক্ষয় করিয়া গিয়াছে। এ সমস্তই জাতীয় লোকসান।

(১৫) **রোগী ও দুর্বলের সংখ্যাধিক্য**—ইহা ছাড়া আরও একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় আছে মৃত্যুহারের উচ্চতার আর এক অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তিদের ছাড়া আরও অনেক রোগী কোনও প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মৃতপ্রায় রুগ্ন লোকগুলি রাষ্ট্র ও জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যহীন ও অকর্মণ্য পোষ্যমাত্র। এইরূপ রুগ্ন অকর্মণ্য লোকের সংখ্যা প্রতিবৎসর **বৃদ্ধি পাইতে পাইতে** জাতি কালক্রমে নির্বীর্য **রোগীর জাতিতে** পরিণত হইতে পারে।

(১৬)। **সমাজের কৃষ্টি বৃদ্ধি**—দেখা যায় যে, সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেই জন্মের হার বেশী। ইহার কারণ এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মে, সমস্ত জীবজগতে, যাহাদের জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা কম, তাহারা যাহাতে লোপ না পায় এইজন্য, তাহাদের শিশুমৃত্যুর অনুপাতে শিশুর জন্মও অধিক হয়। দরিদ্রের সন্তানগণ সাধারণত শিক্ষার অভাবে কৃষ্টির আলোক প্রাপ্ত হয় না। ফলে উহাদের সন্তানবৃদ্ধির অর্থ জাতির অনুন্নত অংশের বৃদ্ধি। সুতরাং কৃষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

(১৭) **সমাজ ও জাতির** দিক দিয়া দেখিতে গেলে জন্মনিয়ন্ত্রণের আর্থিক প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ টমাস্ ম্যাল্‌থাস্ (১৭৬৬-১৮৩৪ খৃঃ) খুব জোরের সহিত এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের খোরাকী সরবরাহের অনুপাতে তাহাদের জন্মের হার এত অধিক যে, এই হারে জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ খোরাকীর অভাবেই মারা যাইবে। ম্যাল্‌থাসের বিখ্যাত গবেষণামূলক পুস্তক (The Principle of Population) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়

ইহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা গুণখড়ি অনুসারে (Geometrical progression) অর্থাৎ ২-৪-১৬ এইভাবে বর্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের খোরাকী সরবরাহ যোগখড়ি অনুসারে, (Arithmetical progression) অর্থাৎ ২-৪-৬ এইভাবে বর্ধিত হইতেছে। ম্যাল্‌থাস আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বর্তমান হারে পৃথিবীর জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অচির-কাল মধ্যে মানুষের খোরাকীর অভাব হইবে। সুতরাং জন্মের হার খুব বেশী হওয়া উচিত নহে। ম্যাল্‌থাসের মতবাদের মধ্যে ত্রুটি নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না। কারণ, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ও মানুষের নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বনে ফসল বৃদ্ধি করার ক্ষমতার কথা বিশেষ বিবেচনা করেন নাই। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, মানুষ তাহার সনাতন উৎপাদন-নীতিতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা—বিজ্ঞানোন্নত আধুনিক জগতেও জন্মবৃদ্ধি হারের ভয়াবহতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বহু বৈজ্ঞানিক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ্ অর্গানাইজেশান্ (W. H. O.) কর্তৃক সংগৃহীত হিসাবে দেখা যায় যে, এই শতাব্দীর প্রথম হইতে মধ্য (১৯৫০) পর্যন্ত সময়ে সারা পৃথিবীতে ৮২৬,০০০,০০০ জন লোকবৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯৪৯ সালে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ২,৩৭৮,০০০,০০। ১৯০০ সালে উহা ছিল ১,৫৫২,০০০,০০০। প্রতিদিন পৃথিবীতে প্রায় ৬০,০০০ মানব শিশু জন্মায়!

বর্তমানে যত খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহাতেই সমস্ত লোক পোষণ হইতে থাকিলে অচিরেই পৃথিবীতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

অন্যান্য বিজ্ঞানোন্নত দেশে যাহাই হউক, পাক-ভারতে যে ম্যাল্‌থাসের মতবাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরতবাসী তাহাদের পিতৃ-পিতামহের আমলের আবাদী ভূমি ও উৎপাদন-প্রণালীকে যে ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে তাহাদিগকে দিন দিন অধিকতর দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অজ্ঞতাহেতু রোগ বৃদ্ধিও আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সুতরাং এই দিক দিয়াও এ দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

(১৮) **নীতি সম্মত আচরণ**—অবশেষে নীতির দিক দিয়াও আমাদের **জননক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত** হওয়া প্রয়োজন। **গণোরিয়া, সিফিলিস, যক্ষ্মা ও**

কুষ্ঠ রোগীদের সন্তান জন্মদানের কোনও অধিকার থাকা উচিত নহে। নিরপরাধ সন্তানকে অভিশপ্ত রোগী রূপে পৃথিবীতে আনিবার বা জন্মের পরেই সংক্রামক রোগের কবলে ফেলিবার অধিকার কাহারও নাই। নিষ্পাপ সন্তান এমন কোনও অন্যায় করে নাই যাহার জন্য তাহাকে মাতাপিতার অসংযম, অজ্ঞতা এবং অবিবেচনার জন্য সারা জীবন অশিক্ষার অন্ধকারে রোগজীর্ণ ও অভিশপ্ত দেহ বহন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সুতরাং যাহারা বিচার-বিবেচনা না করিয়া পৃথিবীতে দুঃখী, রোগী ও অভাবগ্রস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা যে শুধু জাতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় করিতেছে তাহা নহে, তাহারা মানব জাতিরও শত্রুতা সাধন করিতেছে।

মিসেস স্যাঙ্গারের মতবাদ

জন্মনিয়ন্ত্রণের মহিলাপ্রবক্তা আমেরিকার মিসেস্ মার্গারেট স্যাঙ্গার (Mrs. Margaret Sanger) এ বিষয়ে চমৎকার কথা বলিয়াছেন। এই আমেরিকান মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণকে জগতের শান্তি ও মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য এত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকেন যে, তিনি সকলকে ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত করিবার জন্য সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর বোম্বাই-এ অবতরণ করিয়া সংবাদপত্র-প্রতিনিধির নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ হইতেছে—'পিতৃত্বকে স্বেচ্ছাকৃত, দায়িত্বপূর্ণ, মহান ও সগৌরব কর্তব্যে পরিণত করিতে হইলে উহাকে অন্ধ নিয়তির হাত হইতে মুক্ত করিয়া সজ্ঞান ও ইচ্ছা-সাপেক্ষ কার্যে পরিণত করিতে হইবে।'

মিসেস্ মার্গারেট স্যাঙ্গার জন্মনিয়ন্ত্রণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইহাকে প্রত্যেক দেশের ও রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান কার্যক্রমে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। সেজন্য তিনি সমস্ত দেশেই জন্মনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্ঘের কার্য হইবে : **(১) নরনারীকে জ্ঞানে উন্নত করা ; (২) জন্ম ও মৃত্যুর হার হ্রাস করা ; (৩) দেশান্তর গমন আইনের কঠোরতা দ্বারা মুর্খ, উন্মাদ, গণোরিয়া, সিফিলিস্-রোগী, স্বভাবসিদ্ধ অপরাধী ও বেশ্যাদিগের গতি নিয়ন্ত্রণ করা ; (৪) আইনের কঠোরতা দ্বারা অবাঞ্ছিত ক্ষেত্রে লোকের প্রজনন-শক্তি ও সুবিধা নষ্ট করা ; (৫) ঐ সমাজ কলুষকারী**

নর-নারীকে জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার **জন্য পৃথক উপনিবেশ** স্থাপন করা ইত্যাদি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আপত্তি

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যেরূপ দৃঢ় মত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার বিরুদ্ধ মতসমূহও তদপেক্ষা কোনও অংশে কম দৃঢ় নহে। যাঁহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তি মোটামুটি এই; ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ; ইহাতে যৌনপাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে; ইহাতে ক্রমে পৃথিবীর লোক-সংখ্যা হ্রাস হইবে; জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্যহানি এবং বন্ধ্যা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, ইত্যাদি।

(১) অস্বাভাবিকতার কথাই প্রথম ধরা যাউক। জন্মনিয়ন্ত্রণ অস্বাভাবিক কেন? পুরুষের মিলনের হার প্রকৃতি নিশ্চয়ই বাঁধিয়া দেয় নাই। সুতরাং একজন যদি পাঁচ বৎসরে একবার মাত্র স্ত্রী-সঙ্গম করে, কিংবা একেবারেই না করে, তবে তাহাকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, সাধু বাবাজী বলিয়া ভক্তি করিবার লোকের অভাব হইবে না। ঐ ব্রহ্মচারী বাবাজী যে অন্তত পাঁচটি সন্তানের বাবা হইতে পারিতেন এবং তাহা যে তিনি হইলেন না, সে জন্য তাঁহাকে কেহ অস্বাভাবিক কার্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিতেছে না; অথচ যে মাতাপিতা নিজেদের ও ভাবী শিশুর স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাত্র কয়েকটির বেশী সন্তান উৎপাদন করিল না, তাহাদের কার্যকে স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিবার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। যদি বলা হয় যে, একেবারে সহবাস না করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাহা করিয়াও কোনও উপায়ে ইচ্ছা করিয়া গর্ভনিবারণ করা অস্বাভাবিক, তবে তদুত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যেক মিলনেই কি সন্তানের জন্মলাভ করা স্বাভাবিক? বহুবার মিলনের ফলে অকস্মাৎ একদিন গর্ভাধান হয়। তবে পার্থক্য এই যে, কোন্ বারে যে গর্ভ হইল আর কোন্ বারে হইল না ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। জন্মনিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু উপায় অবলম্বনে আমরা এই অনিশ্চিত অবস্থা ও দৈবের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারি।

সৃষ্টির বীজ ধ্বংসের অভিযোগ

যদি বলা হয় যে, আমরা জন্মনিরোধ করিয়া শুক্রকীট ধ্বংসের দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলিব, তবে তদুত্তরে ইহা বলা

যাইতে পারে যে, প্রকৃতিই কি প্রত্যহ বহু জীবাণু ধ্বংস করিতেছে না? বৃক্ষ-লতার ফুল, মুকুল ও ফল হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যাদি কীট-পতঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতি মোটেই মিতব্যয়ী নহে। যে ক্রিয়ায় সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাতেও কোটি কোটি শুক্রকীট নির্গত হয়, যদিও সন্তান-জন্মের জন্য একটি মাত্র শুক্রকীটই যথেষ্ট। শুধু জীবাণু সম্বন্ধেই প্রকৃতি যে অমিতব্যয়ী তাহা নহে; প্রাণীজগৎ সম্বন্ধেও প্রকৃতি তথৈবচ। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা ও যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ধ্বংস হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য আমরা বহু মশা, মাছি, পিপীলিকা ধ্বংস করিতেছি। উপরোক্ত 'স্বভাব'বাদিগণ এই সমস্তের কোনটাই কি প্রতিবাদ করিয়াছেন?

সভ্যতার প্রায় সারা উপাদানই "অস্বাভাবিক"

মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা বুদ্ধি-বৃত্তি খাটাইয়া অনেক-কিছু করিয়াছি যাহা অন্য কোনও প্রাণীর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের, ঘর-বাড়ী গাড়ী-ঘোড়া কাপড়-চোপড়, দাড়ি কামানো, চশমা পরা, টীকা লওয়া, কৃত্রিম দাঁত, কৃত্রিম আলো, রাঁধা খাবার, টেলিফোন, জলের কল, চা-বিস্কুট পর্যন্ত সভ্যতা-সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের নাম করা যাইতে পারে। আমরা যে আজ এরোপ্লেনে চড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছি ইহা কি অস্বাভাবিক নয়? আমাদের উড়িয়া বেড়ানো যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় হইত, তবে স্রষ্টা কি আমাদিগকে দুইটা ডানা দিতে পারিতেন না? ফল কথা, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিকতার দোষ দেওয়া হয় উহা সত্যই অস্বাভাবিক বলিয়া নহে, পরন্তু উহা অভিনব বলিয়া। যুগে-যুগে **প্রত্যেক নূতন আবিষ্কার ও অভিনব মতবাদকে প্রাচীন-পন্থীরা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা** করিয়াছে। অমন যে বর্বর দাসত্ব-প্রথা, তাহাকেও স্বাভাবিক বলিয়া উহার সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করা হইয়াছিল। টীকা লওয়া ও রেল গাড়ীর প্রথম প্রচলনের সময়েও ঐগুলি অস্বাভাবিক ও ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছিল।

(২) **ব্যভিচার বৃদ্ধির অভিযোগ**—জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এতদ্বারা ব্যভিচার বৃদ্ধি হইবে। নারীপুরুষ এখন ব্যভিচারে বিরত থাকে লোকলজ্জা, অপযশ ও শাস্তির ভয়ে। তাহারা জানে মিলনের ফলে গর্ভ

হইতে পারে, কাজেই যে সমস্ত নারীর বিবাহ হয় নাই বা যাহাদের স্বামী নিকটে নাই, তাহারা ব্যভিচার করিতে সাহস পায় না। এই যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও জন্মশাসনের উপায়সমূহ প্রচারের ফলে অবৈধ মিলন বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, তথাপি তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে যে সব অনিষ্ট হয় এবং তাহাদের প্রচারে উপরোক্ত যে সব ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপকারের সম্ভাবনা সেগুলি বিবেচনা করিলে লোকসানের অপেক্ষা লাভ অনেক বেশী মনে হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় অবৈধ প্রণয়ঘটিত গর্ভ হইলে সাধারণত ভ্রূণহত্যার দ্বারা লজ্জা এড়াইবার চেষ্টা করা হয়।

সম্ভোগের আধিক্য

তাহারা আরও বলেন, সন্তান-বৃদ্ধির আশঙ্কাতেই স্বামীরা স্ত্রীর উপর বেশী মাত্রায় অত্যাচার করিতে পারে না। যদি সন্তান-জন্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তবে স্বামীরা তাহাদের লালসা তৃপ্তির জন্য সদাসর্বদা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিয়া তাহার জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে।

এই সকল যুক্তিদাতারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, সহবাস কেবল পুরুষেরই দৈহিক প্রয়োজন, নারীর উহাতে কোন প্রয়োজন নাই। উহাদের ধারণা এই বলিয়া বোধ হয় যে, পুরুষ কামুক ও নারীর কাম নাই, পুরুষ যৌনক্রিয়ার সমস্ত আনন্দটুকু একাই ভোগ করে, নারী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কেবল পুরুষের মন রাখিবার জন্য অতিশয় কষ্ট স্বীকার পূর্বক কোনও প্রকারে ধৈর্য ধরিয়া পড়িয়া থাকে মাত্র। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। নারী-পুরুষের যৌন-মিলন উভয়েরই তীব্র দৈহিক প্রয়োজন; উভয়ে উহাতে সমান আনন্দলাভ করিয়া থাকে। তবে যাহারা স্ত্রীর বাসনা জাগ্রত না করিয়াই সম্ভোগ করিতে চায় তাহারা প্রকৃতপক্ষে বলাৎকার করিয়া থাকে, সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সে প্রকৃতি যাহাদের আছে, তাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনও সংবাদ না জানিয়াও স্ত্রীকে ধর্ষণ করিয়া থাকে।

তবে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, সন্তান-জন্মের আশঙ্কা দূর হইলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পূর্বাপেক্ষা সঙ্গমের পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে। যদি তাহা করেও তবে তাহাকে আতিশয্য বলা যাইতে পারে।

(১) জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে, উহা দ্বারা পৃথিবীর লোক-সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং পরিণামে পৃথিবী লোকশূন্য হইবে। এই আপত্তি যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থে গর্ভ-নিরোধ বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা হয়তো মনে করেন যে, গর্ভধারণে নারীজাতিকে যে দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহাতে তাহারা যদি একবার গর্ভনিবারণের উপায়ের সন্ধান পায়, তবে আর কোনও দিন গর্ভধারণে সম্মত হইবে না। যাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা মানুষের, বিশেষ করিয়া নারীর, মাতৃত্ব-বাসনার তীব্রতার সন্ধান রাখেন না। প্রসব পথের সঙ্কীর্ণতা বশত যে নারীর পেট ও জরায়ু কাটিয়া সন্তান বাহির করিতে হইয়াছে. তাহাকে উক্ত অপারেশনের পূর্বে ডাক্তার বলিয়াছেন যে তাহার গর্ভ হইলে প্রতিবারেই এইভাবে প্রসব করাইতে হইবে, সুতরাং তিনি অনুমতি দিলে, ঐ অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি সামান্য অপারেশন করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা করিয়া দেন, তাহাতে উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাও আপত্তি করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। জরায়ু-সংক্রান্ত চিকিৎসা করিয়া ডাক্তার যখন নারীকে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার শরীরে আর কোনও ক্রুটি নাই, মিলনে কোনও অসুবিধা হইবে না, তবে তাঁহার গর্ভে আর সন্তান হইবে না, তখন সেই নারীর মুখের আকৃতি যে দেখিয়াছে, সেই জানে নারীর মাতৃত্বের বাসনা কত তীব্র! বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান-লাভের আশায় শিবমন্দির দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া তাবিজ-কবজ ব্যবহারে আগ্রহের তীব্রতা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই জানে নারীকে সন্তান-জন্মের স্বাধীনতা দিলে তাহারা মোটেই গর্ভধারণ করিবে কি না! নারীপুরুষ পিতৃ-মাতৃত্বের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য নহে, পরন্তু ঐ দায়িত্ব সম্যক্‌-ভাবে প্রতিপালনের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবে। যত জনকে প্রতিপালন করিতে পারিবে ও যত জনের **শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে, মাত্র তত জনকে জন্মদান করাই প্রকৃত পক্ষে পিতৃত্বের দায়িত্ব প্রতিপালন**। প্রতি-পালন করিতে পারিব একজনকে, জন্ম দিয়া বসিলাম দশজনের, ইহাকে কদাচ পিতৃত্বের দায়িত্ব প্রতিপালন করা বলা চলে না।

(২) **স্বাস্থ্যহানি বা বন্ধ্যত্বের আশঙ্কা**—জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি কাল্পনিক যুক্তি এই যে, দীর্ঘদিন জন্মনিরোধ অভ্যাস করিলে নাকি পুরুষ ও নারী উভয়েই বন্ধ্য হইয়া যাইতে পারে। এই যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী এই জন্য যে, ইহা জন্মনিয়ন্ত্রণের খুব গোঁড়া সমর্থককেও ভাবাইয়া

তুলিতে পারে। কারণ, যদি জন্মনিয়ন্ত্রণে বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনাও দেখা যায়, তবে ইহা সন্তান-কামী দম্পতির অনুপযোগী।

কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যাঁহারা বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ আরোপ করেন, তাঁহারা দলিল-প্রমাণ ও হিসাব-পত্র দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীর্ঘদিন জন্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করিয়াও নারী-পুরুষ কাহারও দেহে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে অনিষ্টকর প্রক্রিয়াগুলির কথা স্বতন্ত্র।

বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে এখানে শুধু মাত্র এই বলিলেই চলিবে যে, অসাবধান ও অসঙ্গত উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে যাওয়া অনিষ্টকর হইতে পারে; সঙ্গত উপায়ে উহা করা অনিষ্টকর নহে।

অন্যান্য তথ্য

পৃথিবীর কতকগুলি জাতি শক্তিশালী রাষ্ট্র-গঠনে বদ্ধপরিকর হইয়া, গত দুই বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব হইতে, জন্মনিয়ন্ত্রণের বদলে, জন্মের হার বাড়াইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জার্মানী, ইটালী ও জাপানের আন্দোলন উল্লেখ-যোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যহ যে পরিমাণ মানব-সন্তান বলিদান করা হইত তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয়, তাহাদের এইরূপ লোকবল না বাড়াইয়া উপায় নাই। পাক-ভারত লোক-সংখ্যার দিক দিয়া কোনও মতে নিকৃষ্ট নহে, তবে অর্থ, সামর্থ্য, ইত্যাদির কথা স্বতন্ত্র। ইহার উপরে মনে রাখিতে হইবে, এইগুলি কৃষিপ্রধান দেশ; এখানে লোক-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা অপেক্ষা বেশী অর্থ ও সামর্থ্য অর্জন করার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য খাদ্যের যোগানের তুলনায়, অপর অনেক দেশ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে ক্রম-বর্ধমান অত্যধিক লোক সংখ্যা কমাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনের ইতিহাস—ইহা বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পুরাকালেও লোকে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস পাইত তাহার প্রমাণ পুরাতন পুঁথি-পুস্তকে পাওয়া যায়। বাইবেলে ওনানের কথা প্রসঙ্গে নিরুদ্ধ সঙ্গমের উল্লেখ আছে। হজরত মোহাম্মদের নিকট এই প্রথার উল্লেখ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি এই বলিয়া মত প্রকাশ করেন যে, এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলেও খোদার সন্তানদানের

ইচ্ছা থাকিলে সন্তান হইবেই। বোধ হয় এই প্রক্রিয়ার বিফলতার কথা অবগত থাকায়ই তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্লেটো, অ্যারিষ্টট্ল্ প্রমুখ মনীষিগণও জন্ম-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

অসভ্য জাতিদের মধ্যেও জন্মনিয়ন্ত্রণের নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার প্রচলন দেখা যায়।

রবার্ট ম্যালথাসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক পুস্তকের (Principles of Population—১৭৯৮) কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাকেই আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রবক্তা বলা যায়।

তাঁহার পরবর্তী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রিচার্ড কার্লাইল, রবার্ট ওয়েন্, চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল, এ্যানি বেসান্ত্, ড্রিস্‌ডেল, ফোরেল্, মেরী ষ্টোপ্‌স্, নরম্যান হেয়ার, মিসেস্ স্যাঙ্গার, ডাঃ এবং মিসেস ষ্টোন্ মাইকেল ফিল্ডিং, ভ্যান ডি ভেল্ডি, রবার্ট ল্যাটো ডিকিন্‌সান্ ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদ্রূপভাজন, এমন কি, অভিযুক্তও হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশেও অনেকে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পুস্তকাদি সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

আমার **যৌন-বিজ্ঞান** পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ সংস্করণে (১৯৫৫ সালের) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার ফলাফল আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া "জন্মনিয়ন্ত্রণ" নামক বাংলায় স্বতন্ত্র পুস্তকের চতুর্থ এবং উহাদের হিন্দী ও উর্দু সংস্করণগুলিতে ইংরাজী পুস্তক Controlled Parenthoodএ জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের সবিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

সুসন্তান লাভ

বংশক্রমের বিধি

জীবজগতের দিকে দৃষ্টিলাভ করিলে আমরা এক আশ্চর্যজনক নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ি। বংশক্রমের কি সুন্দর ব্যবস্থা!

মানুষের গর্ভে মানুষই জন্মায়—আবার সেই মানুষটি পিতৃপুরুষের মতই মানবীয় আকৃতি ও প্রকৃতি পায়। তাহার নাক, কান, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি সুন্দরভাবেই না গঠিত। কেবল গঠনের কথাই বা বলি কেন? প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত সুবিন্যস্ত,—জন্মমুহূর্ত হইতেই উহারা স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। মানব-দেহযন্ত্র বাস্তবিকই এক অতি জটিল এবং বিস্ময়কর কারখানা-বিশেষ।

মাতা দীর্ঘকাল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে কিন্তু উহার শারীরিক গঠনের উপর তাহার কোন হাত নাই। এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়মে মানব-চক্ষুর অগোচরে সুঠাম সুন্দর মানব-দেহপিণ্ড ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া একদিন এই আলো-বাতাসময় পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়।

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মপদ্ধতি কি সুন্দর। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র বিভিন্ন স্তর পার হইয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া দ্রুত সাধিত হয়—গোবৎস ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দৌড়াইতে আরম্ভ করে, মুরগীর শাবক ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে থাকে, হাঁসের বাচ্চা স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে জলে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করে। ইহাই প্রাণীদের দৈহিক সামঞ্জস্য-বিধান-প্রচেষ্টা।

দৈহিক অবয়ব, দেহযন্ত্রের সক্রিয়তা এবং বিভিন্ন অবস্থায় মনের ভাবের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে গোটা মানব জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। চীনা যুবক এবং ফরাসী যুবতীর মধ্যেও প্রণয় জন্মিতে পারে এবং তাহাদের মিলনের ফলে সন্তানও জন্মিতে পারে।

সুসন্তান কামনার পাত্র

সন্তান জন্মের বিষয় আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সুস্থ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সুস্থ সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করিবে এরূপ আশা করা যায়। সুসন্তান কাহার না কাম্য? ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে মানুষ মাত্রেই চিরজীবী হইয়া থাকিতে চায়। মানুষ অমর নহে কিন্তু ধরাপৃষ্ঠে তাহার সুযোগ্য বংশধর বিদ্যমান থাকুক এই চিরন্তন বাসনা মানুষকে অমরতার স্বাদ গ্রহণে কিছুটা সাহায্য করে বৈকি! কাজেই সুস্থ দেহমনবিশিষ্ট সন্তান সকল দম্পতিরই সাধনার ধন।

ব্যতিক্রম হয় কেন?

কিন্তু বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক, কাণা, অন্ধ, খোঁড়া, আতুর, চিররুগ্ন, সন্তান আমরা সর্বত্র দেখিতে পাই। এ কি প্রকৃতির খেয়াল না দৈব দুর্ঘটনা?

আমরা প্রথমে প্রকৃতির কার্যপদ্ধতি অনুসন্ধান করিব। "প্রকৃতি" কি মানবজাতির উন্নতি না অবনতি ঘটাইতে প্রয়াস পাইতেছে?

চিররুগ্ন, বিকৃতবুদ্ধি এবং বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষ সমাজে গলগ্রহ হইয়া পৃথিবীর বুকে বেপরোয়াভাবে বিচরণ করিতে থাকুক ইহা কখনও আমাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্তু নানাকারণে আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করা সম্বন্ধে আমাদের অক্ষমতা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং প্রকৃতির খেয়াল প্রভৃতি কারণ সমবেতভাবে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

তবে প্রকৃতির সর্বত্রই যে নির্বাচন প্রথা চলিয়াছে ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। **যোগ্যতমের উদ্বর্তনই প্রাকৃতিক নিয়ম**। যে অযোগ্য, দুর্বল, সে জীবনযুদ্ধে টিকিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। আবার প্রকৃতিকে নির্মম পক্ষপাতী মনে করিলে ভুল করা হইবে। প্রকৃতি একদিকে যেমন মালীর মত কাঁচি দ্বারা সব কিছু ছাঁটিয়া সুন্দর করিতেছে, অযোগ্যকে বাছিয়া বাছিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, সেইরূপ আবার অন্যদিকে দুর্বলকেও রক্ষা করিতেছে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে কেবল একটি তুমুল যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিয়াছে এরূপ ধারণা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বিপুলকায় হস্তীর পাশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকাও

রহিয়াছে ; গভীর অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী এক-সঙ্গেই বাস করিতেছে। কি সুন্দর প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাণীজগতে উন্নতিই সাধন করিতেছে। তবে প্রকৃতি আমাদের মতামতের ধার ধারে না ; তাহার গতি মন্থর ; লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া তাহার পরিকল্পনা।

যৌন-নির্বাচন—এককালে যৌন-নির্বাচন মতবাদ মানবজাতিকে খুব পাইয়া বসিয়াছিল। ডারউইনই সর্বপ্রথম এই মতবাদের সূচনা করেন। তাঁহার মতে স্ত্রী পুরুষের মিলন এক প্রকার নির্বাচন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্ত্রীজাতিকে ভুলাইবার ও বশে আনিবার জন্য পুরুষ জাতি সাজসজ্জা, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর বা শক্তিশালী পুরুষই অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইয়া, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মারিয়া স্ত্রীপ্রাণীর চিত্ত জয় ও শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই যৌননির্বাচনের জন্যই পুরুষজাতির পালক, কেশর, ঝুঁটির সাজসজ্জা, দাড়ি, গোঁফ, নাচ-গানের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি ইত্যাদি হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইত।

এই প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পিতারই সন্তান জন্ম দিবার অধিকার ও সুবিধা থাকিত বলিয়া প্রাণীজাতির ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধিত হইবে আশা করা যাইত। অধুনা এই মতবাদ নানারূপ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষই পরস্পরকে একটু আধটু বিচার ও নির্বাচন করিয়া থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে যৌন-প্রবৃত্তি এত সবল যে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যৌনমিলন হইয়া থাকে।

মানবজাতির প্রচেষ্টা

প্রকৃতি তাহার ইচ্ছামত চলিবে কিন্তু তাই বলিয়া মানুষও নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধিমত্তা তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে স্বতঃই প্রণোদিত করিবে। মানুষ স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টায় পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে ; তাহার হস্তক্ষেপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কিন্তু ক্ষমতার সীমা আছে।

স্বজাতির উন্নতিবিধানে মানুষ কি করিয়াছে, করিতেছে এবং করিতে পারে তাহাই এখানে আলোচ্য।

ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা **অজ্ঞতাপ্রসূত অবৈজ্ঞানিক জাতিবিভাগ**। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই শত শত মহাত্মার দরকার। "হরিজন" কথাটি মানবের মুখ ও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

আমরা যে **সুসন্তান** বা **উন্নত মানুষের** কথা এখানে আলোচনা করিতেছি সে হইবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্বাচিত—**লোকাচার, দেশাচার, তথাকথিত বর্ণ, শ্রেণী,ধর্ম সকলের উর্ধে**।

সুসন্তান বলিতে আমরা বুঝিব—শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সবল, সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বুদ্ধিমান মানব-শিশু। ধনীর অট্টালিকায় কিংবা দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, কোলাহল মুখরিত নগরে কিংবা নিভৃত পল্লীগ্রামে,—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সে নিখুঁত দেহমন লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

গর্ভস্থ সন্তানের উপর গর্ভিণীর প্রভাব

সুপ্রাচীন কাল হইতে মানব মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর মানসিক অবস্থা এবং কল্পনার প্রভাব সন্তানের উপর বিস্তার লাভ করে এবং ইহাতে সন্তানের শারীরিক চারিত্রিক বৈষম্য ঘটিতে পারে। গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশের জগদ্বরেণ্য বহু প্রাচীন পণ্ডিত, যথা, অ্যারিষ্টট্‌ল্, প্লেটো, হেসিয়ড্ (Hesiod), মহাকবি হোমারের সমসাময়িক সোরানাস (Soranus) নামে জনৈক গ্রীক চিকিৎসাবিৎ, এমন কি গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও বহু মনীষী গর্ভিণীর কল্পনার প্রভাব সন্তানের উপর বর্তে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। জীব তাহার সদৃশ জীবের জন্মদান করিয়া থাকে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সেণ্ট্ টমাস একুইনাস্ নামক জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিতেন যে, পিতা-মাতার মনোযোগ যে বস্তুর উপর একান্তভাবে নিবদ্ধ হয় সন্তানের দেহে বা মনে তাহারই স্বরূপ প্রকাশ পায়। মিলনের সময় মাতাপিতার কল্পনাশক্তি বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে বলিয়াই সন্তান তদীয় জন্মদাতা মাতাপিতা হইতে বিভিন্ন রূপ হয়।

পেয়ারি (Pare) মনে করেন যে, কেবলমাত্র গর্ভসঞ্চারের সময়ই মাতার কল্পনার প্রভাব সন্তানের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। জন্মকালে সন্তানের যে সব অঙ্গবৈকল্য দৃষ্ট হয় তাহা অন্যান্য কারণেও ঘটিতে পারে, যথা, জরায়ুর সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি। কাহারও কাহারও এই **কুসংস্কার** আছে যে ঋতুস্রাবের সময় সহবাসের ফলে এরূপ ঘটে। যাহারা উক্ত নিষিদ্ধ কর্মের বিরোধী তাহারা ঐ নিষেধের প্রকৃত শারীরিক (physiological) কারণ না জানিয়া, ঐরূপ কল্পনাও প্রচার করিয়াছে।

ভারতবাসীদের মধ্যে **কুসংস্কার** রহিয়াছে যে, গর্ভবতী মাতা যদি ইঁদুর দেখে তবে সন্তানের শরীরে ইঁদুরের মত চিহ্ন দৃষ্ট হয়; মাতা যদি চূর্ণীকৃত কোন হাত দেখে তবে সন্তানের হাতের কোনও অস্থি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে না; মাতা যদি কোনও সুন্দর সন্তানের কল্পনা করে তবে তাহার গর্ভেও অনুরূপ সুন্দর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; বিলাতী বেগুণ কিংবা অন্য কোন লাল ফলের জন্য মাতার আগ্রহ যদি খুব তীব্র হইয়া ওঠে, কিংবা মাতা যদি আগুন দেখিয়া ভীত হয় তবে সন্তানের দেহেও লাল জড়ুল দেখা দিবে—এইরূপ বহু কুসংস্কার ও ভ্রমাত্মক ধারণাও রহিয়া গিয়াছে। অনেক সময় সদ্যোজাত শিশুর দেহ-চর্মের রক্তবাহী শিরাগুলি সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত অবস্থায় থাকে, ফলে উহার অঙ্গ বিশেষে লাল দাগ থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু লাল ফল-ফুলের জন্য মাতার আগ্রহ বা অগ্নি-ভীতি ইহার কারণ নয়।

গর্ভাবস্থায় গান-বাজনার চর্চা করিলে সন্তানের মধ্যে গান বাজনার স্বাভাবিক রুচি এবং উহার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় বলিয়া অনেক মাতা বিশ্বাস করেন। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। যদি গান-বাজনার প্রতি মাতার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে তবে সন্তানের মধ্যেও ঐরূপ ঝোঁক জাগিয়া উঠিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মাতা গান-বাজনা করিলেই যে সন্তানও সঙ্গীতপ্রিয় এবং ওস্তাদ হইয়া উঠিবে এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

সন্তানের শরীরের নানাপ্রকার দাগ, জড়ুল কিংবা অন্য প্রকার অঙ্গ-বিকৃতি এবং উহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মাতার কল্পনার প্রভাব কতটুকু দায়ী এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা খুব বেশী কিছু হয় নাই। অনেকে মনে করেন, মাতার রুগ্ন স্বাস্থ্য এবং তজ্জনিত কষ্টদায়ক ও শ্রান্তিজনক জন্ম-প্রণালীই সন্তানের বিবিধ অঙ্গ-বৈকল্যের জন্য দায়ী। চর্ম রোগের দরুনও সন্তানের গায়ে জন্ম-চিহ্ন প্রকাশ পাইতে পারে। প্রকৃতির খেয়ালও যে এই সবের জন্য দায়ী নয় তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে?

গর্ভাবস্থার ২।৩ মাসের মধ্যেই গর্ভস্থ ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া ওঠে। যদি বলা হয় যে ৭।৮ মাস পরেও মাতার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটে তবে মনে করিতে হইবে যে একবার গড়িয়া উহারা আবার নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সম্ভবপর নহে।

ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ

লিঙ্গ-নিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের আনন্দ উপভোগ অব্যাহত রাখিয়া, যখন চাহিব তখনই মাত্র সন্তান হইবে, অন্যথায় সন্তান হইবে না। এক কথায় সন্তান উৎপাদন করা-না-করা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন হইবে। কিন্তু সকলের কামনা এরূপ ক্ষমতালাভ করা যে, **আমরা যে লিঙ্গের সন্তান চাহিব সেই লিঙ্গের সন্তান হইবে অন্যথা হইবে না।**

জন্মনিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়সমূহ সাবধানতার সহিত অবলম্বন করিলে আমরা আমাদের ইচ্ছামত সময়ে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিব, কিন্তু **ইচ্ছামত নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান উৎপাদন করিতে পারিব কিরূপে** ইহ' কঠিনতর সমস্যা। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

সন্তানের লিঙ্গ-নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস মানব সমাজে আদি যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ঈপ্সিত লিঙ্গের সন্তানের অভাবে কত রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে। কত পরিবারে সুখ শান্তি চিরতরে বিদায় লইয়াছে। কাজেই ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভের জন্য মানুষ চিরকালই একান্ত অধীর আগ্রহে নানাপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব, কষ্টকল্পিত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এক যুগে যে সকল উপায় ব্যর্থ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই হয়ত পরবর্তী যুগে বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ দ্বিগুণ উৎসাহে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ; আবার শোচনীয় ব্যর্থতায় সকল প্রচেষ্টা পর্যবসিত হইয়াছে। যুগে যুগে কত হাতুড়ে ডাক্তার মানুষকে প্রতারিত করিয়া নিজের পকেট পূর্ণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর আমেরিকায় গড়ে ৫০ কোটি ডলার মুদ্রা হাতুড়ে ডাক্তার এবং পুত্র বা কন্যা লাভের বিজ্ঞাপিত অব্যর্থ মহৌষধের (?) জন্য ব্যয়িত হয়। লিঙ্গ বিভেদের কারণ খুঁজিতে গিয়া মানুষ নানাদিকে হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে। আইন করিয়া এইরূপ মিথ্যা ও লোক ঠকানো বিজ্ঞাপনসমূহ বন্ধ করা উচিত।

ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভের ক্ষমতার জন্য আগ্রহ হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক; যদিও মানুষ ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা জন্মদান করিতে পারিলে যে পারিবারিক ও সামাজিক নানারূপ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তবে একথা সত্য যে, কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া ওঠে।

এ বিষয়ে অসংখ্য মতবাদের ছড়াছড়ি রহিয়াছে। এ সমস্ত মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলি সুস্পষ্ট শ্রেণীর সন্ধান পাই:—

(১) বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ **বহির্জাগতিক নানা জিনিসের** প্রভাব মানিয়া লইয়াছে; চন্দ্র, সূর্য, এমন কি সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটাকে লিঙ্গ বিভেদের জন্য দায়ী করিয়াছে!

(২) কল্পনার সাহায্যে এ ব্যাপারে **জিন এবং দেবতার হস্তক্ষেপের** কথাও বাদ দেওয়া হয় নাই; মন্ত্র, তাবিজ, কবচের আশ্রয়ও অনেক ক্ষেত্রে লওয়া হইয়াছে।

(৩) বৎসরের **আবহাওয়া** বা **ঋতু পরিবর্তনের** সঙ্গেও অনেকে লিঙ্গ বিভেদের কারণ জুড়িয়া দিয়াছেন! গ্রীষ্মকালের শেষভাগে গর্ভাধান হইলে পুত্র সন্তান বেশী হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস!

(৪) মাতাপিতার বয়সের তারতম্যের মধ্যে অনেকে লিঙ্গ বিভেদের কারণ খুঁজিয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে সকল বয়সেই পুত্র বা কন্যার জন্ম হইতে দেখা যায়।

(৫) **মাতাপিতার দৈহিক শক্তি বা যৌন ক্ষমতার তারতম্যের** মধ্যেও অনেকে কারণ খুঁজিয়া বেড়ান। কাহারও মতে অধিকতর শক্তিশালী জনক পুত্রের এবং সমধিক শক্তিশালিনী জননী কন্যার জন্মদান করিবে; আবার অনেকে ইহার ঠিক বিপরীত মতও পোষণ করেন। শক্তি ও ক্ষমতা কাহার কতটুকু এবং কি ভাবে উহা পরিমাপ করিতে হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলেন না।

(৬) **মাতাপিতার আহার পরিপুষ্টিকেও** অনেকে লিঙ্গ-নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী করেন। কাহারও মতে গর্ভিণীকে ভালমত পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে থাকিলে কন্যা জন্মে।

(৭) ভিয়েনার ডাঃ লিউপোল্ড শেঙ্ক (Dr. Leopold Schenk)প্রভৃতির

মতে **পুরুষ সন্তান কামনা করিলে** গর্ভবতীকে অন্তত এক মাস খুব **পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া** এবং তাহার জীবনী শক্তি বাড়াইবার অন্যবিধ উপায়ও অবলম্বন করা দরকার।

রুশিয়ার জার নিকোলাসের চারিটি কন্যার জন্মগ্রহণের পর ডাঃ শেঙ্কের ব্যবস্থা অনুযায়ী জারিনাকে পুষ্টিকর আহার্য দান করিলে পুত্র সন্তান লাভ করেন ফলে তখন এই মতবাদ খুব বিখ্যাত হইয়া পড়ে। পরবর্তী গবেষণার ফলে অবশ্য ইহার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় নাই।

(৮) **মাতার অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ায় সন্তানের লিঙ্গ বিভেদ** হয় কি না তাহা লইয়া অধুনা গবেষণা চলিতেছে। হরমোণ ইন্‌জেক্‌শান করিয়া মাতার গর্ভনিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন কথাও শোনা যায়। এ বিষয়ে কিছুই এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

(৯) **ঋতুমাসের কোন্ সময়ে গর্ভ হইলে** পুত্র বা কন্যা হইবে ইহা লইয়াও জল্পনা কল্পনা হইয়াছে এবং হইতেছে। সীজেল (Siegel) ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত Constructive Eugenics and Rational Marriage পুস্তকে একটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

যদি ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে নবম দিন পর্যন্ত গর্ভসঞ্চার হয় তাহা হইলে এই সকল ক্ষেত্রে শতকরা ৮০টি পুত্র সন্তান হয়; ঋতুস্রাবের দশম হইতে চতুর্দশ দিবস পর্যন্ত গর্ভাধানে সমান সংখ্যক পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে; ১৫শ দিবস হইতে ২২ বা ২৩ দিবসে সহবাসের ফলে শতকরা ৮০টি কন্যা-সন্তান জন্মিয়া থাকে।

এই সূত্রটিকেও অনেকে সমর্থন এবং অনেকে উহার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। মোট কথা, ইহা **সুপ্রমাণিত হয় নাই**। ডাঃ ভেল্ডি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁহার Ideal Birth পুস্তকে এই সূত্রটির সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

নারীজীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়ের অধ্যায়ে অধুনা প্রায় সকল পণ্ডিত দ্বারা স্বীকৃত ওজিনো (Ogino) ও নাউস (Knaus) এর গবেষণার অনুযায়ী প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ঋতু মাসের প্রথম ৯।১০ দিনে এবং ১৬।১৭ দিনের পর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা খুব কম এবং শেষ সপ্তাহে (অর্থাৎ ২১ হইতে ২৮ দিনে) অত্যন্ত কম।

(১০) গর্ভাধানের সময় **মাতার মাথা যে দিকে থাকে** সেই অনুযায়ী পুত্র বা কন্যা জন্মে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ইহা অমূলক বিশ্বাস।

(১১) **শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষে** গর্ভাধান হেতু লিঙ্গ ভেদ হইয়া থাকে বলা হয়। ভুল কথা।

(১২) **দক্ষিণ অণ্ডকোষের শুক্রকীট দ্বারা** ও **দক্ষিণ ডিম্বকোষ** হইতে নির্গত ডিম্ব হইতে **পুত্র** ও তদ্বিপরীতে কন্যা হয়। এ মতবাদও পরিত্যক্ত। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত ডাঃ ট্রাল (Tryall) এর Sexual Physiology গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এই মত এবং ইহার সমর্থনে নানা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে তিনি ইহা বাদ দেন।

(১৩) **আয়ুর্বেদের অন্তর্গত** সুশ্রুত সংহিতার মতে ঋতুর প্রথম দিন হইতে গণনা করিয়া প্রথম ১৬ দিনের মধ্যে যুগ্ম দিনে সহবাসের ফলে পুত্র জন্মে ও অযুগ্মদিনে কন্যা হয়। তাহার পর আর গর্ভ হয় না। পুত্র ও কন্যা জন্মিবার এই নিয়ম ঠিক নয়, কিন্তু ঋতুমাসের ষোড়শ দিন পরে গর্ভ না হওয়ার মত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটে।

(১৪) মতান্তরে **ঋতুর প্রথম সপ্তাহে মিলনে কন্যা ও পরবর্তী সপ্তাহে পুত্র** জন্মে। উপরোক্ত ওজিনো-নাউসের মতানুযায়ী প্রথম সপ্তাহে গর্ভাধানের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

(১৫) জার্মাণীর অন্তর্গত কনিগ্‌স্‌বার্গের (Koenigsberg) প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উণ্ট্যর্‌বার্গ্যর (Unterberger) বলেন যে, সন্তানের লিঙ্গের উপর কৃত্রিম উপায়ে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করা যাইতে পারে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অনেক বন্ধ্যা নারীর যোনিপথে নির্গত রস অত্যধিক অম্লভাবাপন্ন। অধিক অম্লরস শুক্রকীট ধ্বংস করে। এই অম্লতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে যৌন-মিলনের পূর্বে যোনিপথে ক্ষারধর্মী পদার্থ প্রয়োগ করিয়া রসের অম্লতার প্রশমন করায় তাঁহারা সন্তানবতী হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী যাঁহারা পুত্র কামনা করেন তাঁহারা ক্ষারধর্মী সোডিয়াম্ বাই-কারবোনেট্ (Sodium-bi-Carbonate) এর দ্বারা যোনিপথে ডুশ দিয়া কিংবা বাই-কারবোনেট্ অফ সোডার গুঁড়া পুরুষাঙ্গে মাখাইয়া ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারেন। কারণ যতটা অম্লত্বে পুত্র উৎপাদনকারী শুক্রকীট মরে, তাহাতে কন্যা উৎপাদন কারী শুক্রকীট মরে না, সুতরাং সোডা প্রয়োগে অম্লত্ব কমিয়া যাওয়াতে পূর্বোক্তগুলির বাঁচিবার সম্ভাবনা হয়। যাঁহারা কন্যা চাহেন তাঁহারা যোনিপথে অম্লরসাত্মক ল্যাকটিক্ এ্যাসিডের ডুশ দিয়া দেখিবেন। কিন্তু,

যোনিতে অম্লের মাত্রাধিক্য হইলে সমস্ত শুক্রকীট মরিয়াই যায়, সুতরাং গর্ভাধান হয় না।

১৯৪০ সালে এ্যামেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফলে এই মত প্রমাণিত হয় নাই। Journal of Heridity পত্রিকার ১৯৪০ সালের এপ্রিল সংখ্যায় Robert Cook লিখিত Sex Control Again in the News প্রবন্ধ এবং ডিসেম্বর ১৯৪০ সংখ্যায় Reports on·Experimients in·Sex Control at three Universities by Various authors, অথবা Amaram Scheinfeld লিখিত (নর ও নারীর শরীর, মন ও নানা ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের তুলনাকারী) Women and Men নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ৩৪৩ ও ৩৫৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

কোনও বাহ্য কারণে বা খাদ্যের তারতম্যের দরুন গর্ভস্থ সন্তান পুরুষ বা মেয়ে হবে এরূপ মতবাদ এযুগে আর কেহ মানিতে রাজি নয়। দুইটি যমজ সন্তানের একটি পুরুষ এবং অন্যটি মেয়ে হয় কেন? যদি খাদ্যের তারতম্যের উপর ভ্রূণের লিঙ্গ-ভেদ নির্ভর করিত তবে যমজ সন্তানের উভয়ই এবং কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতির একবারে জাত সকল বাচ্চাগুলিই কেন পুরুষ বা স্ত্রী হয় না? দুইটি সম-যমজ সন্তানের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহারা উভয়ে প্রায়ই· হয় স্ত্রী, নয় পুরুষ হইয়া থাকে। **সম যমজ সন্তানের সমলিঙ্গত্ব** হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে **অঙ্কুরিত ডিম্বের মধ্যেই** ভ্রূণের **লিঙ্গ-নির্ধারণের পালা শেষ** হইয়াছিল। উপরোক্ত মতগুলি অনুসারে একই দিন-ক্ষণ এবং অবস্থায় উৎপন্ন সমস্ত অসম-যমজ সন্তানও একই লিঙ্গের হওয়া উচিত, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহারা বিভিন্ন লিঙ্গের হয়।

(১৬) ১৩৫৭ সালের নরনারীর শারদীয় সংখ্যায় 'যোগ ও স্বাস্থ্য' প্রবন্ধে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় এবং উক্ত সালের পৌষ সংখ্যার ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠায় "হঠযোগী" মিহির কুমার সরকার লিখিয়াছেন "মাতৃদেহে সবল এড্রিনালজাত রসের সাহায্যে গর্ভস্থ ভ্রূণ পুং শিশুতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে উক্ত গ্রন্থি দুর্বল হইলে ভ্রূণ স্ত্রী শিশুতে পরিণত হয়।"

কৌতুকের বিষয় এই যে, যে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা এড্রিনাল প্রভৃতি অন্তঃস্রাবী বিনালী গ্রন্থিগুলির অস্তিত্ব, ক্রিয়া প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারা উহাদের সম্বন্ধে যে কথা জানেন না এদেশের যোগীরা তাহা জানিয়া ফেলিয়াছেন।

হয়ত এই অদ্ভুত মত কোনও বাজে ইংরাজী বা বাংলা পুস্তক বা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অথবা, লেখকই ইহার আবিষ্কর্তা। আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্ত্য দেশেও কল্পনাবিলাসী, সহজে বিশ্বাসী ও সামান্য সূত্রের দুর্বল ও ভঙ্গুর ভিত্তির উপর কল্পনা ও অনুমানের মশলার সাহায্যে বিরাট ও অভিনব সিদ্ধান্ত সৌধ, রচনা করিবার মত লোকের অভাব নাই। তাহাদের সম্পর্কে বলা যায় যে তাহারা গবেষক বা বৈজ্ঞানিক নামের কলঙ্ক। স্বীয় অনুমান যাচাই করার জন্য নানা ক্ষেত্রে বারবার পরীক্ষা করিয়া, পরিশ্রম করিতে তাহারা অনিচ্ছুক, এবং তাহা করিবার জন্য যে ধৈর্য, উদ্যম, অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন তাহা তাহাদের নাই। তাহাদের অভিলাষ হইল সস্তায় কিস্তীমাৎ করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—একটি অথবা ২।১০টি ক্ষেত্রে কোনও ঔষধ, উপায় বা মতবাদ সুফল দিতে দেখা গেলেই তাহার কার্যকারিতা প্রমাণ হয় না। কত ক্ষেত্রে উহা বিফল হইয়াছে তাহাও **নিরপেক্ষ** ভাবে লক্ষ্য ও অনুসন্ধান করা এবং উভয় প্রকার ক্ষেত্রের ফলাফল **যথাযথ** ভাবে সবিস্তারে **লিখিয়া** রাখিয়া **তুলনা** করিলে তবেই সত্য নির্ণয় হয়।

ফলত কোনও বাহ্য প্রভাবে পুত্র বা কন্যা জন্মে না। পুত্র বা কন্যা উৎপাদনকারী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুক্রকীটের দ্বারাই যে **গর্ভাধানের মুহূর্তেই পুত্র বা কন্যা জন্মে** তাহা আণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

পুত্র বা কন্যা জন্মিবার প্রকৃত কারণ

আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সন্তানের লিঙ্গভেদের রহস্যভেদ হইয়াছে। ইহাও স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যে অন্তত উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া মানব জাতির মধ্যে, **ডিম্বের প্রাণবন্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের লিঙ্গ কি হইবে তাহা নির্ধারিত হইয়া যায়।**

আমরা দুই প্রকার যমজ সন্তানের বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। **অসম-যমজ** সন্তানের বেলায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উভয় সন্তান একই লিঙ্গের হইয়া থাকে। এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষভাবে উপরোক্ত সূত্রটি সমর্থন করে।

আমরা 'ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি' অধ্যায়ে Cell সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই সকল কোষের মধ্যে শলাকার মত কতকগুলি করিয়া **ক্রোমোসোম্**

(Chromosome) থাকে। এই ক্রোমোসোম্‌গুলিই পিতৃপুরুষের বৈশিষ্ট্যগুলি বহন করে। যে ক্রোমোসোম্‌ জোড়া হইতে পুত্র বা কন্যা জন্মায়, অর্থাৎ, জীবকোষ বা জনন কোষ বা যৌন কোষে (সেক্স সেলস্‌, Sex Cells) অর্থাৎ শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মধ্যে আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত গুণবীজ (জীন Gene) থাকে।

এই সমস্ত জীনের (Gene) মধ্যবর্তীতাতেই মাতৃকুলের শারীরিক ও মানসিক দোষ ও গুণের সমাগম (Inheritence of characteristics) হইয়া থাকে।

প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক প্রাণীদেহের কোষই সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম্‌ থাকে। ইঁদুরের প্রত্যেক কোষে ৪০, মুরগীর ১৮, এবং মানুষের ৪৮টি করিয়া ক্রোমোসোম্‌ আছে।

যে ক্রোমোসোম জোড়া হইতে পুত্র বা কন্যা জন্মায় তাহা কিন্তু অন্যান্য ক্রেমোসোম্‌ হইতে ভিন্ন রকমের। **পুরুষের** মধ্যে এই ক্রোমোসোম-জোড়া একটি অপর সমস্ত গুলিরই মত বড় কিন্তু অপরটি তাহা অপেক্ষা ছোট। বড়টিকে ইংরাজিতে এক্স (X) এবং ছোটটিকে ওয়াই (Y) ক্রোমেসোম বলা হয়। বাংলায় তাহাদের যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বলিতে পারি। **স্ত্রীলোকের** এইরূপ উভয় ক্রোমোসোমই ক জাতীয়।

সাধারণ কোষ-বিভক্তির প্রাক্কালে ক্রোমোসোমগুলির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং নূতন দুইটি কোষের প্রত্যেকটিতে আবার পূর্বের মত নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম (মানবের ক্ষেত্রে ৪৮টি) রহিয়া যায়।

জননকোষ নির্মাণ

যৌনকোষ (Sex Cells) সম্বন্ধে কিন্তু এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়। এই ক্ষেত্রে কোষ-বিভক্তির প্রক্কালে ক্রোমোসোমগুলি সংখ্যায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয় না। ইহার ফলে নূতন নূতন কোষে অর্ধেক সংখ্যক (২৪ টি) ক্রোমোসোম থাকে।

ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের যৌন ক্রোমোসোমে পার্থক্য

ডিম্বাণু ও শুক্রকীট প্রত্যেকের ভিতরের ১২ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি জোড়া অপর ১১ জোড়া হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এইগুলি হইতে পুত্র কন্যা জন্মায়, এই জন্য উহাদের যৌন (বা লিঙ্গ-নির্দেশাত্মক) ক্রোমোসোম্‌ (Sex Chromosome) বলে।

ডিম্বাণু—শরীরের যে কোষটি হইতে প্রথম ডিম্বাণু সৃষ্ট হয় তাহার এই জোড়ার দুইটি ক্রোমোসোম একই প্রকারের, সুতরাং যখন তাহা ক্রমাগত দ্বিধা বিভক্ত হইতে হইতে সংখ্যায় বর্ধিত হইতে থাকে, তখন সকল ডিম্বাণুর মধ্যেই দুইটি একই আকারের ও প্রকারের ক জাতীয় লিঙ্গনির্দেশাত্মক যৌন ক্রোমোসোম্ থাকে। অতএব সকল ডিম্বাণুই একই প্রকারের, পুত্র বা কন্যার জন্ম দানে ইহাদের কোনও হাত নাই।

শুক্রকীট—কিন্তু যে কোষটি প্রথম শুক্রকীটের জনক তাহাতে উক্ত জোড়ার মধ্যে, একটি (ডিম্বাণুর ভিতরের দুই সমান আকার ও প্রকারের যৌন ক্রোমোসোমেরই মত) **বৃহৎ**, এই জন্য সেটিও ক জাতীয়, এবং অপরটি তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র যেন বড়রই একটি কাটা টুকরা, সুতরাং খ জাতীয়। এই জন্য যখন শুক্রকীটের পূর্বপুরুষ-রূপী কোষটি দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন ক ক্রোমোসোমটি ২৩টি সাধারণ ক্রোমোসোমের (ইহাদের অটোসোম Autosome বলে) সহিত মিলিয়া এক প্রকারের শুক্রকীট সৃষ্ট হয়। এবং তাহার খ ক্রোমোসোমটি অপর ২৩টি অটোসোমের সহিত মিলিয়া, অপর এক ধরনের, সমান সংখ্যক শুক্রকীট সৃষ্টি করে।

পুত্র বা কন্যা কিরূপে জন্মায়—এইরূপ (অর্থাৎ খ ক্রোমোসোম সম্পন্ন) একটি কীট যদি (সহবাসের ফলে, অথবা পিচ্‌কারী দ্বারা কৃত্রিম নিষেকে) নারীদেহের মধ্যে গিয়া একটি ডিম্বাণুর মধ্যে স্বীয় মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে ডিম্বাণুর ক জাতীয় এবং শুক্রকীটের খ জাতীয় যৌন ক্রোমোসোম মিলিয়া, ক+খ এর যোগফলে, একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে, যদি ক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট একটি শুক্রকীট ডিম্বাণুর সহিত ঐ ভাবে মিশে, তাহা হইলে ডিম্বাণু ও শুক্রকীট প্রত্যেকের একই জাতীয় একটি একটি ক যৌন ক্রোমোসোম মিলিয়া, ক+ক এর ফলে, একটি কন্যা জন্মায়।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের লিঙ্গ শুক্রকীটের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। শুক্রকীটের মধ্যে ক এবং খ ক্রোমোসোমবিশিষ্ট সংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান সমান। তাই পুত্র ও কন্যা সন্তানের সংখ্যার অনুপাতও সমান সমান হইবারই কথা।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই দুই প্রকৃতির শুক্রকীটগুলির আকারগত পার্থক্য ধরা যায়। কোটি কোটি শুক্রকীট ধাবমান হইয়া ডিম্বকে পরিবেষ্টন

করিয়া ফেলে এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি ডিম্বের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায়। এই শুক্রকীটটি কোন্ ধরনের হইবে তাহা বলা অসম্ভব।

ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

তবে ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিয়া জানা গেলে এবং কোন বিশেষ ঔষধ যোনিনালীতে ডুশ দিয়া বা লাগাইয়া একটির গতিরোধ করা গেলে অপরটি ডিম্বের সহিত মিলিত হইবার অধিক সুযোগ পাইবে।

দেখা গিয়াছে যে ক ক্রোমোসোম-বিশিষ্ট শুক্রকীটগুলি ক্ষার রসের সংস্পর্শে দুর্বল বা নিস্তেজ হইয়া যায়, কিন্তু খ ক্রোমোসোমবিশিষ্ট শুক্রকীটের তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। অতএব নারী ঐ রসের (যথা, বাইকার্বোনেট্ অফ সোডার) ডুশ লইয়া স্বামী সহবাস করিলে পুত্রসন্তান লাভ করা সহজ হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু, একটু পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই পদ্ধতি কার্যকরী নয়।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ভবিষ্যতে সফল হইতে পারে ঃ—

(১) ক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট শুক্রকীটগুলি খ ক্রোমোসোম বিশিষ্ট গুলি হইতে আকারে সামান্য বড় এবং ওজনে একটু বেশী। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতেও পার্থক্য থাকা সম্ভব (ক) রাসায়নিক উপাদান (খ) গঠন, (গ) ইহাদের উপর বিদ্যুতের ক্রিয়া (electrical reaction) এবং (ঘ) গতিবেগ। সুতরাং (১) কেন্দ্রাতিগ (centrifuging) প্রক্রিয়া, (২) রাসায়নিক বা (৩) বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার দ্বারা ইহাদের স্বতন্ত্র করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইতে পারে। তখন পুত্র বা কন্যা কামনা করিলে, স্বামী হস্তের সাহায্যে শুক্রপাত করিবার পর, বৈজ্ঞানিক কোনও উপায়ে, যথাক্রমে খ বা ক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট শুক্রকীটগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া নারীর উর্বর সময়ে, পিচকারী দ্বারা জরায়ুর ভিতর অথবা তাহার নিকটে কৃত্রিম নিষেক দ্বারা পৌঁছাইয়া দিলে সফলকাম হওয়া সম্ভব।

(২) এমন কোনও রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহার মধ্যে কোনও একপ্রকার শুক্রকীট অপর শ্রেণী অপেক্ষা দ্রুত সাঁতার দিতে পারে। তখন রমণ-পথে সেই পদার্থের পিচকারী দিলে, শুধু সেই ধরনের কীটই ডিম্বাণুকে প্রাণবন্ত করিতে পারিবে।

(৩) সেখানে এমন কোনও পদার্থের পিচকারী দেওয়া যাইতে পারিবে, যাহার ফলে শুধু কোনও এক প্রকারেরই শুক্রকীট বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে।

শেষ কথা

তবে আমাদের মনে হয় যে, এ রহস্য অজ্ঞাত থাকাই উত্তম, অথবা, জ্ঞাত হইলেও, এরূপ আইন হওয়া উচিত যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, সরকারের মঞ্জুরী লইয়া তবেই, এই উপায় অবলম্বন করা যাইবে। কারণ, ইহার উপায়গুলি জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হইলে, যে সমাজে পুত্রের চাহিদা অধিক সেখানে পুত্রের সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইবে, যে বিবাহের বাজারে পুত্রের মূল্যই কমিয়া যাইবে। বরপণের পরিবর্তে সেখানে তখন ক্রমশ কন্যাপণের রীতি আসিবে। ইহা ব্যতীত, সমাজে স্বল্প-সংখ্যক কন্যাদের লাভের জন্য পুরুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়াই থাকিবে। তখন আবার কন্যার সংখ্যা বাড়াইবার ঝোঁক আসিবে। শুধু তাহাই নহে, আইন বলে পুত্রের সংখ্যা নির্দিষ্ট সীমায় না রাখিলে, পঞ্চ পাণ্ডবের মত একাধিক ভ্রাতাকে একটি মাত্র কন্যা বিবাহ করিতে হইবে, যেরূপ রীতি আজিও তির্বতে, ভারতে দেরাদুন-চাকরাতা পথের উপর যমুনা জলবিদ্যুতের কারখানার কাছে, ৬০,০০০ জওনসারিদের মধ্যে এবং কোনও কোনও জাঠ ও শিখ পরিবারে আছে। তাহার ফলে নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ক্রমশ বংশের অবনতি হইবে এবং জনসংখ্যা কমিতে থাকিবে। আবার, যে সমস্ত সমাজে কন্যার আদর অধিক সেখানকার লোকেরা যদি অধিক পুত্রীর জন্ম দিতে আরম্ভ করে তাহা হইলেও এই ধরনের নানা সমস্যা দেখা দিবে।

পুত্র ও কন্যার অনুপাত—সাধারণত দেখা যায়, যে প্রতি ১০০টি কন্যা জন্মিলে ১০৬টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অকালপ্রসব ও মৃত ভ্রূণের হিসাব করিলে এই অনুপাত প্রায় ১০০ কন্যা : ১১৬ পুত্রে দাঁড়ায়।

স্থূলদৃষ্টিতে ভিন্ন লিঙ্গের পিতা ও মাতার সমবায়ে সন্তানের সংখ্যায় পুত্রকন্যার অনুপাত প্রায় সমান সমান হওয়াটাই স্বাভাবিক। পুরুষ ভ্রূণ ও শিশু, রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতায় স্ত্রী-জাতীয়া অপেক্ষা দুর্বল, এই জন্য তাহাদের মৃত্যুর হার অধিক বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে অধিক সংখ্যায় জন্মায়। সকল বয়সেই পুরুষ উক্ত ক্ষমতায় এবং জীবনী শক্তিতে নারী অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া তাহার মৃত্যুহার বরাবরই অধিক। এই জন্য নারীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। তাই সকল দেশে বৃদ্ধ অপেক্ষা বৃদ্ধা অধিক দেখা যায়।

সুজাত শাস্ত্র (Eugenics)

সুস্থ, সুগঠিত ও সদ্‌গুণাবলীবিশিষ্ট পিতামাতা দ্বারা সুস্থ, সুগঠিত ও সদ্‌গুণাবলীবিশিষ্ট সন্তান জন্মাইয়া পৃথিবীকে সুস্থ, সবল ও সৎলোকের বাসস্থানে পরিণত করা সভ্যতা উদ্ভুত বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা সফল করিবার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকগণ করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ইউজেনিক্স (সুপ্রজননের) মতবাদ বলা হইয়া থাকে। ইউজেনিক কার্যক্রমকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে ঃ

(১) প্রথমত ইহার **আদেশাত্মক** (Positive) দিক, অর্থাৎ কি কি করিতে হইবে, সেই দিক। এই দিকে সুস্থ নরনারীর বিবাহ, যৌন সম্বন্ধের সংস্কার ইত্যাদি সাধন করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়ত **নিষেধাত্মক** (Negative) দিক, অর্থাৎ কি কি কার্য হইতে বিরত হইতে হইবে, সেই দিক। এই দিকে বদ্ধ মাতাল, বংশগত রোগে (যথা, উন্মাদ, জড়বুদ্ধি (হাবা) প্রভৃতি) রোগীদিগকে আইন বলে বন্ধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩) তৃতীয়ত **প্রতিকারাত্মক** (Preventive) দিক। এই দিকে আমাদিগকে ইউজেনিক-পরিপন্থী রোগসমূহের প্রতিকার করিতে হইবে।

চরিত্র গঠনে কোন্‌টি বড়—বংশগতি না শিক্ষা ও সঙ্গ

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউজেনিক মতবাদ প্রধানত বংশগতির নিয়মের অর্থাৎ Theory of Heredityর উপর প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার দোষগুণ সন্তানের উপর বর্তিয়া থাকে, ইহাই হেরিডিটি মতবাদের মূলকথা। শুধু চরিত্রগত নহে, পরন্তু দৈহিক দোষ-গুণেরও অনেকগুলি, সন্তানে বর্তিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাবে ঐ সমস্ত দোষ-গুণের কতকটা গতিরোধ করাও সম্ভব।

বংশগতি এবং শিক্ষা ও আবেষ্টনীর প্রভাব

পিতৃ ও মাতৃকুল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীন (gene) গুলি শিশুর শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী এবং তাহাদের উৎকর্ষের ঊর্ধ্ব সীমা নির্দেশ করে, পরন্তু শিক্ষা, সঙ্গ, সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী সেই গুণাবলী অল্প বা অধিক উৎকর্ষ লাভ করে।

একই প্রকার বীজ, উর্বর অনুর্বর জমিতে বপন করিলে যেরূপ উক্ত দুই প্রকার ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের উৎকর্ষে তফাৎ হয়, অথবা, একটি ক্ষেত্রের অর্ধেকটিতে কোনও একটি শস্যের ভাল এবং অপরার্ধে মন্দ বীজ বপন করিলে যে প্রকার ফসলের তফাৎ হয়, একই প্রকার গুণবীজ (জীন) বিশিষ্ট দুই শিশু বিশেষ পার্থক্য বিশিষ্ট বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে শিক্ষা ও সুযোগের মধ্যে লালিত-পালিত হইলে, অথবা একই প্রকার আবেষ্টনীর মধ্যে একই প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা ও সুযোগ প্রাপ্ত উত্তম ও অধম গুণ-বীজ বিশিষ্ট দুই শিশু বর্ধিত হইলে তাহাদের রীতি-নীতি ও চরিত্রে সেইরূপ বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

এই বংশানুক্রম মতবাদ (Laws of Heredity) আজকাল খুব সাধারণ ও জনপ্রিয় হইলেও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হার্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন। স্পেন্সারের অল্পদিন পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডারউইন তাঁহার **উদ্বর্তনবাদ**, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্যাল্‌টন তাঁহার **বিবর্তনবাদ** এবং ১৮৯৩ খৃঃ ওয়াইজম্যান তাঁহার **অভিব্যক্তিবাদ** দ্বারা স্পেন্সারের মতবাদের অনেক সংস্কার সাধন করিলেও উহার মূলকথার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। সমস্ত মতবাদ অনুসারেই সন্তান কতকগুলি দোষগুণ পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং কতকগুলি শিক্ষা ও পরিবেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে।

সুপ্রজননের মতবাদ কার্যকরী করিবার কুফল

মানুষের দেহের ও মনের উপর বংশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে কোনও একটি বিশিষ্ট মতবাদকে বিশেষ প্রাধান্য দান করিলে উহা অতি সহজেই অনভিপ্রেত ও অকল্যাণকর কুসংস্কারে পরিণত হইতে পারে। ইউজেনিক মতবাদের নিষেধাত্মক কার্যক্রমের কথাই ধরা যাউক। জড়বুদ্ধি, উন্মাদ রোগী প্রভৃতিকে অযোগ্য ঘোষণা করিয়া

তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিলে এতদ্দ্বারা অতি সহজেই শ্রেণী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং মানব-কল্যাণেচ্ছা-প্রসূত আদর্শটি দুর্বল-পীড়নের অত্যাচার-মূলক কারণে পর্যবসিত হইতে পারে। কারণ, রোগ ইত্যাদির প্রতিকার ও চিকিৎসাও হইতে পারে। সেইজন্য কোলাপুর কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ ফাড্‌কে তদীয় "Sex Problem in India" নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে ইউজেনিক প্রথা প্রচলনের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা ততটা উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

ব্যাপারটির আর একটি দিকও দেখা যাউক। আদর্শ সন্তান লাভের জন্য সর্ববিধ কার্যকরী উপায় অবলম্বন করা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গাছপালা, কিংবা পশুপক্ষীর মধ্যে যেরূপ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নততর সঙ্কর জাতির জন্মদান সম্ভবপর হয় মানব সম্বন্ধে তাহা হইবে কি? সৃষ্টির সেরা মানুষ বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ইত্যাদিতে তাহারা এক অতি শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত আসন দখল করিয়াছে। গাছপালা ও নিকৃষ্টতর প্রাণীজাতির উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার মানুষ বুদ্ধিবলে করিয়া লয়; নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকেই সে অধিকতর মনোযোগ দেয়। কিন্তু মানুষ নিজের বিচার নিজে করিতে গেলেই নানা স্বার্থ ও বিভিন্ন প্রয়োজন ইত্যাদির দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। সমাজের কোন্ কোন্ স্ত্রী এবং পুরুষ বিবাহের অযোগ্য কিংবা কাহাদের পক্ষে সন্তান -জন্মদান নিতান্ত গর্হিত ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা করিয়া নির্ধারণ করিতে হইলে এরূপ আইন প্রণয়ন কার্যকরী করিতে হইবে যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচজন চিকিৎসকের দ্বারা গঠিত কমিটির মতে যাহারা কোনও সংক্রামক বা বংশগত (ট্রান্সমিসিব্ল Transmissible) শারীরিক বা মানসিক রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের মধ্যে **সংক্রামক রোগগ্রস্তেরা রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি পাইবে না,** এবং **অসাধ্য বংশগত রোগগ্রস্তদের বন্ধ্য করিয়া** দেওয়া হইবে। এই দুই শ্রেণীর (অর্থাৎ, বিবাহ অথবা সন্তান জন্মদানের অযোগ্য) ব্যক্তিরা সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ২০ জনের কমই হইবে।

দায়িত্বজ্ঞান সহায়ে সুপ্রজনন

তবে অন্যদিকে এ কথা খুবই ঠিক যে, উন্মাদ, অন্ধ, মূর্খ সন্তানের জন্য কেহই লালায়িত নহে। এরূপ সন্তান যাহাতে না জন্মিতে পারে সেই চেষ্টা

করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। শিক্ষা এবং সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই পরিবার এবং সমাজের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে; মানুষের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান দ্রুত বিকশিত হইতেছে।

কিন্তু, জড়বুদ্ধি, হাবা, বিকৃত বা দুর্বল মস্তিষ্ক, উন্মাদ অথবা ঘোর মদ্যপের কাছে এরূপ দায়িত্বজ্ঞানের প্রত্যাশা কখনও করা যায় না। সুতরাং, সুদূর ভবিষ্যতে যদি জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষা, সভ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হয়, তখনও অন্তত এই সকল শ্রেণীর লোকদের আইনের বলে বন্ধ্য করিতেই হইবে, নতুবা সমাজে উহাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া দেশ তাহাদের ভারগ্রস্ত হইয়া শক্তিহীন হইতে থাকিবে।

আইনের বলেই শীঘ্র নিতান্ত অযোগ্যের বিবাহ স্থগিত রাখা এবং অসাধ্য বংশগত রোগগ্রস্তদের সন্তান উৎপাদন নিবারণ করা সম্ভব। কেবলমাত্র জনমতের চাপে অথবা দায়িত্বজ্ঞান বিকাশের ফলে ঐরূপ অধিকাংশ নরনারী স্বেচ্ছায় চিরকাল কাম দমন করিয়া চলিবে কিংবা, গর্ভ নির্ধারণের কোনও সুষ্ঠু উপায়, প্রত্যেক সঙ্গমের সময়, অতি সাবধানে, যথাযথ ভাবে অবলম্বন করিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন, অথবা বিবাহেতর সহবাস করিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রলয় বা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। আইন না হইলে আজিও কি সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কন্যা শিশু হত্যা প্রভৃতি অনাচার ও কদাচার বন্ধ হইত? জনমতের চাপ এবং শিক্ষা বিস্তারের ফলে কি বিবাহিতদেরও গণিকাগমন বন্ধ বা হ্রাস হইয়াছে?

পুরুষ স্বভাবতই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও চরিত্রবতী মেয়েকে এবং নারী সুস্থ, সুঠাম ও বলশালী পুরুষকে ভালবাসে। কাজেই লোকমতের প্রাবল্যে ইউজেনিক মতবাদ বিনা বাধায়, প্রচলিত হইলে কিংবা প্রয়োজনে আইনের সাহায্যে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রেম-বিলাস এবং নারী-পুরুষের যৌন-মিলনের জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার কথা উঠিবে তাহা খুব বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্জন দ্বারা সুপ্রজনন

১৯০৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তেইশটি বিভিন্ন রাজ্য অস্ত্রোপচার দ্বারা অবাঞ্ছিত স্ত্রী এবং পুরুষকে বন্ধ্য করিবার আইন প্রবর্তন করে

অসাধ্য উন্মাদ, স্বভাবসিদ্ধ অপরাধী, বংশগত রোগগ্রস্ত এবং বিকৃত যৌন-বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এইভাবে বন্ধ করিলে ভবিষ্যৎ সমাজের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। মালী যত্নে বাগানের আগাছা উপড়াইয়া ফেলে পাছে উহারা ভাল ভাল ফুলের গাছ ধ্বংস করিয়া ফেলে। মানবসমাজেও অনেক আগাছা রহিয়াছে ; এই আগাছা উপড়াইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই নিষেধাত্মক ইউজেনিক মতবাদ ক্রমে সভ্যজগতে বিস্তার লাভ করিতেছে।

অবশ্য এই মতবাদ এখনও সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং মঙ্গলজনক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। মানুষের রচিত অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার মত ইহাও নিখুঁত নয়। খুব বিচার এবং বিচক্ষণতার সহিত এই মতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সুপ্রজনন

সুতরাং আমরা মোটামুটি নীতি হিসাবে সৌজাত্য মতবাদের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে শিক্ষা, সভ্যতা বিস্তারের দ্বারা ব্যক্তিগত কৃষ্টি-উন্নয়ন করিলেও মানব-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অন্য দেশের কথা যাহাই হউক, পাক-ভারতে জনসাধারণের মধ্যে কৃষ্টি-বিস্তারের কর্তব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে সম্যকরূপে সম্পাদন করেন নাই, একথা লজ্জার সঙ্গে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের বিশ্বাস, কৃষ্টি-বিস্তারের দ্বারা আমরা অধিকাংশ মানবের মানসিক ও দৈহিক উন্নতিবিধান করিতে পারিব।

সু-সন্তান লাভের উপায়

সুসন্তান লাভ করিবার নানা প্রচেষ্টার আলোচনা করা হইল। এখনও এমন কোন নির্ভুল ও নিশ্চিন্ত উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে সকলেই কেবল সুসন্তানই লাভ করিতে পারে।

তবে নানা বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিলে অধিক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায় ডাঃ ভেল্ডি তাঁহার Ideal Birth পুস্তকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার এই পুস্তকের নামাকরণ হইতেই অনেক পাঠক-পাঠিকার মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে, বুঝি বা লেখক সুসন্তান লাভের অব্যর্থ প্রক্রিয়ার

সন্ধান দিয়াছেন! এ বিষয়ে অক্ষমতা স্বীকার করিতেছি :—কারণ বিজ্ঞান এখনও অনুসন্ধান করিয়াই চলিয়াছে।

তবে **কতকগুলি পালনযোগ্য বিধি-নিষেধের উল্লেখ** নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ বিধি-ব্যবস্থাও কম মূল্যবান নয়।

(১) সুস্থ দেহমনবিশিষ্ট সন্তানলাভ করিবার সর্বপ্রধান উপায় **মাতা ও পিতার উভয়ের সুস্থ দেহমনবিশিষ্ট** হওয়া।

বিবাহের প্রাক্কালে তথাকথিত বংশ-মর্যাদা; আর্থিক অবস্থা, পণের পরিমাণ, বাহ্য চাকচিক্য ইত্যাদির চেয়ে বেশী লক্ষ্য করিতে হইবে **পাত্র ও পাত্রীর** এবং তাহাদের পিতৃ ও মাতৃকুলের **দেহ ও মনের সবলতা,** বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চরিত্রের উৎকর্ষ বিচার বিশ্লেষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ইহাই হইবে।

আমরা ক্রোমোসোম এবং জীনের কথা বলিয়াছি। নারীর ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীট অপেক্ষা আকারে বহু গুণ বড় হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেককেই নূতন জীবসৃষ্টিকল্পে সমান সংখ্যক (২৪টি) ক্রোমোসোম যোগাইয়া থাকে। তাই পিতা মাতার গুণাগুণ সন্তানে বর্তে। মাতা ও পিতার ভ্রাতা ও ভগিনীদের এবং পূর্ব পুরুষের গুণাগুণের সঞ্চার অনেক ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। সেজন্য-সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে দাম্পত্য সম্বন্ধ ও অধিকারকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল-মুক্ত করা। বস্তুত স্বামী বা স্ত্রী **নির্বাচনে মানুষকে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে হইবে। এক্ষেত্রে দেশ, বর্ণ, জাতীয়তা এমন কি ধর্মমত প্রভৃতি সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।** দম্পতির **দৈহিক** ও **মানসিক কল্যাণ** ও **তৃপ্তি এবং ভাবী বংশধরের** মঙ্গলই হইবে বিবাহের পাত্র পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি। তাহারা হইবে **জীববিজ্ঞানের মাপকাঠিতে নিখুঁত** (Biologically sound);—অন্যান্য গৌণ বিষয়ের বিবেচনা আসিবে পরে।

(২) জনক জননীর সংক্রামক বা বংশানুক্রমিক দৈহিক বা মানসিক ব্যাধি থাকিলে **সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া** তবে সন্তান-জন্মদানে ব্রতী হইতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সন্তানের আঙ্গিক এবং মানসিক বৈকল্যের জন্য মাতাপিতাকেই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী করা যায়; উহার

কারণও সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে। অবশ্য প্রকৃতির খেয়ালেও কখনও কখনও এরূপ ঘটে।

বংশানুক্রমিকভাবে নানা ব্যাধি, সন্তানে বর্তে। পিতামাতার ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, এবং বৃক্কদ্বয়ের ব্যাধি, বহুমূত্র কিংবা যৌন-অঙ্গের ব্যাধি ইত্যাদি কারণে সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ নাও করিতে পারে। উপদংশ অতি মারাত্মক ব্যাধি। গর্ভাবস্থায় এই ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করিলে গর্ভধারণের ২।৩ মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয়। ২।৪টি গর্ভস্রাবের পর, ৭।৮ মাসের মধ্যে মৃত সন্তান হয়। ২।১ বার এরূপ হওয়ার পর, ৯।১০ মাসে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে, ২।১ বার এরূপ হওয়ার পর, ক্ষীণজীবী এবং অল্পায়ু সন্তান জন্মে, এবং বংশপরম্পরায় বিষ সঞ্চারিত হইয়া বংশ লোপ পাইতে পারে।

আবার মাতার যদি **যক্ষ্মারোগ** হয় তবে গর্ভাবস্থায় এই রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায় এবং সন্তান যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া না জন্মাইলেও তদ্বারা আক্রান্ত হইবার প্রবণতা অধিক থাকে, এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত মাতা পিতার সংস্রবে শৈশবেই উহার বীজ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। আবার মাতাপিতার মানসিক ব্যাধিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্তানে বর্তে। অসাধ্য হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, উন্মাদ, প্রভৃতি বংশানুক্রমিক রোগগ্রস্তদের আইন বলে বন্ধ্য করাই উচিত। কারণ ইহাদের সন্তান-সন্ততি সুস্থ-মস্তিষ্ক এবং নীরোগ হয় না। অবশ্য একথা সত্য যে প্রসিদ্ধ জার্মান সঙ্গীত রচয়িতা বিটোফেন্‌ (Beethoven) এক মদ্যপায়ী বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া সকল মদ্যপায়ীর ঔরসেই যে প্রতিভাবান সন্তান জন্মিবে এরূপ আশা করা যায় না।

(৩) উপরোক্ত সর্তসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য সকল দেশেই **উপযুক্ত চিকিৎসক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং জন্মবিজ্ঞানবিদ্‌** লইয়া গঠিত **"বিবাহ ব্যুরো"** থাকা ভাল। (আমি ঘটক সমিতির কথা বলিতেছি না)। এই সকল ব্যুরো পাত্র ও পাত্রীকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত অভিমত দিবেন। ইঁহারা "স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট" দিবার অধিকারী থাকিবেন। আবার রোগগ্রস্ত পাত্র বা পাত্রীকে রোগমুক্ত হইবার পথও প্রদর্শন করিবেন।

তবে তাহাদের অভিমত খুব গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। কাহারও ভবিষ্যৎ অকল্যাণ হইয়া পড়ে এমন কাজ করা অবশ্যই অন্যায়।

আবার ইঁহাদের মতামত হইবে উপদেশাত্মক ; বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ

পাত্র ও পাত্রী জানিয়া শুনিয়া ঐ সকল মতামত উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিলে দায়িত্ব তাহাদের নিজেদেরই থাকিবে।

(৪) মাতাপিতার দৈহিক ও মানসিক পরিণতি সুসন্তানলাভের সহায়ক।

আমরা নারী পুরুষের সন্তানোৎপাদনের সব চেয়ে উপযুক্ত বয়সের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি, কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়সেই (এ দেশে ১৮ হইতে ২৮ ধরা যায়) নারী-পুরুষের সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটে। অনেকের মতে সর্বাপেক্ষা শুভ সময় পুরুষের পক্ষে ২৮ হইতে ৩০ এবং নারীর পক্ষে ২০ হইতে ২২।

ইহার অর্থ এই নয় যে, অন্য বয়সের সন্তান সুযোগ্য হয় না। কতক ক্ষেত্রে অধিক ও অল্পবয়স্ক মাতাপিতার ঔরসেও সুযোগ্য সন্তান জন্মাইতে দেখা যায়। আমরা এখানে শুধু অধিকাংশ ক্ষেত্রে **সম্ভাবনার** কথাই বলিতেছি। অল্প বয়সে (২১ এর কম; এদেশে ১৮র নীচে) নারীর দেহ ও মন অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং গর্ভধারণ করিবার মত উপযুক্ততা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। ইহাতে সন্তানোৎপাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সন্তানের দেহের অনিষ্টও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, অধিক বয়স্কা (৩৫ এর উপরে) নারীর স্বাভাবিক গর্ভধারণ-প্রক্রিয়ার অভাবে প্রসবযন্ত্রসমূহ ঠিক উপযুক্ত নাও থাকিতে পারে। ইহাতে প্রসবে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি, এমন কি মৃত্যু, এবং সন্তানের অঙ্গহানি হইতে পারে।

পিতা অপেক্ষা মাতার বয়স কয়েক বৎসর কম হওয়া ভাল। কারণ, নারীর যৌনজীবন শীঘ্র শীঘ্র পরিণতি লাভ করে।

(৫) **নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ** হওয়া উচিত কিনা তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ রহিয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের সহিত যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনে সকল জাতিই আজকাল ঘৃণাবোধ করিয়া থাকে। কিন্তু বরাবর এই মনোভাব ছিল না। মিশর, গ্রীক ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে পিতাপুত্রী ও মাতা-পুত্রে বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। ওয়েভাল্ বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাচীন ধর্ম-শাস্ত্রেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে, মিশরীয় দেবতা আমন তাঁহার মাতাকে, স্কেন্দানাভিয়ার দেবতা ওভিন্ স্বীয় কন্যা ফ্রিগাকে, রোমীয় দেবতা জুপিটার তাঁহার সহোদরা জুনোকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীর কথা ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পারস্য, মিশর, সিরিয়া, এথেন্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে মাতা-পুত্রে, পিতা-কন্যায়, ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে মিশর ও পারস্য হইতে ঐ প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে বটে তবু এখনও নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে খুব বিবাহ হইয়া থাকে। স্পেন ও রুশিয়া ব্যতীত ইওরোপে অন্যান্য সমস্ত দেশেই সহোদরা ভাই-ভগিনী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার অর্ধসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে এত কড়াকড়ি নিয়ম বিদ্যমান যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে বাধ্য। সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের হিন্দুগণ, বিশেষত বাঙলার হিন্দুগণ, এক গোত্রে পর্যন্ত বিবাহ করেন না। যদিও ঐ প্রথার উৎপত্তির সময় গোত্রগুলি যেরূপ অল্প ভূভাগে বিস্তীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছিল এখন আর সেরূপ নাই, সুতরাং উক্ত নিষেধের আর কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। এই প্রথার নাম বহির্বিবাহ বা এক্সোগ্যামি (Exogamy)।

এক গোত্রে কিংবা নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ না করিবার দুইটি যুক্তি দেওয়া হয়ঃ প্রথমত, ইহাতে সম্বন্ধ এলোমেলো হইয়া যায়; দ্বিতীয়ত ইহার ফলে পরবর্তী বংশগুলি ক্রমশ অবনত হয়।

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে বহু অর্ধসভ্য সম্প্রদায় আছে, যাহারা নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ে বিবাহ করে না। ইহার নাম আন্তর্বিবাহ বা এণ্ডোগ্যামি (Endogamy) সিংহলের ভেড্ডা (Vedda) সম্প্রদায়ের মধ্যে সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ খুব পুণ্যের কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদিমকালে মানুষ যাহাই করুক না কেন, এখন মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, সর্ববিষয়ে মধ্যপন্থাই বিজ্ঞানসম্মত ও শ্রেয়। একেবারে ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্কের যৌনমিলনও যেরূপ শুভ নহে, তেমনই একেবারে ভিন্ন গোত্রে চলিয়া যাওয়াও বিজ্ঞানসম্মত নহে। ডাঃ ফোরেল্ বলিয়াছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর মধ্যে যৌন-মিলন করাইয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে সন্তানোৎপাদন হয় না। আবার কয়েক পুরুষ যাবৎ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের যৌন-সম্মিলন দ্বারা যে সমস্ত সন্তান হয়, তাহারা দুর্বল-মস্তিষ্ক ও উৎপাদিকা-শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, এমন বহু জাতি একেবারে

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ ফোরেলের মতে এই শ্রেণীর মিলনে শতকরা ২৫টি সন্তান মাতৃগর্ভেই মারা যায়।

কিন্তু সাক্ষাৎ খুড়তুত, মামাত এবং পিসতুত ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা যে মানবের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, ডাঃ ওয়েষ্টার মার্ক বা ফোরেল্ তাহা স্বীকার করেন না। ইওরোপের অধিকাংশ দেশে এবং সমস্ত মুসলিম-জগতেও ইহার বহুল প্রচলন আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা যে ইহাদের জন্মসংখ্যা-গত কি মস্তিষ্ক-গত কোনও অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবাহে মানুষের একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সে বিতৃষ্ণা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার জন্য নহে, পরন্তু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার জন্য। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে মানুষের বাসনা উদ্দীপ্ত হয় না। কতকটা অপরিচয় এবং প্রকৃতি ও আকৃতির বিভিন্নতাই আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকে,ইহা ডাঃ বার্ণাডিনের অভিমত।

সুতরাং মানুষ যে সাধারণত অতি পরিচিত আত্মীয় গোষ্ঠির বাহিরে বিবাহ করিতে চায়, তাহা আত্মীয়-গমনে বিতৃষ্ণার জন্য নহে, পরন্তু অভিনবত্বের লালসার জন্য।

মোটের উপর, **পাত্র ও পাত্রী নিখুঁত এবং সুস্থ হইলে ইহা মোটেই দোষের নয়।** অন্যথায় ইহা বর্জনীয়।

বহুকাল পর্যন্ত ডারউইন্, ওয়েজ্‌উড্ এবং গ্যাল্টন্ পরিবারে খুড়তুত-পিসতুত ভ্রাতা ভগ্নির মধ্যে বিবাহ চলিয়াছে। ডারউইন্ তাঁহার এইরূপ একটি ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সকল বংশে বহু ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ যে অবশ্যই সুফল বা কুফলপ্রসূ হইবে তাহা নয়। আসল কথা এই যে, যদি কোনও শারীরিক বা মানসিক দোষ গুণ পিতা মাতা উভয়েরই মধ্যে থাকে তাহা হইলে সন্তানদের মধ্যে সেই দোষ বা গুণ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে একই দোষ বা গুণ থাকার সম্ভাবনা বেশী। যদি বিবাহিত ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে কোনও একটি বা একাধিক সাধারণ দোষ থাকে তাহা হইলে তাহাদের **সন্তানেরা অধিক মাত্রায় সেই দোষযুক্ত** হইবে। সুতরাং সে বিবাহের ফল মন্দ হইবে। পক্ষান্তরে, যদি কোনও

একটি বা একাধিক গুণ তাহাদের দুজনেরই মধ্যে থাকে, তবে তাহাদের সন্তানগণ সেই গুণ আরও বেশী পরিমাণে পাইবে। তবে কয়েক পুরুষ যাবৎ নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হইলে বংশের অবনতি হয়। তাই **মাঝে মাঝে অন্য বংশে বিবাহ হইলে বংশের ও জাতির উন্নতি হয়।**

(৬) **সন্তানকে কামনা করিতে হইবে; অবাঞ্ছিতভাবে সে আসিবে না।**

ইহাতে গর্ভিণীর মন ভাবী-সন্তানের প্রতি প্রসন্ন থাকিবে, গর্ভধারণের সকল কষ্ট সে অকাতরে সহ্য করিয়া যাইবে। মনের প্রফুল্লতা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকটিত হইবে এবং পরোক্ষভাবে ভাবী-সন্তানের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিবে।

আমি পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। জন্মনিয়ন্ত্রণের জ্ঞান থাকিলে দম্পতি অনায়াসে **উপযুক্ত সময়ে** সন্তান লাভে ব্রতী হইতে পারিবে এবং **স্বাভাবিক** ও **সুন্দর পরিবেষ্টন** ও **আনন্দময় মানসিক পরিস্থিতির** ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৭) স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পিতৃ ও মাতৃকুলের গুণাগুণ সন্তানে বর্তিলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। আমরা একটু পূর্বেই এ সম্বন্ধে কুসংস্কারের ছড়াছড়ির উল্লেখ করিয়াছি। গর্ভিণীর সাময়িক মনোভাব সন্তানের উপর ততটা প্রভাব বিস্তার না করিতে পারিলেও তাহার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যাধি, জরায়ুর অবস্থিতি, ভ্রূণের রক্ত চলাচলের সুবিধার ব্যতিক্রম, মাতার শরীর হইতে নানাবিধ বিষ ইত্যাদি সন্তানের শরীরের উপর অনেকটা ক্রিয়া করিয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক মাতার চিকিৎসা করিয়াই ভ্রূণের চিকিৎসা পর্যন্ত করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন। (এই বিষয়ে একটু পূর্বে 'গর্ভস্থ সন্তানের উপর গর্ভিণীর প্রভাব' অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে।)

(৮) আজকাল দারিদ্র্যের চাপে অনেক মাতাকেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। নারীর, বিশেষত গর্ভিণীর অত্যধিক শ্রান্তি সুসন্তান লাভের পরিপন্থী।

অধিকক্ষণ পরিশ্রম করা, রাত্রি জাগরণ, অস্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র, ধূম্র ও ধূলি দ্বারা দুষ্ট আবহাওয়া, বিষাক্ত দ্রব্যাদি লইয়া নাড়াচাড়া, ক্লান্তিকর ভাবে বেশীক্ষণ কার্যরত অবস্থায় দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকা, আমোদজনক

ব্যায়ামের অভাব,—প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে ভ্রূণের অকল্যাণ এবং পরোক্ষভাবে মাতার রক্তহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, যক্ষ্মা, দুর্বলতা ইত্যাদির কারণ হইয়া সন্তানের অনিষ্ট সাধন করে।

অবশ্য কারখানা প্রভৃতির নারী চাকুরিয়ারা গর্ভিণী অবস্থায় কিছুদিনের ছুটি (Maternity leave) পায়, কিন্তু আরও দীর্ঘকালের অবসরের (Procreation leave) দরকার।

(৯) পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণজনিত নারীদেহের দুর্বলতাও সুসন্তান লাভের পরিপন্থী।

দুই সন্তানের মধ্যে অন্তত দুই বৎসরের ব্যবধান থাকা উচিত। এই জন্যও গর্ভ নিবারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' অধ্যায় দেখুন। সারা জীবনে অবসরান্তরে চারিটি সন্তান লাভই উৎকৃষ্ট।

(১০) প্রগতিশীল রাষ্ট্রে আইন হওয়া উচিত, প্রত্যেক বিবাহ একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ (রেজেষ্ট্রি) হইবে। তিনি দেখিয়া লইবেন যে, উপযুক্ত ডাক্তার পাত্র ও পাত্রী শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ও যন্ত্রের এবং রক্ত, মূত্র, রতিজ রোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল ছাপা ফর্মে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং পাত্র ও পাত্রী, (নাবালক হইলে তাহাদের অভিভাবকেরা) উহা দেখিয়া অথবা শুনিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরূপ, তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, অথবা টিপসহি দিয়াছেন। ইহা দেখিলে তবেই তিনি বিবাহে অনুমতি দিবেন। গুরুতর সংক্রামক, অথবা বংশক্রমিক রোগ আছে দেখিলে, উভয় পক্ষ, (মূঢ়তা বশত অথবা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য) সম্মত থাকিলেও, অনুমতি দিবেন না। পাত্র পাত্রী আবেদন করিলে, হয় সরকার নিজেই তাহাদের ঐভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, নতুবা, পাত্রীপক্ষ তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন ডাক্তার দ্বারা পাত্রের, এবং পাত্রপক্ষ তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন মেয়ে ডাক্তার দ্বারা পাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

শিক্ষার গুরুত্ব

'ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি' অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, সন্তান পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জন্মিয়া থাকে ;—উহাদের হস্ত, পদ, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় এবং কর্মক্ষম অবস্থাতেই জরায়ু হইতে বহির্গত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং মলমূত্র ত্যাগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মমুহূর্তেই আত্মপ্রকাশ করে : মস্তিষ্ক

এবং স্নায়ুমণ্ডলী এরূপ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঐকতানবিশিষ্ট যে জন্মমুহূর্ত হইতেই উহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাহা শিশুর জ্ঞান ও নানা বৃত্তির বিকাশে সাহায্য করে।

সুপ্রজনন মতবাদীগণ মানবকুলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সদ্‌গুণাবলীবিশিষ্ট, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সুস্থ, সুঠাম সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে মানবসমাজের চেহারা বদলাইয়া যাইবে,—তখন আর দুর্ভাগা অন্ধ, আতুর, বোবা, উন্মাদ, মূর্খ, বিকলাঙ্গ মানুষ সমাজের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে না। এইরূপ আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই সুজাত-শাস্ত্রের প্রবক্তারা কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও জন্ম ব্যাপারে মানুষের হাত অতি সামান্য।

একই মাতাপিতার যমজ সন্তান (অসম) * একই যৌনমিলনের ফলস্বরূপ বিভিন্ন লিঙ্গ, অবয়ব, স্বাস্থ্য, শক্তি এবং মনোবৃত্তি লইয়া জন্মিয়া থাকে। সুতরাং **একই** মাতাপিতার **একই** সহবাসের ফলে **একই** জরায়ুতে ক্রমবর্ধিত দুই বা ততোধিক অসম-যমজ সন্তান যদি এত বিভিন্ন হইতে পারে তবে কেবল মাতাপিতার ইচ্ছাতেই একইরূপ প্রতিভাবান বা সুশ্রী সন্তান হইতে থাকিবে এমত মনে করার কারণ, কি থাকিতে পারে? বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যই বুঝি প্রাকৃতিক বিধান।

তবে বিভিন্ন রুচি এবং শক্তিবিশিষ্ট সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পিতৃক্রম এবং মানুষের সহজাত গুণাবলী ও প্রকৃতির উপর আরও আলোকপাত হইতে পারে। কিন্তু আমরা উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকটি শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং তাহার সহজাত শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশের সাহায্য অবশ্যই করিতে পারি। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সহজাত শক্তি বা প্রবৃত্তির আমূল পরিবর্তন সাধন নয়, এবং সাধ্যও নয়, পরন্তু উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া প্রত্যেকটি শিশুকে তাহার রুচি অনুযায়ী উপযুক্ত পথে চালিত করার নামই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার ফলে সকলেই সমান পণ্ডিত হইবে না; তবে কৃষ্টির আলো সকলেই পাইবে।

* বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'যমজ সন্তান' বিষয়ক অধ্যায়ে করিয়াছি।

উপসংহার

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, জন্মবিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতে যথোপযুক্তরূপে আমার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। স্বীকার করিতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করা উচিত নহে যে, অনেক বিষয়েই আলোচনা করা হয় নাই। কিন্তু একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিব যে, আমার বক্তব্যে কোনও আন্তরিকতার অভাব নাই, এবং আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা **মানবজাতির কল্যাণ কামনাতেই** বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কৃষ্টির আন্তর্জাতিক সাধনা

এই আলোচনায় বিশ্বের মানুষকে আমি কেবলমাত্র মানুষরূপেই দেখিয়াছি। কি তাহার ধর্ম, কি তাহার মতবাদ, কি তাহার জাতি, কোথায় তাহার অধিবাস, কেমন তাহার বর্ণ—সে বিচার আমি করি নাই। প্রকৃতিদত্ত মানবতা ছাড়া তাহার জাগতিক কোনও দোষ-গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত হইতে দিই নাই।

মানব মন ও মানবের প্রজ্ঞা আজ মুক্ত হইতে চলিয়াছে; মানুষ আজ ধীরে ধীরে অতীত ভ্রান্ত মতবাদের দাসত্ব-বন্ধন হইতে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বিচার বুদ্ধির সাহায্যে শ্রদ্ধাসহকারে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেছে। সে নিজের চলচ্ছক্তিতে আস্থালাভ করিয়া প্রাচীন মতবাদের সাবধানী স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার আলিঙ্গন-পাশ হইতে ধীরে ধীরে নিজেকে বিযুক্ত করিতেছে।

দেশবাসীর নিকট বিশেষ করিয়া আমার বক্তব্য এই যে, দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সত্যদর্শন না করিলে এবং কৃষ্টি-সাধনাকে আন্তর্জাতিক সাধনারূপে গ্রহণ না করিলে মানবের সাধনা কদাচ সাফল্য লাভ করিবে না। তাই আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক অথবা সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনা যেন আমাদের কৃষ্টি-সাধনাকে সংকীর্ণ, সুতরাং ব্যাহত, করিতে না পারে।

বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপযোগী মনোভাব

সর্বশ্রেণীর সকল শাখার জ্ঞানসাধনায় যে কথা সত্য, যৌনবিজ্ঞান ও জন্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথাই অবিকল সত্য। **চরম সত্য বলিয়া এখানেও কোনও কথা নাই।** অন্যান্য জ্ঞানসাধনার ন্যায় এখানেও ধর্মই এ যাবৎ কাল শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছে। কুসংস্কার, পরিবর্তন-বিরোধিতা, শারীরতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্মচর্য, ধর্ম, সুনীতি, সুচারু প্রভৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত, বিকৃত ধারণা ও গোঁড়ামী এই সকল আলোচনায় আমাদের দৃষ্টিকে যতটা বিভ্রান্ত করিয়াছে, অন্যান্য বিজ্ঞান-শাখায় ততটা পারে নাই।

জন্মরহস্যের জটিলতা

জন্মরহস্য মানুষের জীবন-রহস্যের ন্যায় জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, বিশেষত শারীর-তত্ত্ব, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব, রসায়ন-শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের সহিত জন্মবিজ্ঞানের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুস্তক রচনায় আমাকে এই সমস্ত বিজ্ঞান-শাখার বহু পুস্তক আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। আমার অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানই পাঠক সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলাম। আমার সিদ্ধান্তসমূহ নির্ভুল হইয়াছে কি না সে বিচারও পাঠকগণ করিবেন এবং আমাকে তাহা জানাইবেন ইহাই আমার অনুরোধ।

বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা যৌন-ব্যাপারে সত্যই আমরা অনেক লাভবান হইয়াছি। এতদিন যাহা কেবল দৈব ও ভবিষ্যতের নির্ধার্য বিষয় ছিল, তাহা বহুলাংশে মানবের শাসন ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে।

আমার **যৌনবিজ্ঞান** পুস্তকের উপসংহারে আমি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমি এই পুস্তকেরও উপসংহার করিতেছি।

বিবাহে সংস্কার

বর্তমান যুগে দাম্পত্য-সুখের জন্য কেবলমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর না করিয়া দম্পতির জীবনকে সুখময় করিবার অনেক চেষ্টা-চরিত্র হইতেছে; নারীর অধিকার পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে স্বীকৃত হইতেছে। নারী পুরুষের অধিকারের সমতা অন্তত নীতি হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। নারীগণ ক্রমশ অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষিতা ও অর্থোপার্জনে সক্ষম হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্য আরও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। **পুরুষ প্রাধান্তের** প্রাচীন মতবাদ ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইতেছে। **এক বিবাহই** যে শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম বিবাহ প্রণালী, এই মতবাদও ক্রমে সর্বত্র গৃহীত হইতেছে। **বিধবাদের বিবাহ করিবার অধিকার** সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধ ও অধিকারকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল-মুক্ত করা হইতেছে। বস্তুত জীবন সাথী **নির্বাচনে মানুষকে আরও অধিক স্বাধীনতা** দান করিতে হইবে—এক্ষেত্রে দেশ, বর্ণ, জাতীয়তা, এমন কি ধর্মমত প্রভৃতি **সংকীর্ণতা পরিত্যাগ** করিতে হইবে। বিবাহিত জীবনে নিজেরা সুপরিতৃপ্ত হইতে এবং পরস্পরকে ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্যে দম্পতিকে যৌনবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও শিক্ষিত হইতে হইবে। **শৈশব ও বাল্য-বিবাহ** বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দম্পতিকে সকল প্রকারে **পরস্পরের উপযোগিতা** অর্জন করিতে হইবে। দম্পতির **দৈহিক ও মানসিক কল্যাণ ও তৃপ্তিই যৌনমিলনের** একমাত্র মাপকাঠি হইবে। বিবাহিত জীবনকে সকল প্রকারে **সুখী, তৃপ্ত, কল্যাণপ্রদ** করিয়াই বেশ্যা-প্রথা, যৌন-বিকল্প, যৌন-ব্যাধি, সুরাপান প্রভৃতি সামাজিক অমঙ্গল সমূহকে দূরীভূত করিতে হইবে। অর্থ-সম্পদের বৈষম্যই সভ্যতার সৃষ্টি হইতে যৌন-জীবনে অনাচারের প্রবর্তন করিয়া মানবতা বিকাশের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। বহু-পত্নীত্ব, উপপত্নীত্ব, বেশ্যা-প্রথা প্রভৃতি সকল প্রকার নারী-নির্যাতন এবং নিম্নশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ ধন সম্পদের বৈষম্য। যথাসাধ্য **ধনসাম্যবিধানের** দ্বারা মানবতাকে নিশ্চিত অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রজননে নিরাপত্তা

প্রজনন-বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গর্ভধারণ ও জন্মদানকে নারীর অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে গণ্য করা হইত। সুতরাং ঐ কার্যে তাহাকে যে সমস্ত কষ্টভোগ করিতে হইত, তাহা একরূপ প্রকৃতির অনিবার্য বিধান বলিয়াই গণ্য হইত। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে প্রসব বেদনাকে আদি নারী ঈভের (Eve এর বা হাওয়ার) আদি মানব আদমকে, ঈশ্বর কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে প্ররোচিত করিবার পাপের ফল (ভগবানের অভিশাপ অনুযায়ী) বলিয়া মনে করা হয়। ফলে প্রসবকার্যে নারীর দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমাদের দেশে আজিও গর্ভিণী ও প্রসূতি মৃত্যুর হার

দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিজ্ঞান গর্ভিণী ও প্রসূতির অনেক কল্যাণ করিতেছে; বহু দেশ তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা ও রোগ অনেকটা লাঘব করিবার চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে। আশা করা যায়, অচিরকাল মধ্যেই প্রসবকার্য নিরাপদ স্বাভাবিক কার্যে পরিণত হইতে পারিবে। আমি যথাস্থানে ইহার উপায় আলোচনা করিয়াছি। এই স্থানে আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আমাদের গর্ভিণী ও প্রসূতিগণকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং সরকারের দায়িত্ব বিরাট ও কর্তব্য মহান। আমি আশা করি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিরাট দায়িত্ব ও মহান কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

গর্ভধারণে নারীর অধিকার

গর্ভ-প্রকরণ, গর্ভধারণ ও **প্রসব-কার্যের** সমস্ত **আবশ্যকীয় তথ্য** নারীকে **শিক্ষা দিতে** হইবে। সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার পূর্বে নারীকে শিখিতে হইবে, কেন, কি ভাবে গর্ভোৎপাদন হয় এবং কি ভাবে নিজের ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের নিরাপত্তা সহকারে প্রসবকার্য সমাধা হইতে পারে। (উপরোক্ত প্যারায় উল্লিখিত তিনটি অধ্যায় দেখুন)। শুধু তাহাই নহে, বিবাহ ব্যাপারে যেমন নারীর স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, বিবাহের পরও সন্তান গর্ভে ধারণ সম্বন্ধেও তাহার সেইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। গর্ভধারণ করিবে কিনা, করিলে কখন করিবে কতগুলি সন্তানের জন্ম দিবে প্রভৃতি সকল ব্যাপারে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই একমাত্র নিয়ন্তা হইবে। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হইবে কিনা, বর্তমান যুগে এই কথা উঠে না; কি উপায়ে সুন্দররূপে ও সাফল্যের সহিত জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে, সমস্যা তাহাই। গর্ভধারণ ব্যাপারে নারীকে স্বাধীনতা দান করিলে নারীরা আর গর্ভধারণ করিতে চাহিবে না, সুতরাং প্রজনন-কার্য বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ, তাঁহারা নারীর তীব্র সন্তান কামনা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া, পৃথিবীতে যে লোক-সংখ্যাধিক্য ঘটিতেছে, বিশেষত পাক-ভারতে লোকসংখ্যাধিক্যের ফলে যে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়া যাইতেছে, এই মতবাদও ত উপেক্ষণীয় নহে। রোগের পাত্র হইবার, মহামারীর কবলে পড়িবার

অথবা রণদেবতার বলি স্বরূপ মানুষের জন্মদান করিয়া লাভ নাই, শুধু লাভ নাই নহে—পাপ !

জন্মনিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ

ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভের চেষ্টা এ পর্যন্ত সম্যক্ সফল না হইলেও এবিষয়ে বিজ্ঞান-সাধনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছে। আমরা আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে আমরা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত পুত্র ও কন্যার জন্মদান করিতে পারিব। কিন্তু পুত্র ও কন্যা-সন্তানের প্রতি আমাদের ব্যবহার ও মনোভাবের সাম্য সাধিত হওয়া প্রয়োজন। পুত্র ও কন্যার প্রতি আমাদের দেশবাসীর মনোভাবের বৈষম্য, সামাজিক অবস্থা ঐতিহ্য ও প্রথা সঞ্জাত কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অত্যাচারমূলক। এস্থলে পণ-প্রথা আবার পুত্র-কন্যার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করিয়া এই পক্ষপাতমূলক ব্যবহারকে সমর্থন করিতেছে। এই বিষময় কুপ্রথার ফলে বহু "স্নেহলতা" আত্মহত্যা করিয়া ভারতীয় নারীর দুরবস্থার কথা চীৎকার করিয়া জগদ্বাসীকে জ্ঞাপন করিতেছে। এই শোচনীয় কুপ্রথা দূরীকরণের জন্য ভারতবর্ষে সহস্র মহাত্মা গান্ধীর প্রয়োজন।

ইউজেনিক্স মতবাদের ভবিষ্যৎ

ইউজেনিক্সমতবাদ দ্বারা ভাবী মানব জাতিকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ব্যাধিমুক্ত করিবার সম্ভাব্যতায় আমি বিশ্বাসবান। আমি এই বিষয়ক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা মানুষের জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অধিকতর সাফল্যের সহিত জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। **বিকৃত-দেহ, বিকৃত-মস্তিষ্ক ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের দ্বারা সন্তান জন্মাইয়া এই দুঃখ ও সংগ্রামপূর্ণ বিশ্ব-জগতে রোগী ও দুঃখীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই**। আমি আশাকরি, শিক্ষাবিস্তারে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে এই দায়িত্ব ও কর্তব্য-জ্ঞানের উন্মেষ হইবে। এই ব্যাপারে আভিজাত্য, বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেণী-প্রাধান্য যাহাতে মানবতাকে কলুষিত করিতে না পারে, সেদিকে ভাবী মানব সম্পূর্ণ সচেতন হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অনাগত শিশুর প্রতি আমাদেয় কর্তব্য-বোধ আরও তীব্র হওয়া প্রয়োজন। অনভিপ্রেত সন্তান-সন্ততি অনিচ্ছুক মাতাপিতার দারিদ্র বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, এই অবস্থাকে কিছুতেই স্থায়ী হইতে দেওয়া উচিত নহে। **মাতাপিতার আর্থিক সামর্থ্য**

ও ইচ্ছার উপরই সন্তান-জন্ম নির্ভর করিবে; বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা এই ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তন করিতে হইবে।

রতিজ রোগের প্রতিকার

রতিজ রোগসমূহ আমাদের জনশক্তিকে অনুদিন দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের সহানুভূতিহীন নির্দয় কঠোর শাসনের ভয়ে দৈবাৎ এতাদৃশ রোগগ্রস্তগণ প্রাণ খুলিয়া নিজের হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাই সমাজ পরিচালকদের অজ্ঞাতে সে সংগোপনে ব্যাধি বিস্তার করিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অপরাধ ও ব্যাধি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। লোক-লজ্জা ও শাসনের ভয়ে ব্যাধিগ্রস্তরা নিজেদের রোগের সুচিকিৎসা করাইতেছে না; পাপ-ব্যবসায়ী হাতুড়িয়াদের হস্তেই নিজেদের জীবনমরণ সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। অথচ এই সমস্ত যৌন-ব্যাধির বিস্তৃতি, সংক্রামকতা ও ভয়াবহতা কলেরা বা বসন্তের অপেক্ষা কম মারাত্মক নহে। সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ অনুসন্ধান দ্বারা এইরূপ রোগীদের বিশ্বাস অর্জন এবং এই রোগগুলির প্রতিষেধ ও চিকিৎসার সম্যক ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাধির যথাযথ প্রতিষেধ ও প্রতিকারোপায় অবলম্বিত হইবে না।

শেষ কথা

আমার দেশবাসী তরুণ বন্ধুদের কাছে একটি কথা বলিয়া আমি শেষ করিব। তরুণেরাই জাতির ভাবী সম্পদ। সুতরাং জাতি রক্ষার উপযোগী অভিনব সত্য তাহাদিগকে আবিষ্কার ও প্রচারকার্যে তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমাজ বড়ই বেয়াড়া ও স্থিতিস্থাপক। তরুণেরা যে নূতন সত্য গ্রহণ করে না, তাহা নহে; সমাজই নূতন সত্যপ্রচারককে কঠোর হস্তে দণ্ডদান করিয়া থাকে। **পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ ও নূতনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষই সমাজ-জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব**। আমার দেশবাসী তরুণেরা আমার পুস্তকে প্রচারিত সত্যসমূহকে যদি জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধ করে, তবে চিন্তাশক্তিবিহীন, সঙ্কীর্ণচেতা, রক্ষণশীলদের নিন্দা, বিদ্রূপ, বিরুদ্ধতা, অবিচার ও অত্যাচারের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিয়া সে সমস্ত উপেক্ষা করিবে এবং ধৈর্য ধরিয়া তাঁহাদের মতের পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হইবে, এই বিশ্বাস ও আশা লইয়া আমি আমার গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

প্রমাণ-পঞ্জী

এই পুস্তক প্রণয়নে যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িক পত্রিকা, সংবাদ পত্র ইত্যাদি হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া দুরূহ আমি নিম্নে কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তকের উল্লেখ করিলাম মাত্র।

The Miracle of life—Home Library Club.
A Biology Course for Schools—R. H. Dyball.
Biology for Everyman—J. A. Thomson.
Outline of Zoology—J. A. Thomson.
The Science of Life—H. G. Wells & others.
An Outline of Modern Knowledge—Various Writers.
The Science of Human Reproduction—Parshley.
The Physiology of Reproduction—Marshall.
Being Well-born—Helen. M. Guyer.
Fit or Unfit for Marriage—Van de Velde.
Radiant Motherhood—Marrie Stopes.
The Science of Regeneration—A. Gould & Dr. F.L. Dubois.
Sex in Married Life—G. R. Scott.
Being Born—F. B. Strain.
Ideal Marriage—Van de Velde.
Power to love—Hirsch.
Ideal Birth—Van de Velde.
A Marriage Manual—Dr. Stone & Dr. (Mrs) Stone.
Modern Views on Sex—Mary Denham.
Marriage and Motherhood—Davidson.
Sex and the Love Life—Fielding.
Fertility and Sterility in Marriage—Van de Velde.
The Sexual Life of Woman—Kisch.
The Sexual Life—Malchow.
The Sexual Question—Forel.
Sex Lore—Herbert.
Sex in Human Relationships—Hirschfeld.
Sex in Everyday Life—Griffith.
The Psychology of Sex—Ellis.

Sexual Life of Our Time—Block.
Factors in the Sex Life of Twenty two Hundred Women —K. Davis.
A Text-book of Midwifery—R. W. Johnstone.
A Text-book of Gynaecology—James Young.
Mothercraft Manual—Liddiard.
The expectant Mother and the child—Kamath.
The Management and Medical Treatment of Children in India —Armytage & Hodge.
Biological and Medical Aspects of Contraception—Sanger.
Planned Parenthood—Denham.
Parenthood—Fielding.
Contraception—Marie Stopes.
Control of Conception—Dickinson & Brayant.
Birth Control Methods—Norman Haire.
Practical Birth Control—F. A. Hornibrook.
Controlled Parenthood—Abul Hasanat.
Fundamentals of Child Study—Krikpatric.
Understanding Human Nature—Adler.
Social Psychology—Allport.
Parenthood and Child Nature—Baker.
Eugenics—Carr Saunders.
How Children Learn—Houghton.
The Pshychology of Child Development—Houghton.
Early Childhood Education Picker.
The Biological Basis of Human Nature—Jennings.
Encyclopaedia of Sexual Knowledge Vol. I. Dr. S. A. Costler, A. Willy etc. Edited by R. Haire.
Do Vol. II. Dr. A. Willy, L. Vander, O. Fischer etc.
Encyclopaedia of Sex—G. R. Scott.
The English Nursery School—Abdul Huq.
Crime and Criminal Justice—Abul Hasanat.
Boy or Girl ? How parents decide the Sex of their child —D. H. Sandell, M.D., F.R.C.S. 1937.
Modern Women's Home Doctor.
Children's Questions in the First Five Years—L. Chalone.
Woman's Periodicity—Mary Chadwick S. R. N.

How are the Children ?—Mary R. Hargreaves.
Getting Ready to be a Mother—Carolyn C. Van Blarcom, R.N.
All about the Baby—Belle Wood Comstock.
Sex Problems in Woman—Dr. Magian.
Riddle of Woman—Tenenbaun.
Thousand Marriages—R. L. Dickinson, M. D.
The Single Woman—R. L. Dickinson, M. D.
The Adolescent Girl—Phylis Blanchard.
Woman—Vol. I, II & III—Ploss & Bartels.
Childbirth without Fear—Read.
Control of Pain in Child Birth—Lull & Hingson.
Sterile Marriages—J. Dulberg, M. D., J. P.
Jealousy in Children—Edmund Ziman, M. D.
How shall I tell my Child ?—Belle S. Mooney, M. D.
Baby and Child Care—Dr. Spock.
Sexual Behaviour in the Human Female
—Kinsey, Pomeray, Martin.
Advice to a Mother—Chavasse.
সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস।
প্রসূতি-পরিচর্য্যা—ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়।
জন্মশাসন—নৃপেন্দ্রকুমার বসু।
জন্মনিয়ন্ত্রণ—অবুল হাসানাৎ।
খাদ্যবিজ্ঞান—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় D. S. C.
ও হরগোপাল বিশ্বাস, M. S. C.
আহার ও আহার্য—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য।
যৌন-বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ।
গৃহশ্রী—দীনেশচন্দ্র সেন।

"If any one is able to convict me of error or deed I will gladly change. For I seek the truth by which no man was ever injured. The injury lies in remaining constant to self deception and ignorance."

—Marcus Aurelius

প্রশ্নমালা *

(১) এই পুস্তকে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আরও গবেষণা কার্য চালাইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই প্রশ্নমালা তৈয়ারী করা হইল।

(২) যাঁহাদের উত্তর নির্ভুল ও বহুল তথ্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে তৃতীয় সংস্করণের একখানা পুস্তক বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

(৩) আশা করি পাঠক-পাঠিকারা এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়াবলী সম্পর্কীয় নানা তথ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিতরণে আমাকে সাহায্য করিবেন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যে তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সযত্নে সুবিন্যস্ত এবং সুশৃঙ্খল করিতে পারিলেই কোন একটি বিজ্ঞান-শাখা গড়িয়া তুলিতে পারা যায়।

(৪) প্রশ্নমালার উত্তরাবলী নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাব্লিসশার্স ৬, হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা-৯

(৫) অনুগ্রহপূর্বক প্রশ্নমালার **সংখ্যানুযায়ী** উত্তর দিবেন। যে সব বিষয় সম্বন্ধে আপনার **সঠিক ধারণা** আছে এবং যাহা আপনার **স্পষ্ট স্মরণ আছে** তাহাই লিপিবদ্ধ করিবেন। সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

(৬) উত্তরসমূহ খুব গোপনীয় মনে করা হইবে। নাম, ঠিকানা কিংবা উত্তরদানকারীর পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ কোন তথ্য প্রকাশ করা হইবে না।

(১) নাম—(আত্মপরিচয় গোপন করিবার জন্য যে কোন নাম লেখা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত নাম দেওয়াই ভাল। আপত্তি থাকিলে নাম না দিলেও চলিবে।)

(২) ঠিকানা। (ঐ, ঐ)

(৩) ধর্মমত।

* লক্ষ্ণৌএর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দের নিকট আমি অধিকাংশ প্রশ্নের জন্য ঋণী।

(৪) শিক্ষা।

(৫) লিঙ্গ—স্ত্রী না পুরুষ।

(৬) শারীরিক গঠন (অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট, মাঝারি অথবা শীর্ণকায়); উচ্চতা এবং ওজন (যদি জানা থাকে)।

(৭) স্বাস্থ্য (ভাল, মাঝারি কিংবা খারাপ)।

(৮) দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজাত ব্যাধিসমূহ—যদি কিছু থাকে।

(৯) শারীরিক ব্যায়াম অথবা মুক্ত বাতাসে খেলাধূলার অভ্যাস আছে কি না।

(১০) আর্থিক অবস্থা (ভাল, মাঝারি অথবা খারাপ)।

(১১) আপনি মদ কিংবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন করেন কি না।

(১২) যদি করেন, তবে আপনার যৌন এবং পারিবারিক জীবনে এই অভ্যাসের প্রভাব কিরূপ?

(১৩) প্রাদেশিক জাতীয়তা (যথা, মারাঠী, বাঙালী, ইত্যাদি)।

(১৪) জাতি।

(১৫) ব্যবসায়।

(১৬) অবিবাহিত, বিবাহিত অথবা মৃতদার বা বিধবা।

(১৭) সন্তানাদির (যদি হইয়া থাকে) জন্ম তারিখ ও উহারা ছেলে না মেয়ে।

(১৮) এখন কতজন সন্তান জীবিত আছে।

(১৯) প্রত্যেকবার বিবাহের সময় আপনার সম্বন্ধে **নিম্নলিখিত** তথ্যগুলি প্রদান করিবেন—

(ক) বয়স (খ) ব্যবসায় (গ) স্বাস্থ্য (ঘ) মানসিক অবস্থা (ঙ) আর্থিক অবস্থা।

যদি মুরব্বিস্থানীয় কোন বয়স্ক লোক আপনার জন্য পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করিয়া থাকেন, তবে (১) তাঁহারা উহাদের সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং নির্বাচন ব্যাপারে কোন্ বিষয় তাহাদিগকে চালিত করিয়াছিল? (২) আপনার নিজের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছিল কি? (৩) আপনার মতে কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং উহাদের গুরুত্বের হিসাবে কোন্ পর্যায়ক্রমে? (৪) যদি আপনি নিজেই নির্বাচন করিয়া থাকেন তবে কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং কোন্ বিষয় আপনার নির্বাচনে সাহায্য করিয়াছিল?

(২০) আপনার স্বামী বা সহধর্মিণী কিংবা সহধর্মিণীগণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অনুগ্রহপূর্বক দিবেন—

(ক) বয়স (খ) ব্যবসায় (গ) চেহারা (ঘ) শিক্ষা (ঙ) শারীরিক গঠন (চ) স্বাস্থ্য (ছ) মেজাজ (জ) অভ্যাস এবং (ঝ) ছেলেমেয়ের সংখ্যা—যদি বিধবা বা মৃতদার হন।

(২১) আপনি কিংবা আপনার সহধর্মিণী কখনও কোন জননেন্দ্রিয়-ঘটিত বা যৌনব্যাধিতে ভুগিয়াছেন কি ?

যদি তাহাই হয় তবে অনুগ্রহপূর্বক লিখুন (ক) কে ? (খ) কোন্ রোগে ? (গ) কিরূপে এবং কোন্ বয়সে এই রোগের আক্রমণ সুরু হয় ? (ঘ) রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও কি সহবাস চলিয়াছিল ? (ঙ) যদি তাহা হয় তবে, অপর পক্ষ যাহাতে সেই সেই রোগে আক্রান্ত না হন তাহার জন্য কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল ? (চ) জননেন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাধির কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছিল ? (ছ) উক্ত ব্যাধি যে বাস্তবিক নিরাময় হইয়াছিল তাহা কিরূপে স্থিরীকৃত হইল ? (জ) আপনার সঙ্গী (স্বামী বা স্ত্রী) এবং সন্তানাদির উপর ইহার কিরূপ প্রভাব হইয়াছিল ?

(২২) আপনি/আপনার স্ত্রী কি কখনও ঋতুস্রাবজনিত অসুখ—অনিয়মিত ঋতুস্রাব, বাধক ইত্যাদিতে ভুগিয়াছেন ? প্রতিকারের কি চেষ্টা করা হইয়াছে ?

(২৩) বিবাহিত জীবনে আপনি কি সুখী হইতে পারিয়াছেন ?

(২৪) যদি হইয়া থাকেন কিংবা না হইয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি ? রতিবাসনা আপনাদের মধ্যে কাহার প্রবল ? পরস্পরের বাসনা তৃপ্ত হয় কি ?

(২৫) অসুখের কারণ দূর করিবার জন্য কি চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন ?

(২৬) আপনি কি নিঃসন্তান ? কতদিন যাবৎ ? কারণ কি ? কোন সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় স্বামী বা স্ত্রীর কোন দোষ ধরা পড়িয়াছে কি ? কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি ? ফলাফল কি ? সন্তান লাভের জন্য তাবিজ কবচ নিয়াছেন কি ? ফলাফল কি ?

(২৭) আপনার কি একাধিক স্ত্রী বাঁচিয়া আছে ? একাধিক বিবাহ কেন করিলেন ? পারিবারিক জীবন আপনার সুখময় না দুঃখময় ?

(২৮) (আপনার) আপনার স্ত্রীর গর্ভাধানের পর্যায়ক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা

করুন, অর্থাৎ কতদিন পর পর গর্ভবতী হইয়াছেন। গর্ভাবস্থায় অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল ?

(২৯) কোন্ কোন্ বার গর্ভপাত (Abortion) গর্ভনাশ (Miscarraige) এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রসব হইয়াছে অথবা গর্ভপাত করানো হইয়াছে এবং ফলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি হইয়াছে ?

(৩০) গর্ভাবস্থায় কোন্ কোন্ মাসে কতদিন অন্তর সুরত চলিত ?

(৩১) গর্ভাবস্থায় কি আপনার রতি বাসনা আরও প্রবল হইয়াছিল ? যদি তাহাই হয়, তবে কোন্ মাসে ? কোন্ মাসে কোন্ আসনে (অবস্থানে) রতিক্রিয়া চলিত ?

(৩২) [গর্ভাবস্থায় সম্ভোগের] ফলে—যদিই বা কোন কিছু হইয়া থাকে—কি খারাপ ফল দাঁড়াইয়াছিল ?

(৩৩) গর্ভাবস্থায় আপনার কোন ব্যাধিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কি ? যদি হইয়া থাকে তবে তাহা কি ? কারণ কি ? কোন্ চিকিৎসায় কি ফল হইল ?

(৩৪) প্রসবকালে কোন গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছিল কি ? কিরূপ ?

(৩৫) স্বাভাবিক প্রসবক্রিয়া অপেক্ষা আপনার প্রসবক্রিয়া কতদূর এবং কোন্ দিক দিয়া নিকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করুন।

(৩৬) আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ কি প্রসববেদনাজনিত গোলযোগ বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ? যদি তাহা হয়, তবে উহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবেন।

(৩৭) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনুমানিক কতদিন, কত সপ্তাহ বা কত মাস পরে পুনরায় বিহার আরম্ভ হইয়াছিল ?

(৩৮) তাহার ফলে কোন খারাপ ফল হইয়া থাকিলে তাহা কি ?

(৩৯) গড়ে সন্তান প্রসবের কত সপ্তাহ বা কত মাস পরে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় ?

(৪০) তখন কি নবজাত শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতেছিল ?

(৪১) ঋতুস্রাব পুনরায় দেখা না দিবার পূর্বেই কি কোনবার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল ?

(৪২) জীবনের প্রথম বৎসর আপনার শিশুরা কিরূপ ছিল ?

(৪৩) যদি কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে তবে কি কারণে উহা ঘটিয়াছিল ?

(৪৪) আপনার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যমজ (দুই বা তিন) সন্তান হইয়াছে কি? অভিন্ন-যমজ সন্তান (Idential twins) হইয়াছে কি? তাহারা কি এখনও বাঁচিয়া আছে? তাহাদের নাম এবং ঠিকানা দিবেন।

(৪৫) আপনি জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? তাহাদের সুবিধা এবং অসুবিধা ও ফলাফল কি?

(৪৬) স্বামী বা স্ত্রীর ইহাতে কোন আপত্তি ছিল কি? যদি থাকে তবে কেন?

(৪৭) আপনি ফ্রেঞ্চ লেটার্স (F. L.) বা আমেরিকান টিপ্ ব্যবহার করিয়া থাকিলে কোন্ মার্কা করিয়াছেন? উহাদের তুলনামূলক সুবিধা ও গুণাবলী কি?

(৪৮) জন্মনিয়ন্ত্রণকারী কোন ঔষধ কি আপনি ব্যবহার করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে কি ফল পাইয়াছেন? সংবাদপত্রে বা অন্য প্রকারে বিজ্ঞাপিত কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন কি? তাহার ফলাফল কি হইয়াছে।

(৪৯) স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য পেসারী ব্যবহৃত হইয়াছিল কি? কোন্টা কতদিন টিকিয়াছিল? উহার ভিতরে ও বাহিরে কোন শুক্রকীট নাশক জেলী ব্যবহার করিয়াছেন? কোন্টি?

(৫০) "নিরাপদ সময়ের" সুযোগ লওয়া হইয়াছে কি? উক্ত নিরাপদ সময় কি হিসাবে গণনা করা হইয়াছে? কি ফল পাওয়া গিয়াছে?

(৫১) আপনি এই **"নিরাপদ সময়ের"** আধুনিক মতবাদ পড়িয়াছেন; উক্ত সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া মিলিত হইবার ফলে গর্ভসঞ্চার হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া ফলাফল জানাইবেন কি? (সন্তানাদি একেবারে না হউক কিংবা খুব তাড়াতাড়ি হউক এরূপ ইচ্ছা যে স্বামী স্ত্রীর নাই, তাঁহারা এই পরীক্ষা চালাইতে পারেন। এই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়)। *

* আমার যৌনবিজ্ঞান-পুস্তকের ১ম ও ২য় খণ্ডের শেষে একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলার সুদীর্ঘ উত্তর সংযোজিত হইয়াছে, ঐরূপ উত্তর সমাদরে গৃহীত হইবে।

বর্ণসূচী

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL

শ্রদ্ধেয় আবুল হাসানাৎ সাহেবের আরও কয়েকখানা জনপ্রিয়

লোকহিতকর সুপাঠ্য গ্রন্থ:

১। সচিত্র যৌনবিজ্ঞান

ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর ভূমিকা-সম্বলিত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিমত—এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহা সমাদার লাভ করিবে।

এবার আমূল পরিবর্ত্তিত, **বিরাট যৌনবিশ্বকোষে** পরিণত, ডবল ডিমাই সাইজে, সুন্দর কাগজে শোভন ১৯৫৫ সংস্করণ বাহির হইয়াছে—প্রথম খণ্ড ১০৲, দ্বিতীয় খণ্ড ১০৲; দুই খণ্ডে প্রায় ১৪৫০ পৃষ্ঠা। বহু চিত্রে পরিশোভিত।

২। সচিত্র শিশু মঙ্গল

শিশুপালন ও সন্তানের সুশিক্ষা, শিশুর শারীরিক, মানসিক তত্ত্বাবধানে কুসংস্কারবর্জিত আধুনিক স্বাস্থ্য ও মনোবিজ্ঞানের নির্দেশাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। মাতাপিতার অবশ্য পাঠ্য। মূল্য—৩৲।

৩। জন্মনিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ

অনাকাঙ্ক্ষিত পুত্র-কন্যা লাভ করা ঠেকাইতে না পারিয়া অনেকে মনে করেন, **জন্মনিয়ন্ত্রণই** ভুয়ো কথা। এই বই পড়িয়া ইচ্ছামত **সন্তানলাভ** আবার ইচ্ছা না থাকিলে **জন্মনিরোধ** করিতে পারিবেন। খেলো পুস্তক পড়িয়া অনুশোচনা বাড়াইবেন না। নানা চিত্রে বৈজ্ঞানিক ও নির্ভরযোগ্য মত ও পথ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সকলেরই অবশ্য পাঠ্য। ৪র্থ সংস্করণ—২৲।

—পুস্তকের জন্য লিখুন—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাব্‌লিশার্স—৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

দি পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, করাচী